ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

ক্রমবিকাশের পথে

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
জানুয়ারী ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ :
(প্রথম ভাগ) খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৪, কলের্তাব্দা ৫০৩৫
(দ্বিতীয় - চতুর্থ ভাগ) খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৫-১৯৫০

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রয়াসেরই অঙ্গ স্বামীজীর মূলগ্রন্থ ''ক্রমবিকাশের পথে'' প্রকাশ।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা ''আর্ষপ্রয়োগ'' হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত ''আর্ষপ্রয়োগ'' আর কোন্‌টা বা ''প্রেসের ভূত''। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় ‘‘প্রকাশকের নিবেদন’’ বলে প্রকাশ করেছি। ‘‘প্রকাশকের নিবেদন’’ বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

ক্রমবিকাশের পথের চারটি ভাগেরই মূলগ্রন্থ আমরা সংগ্রহে অক্ষম হওয়ায় পরবর্তী কালে প্রকাশিত সংস্করণকেই আশ্রয় করেছি। মূল চারটি খণ্ড ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয়। ‘‘শ্রীগুরুপূজা’’ ও ‘‘আত্মনিবেদন’’ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার সময় স্বামীজীর মুখবন্ধ-স্বরূপ। মূল সংস্করণে তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধ হিসেবে ‘‘পাঠকগণের প্রতি কয়েকটি কথা’’ রাখা হয়।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

শ্রীগুরুপূজা
আত্মনিবেদন
পাঠকগণের প্রতি কয়েকটি কথা

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সূচনা -
ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ-সমাজ-বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব ও তিন প্রকার সমাজবাদ পুস্তকের ১ম-৪র্থ অধ্যায়ের ভূমিকা
কর্ম্মযোগীর পতাকা -
ভারতীয় জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেন? ভারতে শান্তির চাবি মূর্ত্তি ও আত্মা, বেদ জ্ঞান ও পতাকা মূর্ত্তি
মূর্ত্তি ও দেবতার পূজা -
মূর্ত্তি ও নিন্দুক সম্প্রদায় ও পতাকা, মূর্ত্তি ও দেবতা পূজার বিজ্ঞান, মূর্খতা ও বর্ব্বরতার মূর্ত্তি, দেবতা ও দৈবীসম্পদ, দৈবী ও আসুর চরিত্র ভেদ, মূর্ত্তিপূজা ও শান্তির সন্ধান, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিজ্ঞান, দুর্গাপূজা ও অস্ত্রপূজা, আসুরিক সমাজের আয়ু, বিষ্ণুশক্তি ও সমাজ, বৈষ্ণব লক্ষণ, মূর্ত্তিহীন ও বুদ্ধিহীন সমাজ, মূর্ত্তি ও মনস্তত্ত্ব
মূর্ত্তি ও ঈশ্বরীয় শক্তি -
আবিষ্কার ও প্রয়োগ লক্ষ্য, নানা রঙের পতাকা ও প্রয়োগ, পঞ্চ দেবতা ও মনস্তত্ত্ব, নিষ্কাম কর্ম্ম ও আসুরিক কর্ম্ম, কর্ম্মহীনতায় ঈশ্বরীয় শক্তি লাভ হয় না, কর্ম্মী উপাসক ও জ্ঞানী, নিষ্কাম কর্ম্মী ও যোদ্ধা, উপাসক ও ধ্যানযোগী, জ্ঞানী, আসুরিক কর্ম্মী

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি গণেশ -

ঈশ্বরীয় মূর্ত্তিদর্শন, গণেশের ধ্যান, গণেশের ধ্যানে চরিত্র লক্ষণ, বুদ্ধি বিবেক ও গণেশ, গণেশ স্তরের কর্ম্ম লক্ষণ, বুদ্ধি যোগবিজ্ঞান, গণেশ চরিত্র ও কঠোরতা, গণেশ চরিত্র মানব কখন বেশী জন্মে গণেশ, মুষিক, কালা কারবার ও বিপ্লব, বুদ্ধিযোগী ও বৈরাগ্য, গণেশ স্তরের কর্ম্ম, গণেশ পতাকা রহস্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি সূর্য্য -

সূর্য্য ধ্যান, সূর্য্য ও প্রেম ভক্তি স্তর, গণেশ ও সূর্য্য চরিত্র ভেদ, প্রথম উন্নতির সোপান, সূর্য্য স্তরের জ্ঞানী লক্ষণ, রিপুজয় শক্তি, সূর্য্য স্তরের কর্ম্মী লক্ষণ, অধীন থাকার প্রবৃত্তি ও সূর্য্য স্তর, সূর্য্য পতাকা রহস্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি বিষ্ণু -

এক প্রান্তে শরীর অন্য প্রান্তে আত্মা মধ্যস্থলে বোধকেন্দ্র, ভণ্ড ভগবদ্দর্শন, বিতর্ক, বিচার আনন্দ অস্মিতা, নিত্য নিয়মে নিষ্ঠার প্রয়োজন, সমাধি, অবতারের আবির্ভাব কখন, সুখ শক্তিই বিষ্ণু, কর্ম্মী উপাসক জ্ঞানী ও অসুর, পঞ্চ দেবতার বৈজ্ঞানিক ধ্যান, নারায়ণের ধ্যান, ধ্যান ও বিষ্ণু শক্তি, ভালবাসা ও মোহ, শঙ্খ, চক্র, বিষ্ণু স্তরের জ্ঞানী ও কর্ম্মী, প্রেম বিষ্ণুমায়া, ভাগবত, তুলসী রামায়ণ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ বিষ্ণু, সামাজিক ও অসুর শাসন, শক্তি শাসন, বিষ্ণু চরিত্র মানব লক্ষণ, সমাজনেতা, রাজশক্তি, অবতার, স্বার্থ ও সুবিধাবাদী, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য তুলনা, শিক্ষা ও বিচার বিভাগ, বিষ্ণু স্তরের কর্ম্মবিকাশ সমাজ সম্পদ, তিন প্রকার বিষ্ণু চরিত্র মানব, বিষ্ণু পতাকা উহার লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি শিব

শিবপরিচয়, শান্তিই শিব, প্রাণময় কোষ, পঞ্চপ্রাণ, মৃত্যু।
মনোময় কোষ, প্রাণশরীরের উপাদান, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার
হিরণ্ময় অনুভূতি, যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য
শূদ্র, অর্দ্ধনারীশ্বর অষ্টপাশ।
বিজ্ঞানময় কোষ, নিদ্রা, কাঁচা ঘুম, সুষুপ্তি, শিবত্ব, পঞ্চ তন্মাত্রা ও
যোগাবস্থা, শিবের হস্তে কুঠার, মৃগ, ছাত্র ও শিক্ষক।
গায়ত্রী দীক্ষা, কৌল গুরু, সন্ধ্যোপাসনায় লাভ, যোগারূঢ়, ধ্যানাবস্থা
ও ভাবাবিষ্ট সাধক, আথমগোপন, কর্ম্মী ও দেবতা।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং, শিব মূর্ত্তি, মস্তিষ্ক, আজ্ঞাচক্র, গৌরীপট্ট সর্প,
শিব পূজায় শান্তি, যোগীশ্বর মস্তিষ্ক চিত্রে তত্ত্ব কেন্দ্র।
শিবস্তরের মানুষ, জ্ঞানী অজ্ঞানী আসুরিক রাজ শক্তি কেন? দুর্ব্বলবাদই
অসুরবাদ আনয়ন করে।
শিব শংকর, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, আত্ম বিকাশে গণেশ শক্তি। মজুর কৃষক
বিদ্বেষ, শিব বিষ্ণু মানব সম্বন্ধে, অস্বাভাবিক বিষ্ণুবিকাশ, ভারতের
অধঃপতন, আদি যুগের সভ্যতা, শিব মানুষের আদিপুরুষ, পাশ্চাত্য
পণ্ডিতদের মানুষের আদিপুরুষ সম্বন্ধে উদ্ভট কল্পনা।
ঋষিগণ কি জ্ঞানী ছিলেন? মানস পুত্র, পঞ্চ দেবতা, মানুষের ভাষার
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, উপাসনা কাণ্ডে পঞ্চ দেবতা। গণিত, তাল, ছন্দ, ঋষি,
অনুলোম ও প্রতিলোম জীব। সামাজিক এবং রাজশাসনের যুগ, শিবের
পতাকা ও ইঙ্গিত, নাস্তিক শিবস্তরের মানুষ ও সংগঠন।

তৃতীয় ভাগ - গীতার পুরুষোত্তম

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি দুর্গা -

শক্তি স্তরের সন্ধানে আলোচনা ও পরিচয়। পূর্ণবিকাশ লক্ষ্যে প্রধান
অবলম্বন ও বাধা, আসুরিক শক্তি, আশা মোহ অভিমান ভ্রান্তি। সত্য, প্রেম,
শান্তির অবলম্বন ও নির্ভীকতা। জীবত্বের অভিমান ও অষ্টম কলার বিকাশ।

মানব হইতে উন্নত বিকাশ সম্পন্ন জীব সম্ভব কি না। পশু স্তরের মানব ও শঙ্কর বুদ্ধ ঋষি ও পূর্ণ বিকাশ স্তরের মানব। অধ্যাত্ম বাদীগণকে শক্তিস্তরের ভিত্তি ধরিতে হইবে। সূর্য স্তরের "রক্তাম্বুজাসনম্", বিষ্ণু স্তরের "সরসিজাসনম্", শিব স্তরের "পদ্মাসীনম্" এবং শক্তি স্তরের "সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং"। শক্তি স্তর "দুর্গা বা শক্তি"। "হংস সন্ন্যাসী"। দুর্ব্বলতা হীন মহান মানব। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, গীতা, যোগ বাশিষ্ঠ্য। ঈশ্বর ও শক্তি স্তর।
দুর্গাধ্যান। "কালাভ্রাভাং"। অব্যক্ত স্তর। মস্তিষ্ক চিত্র পরিচয়। মনের কেন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, মহৎ, অব্যক্তস্তর ও প্রাণকেন্দ্র। শিব স্তর ও কামহীনতা। "কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং"। অস্থর লক্ষণ। বিভিন্নস্তরের চক্ষের চাহনি লক্ষণ। "নিবেদয়ামি চাত্মানং"। "মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং"। দেবতার কপালে চন্দ্র বিকাশ ইঙ্গিত। শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল কৃপাণ শক্তি সাধকের লক্ষণ। শক্তিশালী পর্ব্ব দিন। শক্তিস্তর ও রাজশক্তি, ধর্ম্ম ও শিব স্তর, শিক্ষা ও সূর্য্যস্তর। ষষ্ঠী দেবী, দুর্গাবোধন। "শঙ্খং, চক্রং, কৃপাণং, ত্রিশূলম্"।
"ত্রিণেত্রাং" ইচ্ছা, ক্রিয়া তথা জ্ঞানং। শক্তি ভিন্ন অন্য স্তর দুর্ব্বল।
"সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং" শক্তিস্তরের মানুষ ও সিংহ স্বভাব। গায়ত্রী উপাসনা ও শক্তিস্তর।
"ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তীং", ভোগী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মন এক স্তরে থাকে না।
"ধ্যায়েৎ" প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও পূর্ণস্তরের কর্ম্মী। ঈশ্বর কি?
"দুর্গাং জয়াখ্যাং"। আর্ত্তি, দুর্গ। মন্ত্র উচ্চারণ ও সত্যবাদিতার অভাব। ছলনা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব।
"ত্রিদশগণাবৃতাং"। এক হইতে ১৬ কলা বা ৩০ কলার বিকাশ, ঋষি সন্তান, গুরুবাদ, অবতার।
"সেবিতাং সিদ্ধি কামৈঃ" বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধির কথা। সন্ধ্যা কর্ত্তব্য। ইহার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্রশক্তি -

মন্ত্রশক্তি ও বীজমন্ত্র, প্রণবতত্ত্ব ও প্রণবরূপ, শক্তি ধ্বনি বিজ্ঞানে জপ, জপে মনের শক্তিবৃদ্ধি, মালার ঝোলা ও কুটীলতা; ওঁ জপ বিজ্ঞান, বাদ্য

ধ্বনিতে প্রণব, ধ্বনির সাধনা, মনের জড়তা নাশ, গুরু, উন্নত লক্ষ্যহীন সাধক, ওঁ মুক্তির সেতু। মস্তিষ্ক কেন্দ্র অ আ ই ইত্যাদি মস্তিষ্কে শক্তিস্তর, শ্রীকৃষ্ণ মোহহীন, পৃথিবীর মঙ্গলকর কর্ম, ভারতের পতন, স্বদেশ প্রেম, ধনতান্ত্রিকতা, কম্যুনিজম।

'অ'কার শক্তি ও সূর্য্যস্তর, উ শিবকেন্দ্র, ঋ কর্ম্মকেন্দ্র, ঌ প্রাণকেন্দ্র, ং জ্ঞানশক্তি, ঃ অব্যক্ত শক্তি, মস্তিষ্কে মন্ত্রশক্তিকেন্দ্র।

ওঁকারে শক্তি সংস্থান, ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ, ত্রীঁ, শ্রীঁ, হ্লীঁ, হুঁ, অনেক বীজমন্ত্র আছে। গায়ত্রীর সার ওঁ কার! অ হইতে ক্ষ ৫০টী ধ্বনিই বীজমন্ত্র। শক্তি ও গতি সৃষ্টির মূল উপাদান।

তান্ত্রিক, বৈদিক, পৌরাণিক ও অলৌকিক মন্ত্র। শক্তি স্তরের দৃষ্টিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয় ও তুরীয়াতীত সবই শক্তির বিভিন্ন স্তর। শক্তি চর্চ্চার অভাবে মূর্ত্তি প্রিয়তা। অনেকবার দীক্ষা, সৃষ্টির মূলে শক্তি স্তর। তন্মাত্রা ও সৃষ্টির বিজ্ঞান স্তর, আত্ম প্রবঞ্চনা অকর্ত্তব্য।

ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন কথা, ভ্রান্ত পণ্ডিত কথা। অন্ন ও যৌনবাদ ও উন্নত বিকাশবাদ, তন্মাত্রা।

শব্দ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময় কোষ, স্পর্শবোধ, ধ্বনিবোধ, লং বং রং যং হং, ঃ + অ + ং = হং, ই + অ + ং = যং, ঋ + অ + ং = রং, উ + অ + ং = বং, ঌ + অ + ং = লং, সত্ত্ব রজ তমঃ এর প্রতিনিধি বর্ণ সকল, বিজ্ঞানময় কোষের বোধে হং, যং, রং, বং, লং ভিন্ন অন্য কোন ধ্বনি প্রবেশ করে না, জীবের প্রাণ ক্রিয়া ও চিন্তাগুলিও ধ্বনিময়, অহংকার, মহৎ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবোধ। ইহার পরই ধ্বনিগুলি শক্তিময়।

সাংখ্যমতে সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ মীমাংসা হয় নাই। আনন্দময় কোষ ও শক্তিস্তর। অব্যক্ত শক্তি (কর্ত্তৃত্ব শক্তি), জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি, শান্তিশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও প্রাণশক্তি। শক্তিস্তর হইতে প্রথম শক্তি ধ্বনিময় নাদময় বা জ্ঞানময়। বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত সৃষ্টির বিবর্ত্তন ইঙ্গিত চিত্র ও ব্যাখ্যা। গীতার অক্ষর পুরুষ সাংখ্যের পুরুষ। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ ও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসঘাট।

স এবং হ উচ্চারণ। ধ্বনির বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। ধ্বনিবিকাশে পুরুষ, প্রকৃতি, তন্মাত্রা, নানাপ্রকার ধ্বনি ও বর্ণের উৎপত্তি। অনুনাসিক বর্ণ। ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতিধর্ম, সৃষ্টি বিজ্ঞানের সহিত জড়িত। বাল্যকালে প্রথম শিক্ষায় বর্ণই জ্ঞানের শেষ স্তরে শক্তির রূপ। শুধু মুসলমানই নহে বহু হিন্দুও ভারতীয় সভ্যতার মূল সূত্র হারাইয়াছে। "আমি চিরদিন আছি চিরদিন থাকিব।" অব্যক্তশক্তি ঃ, জ্ঞানশক্তি ং, শান্তিশক্তি উ, ত্যাগশক্তি ই, ইচ্ছাশক্তি অ, প্রাণশক্তি ঌ, কর্ম্মশক্তি ঋ। শক্তিপূজা বিধানে অষ্টশক্তির পূজা। চণ্ডীর তিন রূপ ও তের অধ্যায়ে বিপ্লব বিজ্ঞান, শক্তিতত্ত্ব ও বেদান্ত সূত্র। শক্তিই চিৎ। শক্তির পতাকা।

চতুর্থ ভাগ

অষ্টম অধ্যায়

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও ব্রহ্মনাড়ী -
ভারতীয় উপাসনায় কুণ্ডলিনী
আত্মবিকাশ, পশুত্ব, মানবত্ব, দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব
মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশ
ব্রহ্মনাড়ী চিত্র ও ষট্‌চিত্র
মস্তিষ্ক চিত্র I, II, III ও পরিচয়
মস্তিষ্কে আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র
যোগের দেবতা শিব, শিবে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ এক
শিবমূর্ত্তি, আজ্ঞাচক্র, কচিবৃক্ষ, বীজচিত্র ও পরিচয়
দেহতত্ত্বে শিবজ্ঞান, শিবলিঙ্গ, অষ্টমূর্ত্তি শিব
দেহতত্ত্বে ষট্‌শিব, পঞ্চমুখ ও ষড়াম্নায় শিব
একেশ্বরবাদের আড়ালে পিশাচ উপাসনা
মস্তিষ্কে কেন্দ্র; মন, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, মহৎ ও অব্যক্ত
জাতিগঠনে বিকাশবিজ্ঞান
শক্তিনাড়ী
শিবপিণ্ড আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার
মস্তিষ্কে নাড়ী সংস্থান
বিমলযশা, ধ্যানশ্রীয়া
অমৃতা, অহংতত্ত্ব
নির্ব্বাণা, নিষ্কলা, অতিমানসা
আরুণী ক্রিয়া, অনাহত নাদ
গুরুপাদুকা স্তোত্রম্‌
গুরুপাদুকায় নাড়ীসংস্থান (চিত্রসহ)
সুখবহা, সুখধা নাড়ী। পূর্ব্বজন্মের ঘটনা
যোগশিরা, শান্তিশিরা নাড়ী। ঊর্দ্ধপথে ও অধঃপথে নাড়ীধারা
নিরুদ্ধা, পশ্যন্তী নাড়ী। বরুণা জলদা নাড়ী
বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরাধ্বনি
নাদকলা, বৈখরীনাড়ী। গায়ক ও শ্রোতা, পূজার বাদ্য
মধ্যমা, মধুরা নাড়ী
গণেশকেন্দ্র সংযুক্তনাড়ী ঊর্দ্ধমুখী। কল্পনা, কল্পধারা নাড়ী
শ্রীভঙ্গা নাড়ী। মন ও পুরুষোত্তম
শ্রীধরা, তাপিনী নাড়ী। এক শরীরে অনেক কর্ত্তা

জ্বালিনী (শান্তি), বিশুষ্কানাড়ী (বৈরাগ্য), অহং ও অগ্নিধারা
বিতর্কা, বিচারা নাড়ী। বুদ্ধির শূন্য গৃহ। স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য
সম্বেগা, বিবেকা নাড়ী
নিরুদ্ধা, বিজ্ঞানা, প্রজ্ঞানা, কৈবল্যা নাড়ী
মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক নাড়ী ও চিত্র
ব্রহ্মনাড়ী, সুষুম্না, বজ্রা ও চিত্রিণী
ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বাম ও দক্ষিণ মস্তিষ্ক
মূলাধার চক্র
ব্রহ্মসূত্রী নাড়ী। ঊর্দ্ধরেতা
সুতীব্রা, বজ্রা, কুণ্ডলিনী
কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা
স্বাধিষ্ঠান চক্র। অর্জ্জমা শুক্রশিরা নাড়ী (শুক্রপাত)
মণিপুর। কল্পনা। অগ্নিশ্রোতানাড়ী। জ্বর।
কল্পশ্রোতা, প্রকল্পানাড়ী। কল্পনা কোথায় বন্ধ হয়।
অনাহত চক্র। বিশোকা। কায়াকাশধ্যান
যশপ্রভা। প্রতিভা (যশদাতা নাড়ী) সুখশ্রীয়া নাড়ী।
সুখ ও ধনদাতা নাড়ী। রাজশ্রীয়া। যোগভ্রষ্টা। নিদ্রাভঙ্গে ধ্যান
বিশুদ্ধাখ্য চক্র। বীতরাগা, সুস্থিরা, সুতৃপ্তা, বেদান্তা, সামগা
প্রাচীন ধর্ম্ম, সন্ধ্যাপূজা ও শিবস্তব। সুকৃষ্ণা, সুঘোরা
ব্যক্ত ও অব্যক্তের দ্বন্দ্ব
কালরাত্রি, মহামায়া, মহালয়া, মহামেধা, মহারাত্রি, মহামোহা
মহারাত্রি, মহানিশা, করালা, মহাঘোরা নাড়ী। মহাসন্ধ্যা ও
মহানিশার পূজা
পুরুষোত্তম ও ব্রহ্মনাড়ী। ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ।
ষট্‌চক্র ধ্যানের কথা।
তত্ত্বধ্যান। ষট্‌চক্রে ডাকিনী আদি। পূজায় নৈবেদ্য
বায়ু পিত্ত কফনাড়ী। নাড়ীজ্ঞান
প্রাণের কার্য্যাবলী (শাস্ত্রমতে)
প্রাণ, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগ
বায়ুরোগ (শুচিরোগ, সন্দেহ বায়ু), ভোজনে বায়ুধ্যান
মর্ম্মবিকার ও কায়াকাশ ধ্যান
শাস্ত্রে নাড়ীতত্ত্ব প্রসঙ্গ
নাড়ী সংস্থানে দেবদেবী। চণ্ডী, গায়ত্রী।
অর্থ ও অন্নশক্তি
নাড়ী সংস্থানে যন্ত্রতত্ত্ব, বিভিন্ন দেশের বর্ণমালার স্তর বিজ্ঞান
দৈবীসম্পদ ও ভোগ নিগ্রহ। অজ্ঞানবৃত্তি ও দৈবীসম্পদের কেন্দ্র
কষ্টকর ও কষ্টহীন উৎক্রামণ

জ্যোতির্ম্ময় শরীর। বাহিরে মৃত্যু আরামপ্রদ
জন্মগ্রহণ
সন্তানের স্বভাবে পিতামাতার প্রভাব। গর্ভাগমন
প্রেতের জন্ম নাই। জীব ও গর্ভহীন সৃষ্টি
গর্ভপাত
এক জন্মের নর অন্য জন্মের নারী হয় কিনা
নারী ভাবে সাধনায় লাভ কি?

নবম অধ্যায়

কর্ম্মফল -
সঞ্চিত, ক্রিয়মান, প্রারব্ধ
যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম
সঞ্চিত কর্ম্মফল ফলোন্মুখ
ক্রিয়মান কর্ম্ম
সঞ্চিত কর্ম্ম। প্রারব্ধে জাতি, আয়ু ও ভোগ
প্রারব্ধগত ৫ প্রকার জাতি
জন্মগত প্রকৃতি বদলায় না। জ্ঞানীর সুকৃতি ও দুষ্কৃতি
কর্ম্মে বিশ্বকল্যাণ। ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম, ইসলাম
বিশ্বকল্যাণে বেদান্ত, শক্তিবাদ, সংগঠনে বিদ্বেষবাদ
পৌরোহিত্যবাদ। কংগ্রেসীদের হিন্দুবিদ্বেষ। সাম্প্রদায়িকতা
ভুল সমাজবাদে বিশ্বের অকল্যাণ
সৃষ্টি বিবর্ত্তন ক্রম, সৎকণা, চিদ্‌অণু
অষ্টশক্তি ও আটটি অনাদি জগৎ
সৃষ্টির মূল ও বিকৃতি অংশ
পঞ্চতন্মাত্রা। পঞ্চমহাভূত অক্ষরপুরুষ
গ্রন্থ সমাপ্তি

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

শ্রীগুরুপূজা

বাবা, একদিন আপনি আমাকে লিখিবার জন্য ডায়রী দিয়াছিলেন। এক বৎসর বাদ সেখানাতে কি লিখিয়াছি দেখিতে চাহিলেন। তাহাতে আশ্রমের হিসাবের নোট ছিল। উহা দেখিয়া আপনি একটু চিন্তিত হইলেন ও বলিলেন - ‘‘ডায়রী কি তোমায় হিসাব লিখিবার জন্য দিয়াছি?’’ আমি নীরব থাকিয়া ভাবিলাম - কি আর লিখিব, লিখিবার আছেই বা কি? নিকটে টেবিলের উপর দোয়াত কলম ছিল। আপনি নূতন বৎসরের ডায়রীখানা হাতে লইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন (সেদিন বোধহয় ৩রা বা ৪ঠা জানুয়ারী ছিল) এবং এক হাতে সস্নেহে আমার ঘাড় ধরিয়া টেবিলের দিকে লইয়া গেলেন। নিজের হাতে কলমটি দোয়াতে ডুবাইয়া আমার হাতে তুলিয়া দিলেন এবং সেই তারিখের ডায়রীর পাতা খুলিয়া দিয়া বলিলেন - ‘‘লিখ’’। আমি পাতার উপরে লিখিলাম ‘‘ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ’’। আপনি সেই ভাবেই ঘাড় ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি বলিলাম ‘‘আপনি যান বাবা, আমি লিখবো’’। আপনি ঘাড়টি ছাড়িয়া দিয়া আসনে যাইয়া বসিলেন। সে বোধহয় তের বৎসরের কথা। চিরদিনের অভ্যাসই ছিল গোপনে লেখা, গোপনে ভাবা, এবং ভাল সব কিছুই গোপনে করিতে চেষ্টা করা। আপনাকে কখনও ডায়রী দেখিতে দেয়ই নাই। যখন বই লিখিতেছিলাম তখনও আপনার শরীর ছিল, কিন্তু দেখাই নাই। প্রথম খণ্ড ছাপাখানা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই আপনি শরীর ছাড়িলেন। আজ গুরুপূজার সময় কেবল এই কথাই মনে হইতেছে - ‘‘আপনি যান বাবা, আমি লিখবো’’।

পূজার উপকরণে আর ফুল বেলপাতা নাই। সাধনার পথে অন্তর জগতে যখন যেমন ফুটিয়াছে তাহাই আছে। ঋষিগণের তপঃপূত এ ভারতে এবং বুদ্ধের জন্মভূমিতে ইহা নূতন কোন কথা নহে। ইহা মানুষ মাত্রেরই অন্তরের সম্পদ। তবুও, যখন আপনি লিখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তখন আশীর্ব্বাদ করুন সাধক মাত্রেই যেন নিষ্কপট হইয়া অন্তর বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হয় এবং কর্ম্মযোগ যেন তাঁহাদের অন্তরের স্বাভাবিক বহির্ব্বিকাশ হয়। সাধক এবং নিষ্কাম-কর্ম্মভূমি ভারত যেন আবার তাহার জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তির প্রভাবে অত্যুচ্চ গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। মানুষও যেন

পশুত্বের মোহ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবকে নিজের জীবনলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ইতি -

মকর সংক্রান্তি।	প্রণতঃ -
বঙ্গাব্দ ১৩৪১, কলের্গতাব্দা ৫০৩৫।	**সত্যানন্দ**

আত্ম নিবেদন

পবিত্র গঙ্গা ধারার মতন জীবনের তিনটি দিক দৃষ্টির সামনে ভাসে। গঙ্গার ঊর্দ্ধ অংশ, মধ্য অংশ ও মিলন অংশ। আমার জীবনের এক অংশ অতীব গম্ভীর, নির্জ্জন, দ্রুতগতিবিশিষ্ট এবং অনপেক্ষ। যখন বয়স তের বৎসর তখন শ্রীগুরু স্বপ্নে দর্শন দেন। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনি তখন চুনারের গঙ্গার উপর এক নির্জ্জন ও প্রাচীন এবং ভগ্নদশাগ্রস্ত আশ্রমে থাকিতেন। স্বপ্ন দৃষ্ট সেই মহাপুরুষ, সেই পবিত্র স্থান ও সেই আশ্রম দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম। আমার জীবন যুদ্ধের ভাবপ্রবণতার যুগ এখানেই শেষ হইল। আমি ধীরে ধীরে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় ২ বৎসর পর গুরুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখন চুনারের পাহাড়ে আনন্দ মঠে, লোকালয় হইতে অনেক দূরে। আমার গুরুদেব স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সাধক, যোগী ও বিদ্বান মহপুরুষ ছিলেন। তিনি সিদ্ধ আনন্দ মঠের গুরু ধারার কলিযুগের প্রথম গুরু হইতে ১৪১ সিড়ীর গুরু। এই ধারার কলিযুগের প্রথম গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। তিনি মঠের পরম্পরাতে বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেব নামে পরিচিত। আচার্য্য শঙ্করের সময় পর্য্যন্ত তিনি সশরীরে ছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। গুরুদেবের নিকট ১০ বৎসর অবস্থান করিয়া আমি আনন্দ মঠের সাধনার ক্রমটি ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করি। আমার এই জীবন কোন সহজ জীবন ছিল না। কর্ম্মের কঠোর দায়িত্ব, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম, জনসেবা, গোসেবা ও গুরুসেবার মধ্য দিয়া আমার প্রতিটি দিন অতিবাহিত হইতেছিল। সাধনার সময়টা আমাকে সন্ধ্যার পর হইতে ঊষাকালের মধ্যবর্ত্তী সময় হইতে বাহির করিতে হইত। ভীষণ কঠোরতা এবং স্নেহদ্বারা গুরু আমাকে ভাঙ্গিতে গড়িতে লাগিলেন। ১০ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর আমি এই আশ্রম ত্যাগ করি এবং আরও কঠোর তপস্যাময় জীবনে প্রবেশ করি। এই সময় মহা মহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও স্বামী আত্মানন্দজী নামীয় এক বিদ্বান গৃহী সাধুর বারবার অনুরোধে ও চেষ্টায় আমি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করি।

গুরুর নিকট অবস্থানকালেই আমি ব্যাপক ও প্রেরণাময় উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতে পাইতাম। সেই প্রেরণাকে আমি কর্ম্মে দাঁড় করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। গুরু অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে কিছু লিখি; কিন্তু দেখা গেল, পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; আমি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমার জীবনধারার উত্তরাখণ্ড ঐখানেই শেষ হয় নাই। এখনও সেই তপঃ ধারা সমভাবেই ক্রিয়াশীল আছে। আমার জীবন লক্ষ্যের শেষ

পরিণতি গঙ্গার শেষ পরিণতির মত সমুদ্র। উহাও একভাবেই বিদ্যমান। জীবনের মধ্য যুগ ইতিমধ্যে হয়তো আরম্ভ হইয়াছে। জীবনের এই অংশ বহু রহস্যপূর্ণ। বহু জন্মের লেনদেন জড়িত বহু ঘটনার মধ্য দিয়া জীবন স্রোতের মধ্য অংশ প্রবাহিত। জীবন প্রবাহের এই মধ্য অংশও ঘাত প্রতিঘাতময়। কিন্তু ইহাতে আমার কোনই আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই। আমার জীবনের প্রথম অংশ ও শেষ অংশ আমার নিকট আমার গুরুর আশীর্ব্বাদে অটল ভাবে বিদ্যমান। গ্রন্থলেখা বা অন্য কোন কর্ম্ম করা রূপ জীবনের এই অংশকে আমি জীবনের কোন বড় ঘটনা বলিয়া মনে করি না। বহু লোকের সংস্পর্শে আসা না আসার সঙ্গেও আমার কোন আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই। আমার কর্ম্মদ্বারা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যদি কোন কল্যাণ হয়, সে কল্যাণের কর্ত্তা আমার প্রিয়তম গুরুদেব এবং সেই কল্যাণের সহায়ক কবিরাজ মহাশয়, আত্মানন্দজী ও সেইসব মহান ব্যক্তি যাঁহারা ক্রমবিকাশ ও শক্তিবাদের পথে জীবন লক্ষ্য বাছিয়া লইয়াছেন। ইতি -

সত্যানন্দ

পাঠকগণের প্রতি কয়েকটি কথা

আলোচিত গ্রন্থে মানুষ ও কর্ম্মের স্তরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভূমিকা পাঠকগণের সুবিধার জন্য বলা যাইতেছে। আমরা গ্রন্থে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি নামক ৫টী স্তরে মানুষ, তাঁহাদের চরিত্র এবং কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি পাঠকগণ নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবগণের চরিত্র বিশ্লেষণে উহা প্রয়োগ করিলে এই বিজ্ঞান যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ইহা বুঝিতে পারিবেন। কোন বিজ্ঞানই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ভিন্ন সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর জ্ঞান সম্যক উৎকর্ষ লাভ করে না। পাঠকগণ মনে রাখিবেন বিজ্ঞান কোন সাহিত্য গ্রন্থ নহে, কোন মতবাদ নহে, কোন বিশ্বাসবাদও (Faith) নহে সেইজন্য বিজ্ঞানকে মানুষ আপন কর্ম্মক্ষেত্রে যত বেশী প্রয়োগ করিবে বিজ্ঞান সেই মানুষের নিকট তত স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে।

মনোবিজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ ক্ষেত্র নিজের চরিত্র। নিজের চরিত্র কোন্ স্তরের চরিত্রের সহিত বেশী মিল হয় উহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে প্রথম। পরে নিজের পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, নেতা, গুরু, শিষ্য, ছাত্র প্রত্যেকের চরিত্রে ইহার কোন স্তরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খাপ খায় উহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, কিছু দিন (৫/৭ দিন) এভাবে চেষ্টা করিবার পর দেখিতে পাইবেন এক একজন মানুষের চরিত্র এক একটী স্তরের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, ইহাতে নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত হইতে থাকিবে এবং নিজের যদি উন্নত লক্ষ্য থাকে তবে নিজের চরিত্রও দিন দিন উন্নতির দিকে চলিতে থাকিবে।

যাঁহারা দেশ এবং সমাজের জন্য ভাবেন তাঁহারা নেতা ও সংবাদ পত্র সেবিগণের লেখা বা বক্তৃতাগুলি এই বিজ্ঞানে ফেলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। শীঘ্রই রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে কাহার কিরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উহা বুঝিতে পারিবেন। স্তরে ফেলিয়া বিচার করিতে শিক্ষা করিলে কাহার কর্ম্ম-লক্ষ্য কিরূপ এবং ঐ কর্ম্মের পরিণামে সমাজের কি ফল উহা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিবেন। প্রথম নিজের, পরে নিকটস্থ বন্ধু বান্ধবের এবং পরে দেশের জননায়কদের চিন্তা বিজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। ২,৩ মাস এইভাবে চেষ্টা করিবার পর একজন বুদ্ধিমান লোক রাজনীতি এবং সমাজনীতি সম্বন্ধে এমন জ্ঞানে অভিজ্ঞ হইবেন যে যে কোন কর্ম্মগতির কোথায় পরিণতি উহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা এই পৃথিবীর বক্ষে যুগান্তরের সূত্রপাত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই গভীর কর্ম্ম-গতি-বিদ্ পুরুষ ছিলেন। কোন্ কর্ম্মের ফল কতদূর যাইয়া কিরূপ রূপ ধারণ করিবে ইহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা কিছুতেই সমাজকে উন্নতির পথে

পরিচালিত করিতে পারিবেন না। এরূপ লক্ষণসম্পন্ন মানুষ যে সমাজের কর্ণধার নহেন সেই সমাজ দিন পর দিন দুর্দ্দশার পথেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। কোন্ স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞান সমাজকে কতটা অগ্রসর করিয়া দিতে সক্ষম এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মানুষের জীবন লক্ষ্য যে 'আত্মা' এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান লক্ষ্য যে উহার অনুকূল হওয়া প্রয়োজন ইহা বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কর্ম্মী মাত্রকেই তেজ, অভয়, ত্যাগ আদি দৈবী-সম্পদের ভিত্তি লইয়া চলিতে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণেশ চরিত্রের লক্ষণ সম্পন্ন মানুষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এ স্তরের মানুষ অন্যায় বিরোধী, ত্যাগী, যুদ্ধপ্রিয়, উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন, একটু একগুঁয়ে, চরিত্রবান, স্বদেশ প্রেমী, কষ্ট সহিষ্ণু, ন্যায় নিষ্ঠ, দৃঢ়ভাষী, সাহসী, জড়বিজ্ঞানে নিষ্ঠাসম্পন্ন হন। ইঁহারা অন্ধবিশ্বাসবাদী হন না। উন্নত বিকাশের পথে এ স্তরের চরিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। বিচারক, ওভারসিয়র, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, যুবকদের নেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ স্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যাইবে। ইঁহারা কঠোর হৃদয় হন।

তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য চরিত্রের মানুষের কথা বলা হইয়াছে। ইঁহারা প্রেমী, কোমল স্বভাব, হিসেবী প্রকৃতি, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী, ভাব প্রবণ হন। দুইটা বিরুদ্ধ মতের মধ্যে পড়িলে ইঁহারা উভয়েরই প্রিয় হইতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্য হইতে আদর্শের দিকে ইঁহাদের লোভ বেশী। মেয়েদের মধ্যে এ স্তরের বিকাশ খুব উন্নত বিকাশ জানিতে হইবে। মেয়েতে এ স্তরের বিকাশ থাকিলে দানশীলা হন। স্নেহশীলা মেয়ে মাত্রই এ স্তরের বিকাশ ক্ষেত্র। শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রফেসর, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার চিকিৎসক, রাজদূত, ধর্ম্ম প্রচারক, বক্তা, সংবাদ-পত্রসেবী, পুরোহিত, গায়ক, কবি, সেবাশ্রম ধর্ম্মী, বৈষ্ণবধর্ম্ম, অহিংসাবাদী, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, সরকারী কেরাণী ও জ্যোতিষীগণের মধ্যে এ স্তরের মানুষ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিষ্ণু চরিত্রের মানুষের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদিগকে মোটামুটী তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (১) আসুরিক বিষ্ণু, (২) দৈবীসম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু ও (৩) অপুষ্ট বিষ্ণু।

(১) ও (২) চরিত্রের বিষ্ণু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, গম্ভীর স্বভাব, চক্রী, মনে এবং বাক্যে দুই রকম, কথায় ও কার্য্যে দুই প্রকারের ভাব সম্পন্ন। ইঁহারা স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেও প্রায়ই কেহ উহা বুঝিতে পারে না। সংগঠন শক্তি সম্পন্ন, ভোগী চরিত্র। মোটেই আদর্শবাদী নহেন।

আসুরিক বিষ্ণু (২) নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক, সুবিধা বাদী।

দৈবীসম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু - কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, দাতা, উদার চরিত্র।

(১) ও (২) বিষ্ণু চরিত্র সম্পন্ন মানুষ রাজা, জমীদার, শাসনকর্ত্তা, রাজপ্রতিনিধি, গোয়েন্দা, পুলিস কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মধ্যে বেশী পাওয়া যাইবে।

(৩) অপুষ্ট বিষ্ণু কোন বিকাশের স্তর নহে। নিম্নস্তরের শিব ও সূর্য্যস্তরের মানুষ লোভ ও সঙ্গ প্রভাবে বা আসুরিক রাজশক্তির প্রশ্রয় পাইয়া বিষ্ণু চরিত্র আয়ত্ত করে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ হয়। ইহারা সমাজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হয়। নির্লজ্জ, মিথ্যুক, চাটুকার, চাটকার নির্জ্জিত, অত্যন্ত স্বার্থপর। চোর গুণ্ডা ইত্যাদিরা এ স্তরের মানুষ হইয়া থাকে। নিম্নতম পুলিসদের মধ্যে এ স্তরের মানুষের সংখ্যা খুব বেশী পাওয়া যায়। যাহারা অঙ্গ-ভঙ্গী দেখাইয়া বা কথার ভঙ্গী দেখাইয়া ভিক্ষা করে তাহারাও এ স্তরের বিকাশ ক্ষেত্র হইয়া থাকে। এইরূপ লোক ভিক্ষা দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করে ও সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে শিবস্তরের মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শিবস্তরের মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (১) নিম্নস্তরের শিব, (২) উন্নতস্তরের শিব।

উভয় প্রকার শিবস্তরের মানুষই প্রাকৃতিক জীবন প্রিয়। মাঠ, বৃক্ষতল, নদীতট, বনের ধারে ইঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অনাড়ম্বর জীবন প্রিয়, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ। অল্পে তুষ্ট। ভবিষ্যতের ভাবনা কম।

নিম্ন শিবস্তরের বিকাশ-সম্পন্ন মানুষ সরল ধর্ম্মে বিশ্বাসী, প্রায়ই প্রেত-উপাসক, মোটেই বুদ্ধিমান নহে। মুটে, মজুর, পেয়াদা, দপ্তরী, চাপ্রাসী, পূজারী, রাঁধুনী, চা ওয়ালা, সাধারণ হোটেল ওয়ালা, মেথর, প্রেস কম্পোজিটার, সহিস, গাড়োয়ান, ঝাড়ুদার প্রভৃতিদের মধ্যে এ স্তরের মানুষ বেশী দেখা যায়।

উন্নত শিবস্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ ত্যাগী, যোগী, সাধক, তপস্বী ও ঋষিগণের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত মহাপুরুষ। গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের মানুষ হইতে ইঁহারা বুদ্ধিমান, কিন্তু এসব স্তরের সম্পদকে তুচ্ছ মনে করেন। বিকাশের পথে মানুষ মাত্রেরই একস্তরে তপস্যার বেগ আসিয়া যায়, যাঁহাদের এই তপঃবেগ অকৃত্রিম তাঁহারাই বনে, জঙ্গলে, নির্জ্জন পাহাড়ে বহু বৎসর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তপস্যার অকৃত্রিম বেগ-সম্পন্ন মানুষই উন্নত শিবস্তরের বিকাশ-সম্পন্ন জানিতে হইবে। (সূর্য্যস্তরের অনুভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষকে কেহ যদি উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষের সমকক্ষ মনে করেন তবে বিচারে ভুল হইবে। উভয়ে বিকাশে, চরিত্রে ও কর্ম্মলক্ষ্যে অনেক ভেদ বিদ্যমান।)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শক্তিস্তরের বিকাশের কথা বলা হইয়াছে। মহর্ষি এবং রাজর্ষি গণের মধ্যে অনেকে এ স্তরের সন্ধান জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণ এ স্তরের বিকাশে শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ। যাঁহারা রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা এই অধ্যায়টী বহুবার পাঠ করিবেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ই এই পুরুষোত্তম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হইয়াছে। কর্ম্মিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে কর্ম্মতত্ত্বও ভাল

বুঝিতে পারিবেন। সাধক ও কর্ম্মিগণ গণেশ চরিত্র আয়ত্ত করিতে পারিলে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব অতিক্রম করিয়া শক্তিস্তরের দিকে অগ্রসর হইতে শক্তিলাভ করিবেন।

এই অধ্যায়ে প্রণবকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য আরও কিছু এখানে বলা যাইতেছে। ধ্বনির উত্থানে 'অ' এর তিন মাত্রা, স্থিতিতে 'উ' এর তিন মাত্রা এবং লয়ে 'ম্' এর নয়* মাত্রা ধ্বনি সহ জপ করিবার সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ইহা হইতেও উন্নত বিজ্ঞানে প্রণব জপ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে জপ করিবেন।

উত্থানে (মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে ও মণিপুরে একমাত্রা করিয়া) 'অ' এর তিন মাত্রা (অ-অ-অ) ধ্বনি করিবেন। স্থিতিতে (অনাহতে) 'উ' এর ধ্বনি 'অ' এর দ্বিগুণ মাত্রায় হইবে (উ-উ-উ -- উ-উ-উ)। লয়ে 'ম্' কারের মাত্রা উত্থানের তিনগুণ দিতে হইবে। লয়ের স্থান বিশুদ্ধাখ্য হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত 'ম্' এর ধ্বনি নয় মাত্রায় হইবে (ম-ম-ম -- ম-ম-ম -- ম-ম-ম)। কুক্কুটের ডাকে লক্ষ্য করিলে এই মাত্রার ভাগ আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কুক্কুটের ডাকে তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগটী হইতে দ্বিতীয় ভাগটীতে দ্বিগুণ মাত্রা হয়। তৃতীয় ভাগটি প্রথম ভাগের তিনগুণ সময় ধরিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। গ্রন্থে 'ওঁ' জপের যে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে উহা হইতে এই বিজ্ঞানে প্রণব জপ আরও উন্নত প্রকারের জানিতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিতে খুবই মধুর।

ইতি -
গ্রন্থকার

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এখানে 'নয়'' শব্দটি আমাদের সংযোজন।

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পুস্তকের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া দিতেছি। মানুষের জীবন-লক্ষ্য পূর্ণ বিকাশ। মানুষের সমস্ত প্রকার রীতিনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সবই এই আত্মভাবের অনুকূলে স্থিত। আত্মাকে ভুলিলে মানুষের জীবনের সমস্ত লক্ষ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এবং মানুষের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষাজীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠাই ভ্রান্তির পথ লয়। ফলে মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন দুঃখ ও অশান্তি পূর্ণ হয়।

এই পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যত প্রকার ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আছে সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, উহার কতগুলির লক্ষ্য জীবনের পূর্ণ বিকাশ এবং কতগুলির লক্ষ্য গুণ্ডামী, বিদ্বেষ, বর্ব্বরতা ও ভোগ। শরীর ও আত্মা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত। কেহ শরীরকেই জীবন লক্ষ্যে কেন্দ্র করেন, আবার যাঁহারা উন্নত স্তরের জ্ঞানী তাঁহারা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সমস্ত প্রকার রীতিনীতি গড়েন। পৃথিবীর সমস্ত প্রকার সমাজ তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় সমাজবাদগুলির এজন্য বিশেষ অমিল আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশের সমাজবাদগুলি ভোগ ও শরীরকে কেন্দ্র করিয়া গড়া হইয়াছে কিন্তু ভারতের সমাজবাদগুলির কেন্দ্রে আত্মাকে ধরা হইয়াছে।

আমি আছি এবং আমার শরীরও আছে। এখানে আমি থাকা অর্থে আত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমার শরীর ঐ আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। বহু গবেষণা দ্বারা পরম পূজনীয় ঋষিগণ ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন যে শরীর এবং আত্মার মধ্যে আত্মাই নিত্য ও সত্য বস্তু। কাজেই ভারতীয় সমাজবাদ যাহাতে উহাকেই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে এজন্য ঋষিগণ প্রচুর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সমাজবাদ এখনও আমাদের শিক্ষিতদের নিকট অজ্ঞাত। ইহাকে চেষ্টা করিয়া প্রচার করিতে হইবে, তাহা হইলে ভারতীয় সমাজ উহাকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। মধ্যযুগে ভারত তাহার শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র ও সমাজবাদ ভুলিয়া গিয়াছিল, ফলে পতন আসিয়াছিল।

আমাদের আমিত্ব শরীর, মন ও আত্মা, এই তিনটিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। ভারত ভিন্ন সমস্ত দেশের সমাজ বাদগুলির ভিত্তি 'শরীর' হইলেও এখন আধুনিক শিক্ষিত সমাজ মনস্তত্ত্বেরও সন্ধান কিছু কিছু রাখে। মনকে মানিলে, মানুষ অধ্যাত্মবাদী হইয়া যায়। মনকে স্বীকার করিবার পর কেহই আর জড়বাদী থাকে না। মানুষের সমাজবাদগুলিকে মনস্তত্ত্বের আলোতে ভাগ করিয়া দিলে, বর্ত্তমান যুগে আর কাহারও উহাকে অস্বীকার করিবার সাহস থাকিবে না। মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের সমাজবাদগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - (১) আসুরিক সমাজবাদ, (২) দুর্ব্বল

সমাজবাদ, (৩) শক্তিশালী সমাজবাদ। আমাদের ক্রমবিকাশ বিভিন্ন স্তরের মনস্তত্ত্বেরই গ্রন্থ। সমস্ত গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিলে পাঠক তাঁহার সব রকম মনের খোরাক প্রচুর পরিমাণে পাইবেন। দুঃখের কথা, মধ্যযুগে দুর্ব্বল সমাজবাদে ভারত জড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা ভারতীয় সমাজবাদ ও রাষ্ট্রবাদ বুঝিতে চাহেন তাঁহারা শক্তিবাদ ও শক্তিশালী সমাজ পাঠ করুন।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে একটি পতাকা মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া একটু দার্শনিক ভঙ্গীতে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে মানুষের জীবনলক্ষ্য আত্মা এবং মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞান উহার অনুকূলে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। এই অধ্যায় বুঝিতে যদি কেহ কঠিন মনে করেন তবে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পাঠ আরম্ভ করিবেন।

এই পুস্তকে ছোট ছোট চারটি অধ্যায় আছে। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আমাদের মনোবিকাশের তিনটি স্তর। প্রথম অধ্যায়ে 'পতাকা' (ধ্বজা) কে অবলম্বন করিয়া আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু ধ্যান ব্যাখ্যা দ্বারা মনোবিকাশের তিনটি অধ্যায়ের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের এই গ্রন্থ পাঠকগণের নিকট বিলক্ষণ নূতন মনে হইলেও চিন্তার খোরাকে প্রচুর উপাদান দান করিবে।

কর্ম্মযোগীর পতাকা

পতাকা স্বরূপের অনুরূপ বা প্রতিরূপ বস্ত্র নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ, যাহা কোন দণ্ডে বাঁধিয়া শূন্যে বাতাসে উড়িবার জন্য রাখা যায়। মানুষ জ্ঞান লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানকে জগতে প্রচার করিবার জন্য অনন্ত পন্থার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এ সব পন্থার আবিষ্কার মানুষের কষ্টকল্পনাপ্রসূত নহে। জ্ঞানের এইরূপ বিকাশ স্বাভাবিক। ইচ্ছা করিলেই মানুষ ইহা প্রচার করিতে পারে না, আবার ইচ্ছা করিলেই মানুষ এই স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রবাহে কেবল নিজেই নীরবে মজিয়া থাকিয়া জগৎকে জ্ঞানের এই অমিয়রস হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। প্রকাশ হওয়া যেন জ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাই জ্ঞান প্রকাশ হইয়াই চলিয়াছে। মানুষ কত পথে যে একই জ্ঞানের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিতে সত্যই নির্ম্মল আনন্দে মনপ্রাণ ভরিয়া উঠে। ভাষা, ভাব, মন্ত্র, ছন্দ, গীতি, তাল, রাগ, যন্ত্র, মুদ্রা ইত্যাদি কত পথে যে একই জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, উহার সংখ্যা করা যায় না। একই জ্ঞানের প্রতীক দাঁড় করাইতে যাইয়া মানুষ যে কত প্রকারের মনোহর মূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিয়াছেন, বিভিন্ন দিকে দাঁড়াইয়া একই বস্তুর যে কত ছবি আঁকিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? একই বস্তুকে যে কত দিক হইতে কতরূপে দেখিয়াছেন, তাহা গণনা করা সহজ নহে। তাই আবিষ্কৃত প্রত্যেক বিষয়টি সত্য, প্রত্যেক ভাবটিই প্রাণময়, প্রত্যেক নামটিই মন্ত্র, প্রত্যেক স্বরূপটিই যন্ত্র। এ যন্ত্র-প্রতীকও যে কত প্রকারের আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা করা যাইবে না। স্বরূপকে যিনি যেমন ভাবে পাইতেছেন বা স্বরূপে যিনি যেমন ভাবে মজিতেছেন, তিনি স্বরূপকে তেমনি

রূপে জগতের সম্মুখে দাঁড় করিয়া দিতেছেন। কেহ যন্ত্ররূপে, কেহ মন্ত্ররূপে, কেহ ভাবরূপে, কেহ শব্দরূপে, কেহ ছন্দোরূপে, কেহ বা (সাঙ্খ্যের) তত্ত্বরূপে স্বরূপকে মূর্ত্ত করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মানুষ স্বরূপের সন্ধানে জ্ঞানের কেন্দ্রে আসিয়া নিজের প্রতিরূপ একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিলেন, যাহা বস্ত্রে প্রস্তুত করিয়া, রং-এ রঞ্জিত করিয়া, আকাশে দণ্ড সাহায্যে উত্তোলন করিবেন; আকাশে উন্নত থাকিয়া মূর্ত্ত থাকিয়া, বাতাসে উড়িয়া, হেলিয়া দুলিয়া, সে আত্মস্বরূপের অমিয়বার্তা জগতে ঘোষণা করিবে; ইহারই নাম "পতাকা"; আকাশে চিরমুক্ত বাতাসের আঘাতে উড়িয়া উড়িয়া সে পৎ পৎ শব্দ করিতে থাকে বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হইল পতাকা, কাহার না ইচ্ছা হয় নিজের নির্ম্মল যশঃ পৃথিবীতে বিঘোষিত হয়? কে না চায় আত্মস্বরূপের অক্ষয় পতাকা, আত্মার মত অমর, প্রফুল্ল, উন্নত এবং স্বাধীন থাকিয়া আমার অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে স্বরূপের ঐরূপ মনোহর অবস্থার কথা জানাইবার জন্য, হাওয়ায় দুলিয়া পৎ পৎ শব্দে নিজের প্রাণে আনন্দ বিস্তার করে? তাই পতাকা উত্তোলন এক বিরাট আনন্দদায়ক ব্যাপার। মানব জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, এ আনন্দে আত্মাহারা হয়। 'আমার পতাকা' বাতাসে দুলিতেছে দেখিয়া আনন্দে কুটি কুটি হয়।

কথাগুলি কতকটা সহজ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। স্বরূপ মানে নিজের রূপ, আত্মার রূপ; আমাদের শরীরস্থিত আসল চৈতন্য সত্তা। আত্মা সর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, আত্মাই জীবরূপ ধারণ করিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন। জীব মোহাবরণে আবদ্ধ হইয়া নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়া আপনার এবং জগতের দুঃখের কারণ হইতেছে, নিত্য অনন্ত অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, নিজে হাবুডুবু খাইতেছে, অন্যকেও তাহাতে ডুবাইতেছে। জীব আত্মস্বরূপ বলিয়াই এরূপ শক্তিমান যে সুখ এবং দুঃখ দুইই সৃষ্টি করিতে পারে। এ জীবই অজ্ঞানাবরণে নিজের এবং অন্যের দুঃখের স্রষ্টা, আবার মোহাবরণ ভাঙ্গিয়া জীব মুক্তির অবস্থায় নিজে অনন্তশান্তিরসে ডুবিয়া থাকেন বা শান্তিস্বরূপতা লাভ করেন, এবং জগৎ তাঁহারই নির্দ্দেশে তাঁহারই আশ্রয়ে অমৃতের সন্ধান পাইয়া শান্তিস্বরূপ, আত্মস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ হইতে পারে। শরীরধারী সব জীবই জ্ঞানী হয় না, সংস্কারমুক্ত মোহমুক্ত বা জীবন্মুক্ত হয় না, বরং কোটি লোকের মধ্যে দুই-একজন অনেক সাধনা, কঠোর তপস্যা দ্বারা এ অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। জগৎ অজ্ঞানাবরণে যখন অত্যন্ত দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া অশান্তি দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তখনই জ্ঞানী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এমন একটি বস্তু তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মভোলা ভ্রান্ত জীব, আপন আত্মস্বরূপের অস্পষ্ট ছায়ামাত্র বুঝিতে সমর্থ হয়। এই বস্তুটির নাম যন্ত্র। এই যন্ত্র অবলম্বন করিয়া সে আত্মস্বরূপের প্রতিকূল আচরণ ত্যাগ করিয়া, আত্মবিকাশানুকূল কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিজের ও সমাজের আত্মনিষ্ঠ শান্তিকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হয়।

যে দেশের লোক আত্মস্বরূপের সন্ধান পাইয়াছে, সে দেশের লোক যে স্বভাবতঃই সর্ব্ব যন্ত্রে আত্মাকেই প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই জন্যই ভারতের জ্ঞান এত সুন্দর, এত প্রাণমাখা এত নির্ম্মল এত মধুর এবং এত পবিত্র। ভারত চিরদিনই ঋষি, জ্ঞানী, যোগী, ত্যাগীর নির্দ্দেশে চলিয়াছে, আজও চলিবে। ভারত কেবল পতাকাকেই

আত্মস্বরূপের সত্য, প্রেম এবং শান্তিময় যন্ত্ররূপে স্থাপন করে নাই। ভারতের ভাষা, ভাব, যন্ত্র, মন্ত্রাদি সর্ব্ব সম্পদই প্রিয়তম আত্মার কথা প্রচার করিয়া থাকে। আত্মারই রূপ সর্ব্ববিদ্যার ভিতরে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের ভাষার বর্ণগুলি পর্য্যন্ত সেই ভাবে আত্মার সহিত একাকারে গ্রথিত এবং সজ্জিত। এ জন্য ভারতের সভ্যতা ও জ্ঞানসম্পদ আজ পর্য্যন্ত মরে নাই, আর কোন যুগে মরিবেও না।

বিশ্ববাসি! কোথায় শান্তির আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? যদি সত্যই শান্তি চাও, তবে এসো, ভারতে এসো। ভারত আত্মার সহিত গ্রথিত। শান্তি তোমার আত্মার সনাতন স্বরূপ। যদি বাস্তবিকই শান্তি চাও তবে ভারতের নিকট মাথা নত করিয়া ভারতের বিদ্যা শিক্ষা কর। ভারতের সর্ব্ববিধ বিদ্যাই শান্তির বিমল ছটা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া অবস্থিত। ভারতের নিজস্ব রাজনীতি বা কর্ম্মনীতি যদি ভারত গ্রহণ করিতে পারে, তবে কেবল ভারতই নহে, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী শান্তির অমিয়ধারায় সঞ্জীবিত হইবে। সত্যই বলিতেছি, যদি শান্তি চাও তবে ভারতের আদর্শকে শিরে ধারণ করিয়া শিক্ষা কর। ভারতের কোন বিদ্যাই শান্তিহীন, প্রাণহীন এবং আত্মাহীন নহে। ভারতের সর্ব্ববিদ্যা এমন ছন্দে লিখিত আছে যে, সেই তানে তোমার অন্তরাত্মা আপনিই বাজিয়া উঠিবে। যদি বাস্তবিক বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া ভারতের বিদ্যার সামান্য চর্চ্চাও করিতে পার, তবে সত্যই শান্তি প্রবাহে মজিতে পারিবে।

স্বরূপকে মূর্ত্ত করিবার জন্য যত প্রকারের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, পতাকা তাহার মধ্যে একটি। যেখানে যে কোন স্বরূপেই মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে, সেইখানেই সেই স্বরূপকে আকাশে উড়াইয়া সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মানুষের জ্ঞান শক্তি যতটা অনুভব করিতে পারে, তাহার সবটাই মূর্ত্তিস্বরূপ এবং মানুষ (বা জীব) নিজে অমূর্ত্ত আত্মস্বরূপ, এ কথা সত্য হইলেও মানুষকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বা স্বরূপের অনুকূল আচরণের সহায়তা লাভ করিবার জন্য নিজেকে মূর্ত্তিরূপেই প্রথমে বুঝিতে হয়। অথবা স্বরূপেরই দুইটা দিক, একটা মূর্ত্ত অবস্থা, অন্য দিকটা অমূর্ত্ত অবস্থা। মূর্ত্তির দিকটাই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ ইত্যাদি নামে দার্শনিকগণ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মহাপুরুষ তত্ত্ব নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে যাহাই হউক না কেন, মূর্ত্তির গণ্ডী অতিক্রম কেহই করিতে পারেন নাই। তাই ক্রিয়ার ইতর বিশেষে, ভাবের ইতর বিশেষে বা রূপের ইতর বিশেষে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের পতাকাযন্ত্র আবিস্কৃত হইয়া আকাশে উড়িয়াছে। আবার মানুষ নিজের রুচির বৈচিত্রে একটি একটি করিয়া সব পুরাতন ভুলিয়া নূতনে মজিয়াছে।

জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক মনোহর বস্তু এবং কলার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং কৌশলে তাহা জীবন্ত করিয়া অন্যকেও অনুভব করাইয়া বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোন মূর্ত্তিকেই মানুষ পতাকাটির মত এমন সরলভাবে গড়িতে পারেন নাই, এবং কোন মূর্ত্তিকেই মানুষ এত উন্নত বা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। এমন সরল এবং সহজ ভাবে প্রাণকে নাচাইবার মূর্ত্তি আর একটিও হয় নাই। তাই আবিস্কৃত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে পতাকাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায়। এ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি মানুষের জ্ঞানাধারে সর্ব্বপ্রথম কখন জাগিয়া উঠিয়া ছিল, জগতে কোন্ যুগে এমন প্রফুল্ল মূর্ত্তি আকাশে প্রথম উড়িয়াছিল, সেই সময় নির্ণয় করা সহজ নহে। পতাকা মানুষের

কষ্টকল্পনা প্রসূত নহে, ইহা ঋষি বা জ্ঞানীর অনুভূত সত্য বস্তু; তাই এ পতাকাকে ঋষিসম্পদ, মানবজ্ঞানের আদি-ভাণ্ডার বেদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। বেদের মধ্যে পতাকার প্রচলন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঋষিগণ পতাকাকে বহু প্রকারে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অসংখ্য রূপে, অসংখ্য ভাবে এবং কর্ম্মে ইহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পতাকাকে অবলম্বন করিয়া কেবল যে স্বরূপ লাভের সহায়তাই লাভ করা যায়, তাহাও নহে, সর্ব্ববিধ লৌকিক এবং অলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্যও যে ইহার প্রয়োজন তাহা তাঁহারা জানিতেন, এবং সেইরূপ বহু প্রকারের কার্য্যে ইহার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রমাণও বেদে আছে। যাহা হউক পতাকা ঋষিআবিষ্কৃত স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞান এবং শক্তিরও স্বরূপ সম্পদ। এই স্বরূপ মূর্ত্তি বৈদিক যুগেও আকাশে উড়িয়া মানুষকে উৎফুল্ল এবং উৎসাহিত করিয়া ছিল।

মূর্ত্তি এবং দেবতার পূজা

আমরা স্বরূপকে যখন যেমন ভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করি, তেমনি ভাবে জগতে উপহার দিবার জন্য মূর্ত্তি গড়িয়া থাকি। সে মূর্ত্তি যেমন শিল্পীর করে ফুটিয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ সেই মূর্ত্তি সাহিত্যিকের ভাষায়ও জীবন্ত হইতে পারে। স্বরূপকে বা অনুভূত সত্য বস্তুকে অন্যের নিকট তুলিয়া ধরিয়া দিবার জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করি, তাহাই মূর্ত্তি বলিতে হইবে। ভাষা, ভাব, রাগ, রাগিণী, রং, ঢং, সবই মূর্ত্তির উপাদান। মূর্ত্তি নিন্দুক ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবাদীরা পতাকা পোড়াইয়া দেয় না কেন? যাহারা মূর্ত্তি নিন্দা করে তাহাদের মূর্ত্তি সম্পদের গভীর বিজ্ঞান বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আবার যাহারা অন্ধের মত কেবল সংস্কারবশে মূর্ত্তির উপর শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহারাও অবশ্যই চিন্তা করিয়া দেখিবে - মূর্ত্তি পূজার উদ্দেশ্য কি? আমরা ঘৃণিত মূর্ত্তিপূজক নহি। ঋষিগণ আমাদিগকে ঘৃণিত মূর্ত্তিপূজক প্রস্তুত করিয়া যান নাই। তাঁহারা ভিতরের সত্য সম্পদকে খুব সংক্ষেপে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিবার জন্য যে সত্য পন্থা অনুভব করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি হেয় নহে, তাই জগতের সর্ব্বত্র পতাকামূর্ত্তির সম্মান বা পূজা প্রচলিত আছে। আমরা এক একটা সত্যবস্তু অনুভব করি, আর সেই বস্তুটাকে বাহিরে লোকের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার সৌন্দর্য্য ভোগ করাইতে চাই। এই ভাবেই পৃথিবী জ্ঞানসম্পদসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

সাধনজ্ঞানহীন এবং অন্তরের উপলব্ধিহীন মিথ্যাচারী মানুষ এ কথা বুঝিতে না পারিয়া মূর্ত্তির উপর আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অন্তরস্থিত মূর্খতা, বর্ব্বরতা ও অজ্ঞানতার মূর্ত্তি তাহারই মুখে ফুটিয়া উঠে। দৈবীভাব ধরিয়া আমরা বিশুদ্ধ স্বরূপে উপনীত হইয়া থাকি। এবং অসুর ভাব অনুশীলনে আমরা অসুর হই। অসুরতোষণ করিয়া আমরা অপদার্থ ও মনুষ্যত্বহীন হইয়া যাই। দৈব, আসুর এবং অপদার্থতা সবই মূর্ত্তিতে বুঝানো যায়। কাজেই মূর্ত্তি নিন্দা মূর্খতারই অভিব্যক্তি। কুরাণ

বাদে মূর্ত্তি নিন্দা কেবল বর্ব্বরতাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। আল্লা কে? নামক পুস্তিকায় উহার আলোচনা হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে বর্ব্বরবাদ ও ধর্ম্মের নামে মূর্খবাদ যাহারা মানে তাহারাই বড় বেশী মূর্ত্তি নিন্দুক হইয়াছে। সময় খুব নিকটেই আসিতেছে যখন বর্ব্বরবাদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও মূর্খবাদ মূলক বিশ্বাসবাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ঋষি-আবিষ্কৃত মূর্ত্তি পূজা এবং দেবতা পূজার বিজ্ঞান এখানে বলা আবশ্যক। প্রত্যেক জ্ঞানী আবিষ্কৃত প্রত্যেক মূর্ত্তিরই একটা সংস্কারহীন উদার বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা প্রত্যেক মানুষের জানিতে হইবে। ঝগড়া বা অজ্ঞানতা ভাঙ্গিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তির উৎপত্তি একথার প্রচার ব্যাপক ভাবে করিতে হইবে। জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য মূর্ত্তি একটি কলা বা কৌশল মাত্র। সে কৌশল যাঁহার যত নিখুঁত এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বা দার্শনিক ক্ষেত্রে উদার হইবে, তিনি তত বড় জ্ঞানী বলিয়া জগতে পূজ্য হইয়া থাকেন। যে সব মূর্ত্তির দার্শনিক ভিত্তি দুর্ব্বল তাহা শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নিখুঁত কলাই জগতে বেশীদিন পূজা বা শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে।*

মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইল, এবার দেবতা এবং পূজা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা যাইতেছে। যে প্রেরণা মানুষকে নিঃস্বার্থ জগন্মঙ্গলকর কর্ম্মে বা যুদ্ধে উৎসাহিত করে এবং যাহা মানুষকে আত্মবিকাশে সাহায্য করে তাহারই নাম দেবতা। সত্য এবং শান্তিকে সকলের নিকট সমান ভাবে ধরিয়া দিবার জন্য জীবনপণ চেষ্টার মূলে যে অলৌকিক অন্তরের প্রেরণা উহাই দেবত্ব। দেবত্ব, বীরত্ব ও সুরত্ব এক কথা। আসুরিকতাকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য যে আন্তরিক এবং জীবনপণ প্রেরণা উহার নাম দেবত্ব। এ দেবত্ব আমাদের অন্তরের দৈবী সম্পদ। সকল মানুষের মধ্যেই ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যদি মানুষ কিছুদিন ধরিয়া সত্যের অভ্যাস করিতে পারে। গীতায় ১৬শ অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরিক সম্পদের উল্লেখ আছে। সেগুলি মোটামুটি বুঝিতে পারিলে কর্ম্ম বিজ্ঞান মোটামুটি বুঝা যায়। ১। অভয়, ২। চিত্তশুদ্ধি, ৩। জ্ঞান আর যোগনিষ্ঠা, ৪। দান, ৫। দম, ৬। যজ্ঞ, ৭। স্বাধ্যায়, ৮। তপ, ৯। সরলতা, ১০। অহিংসা, ১১। সত্য, ১২। অক্রোধ, ১৩। ত্যাগ, ১৪। শান্তি, ১৫। অকপটতা, ১৬। দয়া, ১৭। নির্লোভ, ১৮। মৃদুতা, ১৯। শ্লীলতা, ২০। অচঞ্চলতা, ২১। তেজ, ২২। ক্ষমা, ২৩। ধৃতি, ২৪। শৌচ, ২৫। অদ্রোহ এবং ২৬। নিরভিমান এইসব দৈবী সম্পদ। দর্প, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ এবং পারুষ্য এই সব আসুরিক সম্পদ। এই জগতে যত প্রকারের সৎকর্ম্ম হইয়াছে সবই দৈবী সম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষগণ দ্বারা এবং যত প্রকারের অনর্থের স্রষ্টা ঐ আসুরিক সম্পদসম্পন্ন ঘৃণিত নরপশুগণ। আসুরিক সম্পদসম্পন্ন মানুষকে ক্ষমা করিলে সমাজে পাপ স্পর্শ করে। যাঁহারা দেশ, সমাজ, সম্প্রদায় বা নিজের মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দৈবী সম্পদের অন্ততঃ একটির অবলম্বন করিবেন। এই দৈবীশক্তি মানুষকে এত বীর প্রস্তুত করে যে, সহস্র হিংস্র পশুমানবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা হইলেও নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে পারেন এবং সহস্র হিংস্র পশুর মাঝখানে অবস্থান করিয়া নিজের তপস্যায় দৃঢ় থাকিতে পারেন। আসুরিক সম্পদসম্পন্নগণ কখনও দল না বাঁধিয়া

---

* প্রকাশকের নিবেদন - পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত বাক্য - "মূর্ত্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা ও দুর্গা মূর্ত্তি ও কালী মূর্ত্তি রহস্যে বিস্তারিত দেখুন।"

কোন কাজ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, ইহারা কখনও অন্যের অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই জগতে দান করিতে পারে না। যাঁহারা দৈবী সম্পদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেবতা হইয়া যান। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের মূল, দৈবী সম্পদ। পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ইহার অবলম্বন করিবে। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিলে মানুষের মধ্যে ঐ সম্পদগুলির বিকাশ কম হয় সে ধর্ম্ম পৃথিবীতে বেশী দিন স্থায়ী হয় না। উহাকে চেষ্টা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে।

আর্য্যদের মূর্ত্তিপূজা শুধুই দৈবী সম্পদের পূজা। এ পৃথিবীতে একটা যুগে মূর্ত্তিপূজার খুব আদর হইয়াছিল। সে যুগ নিশ্চয়ই খুব শান্তি এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার যুগ ছিল। মূর্ত্তিপূজায় যত শান্তি ও শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, এত শক্তি ও শান্তির সন্ধান এত সহজে অন্য কোনও প্রকারে মানুষকে দেওয়া যায় না। হিন্দুরা পূজারহস্য ভুলিয়া গিয়াছে এবং পুরোহিতের ব্যবসায়ের শিকারে পরিণত হইয়াছে, এ জন্য হিন্দুদের অনেক অধঃপতন হইয়াছে। অসুরতোষক নেতারা হিন্দুদের আরও সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। যাঁহারা মূর্ত্তিপূজায় শান্তির প্রমাণ চাহেন তাঁহারা নিজেরা কোন যাদুঘরে (মিউজিয়ামে) গমন করিবেন, যেখানে প্রাচীনকালের বহু মূর্ত্তি রক্ষিত আছে; অন্তর লক্ষ্যের সহিত প্রত্যেক মূর্ত্তিরই আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিবেন, দেখিবেন শীঘ্রই মনটি শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

আমাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের দৈবী সম্পদের বিকাশ হইলে আমাদের মুখমণ্ডল এবং সমস্ত শরীরে তদনুরূপ জ্যোতির বিকাশ হয়। মুখ দেখিয়া যাঁহারা চিন্তাবিজ্ঞান বুঝেন, তাঁহারা সহজেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। শিল্পী এবং সাধকগণ এই বিকাশ খুব ভাল বুঝিতে পারেন। আমাদের মনের মধ্যে যখন ত্যাগের ভাব খেলিতে থাকে, সেই সময়কার মুখের ভাব এবং তেজের ভাবসম্পন্ন মুখমণ্ডল এক প্রকারের হয় না। অভিজ্ঞ শিল্পী মূর্ত্তি নির্ম্মাণকালে বিভিন্ন প্রকারের দেবতাদের মুখের উপর বিভিন্ন প্রকারের ভাবের বিকাশকে খুব সতর্কতার সহিত মূর্ত্ত করেন। সেই শান্ত সৌন্দর্য্যকে সাধক বা পূজকগণ যত তন্ময় হইয়া ভাবিতে থাকেন, ততই তাঁহাদের অন্তঃকরণ সেই দিব্য ভাবসম্পদে ভরিয়া উঠিতে থাকে। মানুষের মধ্যে যখন যে রুচি প্রবল হয়, তখন জ্ঞানিগণ জ্ঞানের অমৃত মানুষকে সেই রুচির সহিত মিলাইয়া পান করাইয়া থাকেন। গীতার দৈবী সম্পদের অভ্যাস এবং আর্য্যদের মূর্ত্তিপূজার উৎসাহ মানুষে একই বস্তুর বিকাশ করাইয়া দেয়। এক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে যে কথা মহাবীর অর্জ্জুন শুনিয়া ছিলেন, সেই কথাই একদিন বুদ্ধদেব বৃক্ষতলে বসিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন। আবার মূর্ত্তিপ্রিয়তার যুগে সেই কথাই শিল্পী শিল্পে মূর্ত্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে অসামঞ্জস্যের কিছুই নাই। আসল কথা, সকলকে শক্তিবাদী ও ধার্ম্মিক হইতে হইবে। যাহারা ধর্ম্মের মধ্য হইতে জ্ঞান বা শান্তির বিমল আনন্দ ভোগ করিতে পারে না, তাহারা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া নিজেদের অন্তরস্থিত আসুরিক বৃত্তি জাগ্রত না করিয়া আর কি করিতে পারে?

যাহা হউক, দৈবীসম্পদের অভ্যাসই দেবতা পূজা। যদি মূর্ত্তিপূজা করিয়া সেই দেবত্ব এবং বীরত্ব না আসে তাহা হইলে মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজন নাই। যদি মূর্ত্তিপূজায় সেই বীর ভাবসম্পদ না আসে, তবে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া দুর্গাপূজা করিবার প্রয়োজন কি? যে কোন প্রকারে মানুষকে দৈবী সম্পদসম্পন্ন হইতে হইবে এবং যে কোন প্রকারে আসুরিক সম্পদ এবং আসুরিক সম্পদসম্পন্নকে ধ্বংস করিয়া জগতের প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক)

শান্তিকে স্থির রাখিতে হইবে। গীতায় সেই ব্যাপারই চিত্রিত আছে। গীতা ও বেদ বাদের ইহাই নীতি।

যাঁহারা দুর্গাপূজা দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন দেবীর অস্ত্রাদিরও পূজা আছে। আর্য্যদের পূজার বিজ্ঞান খুব গভীর। এক জায়গায় বসিয়া মানুষকে সর্ব্ববিধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, রীতি, নীতি শিখাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দুর্জ্জয় এবং মুক্তিমার্গে অভয় করিয়া দিবার একমাত্র পন্থা পূজা। পূজার এক-একটি অঙ্গ এক এক প্রকারের জ্ঞানের মাপ-যন্ত্র। যাঁহারা সেইসব অবলম্বন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কর্ম্মের গতি বুঝিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন না তাঁহারা ঐ মহাশক্তি পূজা করিয়া অতি সামান্য ফলই লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের অন্তরস্থিত শক্তি সম্পদের সহিত সংযোগ লাভই শক্তিপূজার উদ্দেশ্য। দৈবীসম্পদের ধারা ধরিয়া শক্তিসম্পদের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) সহিত যুক্ত হইতে হয়। অস্ত্রগুলি কর্ম্মক্ষেত্রে আসুরিকভাবের বিরুদ্ধে দৈবীভাব এবং যুদ্ধভাব। যদি সত্যই শক্তিসম্পদের কেন্দ্রস্থলে আসিতে পার তবে নিশ্চয়ই দৈবীসম্পদগুলিরও অধিকারী হইতে পারিবে; কর্ম্ম এবং শক্তি-বিজ্ঞানও বুঝিতে পারিবে। আবার দৈবীসম্পদকে অবলম্বন করিয়া খুব সহজে আমাদের অন্তরস্থিত শক্তিসম্পদের কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারা যায়। এই কেন্দ্রীয় শক্তিকেই আমরা ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলি এবং যে শক্তি জীবত্ব এবং ঈশ্বরত্বের সংযোগস্থলে বিদ্যমান তাহাই গীতা নির্দ্দিষ্ট দৈবীসম্পদ, আর ইহাই আর্য্যশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট দেবতা। কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি সাধক সকলকেই দৈবীসম্পদের শরণাপন্ন হইতে হয়। তাহা না হইলে ঐ শক্তিসম্পদের কেন্দ্রস্থলে আসা যায় না। আসুরিক সম্পদকে আশ্রয় করিয়াও শক্তি লাভ করা যায় কিন্তু শক্তির কেন্দ্রস্থলে স্থিতি লাভ করা যায় না। আসুরিক সম্পদগুলি মহাশক্তির সহিত সংযুক্ত, কিন্তু আসুরিক সম্পদগুলি আমাদের অহংকার বা অভিমানকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। আসুরিক সম্পদকে আশ্রয় করিয়া যাহারা শক্তি-সঞ্চয়ে নিযুক্ত হয় তাহারা শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই শক্তিকে নিজের ব্যক্তিগত ভোগে লাগাইয়া আবার দুর্ব্বল হইয়া যায়। তাই তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ জন্য পৃথিবীতে অসুরবাদ* অতি শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। একটা অসুরবাদীয় সমাজ ১০০ হইতে বড় জোর ১৫০০ বৎসর জীবিত থাকে। আমরা সকলেই শক্তি-সাগরের তীরে বাস করিতেছি, শক্তি কাহাকেও আপন শক্তি হইতে বঞ্চিত করেন না। আমাদের মধ্যে যাহারা অভিমানী তাহারা সেই শক্তিকে নিজের ছোট আধারে লইয়া গিয়া সেইটাকেই নিজের শক্তি মনে করে। আবার যাঁহারা নিরভিমান, তাঁহারা সেই মহাশক্তিরই অধীন হন। যাহারা নিজেদের ছোট আধারে শক্তি-সাগরের শক্তিকে নিজের অধীন করে, তাহাদের শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। যাঁহারা সেই মহাশক্তিরই অধীন হন, তাঁহাদের শক্তির শেষ হয় না। যাঁহারা শক্তিসম্পদ সমাজ কল্যাণে ব্যয় করেন তাঁহারা শক্তিবাদী। ধন, সংগঠন, অস্ত্রবল, বুদ্ধিবল ও জ্ঞান সবই সমাজ কল্যাণের জন্য।

শক্তি লাভ করিতে হইবে, দৈবীসম্পদ লাভ করিতে হইবে, ইহার নামই দেবতা পূজা এবং শক্তিপূজা। বিভিন্ন প্রকার শক্তিকেন্দ্রে স্থিতি লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের

---

* প্রকাশকের নিবেদন - প্রাসঙ্গিকতা থেকে আমাদের অনুমান, মূলের ''অনুরাগ'' স্থানে ''অসুরবাদ'' হওয়া স্বাভাবিক।

দৈবীসম্পদ অবলম্বন করিতে হয়। আবার যিনি যেমন শক্তি-কেন্দ্রে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মে এবং স্বভাবে সেইরূপ দৈবীসম্পদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। বিষ্ণু শক্তির কথা ধরা যাক্। সর্ব্ব প্রাণীতে, সর্ব্ব জগতে সমানভাবে ব্যাপ্ত চৈতন্য সত্তাকে বিষ্ণু বলা যায়। বিষ্ণুপূজা এবং সর্ব্ব প্রাণীকে সমান ভাবে ভালবাসিবার অভ্যাস এক কথা। যাঁহারা বিষ্ণু দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভেদ ভাব, উচ্চ-নীচ ভাব থাকে না। বিষ্ণুর হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রহিয়াছে। ইহারা বিষ্ণু-কেন্দ্র স্থিত দৈবীসম্পদ। অন্যায় এবং অসত্যের দৃঢ় প্রতিবাদকে শঙ্খ বলা হয়। সমস্ত মানুষকে সংঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ রাখিবার চেষ্টাকে চক্র বলিয়া জানিতে হইবে। অসৎ সংঘের বিরুদ্ধে কৌশলও চক্র নামে খ্যাত। আসুরিক ভাবসম্পন্ন জীবকে নির্ম্মূল করিবার নিরেট অস্ত্রকে গদা বলা হয়। ইহাই শান্তির স্বাভাবিক অবস্থা, এই শান্তির নাম পদ্ম। বিষ্ণুপূজা দ্বারা ঐসব শক্তি লাভ হয়। বিষ্ণুশক্তি দর্শনে সাধকের ঐ সব শক্তি নিশ্চয়ই আসিবে। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে উপরি উক্ত ভাবে শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে।

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত চৈতন্য সত্তাতে স্থিতি লাভ করিবার পর বিষ্ণুকেন্দ্রস্থিত দৈবীসম্পদগুলি সাধকের অন্তরে স্পষ্ট ভাবে খেলিতে থাকে। তখন অসুরের ভয়ে সত্য কথা বলিতে সংকোচ আসে না। মা, ভগিনী, ধন, গৃহ অসুর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। সহস্র সহস্র লোকের অনাহারের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিজের সিন্দুকে মুদ্রারাশিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারও প্রবৃত্তি হয় না। সত্যই যদি বিষ্ণুপূজা সমাজে চলিতে থাকে, তবে সমাজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিবে। যিনি বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু রূপ হইয়া যাইবেন। ইহাতে অন্যথা হইতে পারে না। আমাদের বিষ্ণুপূজা এখন ঢাক ঢোলের বাজনা এবং দক্ষিণার পয়সা আদায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বাস্তবিক একটা পুতুল প্রস্তুত করিয়া বালকের মত খেলা করিব, এ জন্য পূজাবিধি হয় নাই। যাঁহারা পূজার ক্রম জানেন, এবং প্রকৃতই কর্ম্মী সাধক তাঁহারা একথা খুব ভাল বোঝেন। সমস্ত মানব দৈবী সম্পদেরই পূজা করিবে, দৈবী সম্পদ শক্তি সম্পদ লাভ করিবে, ইহাই পূজার ইঙ্গিত। এই দৈবীসম্পদের বিকাশের জন্যই সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত আছে। লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যেসব সম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্ত্তির আদর নাই তাহাদের বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ হয় না। তাই আমরা বড় বড় বীর যোদ্ধা, ত্যাগী, যোগী এবং দাতাগণের (দৈবীসম্পদসম্পন্ন গণের) মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজেদের মধ্যে দৈবীসম্পদের বিকাশ করিতে যত্নশীল হই। বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাজের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করা হয় না। তাঁহার অন্তরস্থিত দৈবীসম্পদের সম্মান করা হয় মাত্র। তাঁহার আত্মা বাস্তবিক আমাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না। তিনি আপন কৃতকর্ম্মের ফল অনুসারে উন্নত জ্ঞানের বিকাশের চেষ্টায় জন্ম গ্রহণ করিয়া হয়তো আমাদের সঙ্গেই বিচরণ করিতেছেন।

এইরূপ, পতাকাও মূর্ত্তিস্বরূপ। সে কেবলই স্বরূপকে বা নিজেকে স্বাধীন এবং উন্নত রাখিবার ইঙ্গিত মাত্র। আমাদের জ্ঞানাধার (মস্তিষ্ক) সর্ব্বদাই নানা প্রকার চিন্তায় এবং ভাবতরঙ্গে আলোড়িত হইতেছে। এই তরঙ্গরাশি আমাদিগকে মূল ভাবের ধারা অনুসারে

এক এক প্রকার রং-এ রঞ্জিত করিয়া দিতেছে। অহিংসা, সত্য, ত্যাগ, দান, তেজ, অভয় প্রভৃতি দৈবীভাবের আবেশে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভাবের মানুষ হইয়া যাই। স্বরূপে উপনীত হইবার জন্য, স্বরূপকে জগতে অবিকৃত রাখিবার জন্য, স্বরূপকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য, আমরা দৈবী এবং শক্তিসম্পদের বৃদ্ধি করিয়া থাকি। আমরা যখন যেমন আমাদের অন্তরস্থিত শক্তি এবং দৈবীসম্পদের নিকটবর্ত্তী হই, তখন আমরা সেইরূপ রং-এ রঞ্জিত হইয়া যাই। আমাদের অন্তরস্থিত আত্মবিকাশক ঐ ভাব এবং শক্তির মূর্ত্তিকেই জ্ঞানী মহাপুরুষগণ দণ্ডে বাঁধিয়া আকাশে স্থাপন করেন। ইহাই আমাদের "পতাকা মূর্ত্তি"। আমরা সকলেই তাহার সম্মান করিয়া নিজেরা সম্মানিত হইয়া থাকি। আমরা পতাকাকে আকাশে উড্ডীন করি না। উড্ডীন করিয়া থাকি স্বরূপকে। পতাকাকে পূজা করি না, পূজা করি অন্তরস্থিত শক্তিকে, দৈবীসম্পদকে এবং আত্মাকে। আমাদের নিকট জ্ঞানী-আবিষ্কৃত যত মূর্ত্তি আছে সকলেই ঐ একই কথার ইঙ্গিত দিতেছে। মূর্ত্তির দিকে তাকাইও না, তাকাও আত্মার দিকে। যদি মূর্ত্তিপ্রিয় হও তবে নিশ্চয়ই একদিন আত্মাকে অপ্রিয় করিবে। নিজের দিকে তাকাও, জীবের দিকে তাকাও, আত্মার দিকে তাকাও, আবার পতাকার দিকে তাকাও, দেখিও যেন মূর্ত্তির আবিষ্কারককে অজ্ঞানী প্রস্তুত করিও না, আবার অসুরকেও যেন ক্ষমা করিও না। নিজের অজ্ঞান আচরণকে জ্ঞানী নির্দ্দেশ বলিয়া প্রচার করিও না। দৃষ্টি জ্ঞানীর মত উদার কর, সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। সর্ব্বত্র সকলকে একরূপে, একভাবে গ্রহণ কর। আত্মা তোমার স্বরূপ, জীব তোমার স্বরূপ, পতাকা তোমার স্বরূপ, সর্ব্বোপরি মানুষ তোমার স্বরূপ, দেখিও যেন ভুল না হয়।

মূর্ত্তি ও ঈশ্বরীয় শক্তি

মানুষকে স্বরূপসন্ধানে আকর্ষণ করিবার জন্য, স্বরূপের অনুরূপ কর্ম্ম-ভাব এবং জ্ঞান-ভাব মানবমধ্যে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য পতাকার উদ্ভব হইয়াছিল। মানুষ যে সময় যেমন স্তরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, পতাকার ব্যবহারও সেই সময় ঠিক সেইরূপেই হইয়াছে। পতাকার আবিষ্কার যেমন জ্ঞানী, দার্শনিক বা ঋষি কর্ত্তৃক হইয়াছে, পতাকার ব্যবহার কিন্তু সেইরূপ নির্ম্মলভাবে সব দিন হয় নাই। পতাকা কেন, এ পৃথিবীর কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পদই আবিষ্কারকের নির্ম্মল মনোবৃত্তি বা শুভ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। কঠোর তপস্যা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ এবং ধৈর্য্য অবলম্বনে যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারই হইয়া থাকে, শীঘ্রই সেই বস্তু বিলাসী, ভোগী এবং অত্যাচারিগণের অধিকারে আসিয়া অন্যের উপর পীড়ন করিবার কৌশলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। স্বরূপের সন্ধানে বা স্বরূপকে জগতে অবিকৃত রাখিবার জন্য যদি পতাকার প্রয়োগ হইতে পারে, তবে সত্যই জগতে কোনও দুঃখ থাকিতে পারে না। মানুষ অন্যকে বঞ্চিত করিয়া কেবল আপনার সুখের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং অন্যকে বঞ্চিত

করিয়া অন্যকেও ঐরূপ কার্য্যে উৎসাহিত করে। এইভাবেই জগতে দিন দিন দুঃখ বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে।

অনেকে এই সব (পতাকাদি) অবলম্বনের মধ্যেই যে অশান্তির কারণ বিদ্যমান, তাহাই বিতর্ক সাহায্যে বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক অবলম্বনের মধ্যে ভুল নাই, যদি অবলম্বনটি জ্ঞানী বা ঋষি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানুষ যখন খুব ব্যাপকভাবে কোন বস্তুর অবলম্বন করেন, তখন সেই বস্তুকে খুব সৎভাবে পাইয়াই অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে জ্ঞান এবং সাধনা বা আত্মার ছাঁচে বিচারশক্তির অভাবে তাহাকে খুব সঙ্কুচিত ভাবে ব্যবহার করিতে থাকে। এ পতাকা একদিন বাস্তবিকই স্বরূপ এবং শক্তির উৎকর্ষের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত অনেকে ইহাকে সেই ভাবেই ব্যবহার করিয়াও আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায় ভাবে হইতেছে।

ঋষিযুগে আবিষ্কৃত প্রত্যেক বস্তুই সৎভাবে বা জগতের মঙ্গলের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছিল। পরবর্ত্তী যুগে ব্যবহারে ভুল বা স্বার্থ আসিয়া গিয়াছে। রঙের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া পতাকার প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পতাকার রংটি দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহা কোন্ ভাবের বা কর্ম্মের ইসারা আমাকে দিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার উদ্দেশ্যে ভুল করিয়া বা স্বার্থের সুযোগ বুঝিয়া অথবা একটা অজ্ঞান সংস্কারের অধীন হইয়া আমরা পশুর মত ইহার ব্যবহার করিতেছি।

শ্যামের পিতা এবং শ্যামের গ্রামবাসী, তাহার খুড়োকে বিশেষ দুশ্চরিত্রতার জন্য গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাড়াইবার সময় শ্যামের পিতা হয় তো রক্তবর্ণ পতাকা হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। শ্যাম বাল্যকালে দেখিল পিতা তাঁহার ভাইকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন তাহার পিতার বয়স চল্লিশ বৎসর আর শ্যামের বয়স পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র। শ্যাম বিশেষ কিছুই মনে রাখিল না। কেবল ইহাই তাহার মনে রহিল যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে পিতা নিজ ভাইকে রক্ত পতাকা হস্তে তাড়াইয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই শ্যামের পিতার মৃত্যু হইল। কিছুদিন পরে সে তাহারা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল খুড়োকে বাবা তাড়াইলেন কেন? মা বলিল - ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমার পিতা খুড়োকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তখন শ্যাম মনে মনে ভাবিল, চল্লিশ বৎসর বয়সে, আমাকেও ধর্ম্মরক্ষার জন্য ছোট ভাইকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। যাহা বাবার ধর্ম্ম, তাহা আমারও ধর্ম্ম হইবে। যাহা হউক, শ্যামের বয়স চল্লিশ হইল। তাহার মাও বৃদ্ধা হইলেন। এবার শ্যাম ছোট ভাইকে তাড়াইবার জন্য রক্ত পতাকা এবং গ্রামবাসীকে একত্র করিল। ভাই বলিল - ব্যাপার কি? শ্যাম বলিল - তোমাকে গ্রামের বাহিরে যাইতে হইবে ধর্ম্মরক্ষার জন্য। ভাই বলিল - সত্যই কি তাই? শ্যাম বলিল - মাকে জিজ্ঞাসা কর। মা বলিল - হ্যাঁ, তোমাদের পিতা এ ভাবেই ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

এই ভাবেই বংশপরম্পরায় ধর্ম্মরক্ষার নামে ভ্রাতৃ বিতাড়নে পতাকার ব্যবহার হইতে থাকিবে। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মরক্ষার দৃষ্টান্তের ঠিক এইরূপ একটি নমুনা না পাইলেও এ নমুনার সহিত মিল হয়, এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পদ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে। হয়তো কোন সময় কোন

মহাপুরুষ রক্ত পতাকার মূল বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া সমাজে প্রচার করিয়া ঐ হীন প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। সে কথা সকলে বুঝিল। কিন্তু ছোট ভাইকে ঠকাইবার একটি সুন্দর পন্থা বুঝিতে পারিয়া বড় ভাই সেটি গ্রহণ করিল না। বরং রাজ-দরবারে সমাজ-দরবারে ধর্ম্মরক্ষার ভাণ করিয়া, নকল ধার্ম্মিক সাজিয়া সেই মহাপুরুষের উপর অত্যাচারের জাল পাতিয়া বসিল। অথবা সেই মহাপুরুষের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতে লাগিল। জ্ঞানের অভাব এবং হীন স্বার্থ সমাজের সমস্তটা অঙ্গই দখল করিয়া বসিয়াছে।

একই রঙের পতাকাকে ঋষিগণ বহুভাবে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরীয় শক্তিরূপে, দৈবীভাবরূপে এবং স্থূল ব্যাপারে এই পতাকার ব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। পূজা এবং যজ্ঞবিধিতে পতাকাকে খুব উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ওলাওঠা বসন্তাদি মহামারী নিবারণ করিবার জন্য এখনও অনেক স্থলে পতাকা রোপণের প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিধি আছে। ধ্বজা রোপণের সঙ্গে সঙ্গেই মহামারির প্রকোপ কমিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। সে সবের আলোচনা এখানে করা হইবে না। আমরা এখানে কেবল কর্ম্মযোগের ভিত্তির উপর পতাকাকে স্থাপন করিয়াছি। সেই দিকটাকে পুষ্ট করিয়াই পতাকার আলোচনা করা হইবে। যদি প্রকৃত কর্ম্মযোগের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার সেইসব জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

শক্তি (দুর্গা), শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য এবং গণেশ, ইহারা আর্য্যের খুব পরিচিত পঞ্চদেবতা। ইহাদের ধ্যান-মন্ত্রাদির মত ইহাদের পতাকাও আছে। যাঁহারা সাধক তাঁহারা এই দেবতাতত্ত্ব সাধনা দ্বারা অনুভব করেন। আবার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তাঁহারা পতাকাগুলির রং বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের প্রকৃত তাত্ত্বিক স্বরূপ বুঝিতে পারেন। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের সংঘ এবং সমাজ-সংগঠনকারী, তাঁহারা সেইসব তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিবেন এবং কি করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া শক্তিশালী হইতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর্য্য ঋষিগণ যাঁহাদিগকে পঞ্চদেবতা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদেরই অন্তঃকরণের বিভিন্ন প্রকারের শক্তি সমন্বিত আত্মার স্বরূপ। তাহা কোন অবাস্তব এবং কাল্পনিক বা আমাদের বিচারশক্তির বাহিরের কোন সত্তা বা শক্তি নহে। তাহা আমাদের আত্মার সহিত গ্রথিত, আমাদের ইচ্ছাগুলি, বিচারগুলি, স্মৃতিগুলি এবং অভিমানগুলি যেমন আত্মার সহিত গ্রথিত, সেইরূপ পঞ্চ ঈশ্বরীয় শক্তিগুলিও আমাদের সকলের মূল স্বরূপ আত্মার সহিত গ্রথিত। অবশ্য এ সব শক্তি আমাদের সকলের মধ্যে সমানভাবে বিকশিত নহে। বহু জন্ম দৈবী সম্পদের অভ্যাস এবং নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অভ্যাস দ্বারা ঐসব ঈশ্বরীয় সম্পদগুলি আমাদের অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে এবং পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এখানে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন, এইসব ঈশ্বরীয় শক্তিকে বৃদ্ধি না করিয়া আমরা কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারি না। এখানে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত মুক্তি একভাবে বুঝিতে হইবে। পূর্ণভাবে না হইলেও সকলের মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তির আংশিক বিকাশও নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। মানুষে ঈশ্বরীয় ভাব এবং সংগঠন-সহ কর্ম্মীর ভাব এক কথা। আমরা সকলেই স্বভাবতঃ নিষ্কাম কর্ম্মী, ইহাই হইল আমাদের ঈশ্বরীয় ভাবের সাধারণ

সংজ্ঞা। যখন এই কর্ম্মের ফলকে কোন সংকীর্ণ আবরণের মধ্যে লইয়া আসিতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের এই কর্ম্ম সকাম বা অনীশ্বরীয় হয় বা জৈব কর্ম্ম হয়। আবার যখন এই কর্ম্মের ফলকে শারীরিক ভোগের তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করি, এবং এ কর্ম্মের প্রভাবে অন্যের কেবলই পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন ঐ কর্ম্ম আসুরিক কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। নিজের বিবেকের নিকট আমাদের মনোবৃত্তিকে আমরা নিজেরা যদি মাপিয়া লইতে পারি, তবে আমরা আমাদের কৃত কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বরীয় পর্য্যায়ভুক্ত করিব, কি অনীশ্বরীয় পর্য্যায়ভুক্ত করিব তাহা বুঝিতে পারিব। অন্যে কিছুতেই আমাদের কর্ম্ম দেখিয়া বা বাক্য শুনিয়া ইহার মাপ করিতে পারিবেন না, যদি তিনি নিজে ঈশ্বরীয় ভাবের কর্ম্মী না হন। নিয়মের বাঁধন এবং যশের উৎসাহ দ্বারা মানুষকে ঈশ্বরীয় ভাবের কর্ম্মী করিতে পারা যায় না, যদি মানুষ নিজের বিবেকের অধীন, অথবা কোন প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর অধীন হইতে না পারেন। মানুষ স্বভাবতই নিষ্কাম কর্ম্মী - যদি তিনি অন্যের স্বাভাবিক অধিকারকে নিজের বা নিজের সম্প্রদায়ের ভোগের অধীন করিতে চেষ্টা না করেন এবং নিজেকে শরীরে বা কোন বিশেষ সংকীর্ণ দলের স্বার্থের আবরণে আবদ্ধ করিয়া না ফেলেন।

তুমি কি করিতে যাইতেছ - দেখ। কেন করিতে যাইতেছ - বিচার কর। তোমার কর্ম্মে আসুরিকতার বিরুদ্ধে অভিযানের ইঙ্গিত আছে কিনা। তুমি নিজেকে কি মনে কর, শরীর কি আত্মা? তোমার কর্ম্মে প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশে সহায়তা করে, কি সঙ্কোচ করে? তোমার কর্ম্ম তোমাকে দিন দিন আত্মার ভাবে লইয়া যাইতেছে, কি শরীর, জাতি বা সম্প্রদায়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছে? বিচার কর, বুঝিতে পারিবে - তুমি নিষ্কাম কর্ম্মী, কি সকাম কর্ম্মী, ঈশ্বরীয় কর্ম্মী, বা অনীশ্বরীয় কর্ম্মী বা আসুরিক কর্ম্মী।

প্রধান কথা হইল এই যে, তোমার কর্ম্মে তোমাকে আত্মার মত স্বাধীন করে কি না। দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, তোমার কর্ম্মে জগতের সকলকে আত্মার মত আবরণহীন করিতে সাহায্য করে কিনা। ভণ্ডামী করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মী হওয়া যায় না। জানিয়া রাখিও, সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে শীঘ্রই অভিযান আসিতেছে। যত প্রকার ময়লা এবং কণ্টকাদি আত্মবিকাশের পথকে দুর্গম করিতেছে - সব সমুদ্রে যাইবে।

এই পঞ্চদেবতা-তত্ত্ব এবং ইহাদের পতাকা-তত্ত্ব বাস্তবিক একবস্তু। তর্কসাহায্যে, বিচারসাহায্যে, সাধনাসাহায্যে এবং জ্ঞান বা সমাধি অবলম্বন করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বুঝিতে হয়। উপরি উক্ত পন্থা ক্রমান্বয়ে শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। যিনি যেমন বুঝিতে পারিবেন তাঁহাকে তদনুরূপ অভ্যাস দ্বারা ইহাদের শক্তি বা ঈশ্বরীয় শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহারা আমাদেরই অন্তঃকরণস্থিত সূক্ষ্মশক্তি, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ মুক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি। জগতের যে কোন আশা (নাম যশ পর্য্যন্ত) ইহার বিকাশে প্রতিবন্ধক। প্রত্যেক কর্ম্ম-গতির মাপযন্ত্র যে আমাদের অর্জ্জিত ঈশ্বরীয় শক্তি এবং কর্ম্মহীনতা দ্বারা যে কখনও ঈশ্বরীয় শক্তি লাভ হয় না, একথা প্রত্যেক কর্ম্মী এবং সাধককে জানিয়া রাখিতে হইবে। এ জগৎ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণই আমাদের শক্তি, বুদ্ধি এবং শান্তির ক্ষেত্র। শক্তি, বুদ্ধি এবং শান্তি আমরা বাইরের কর্ম্ম হইতে লাভ করি না, আবার বাইরের কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া আমরা আমাদের অন্তঃকরণস্থিত শক্তিকে প্রস্ফুটিতও

করিতে পারি না। যাঁহারা সাধক এবং দার্শনিক, তাঁহারা অন্তঃকরণকে বাহিরের জগৎ হইতে পৃথক দেখেন না। এ জগৎটা বাস্তবিক আমাদের আত্মারই স্থূল অবস্থা, আমাদের অন্তঃকরণ আমাদের আত্মার সূক্ষ্ম অবস্থা। আমরা যখন যেমন অন্তঃকরণের শক্তির সহিত সংযুক্ত থাকি তখন বাহিরের জগৎকে ঠিক সেইরূপেই দর্শন করিয়া থাকি। বাহিরের জগতের সহিত ব্যবহারে আমাদের অন্তঃকরণের জ্ঞান এবং অজ্ঞান সবই ধরা পড়ে। আমাদের অন্তরস্থিত ভাবক্রিয়া একই বস্তুকে দশ জনের নিকট দশভাবে দেখাইতে বাধ্য করায়। একই আম গাছকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বাগানের মালী, গাছের মালিক, ছুতোর এবং কাঠুরীয়া নিজের ভিতরের ভাবক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকে। ঋষিগণ আমাদিগকে আমাদের অন্তঃকরণের শক্তির সহিত এবং আত্মার ভাবের সহিত সংযোগ দৃঢ় করিবার জন্য পতাকার প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদেবতা পতাকাগুলিকে বুঝিবার জন্য, পঞ্চদেবতার ধ্যান রহস্যগুলি বিশেষ সহায়ক হইবে। এই ধ্যান বা মূর্ত্তিগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা যেরূপ তত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি তাহা দেবতার পতাকারও স্বরূপ তত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ম্মী, উপাসক বা সাধক এবং জ্ঞানী এই ধ্যান বিজ্ঞানকে তিন ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধ্যান মন্ত্রস্থিত হস্ত, অস্ত্র, এবং কর্ম্মভাবের প্রধানতা কর্ম্মীর অবলম্বন হয়। উপাসকগণ রঙের দিকে বেশী জোর দিয়া থাকেন এবং মন্ত্রস্থিত মূর্ত্তির গঠন বা স্থিতিটির রহস্য জ্ঞানিগণ বুঝিয়া থাকেন।

কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্র জগৎ তাই তিনি সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অসত্যের বিনাশের জন্য ঈশ্বরীয় কর্ম্মশক্তি অবলম্বন করেন। উপাসক নিজে এবং ঈশ্বর এই দুইজন থাকিলেই তৃপ্ত, তাই তিনি ঈশ্বরীয় রূপে মুগ্ধ। জ্ঞানী স্বরূপ ভিন্ন কিছুই চাহেন না। তাই তিনি ঈশ্বরীয় স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। স্বরূপকে বা আত্মাকে শক্তিহীন করিয়া বুঝাই যায় না, তাই তিনি দেখেন কখন কেমন শক্তি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া খেলিতেছে। বিভিন্ন প্রকার শক্তির বিকাশে আত্মার স্বরূপও বদলাইয়া যায়। তাই তিনি কখনও গণেশ, কখনও সূর্য্য, কখনও বিষ্ণু, কখনও শিব, এবং কখনও শক্তিরূপ হন। কর্ম্মী চিরদিন যোদ্ধা, উপাসক খুব শান্ত, এবং জ্ঞানী স্বরূপে স্থিত।

নিষ্কাম কর্ম্মী এবং যোদ্ধা একই কথা। যাহারা নিজের অসৎ ভাব নষ্ট করে না, মিথ্যা, অনাচার, অত্যাচার প্রভৃতি যাহারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে না; যাহারা অন্যায়কে অন্যায় বলিতে জানে না, অন্যায় ধ্বংস করিতে যাহাদের ভয় হয়, তাহারা কোন দিনই নিষ্কাম কর্ম্মী নহে। অন্যায়ের সমূল উৎপাটনের চেষ্টা করিতে হইবে, ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। কর্ম্মী, কর্ম্মযোগী এবং নিষ্কাম কর্ম্মী এককথা। নিষ্কাম কর্ম্মীই পার্থিব ঈশ্বর। তাঁহারা এই পৃথিবীতে মানুষের আত্মবিকাশের অনুকূল পথ প্রস্তুত করিয়া দেন।

একজন নিষ্কাম কর্ম্মী জগতে আসিলে, জগতে একটা ওলটপালট হইয়া যায়। একজন লোক যদি সত্যই নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তিনি শত শত লোককে অঙ্গুলী হেলনে চালাইতে পারিবেন। দৈবী সম্পদ অবলম্বন করিতে না পারিলে নিষ্কামকর্ম্মী হওয়া যায় না। যাহারা আসুরিক ভাবাশ্রিত মানুষ তাহারা নিষ্কামকর্ম্মীর অঙ্গুলীসঙ্কেতে চলিতে পারে না; বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে। যাহা হউক, ঈশ্বরত্ব না বুঝিলে নিষ্কামকর্ম্মও বুঝা সহজ নহে।

উপাসক এবং ধ্যান-যোগী প্রায় এক কথা, তাঁহারা খুব শান্ত চিত্ত হন। তাঁহাদের নিকট বিদ্বেষহীন হইয়া অবস্থান করিলে, খুব শীঘ্রই চিত্ত শান্ত হইয়া যাইবে। কর্ম্মিগণ যেমন অঙ্গুলী সঙ্কেতে বহু লোককে কর্ম্মে আকর্ষণ করিতে পারেন তেমনই উপাসকগণ (নিষ্কাম) ইচ্ছা-শক্তি বা সঙ্গ শক্তি দ্বারা বহু লোককে (জীবকে) শান্ত করিয়া দিতে পারেন। এ স্তরের মহাপুরুষগণ খুব দীন এবং বিনীত স্বভাব হন, এবং চিরকালই বিদ্বেষভাবপূর্ণ মানুষ দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন।

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণই জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত। ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ কর্ম্মী এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ জ্ঞানী, একথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। জ্ঞানীর সঙ্গ করিলে দেহাত্ম বুদ্ধি এবং জন্ম মৃত্যুর তাড়না ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হইয়া যায়। আমি আমার ভাবও নষ্ট হয় (সেই সময়ের জন্য)। ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ সমস্ত জগতে নিজের শক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ যদি কর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবে তাঁহারা জগতের প্রয়োজন বুঝিয়া যেমন স্তরের শক্তির প্রয়োজন সেইরূপ শক্তি অবলম্বন করেন। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মানুষ চেনা খুব শক্ত, তাঁহারা খুব সহজ মানুষ হইয়া যান। জগতে এইরূপ মানুষ বিরল।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই স্তরের ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশ হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে এক একটি লোকের মধ্যে এক এক স্তরের শক্তির বিকাশ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ যাহার দ্বারা যেমন কার্য্য হইতে পারে, তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। তাঁহারা জগতের আসুরিক শক্তির কর্ম্ম-গতি বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরীয় শক্তি (সংগঠন শক্তিকে) আমরা যদি দেহাত্ম সুখের জন্য প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করি, তখনই আমরা আসুরিক কর্ম্মী হইয়া থাকি। আসুরিক কর্ম্ম প্রভাবে বহু লোকের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। আসুরিক কর্ম্মিগণও ঈশ্বরীয় শক্তিই আয়ত্ত করেন, কোন আসুরিক শক্তি একটি ঈশ্বরীয় শক্তি, কোন আসুরিক শক্তি দুইটি ঈশ্বরীয় শক্তি, কোনটি বা আরও বেশী সংখ্যক ঈশ্বরীয় শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ সেইগুলি বুঝিতে পারেন, এবং সেইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তিসমন্বিত কর্ম্মিগণকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহাদেরই দ্বারা অসুর ধ্বংস করাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি - গণেশ

ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণকে বা নিষ্কাম কর্ম্মযোগীদিগকে জ্ঞানিগণ পাঁচভাগে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারাই গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। আমাদের অন্তঃকরণস্থিত বুদ্ধি শক্তির ঈশ্বরীয় ভাবকে গণেশ বলিতে পারি। কেহ কেহ একথা শুনিয়া দেবতা খণ্ডন করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখিত হইবেন। বাস্তবিক ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। গণেশ লোক নামক যদি কোন লোক থাকে এবং গণেশ ঈশ্বর নামক যদি কোন ঈশ্বর থাকেন, তাহা যদি বাস্তবিক কোন মহাপুরুষ বা ঋষি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন কি করিয়া, যদি তাহা আমাদের অন্তঃকরণের সঙ্গে সংযুক্ত না হইয়া থাকে? যে সব বস্তু আমাদের অন্তঃকরণের সহিত সংযুক্ত হয় না, তাহাদের দর্শনও হয় না। বাহিরের বস্তু সংযোগকে বিষয়-দর্শন বলে, অন্তঃকরণস্থিত শক্তিই দেবতা এবং ঈশ্বর বলিয়া খ্যাত। যাহারা মনে করে দেবতা বা ঈশ্বরের মূর্ত্তি আমাদের স্থূল বিষয় দর্শনের মত দর্শন হয়, তাহারা ভুল বুঝিয়াছে। ঈশ্বরীয় মূর্ত্তি যত স্থূল রূপ হইয়াই আমাদের দর্শনীয় হউন না কেন, তাহা আমাদের অন্তঃকরণের বিশেষ ভাবের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া দর্শন হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ ভাবটাই বিশেষ দৈব শক্তির প্রভাবে সময় সময় কোনও মহাপুরুষ মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তাহা স্থূল বৈষয়িক দর্শন মোটেই নহে। বিষয় দর্শনে আমাদের অন্তঃকরণস্থিত মনের কেন্দ্রে বিশেষ স্পন্দন উৎপন্ন করে। ঈশ্বরীয় মূর্ত্তিদর্শনে মন ভিন্ন অন্য কোন কেন্দ্রে বিশেষ স্পন্দন উৎপন্ন করে। মূর্ত্তি দর্শন যত বড় দর্শন বলিয়াই আপনারা মনে করুন না কেন, তাহা সূর্য্যস্তরের (সূর্য্য অংশ পাঠ করুন) দর্শন মাত্র। সূর্য্যস্তরের সাধকের চরিত্রে যে সব লক্ষণ আছে, তাহা সেই সাধকে থাকা চাই। যদি না থাকে তবে তাহাকে সাধারণ মানুষ বা ধর্ম্মের নামে দোকানদার বলিয়া নির্ব্বিচারে এবং নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। গণেশ আদি ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন কোন অবাস্তব সত্তা নহেন। তাই পূজকগণ ধ্যান পুষ্পটি হস্তে রাখিয়া হৃদয়ের গভীর স্তরে ডুব দিয়া তাঁহার মিলনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেন, যখন সেই স্বরূপস্থিত হন, তখনই সেই পুষ্পটি নিজের মস্তকে রাখিয়া মানসপূজায় নিযুক্ত হন। পূজায় যিনি যত গভীরভাবে অন্তরের দিকে ডুবিতে পারেন. তিনি ঈশ্বরের ততই নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সাধকের অভাবে আর্য্যবিজ্ঞান আজ লুপ্তপ্রায়। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে আর্য্যদেশ যবন এবং ম্লেচ্ছ দলিত। ঋষিগণ কল্পনার উদ্ভাবক ছিলেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকটি ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এবার আমরা গণেশ ধ্যানে কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গণেশের ধ্যান – খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলং। দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং বন্দেশৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু।

খর্ব্বং.....গণ্ডস্থলং। ধ্যানের এই অংশটি স্বরূপের বর্ণনা। এই ভাগটির ভাবটি জ্ঞানীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাদের অনুভূতি ধ্যানের এই ভাগটির উপর বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে।

দন্তাঘাত.....কর্ম্মসু। ধ্যানের এই অংশটি কর্ম্মের বর্ণনা। বুদ্ধিশক্তির সহিত সংযুক্ত মানবগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহাদের স্বভাবে খুব পরিষ্কার ভাবে এই ভাগটি বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা একাধারে কর্ম্মী এবং অনুভূতি সম্পন্ন, তাঁহারা গণেশ ধ্যানের এই দ্বিতীয় অংশটি বেশী অনুভব করেন। এখানে বলা প্রয়োজন, কি কর্ম্মী, কি ত্যাগী, উভয়ের অনুভূতির মধ্যে উভয় ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মে এবং কথাবার্ত্তার মধ্যেই কে এস্তরের উপলব্ধি পাইয়াছেন তাহা যে কোন উপলব্ধিবান মহাপুরুষ ধরিতে পারিবেন। কর্ম্মীর কর্ম্মে গণেশের কর্ম্মলক্ষণ এবং জ্ঞানীর জ্ঞানে গণেশের জ্ঞানলক্ষণ যদি বিকাশ না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, দুইজনেরই মধ্যে সত্যের বিকাশে ভুল আছে। আমাদের কর্ম্ম হইবে আমাদের অন্তরেরই ক্রিয়ার বিকাশ, আমাদের জ্ঞান হইবে আমাদেরই অন্তরস্থিত দর্শন বা উপলব্ধি। জ্ঞানী কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মীর কর্ম্মে ভুল আছে কিনা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা অন্তরের সঠিক প্রেরণা লইয়া কর্ম্মে নামিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানীর সঙ্গ লাভে এত আনন্দিত হন যে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্মিগণ প্রায়ই বর্হিমুখী জ্ঞানী (তথাকথিত) দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। আবার জ্ঞানী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের ব্যবহারে এমন ভুল পাওয়া যায়, যাহা দেখিলে তাঁহাদের পরিমাপ সহজেই করা যায়।

অন্তরস্থিত বিভিন্নপ্রকার শক্তিকেন্দ্রে যুক্ত হইয়াই মানুষ নানাপ্রকার রীতি, নীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সমাজধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ইত্যাদি বহুবিষয়ের বিচারপূর্ণ গবেষণা করিয়া থাকেন। আমরা বলি লোকটার খুব মাথা। বাস্তবিক অন্তরের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থিত শক্তির বিভিন্ন শক্তি রহস্য (Formula) অবগত হইয়া, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া এরূপ অলৌকিক শক্তির বিকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা লেখার কৌশলে, আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে তাঁহারই বিচার কেন্দ্র লইয়া যান এবং নিজের বিচারকে গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করান। আমরা বলি, খুব বিচারপূর্ণ আচরণ, খুব বিচারপূর্ণ গবেষণা।

খর্ব্বং - (সাধারণ অর্থ) বেঁটে।
(অন্তর্নিহিত অর্থ) নিরভিমান।

স্থূলতনুং - (সাধারণ) স্থূলকায়।
(অন্তর্নিহিত) স্থির বা অচঞ্চল স্বভাব।

গজেন্দ্রবদনং - (সাধারণ) হস্তীশ্রেষ্ঠের মুখ।
(অন্তর্নিহিত) একরোকা বুদ্ধি। নিজের বিচারই ঠিক এমন ভাব। বিচার-শক্তি পশুর মত একরোকা। (মস্তকই আমাদের জ্ঞান-শক্তির স্থান)।

লম্বোদরং- (সাধারণ) ঝোলা পেট ।

(অন্তর্নিহিত) নিশ্চিন্ত এবং শান্তস্বভাব। যাহারা অভাবের ভাবনা কম ভাবে তাহাদেরই পেট ঝুলিয়া পড়ে।

সুন্দরং - (সাধারণ) সুন্দর ।

(অন্তর্নিহিত) চিত্তাকর্ষক স্বভাব।

প্রস্যন্দন্মদ - (সাধারণ) মদের প্রবাহ গাল বাহিয়া পড়িতেছে।

(অন্তর্নিহিত) অন্তরে শান্তির প্রবাহ চলিয়াছে।

গন্ধ লুব্ধ মধুপ - (সাধারণ) ভ্রমর তাহার গন্ধে লুব্ধ।

(অন্তর্নিহিত) জ্ঞানেচ্ছু তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট। (মধুপ মানে যাঁহারা জ্ঞানমধুই পান করেন এমন লোক)।

ব্যালোল গণ্ডস্থলং - (সাধারণ) গালের নিকট (মধুকরগণ) সঞ্চরণ করিতেছে।

(অন্তর্নিহিত) জ্ঞানীগণ তাঁহার সঙ্গ ধরিয়াছেন।

"যাঁহারা অন্তঃকরণের বুদ্ধির কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা নিরভিমান, স্থির স্বভাব, নিজের বিচারে বিশ্বাসী, নিশ্চিন্ত এবং শান্ত স্বভাব, চিত্তাকর্ষক বা লোকপ্রিয়, অন্তরস্থিত শান্তির প্রভাবে নিমগ্ন, জ্ঞানিগণের প্রিয় এবং জ্ঞানিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হন।" সাধক সর্ব্বপ্রথম যখন এ স্তরে আসেন তখন তাঁহার উপলব্ধির একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তিনি যে দিকে তাকান সবই শুন্য বা ফাঁকা হইয়া যায়। কি এক সূক্ষ্ম শক্তি যেন সমস্ত স্থূল দৃশ্য ঢাকিয়া দিতে থাকে। সে মনে করে আমার সব জানা হইয়া গিয়াছে। এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিতে থাকে। কিছুদিন এই অবস্থায় অবস্থান করিবার পর তাঁহার স্বভাবে ধ্যানের সবগুলি লক্ষণই আসিয়া যায়।

বুদ্ধি অর্থে বিবেক। বুদ্ধি আমাদের মনকে নিয়মিত করে। মন অনেক চায়, কিন্তু বুদ্ধি একটি মাত্র স্থির করিয়া দেয়। বুদ্ধিই বিবেক, ইহা বেশী পুষ্ট হইলে মানুষ ত্যাগী ও বিবেকশালী হয়।

এই বুদ্ধি-কেন্দ্রস্থিত কর্ম্মিগণের লক্ষণ বলিতেছি -

দন্তাঘাত বিদারিতারি – (সাধারণ) দাঁতের আঘাতে শত্রুকে বিদীর্ণ করেন।

(অন্তর্নিহিত) অন্যায়কারীকে ক্ষমা করেন না, রক্ষা করেন না। দাঁত দ্বারা আঘাত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এ স্তরের কর্ম্মিগণ পশুর মত দয়াশুন্য হইয়া অসুরনিধনে তৎপর হন। অন্যায়কারীকে নির্ব্বিচারে ধ্বংস করেন।

রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং – (সাধারণ) সেই রুধিরের সিন্দুরে শোভায়মান।

(অন্তর্নিহিত) অন্যায়কারীর রক্তপাতেই তাঁহাদের আনন্দ। সর্ব্বকালের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব। যেন সর্ব্বকালের স্বভাবে সিন্দুর মাখিয়াই রহিয়াছেন।

শৈলসুতাসুতং- (সাধারণ) হিমালয়ের কন্যার পুত্র।

(অন্তর্নিহিত) অন্যায়কারীর উপর দয়া মায়া হীন। পাষাণের বেটীর বেটা। অর্থাৎ, অত্যন্ত কঠোর হৃদয়।

গণপতিং - (সাধারণ) গণেশ।

(অন্তর্নিহিত) গণশক্তির নেতা।

সিদ্ধিপ্রদং - (সাধারণ) কর্ম্মের শেষ ফল বিজয়-দানকারী।

(অন্তর্নিহিত) বিস্তারিত ব্যাখ্যা শক্তি অংশে দেওয়া হইবে।

কর্ম্মস্থ – সর্ব্ববিধ কর্ম্মে।

বুদ্ধি কেন্দ্র-সংযুক্ত কর্ম্মিগণ অন্যায়কারীকে সমূলে ধ্বংস করেন। তাহাদের সঙ্গে ক্ষমা বা সন্ধির কোন ভাবই ইঁহারা অবলম্বন করেন না। তাঁহারা কোন দয়া করেন না। তাঁহারাই জয়লাভ করেন এবং জনসাধারণ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ মানিয়া থাকে।

যাঁহারা এই স্তরের জ্ঞান পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের স্বভাবে ধ্যানের এই অংশটুকু যেভাবে স্থান লাভ করে তাহাও লিখিতেছি। বিক্ষেপের কারণটি চিত্তে আসা মাত্র তাঁহারা তাহাকে ধ্বংস করেন, (কিভাবে ধ্বংস করেন, তাহা জ্ঞানিগণ জানেন), সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন, যাহাতে একটিও বিক্ষেপ চিত্তে উঠিতে না পারে। বিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের কারণগুলির সঙ্গে তাঁহারা কোনও প্রকার দুর্ব্বলতা দেখান না। তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হন, তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই মুক্তি লাভ করেন।

যাঁহারা নিজ নিজ অন্তঃকরণের বুদ্ধিকেন্দ্র পর্য্যন্ত স্থিতি লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের স্বভাবে এবং কর্ম্মে ঐ জ্ঞানলক্ষণ নিশ্চয়ই বিকশিত হইবে।

জগতের সর্ব্ববিধ কৌশল সম্পদ বুদ্ধিকেন্দ্রপুষ্ট মানবের আবিষ্কার। বুদ্ধিকেন্দ্রশক্তি সমন্বিত মনুষ্যগণ কখনও ভোগী হন না, ইঁহাদের প্রত্যেক কাজই অন্যের সুখসুবিধার জন্য। নানাপ্রকার কলকব্জা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রীতি-নীতি আবিষ্কার করিয়া জগৎকে সমৃদ্ধশালী করেন। যত প্রকারের বিজ্ঞানসম্পদ আছে সবই এই বুদ্ধিশক্তির কৌশল। বহু নিয়মকে একটা দুইটা কথার মধ্যে লইয়া আসা, বহু সৌন্দর্য্যকে একটা দুইটা রেখার মধ্যে লইয়া আসা, স্থূলকে নিয়মিত করিবার অসীম শক্তি এই স্তর সংযুক্ত মানবগণের অধীন। ইঁহারা নিরভিমান, কিন্তু স্বাধীন প্রকৃতির লোক। অন্যায়ের নিকট ইঁহারা মাথা কখনও নত করেন না। ইঁহারা মালিকের অন্যায় পর্য্যন্ত সমর্থন করিতে পারেন না। ইঁহারা খুব কঠোর স্বভাববিশিষ্ট কর্ম্মী এবং ত্যাগী। ইঁহাদের ধৈর্য্য বিশ্বাস অসীম। ইঁহাদের কথা কেবল সত্যকে স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য হয়, কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া ইঁহারা কথা বলেন না।

জগৎ যখন খুব ভোগবাদী হইয়া পীড়নজাল চারিদিকে বিস্তার করিয়া বহু লোককে বহু জীবকে কষ্ট দিতে থাকে, তখনই এ স্তরের শক্তিসম্পন্ন মানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা জগৎকে নূতন ছাঁচে গঠিত করেন। ইঁহারা ত্যাগ, সত্য, বীরত্ব এবং সাম্যবাদের উপর সর্ব্ববিধ নীতিকে প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের পরিচালনার জন্য প্রায়ই নেতার প্রয়োজন হয় না। ন্যায় অন্যায় ইঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারেন। মনে মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে খুব উত্তেজিত হইতে থাকেন এবং প্রকাশ্যে নির্ভয়ে প্রতিশোধ লইবার জন্য দণ্ডায়মান হন। ইঁহারা কখনও ক্ষমা করেন না। ইঁহারা নির্ভীক প্রকৃতির লোক। ভাল কাজে ইঁহারা সব সময়ই প্রথমে নামিয়া আসেন।

আমরা পঞ্চ দেবতার ধ্যানগুলির ব্যাখ্যা মাত্র এই গ্রন্থে করিয়াছি। কিন্তু একটা স্তরে যেসব রহস্য পাওয়া যায় উহার সব কথা এইসব সংক্ষিপ্ত ধ্যানে সন্নিবেশিত হয় নাই। বিস্তারিত ধ্যান ও রহস্য ব্যখ্যা করিলে একটা স্তরের আরও অনেক রহস্য জানা যায়। গণেশ ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত প্রিয় ও পুজ্য দেবতা। প্রতি দোকানে স্বস্তিক চিহ্ন ও গণেশ

মূর্ত্তিটি বড়ই শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হয়। ইহার কারণ গণেশ গণবিপ্লবের দেবতা। এই দেবতার বাহন মূষিক। মূষিক খাদ্যচোর জীব। মহাযুদ্ধের অনুগ্রহে কালা কারবারের কথা এখন সকলেই অনুভব করিতে পারিয়াছে। মূষিক মানে কালাকারবারী। হঠাৎ দেখা গেল সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার হইতে কোথায় উধাও হইয়াছে এবং দ্রব্যাদি দ্বিগুণ তিনগুণ দরে বিক্রয় হইতেছে। এইরূপ হঠাৎ দ্রব্যাদিকে আড়াল রাখিয়া দেওয়াই মূষিক বৃত্তি। ব্যবসায়ীরা এইরূপ মূষিক হইলেই সমাজে গণবিক্ষোভ হইয়া গণবিপ্লব দেখা দেয়। প্রাচীন কালে ঋষিগণ সমাজের ব্যবসায়ীদিগকে অধিক লাভ লইয়া কারবার করিতে নিষেধার্থক মূষিকসহ গণেশ মূর্ত্তি দোকানে রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আমরা এসব সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক কথা শক্তিশালী সমাজ নামক গ্রন্থে বলিব। পাঠকগণ গণেশ ধ্যানটুকুতেই গণেশ স্তরের সব কথার মোটামুটি আভাস পাইতে পারেন। এই গ্রন্থে পঞ্চ দেবতার ধ্যানে যেসব ধ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে উহার কোনটিই বিস্তারিত ধ্যান নহে। এজন্য আলোচ্য কোন স্তরের সব কথাই একটা ধ্যানে পাওয়া যায় না। সব কথা দেখাইতে হইলে অনেকগুলি ধ্যান হইতে সে সব দেখানো যায়।

এ স্তরের জ্ঞানিগণ খুব বৈরাগ্য ভাবাপন্ন এবং নির্জনতা প্রিয় হন। তাঁহারা মুক্তির পথ ধরেন। এ স্তরের জ্ঞানী মহাপুরুষগণ প্রায়ই শিবের স্তর পর্য্যন্ত গিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহেন না। মুক্তির পথ গণেশের মধ্য দিয়াই করিতে হয়। তাহা যে কোন মুক্তিই হউক।

বিচারক, জ্ঞান বিজ্ঞান কলকব্জার আবিষ্কারক, শিল্পী, স্থপতি (ইঞ্জিনিয়ার), প্রত্নতত্ত্ববিৎ, এ স্তরের মানুষে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গণেশ স্তরই এইসব শক্তিবিকাশক স্তর। বিষ্ণু, সূর্য্যাদি অন্যান্য স্তরের স্বভাববিশিষ্ট মানুষও উপরিউক্ত বিভাগে কাজ করিতে পারেন। একজন মানুষে এক দুই বা ততোধিক স্তরের শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়। তাই স্বভাব দ্বারাই মানুষ চিনিতে হয়।

গণেশ পতাকা পীতবর্ণ এবং অঙ্কুশ চিহ্নিত। স্বস্তিক যন্ত্রও গণেশেরই যন্ত্র। পীত বা গেরুয়া রঙ্গের উপর স্বস্তিক চিহ্ন দিলেও গণেশ পতাকা হয়। ইহার বিস্তারিত রহস্য উপরে দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপ রহস্য বলা যাইতেছে। পীতবর্ণ ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের বর্ণ। অঙ্কুশ - বেশী স্থূলকায় পশুকে (হস্তীকে) নিয়মিত করিবার অস্ত্র। জড়বাদ, ভোগবাদ ও দেহাত্মবাদকে নিয়মিত রাখিবে। দেহাত্মবাদই পশুত্ব। এ পশুত্বের অধীন হইও না। দেহাত্ম বুদ্ধি ত্যাগ কর। দেহের ভোগ নিয়মিত রাখ। ভোগবাদকে প্রকাণ্ড পশু বলিয়া জানিবে। ইহাকে নিয়মিত রাখিতে না পারিলে সমাজ প্রপীড়িত হইবে। যখন মানুষ ভোগে বিলাসে ডুবিয়া যায়, জাগতিক ভোগসম্ভারে আত্মহারা হয়, তখন এই পতাকা মানুষকে জানাইয়া দিতে থাকে ভোগে সুখ নাই। ভোগই পশুত্ব এবং জড়ত্ব। ত্যাগই শান্তি। ত্যাগই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রথম সিঁড়ি। ভোগবাদই জগতের দুঃখের কারণ। এই পতাকা যখন মানুষের অন্তরে দুলিয়া উঠে তখন তাঁহার জীবনের এক নূতন বিকাশ দৃষ্ট হয়। সে জানিতে পারে একের ভোগের জন্য লক্ষ মানুষের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। লক্ষ মানুষের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করা পাপ। লক্ষ মানুষের প্রাকৃতিক সুবিধা হরণ করিলে নিজের বিলাস চলে। তাই সে বলিতে শিখে, চাই না – ভোগ চাই না। তখন সে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে ভোগকে সমাজে নিয়মিত করিতে।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি - সূর্য্য

গণেশ পতাকা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইল। যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা এই সামান্য ইঙ্গিতে অনেক তথ্য উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। এবার সূর্য্য-ধ্যানে তন্ময় হইয়া দেখিব, ঐ পতাকা আমাদের মধ্যস্থিত কোন্ সম্পদরাশির সহিত আমাদিগকে মিলাইতে চায়। আমাদের অন্তরস্থিত ভালোবাসার ঈশ্বরীয় ভাবকে সূর্য্য বলা যায়। সূর্য্য অজ্ঞানান্ধকার নষ্টকারী আলো, জড়ত্ব নষ্টকারী তেজ। এ স্তরের সহিত পরিচয় হইবার পর কর্ম্মিগণের ধারণা হয় যে মানুষ জানে না বলিয়া অন্যায় করে। যদি মানুষকে শিক্ষার আলো দিতে পারা যায়, তবে মানুষ নিশ্চয়ই সংযম এবং দেবত্ব লাভ করিতে পারে। এ স্তরের সংযুক্ত মহাপুরুষগণ শিক্ষার ভিত্তির উপরই সমস্ত কায়েম করিতে চাহেন। শিক্ষা বা প্রচার দ্বারা সমস্ত মানুষকে সংযত করিতে চাহেন। তাঁহারা প্রেমের শাসনের পক্ষপাতী। নিজেরা অভিমান করিয়া কষ্ট সহিয়া অন্যকে সংযত করিতে চাহেন। ইহারা দৈবীমোহগ্রস্ত। শিক্ষা দ্বারা এবং অভিমান করিয়া তাহাকে সংযত করা চলে, যে না জানিয়া না বুঝিয়া অসুর হয়। যে জানিয়া বুঝিয়া অসুর হয় তাহাকে এই শক্তি দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা করিলে এই দুর্ব্বলতার আড়ালে সে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

সূর্য্যধ্যান – রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্ত জগতামধীপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।

রক্তাম্বুজাসনং - (সাধারণ) রক্তবর্ণ কমলে আসীন।

(অন্তর্নিহিত) অনুরাগে (ঈশ্বরীয় রূপে আত্মহারা)।

অশেষ গুণৈক সিন্ধুং – (সাধারণ) অনন্ত গুণের একটি সাগর।

(অন্তর্নিহিত) চরিত্রটি এমনভাবে নিয়মিত যাহাতে কোনও প্রকার কলঙ্ক আরোপ করা যায় না। মধুর স্বভাব।

ভানুং - (সাধারণ) সূর্য্য।

(অন্তর্নিহিত) তেজস্বী পুরুষ। অজ্ঞানহীন পুরুষ।

সমস্ত জগতামধীপং - (সাধারণ) সমস্ত জগতের অধীশ্বর।

(অন্তর্নিহিত) জগৎপূজ্য মহাপুরুষ।

ভজামি – ভজনা করি।

আমাদের অন্তরস্থিত ভালবাসার ঈশ্বরীয় ভাবকে সূর্য্য বলা হইয়াছে। গণেশ ধ্যানের ন্যায় সূর্য্য ধ্যানকেও দুইভাগে ভাগ করিয়া আমরা ইহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ধ্যানের প্রথম অংশটির ভাবটি (এ স্তরে প্রতিষ্ঠিত) জ্ঞানিগণের আনুভবে ফুটিয়া উঠে। এ স্তরটা ভক্তির স্তর। ভক্তির স্বরূপই এ স্তর। এ স্তরের জ্ঞানিগণকে ভক্ত আখ্যা দেওয়া যায়।

প্রথম প্রথম সাধক যখন ভগবানের স্পর্শ লাভ করেন, তখন হঠাৎ এইরূপে নিজেকে পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। স্নেহময় অরুণাভ জ্যোতিতে সাধকের ভিতর বাহির ভরিয়া যায়। সেই জ্যোতিরই এক কোণে নিজেকে যেন সর্ব্বদাই লুকাইয়া রাখিতে চাহেন। সাধারণ লোক দেখিতে পান, কি এক অমৃতের দৃশ্য সাধক অনিমিষ দর্শন করিতেছেন। সাধক দেখেন, সমস্ত বিশ্ব সংসারই এই কাঁচা রঙে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার দর্শকও সেই লাবণ্যময় জ্যোতির বিকাশে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া কতই না শান্তি পাইয়া থাকেন। দেখিয়া দেখিয়া কেবলই দেখিতে চাহেন। যাঁহাকে দেখিতে এমন মধুর, তিনি যাঁহার দর্শনে বিভোর সেই প্রিয়তম না জানি কতই মধুর। পতীর ভাবনায় তন্ময় সতীর মুখে এবং পুত্রের বিরহে কাতর স্নেহশীলা জননীর বেদনাপুর্ণ হৃদয়ের ভাব দ্বারা প্রতিফলিত মুখমণ্ডলে ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ 'রক্তাম্বুজাসনং' বলিতেই সবটা বুঝিতে পারিবেন, আরও যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা চৈতন্য চরিতামৃত আদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। যাঁহারা ভক্তির পথে আত্মার সন্ধান পান, তাঁহারা এখান হইতেই পথ শুরু করেন। এ পথে যাঁহারা যান, তাঁহারা প্রায়ই বিষ্ণুর (ইহার পর আলোচনা হইবে) অনুভূতি পর্য্যন্ত গিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহেন না। ইঁহারা দ্বৈতবাদ এবং মূর্ত্তি পূজা ভালোবাসেন। মূর্ত্তিকেই নিত্য মনে করেন। সূর্য্য স্তরের প্রথম অনুভূতি বায়োস্কোপের ছবির মত মূর্ত্তিরই খেলা। এ স্তরে যে কোন মূর্ত্তিই খুব প্রিয় এবং সুন্দর দেখায়। স্থূল মূর্ত্তিকে ইহারা স্থূল মূর্ত্তির মত জড় দেখেন না, ইহারা মূর্ত্তি দর্শনকেই ভগবৎ দর্শন মনে করেন। এ স্তরের সাধকগণের জীবনে ভগবানের অনেক দৈবীলীলাও প্রত্যক্ষ হয়। সাধক এ স্তরে আসিলে মূর্ত্তিকে এবং প্রিয়দর্শন প্রফুল্ল বালকগণকে সাজাইয়া খুব আনন্দ পান। ভগবানের নাম কীর্ত্তন এবং ভালোবাসার কথা আছে এমন কীর্ত্তন ইঁহাদের অত্যন্ত প্রিয় হয়। সৌন্দর্য্যটা ইঁহারা খুব সুন্দর ভাবে ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গণেশ স্তরের মানুষ সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে জানেন না। এই স্তরের মহাপুরুষগণ দেখেন সমস্ত জগৎ প্রেমে গড়া, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত, প্রেমে শাসিত। ইঁহারা প্রেমে জগৎকে বশ করিতে চাহেন। প্রেমই জীবের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, এই কথাই ইঁহারা প্রচার করিয়া যান। এ স্তরের মহাপুরুষগণ লোক সঙ্গ ত্যাগ করেন না, ভক্তসঙ্গে সদা প্রেমের আদান-প্রদানে ইঁহারা খুব প্রফুল্ল থাকেন। ইঁহাদের বিশ্বাস প্রেমের দ্বারা সকলকে বশ করা যায়।

গণেশ স্তরের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মিগণ প্রেমে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা দেখেন জীব কর্ম্মী, আত্মা কর্ম্মী। জগৎ চিরদিন কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এ কর্ম্ম মানে যুদ্ধ। প্রত্যেকেই চিরদিন যোদ্ধা, যুদ্ধ ভিন্ন জীব এক মূহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত যুদ্ধকে তাঁহারা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে চাহেন।

সাধক প্রথম যখন উন্নতির সোপানে আসিতে থাকেন, তখন হয় তিনি রাগাত্মক জ্যোতির স্পর্শে আসিবেন, না হয়তো অন্তরস্থিত শূন্য প্রবাহে সংযুক্ত হইবেন। কাহারও মধ্যে সূর্য্য শক্তির উন্মেষ, কাহারও মধ্যে গণেশ শক্তির উন্মেষ দেখা যাইবে। গণেশ কেন্দ্রের দুইটি অনুভূতি আছে – তাহার একটিতে মনের বৈষয়িক সংযোগের স্তব্ধভাব, বা মনের একেবারে শূন্যভাব, আর অন্যটিতে শান্তির প্রবাহে যুক্তভাব। সূর্য্য স্তরের

অনুভূতিরও দুইটা দিক আছে – তাহার একটিতে প্রেমময় জ্যোতির মধ্যে জগতের (মনোজগতের) বস্তুসকলের দর্শন আর দ্বিতীয়টিতে সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য মিলাইয়া গিয়া প্রেমময় অরুণাভ জ্যোতির মধ্যে অবস্থান। ইহা ভিন্নও সাধকের অনেক প্রাথমিক লক্ষণ আছে, কিন্তু উপরিউক্ত দুইটি অবস্থার একটিও যাঁহারা খুব স্থির হইয়া ধরিতে পারেন না, তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নহেন। ধ্যান নির্দ্দিষ্ট সূর্য্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর লক্ষণ এই:–

"প্রেম শক্তির ঈশ্বরীয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ (জগৎ এবং ঈশ্বরীয়) অনুরাগে আত্মহারা থাকেন। তাঁহাদের স্বভাব খুব নম্র এবং মধুর হইয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞানে দীপ্তিমান এবং জগৎপূজ্য হইয়া থাকেন।"

এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মিগণের লক্ষণ বলিতেছি-

পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈঃ – (সাধারণ) দুইটি পদ্ম, অভয় এবং বর হস্তে ধারণ করিয়াছেন।

(অন্তর্নিহিত) দুই পক্ষে (অনুকূলে প্রতিকূলে, স্বপক্ষে বিপক্ষে, দেবতা ও অসুরে) শান্তির প্রচার করেন। গুরুর মত স্নেহশীল এবং সকল সময়ই অভয়দাতা।

এ স্তরের অনুভূতি না আসিলে সাধকগণ কামাদি রিপুগণের তাড়না হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। (গণেশ স্তরের অনুভূতি আসিলেও রিপুজয়ের ক্ষমতা হয়) সাধক বহুদিন রিপুর তাড়নায় বিমর্দ্দিত হইবার পর এ স্তরে আসিয়া স্পষ্ট অনুভব করেন, ভগবান সত্যই স্নেহশীল (বর), সুখে এবং দুঃখে শান্তিদাতা (পদ্মদ্বয়), এবং তাঁহার আশ্রয়ে রিপুর ভয় নাই (অভয়)।

মাণিক্য মৌলিং – (সাধারণ) মাণিক্যের মুকুট।

(অন্তর্নিহিত) জ্ঞানে রাজার মত পূজ্য। তিনি উজ্জ্বল জ্ঞান প্রচার করেন।

অরুণাঙ্গ রুচি – (সাধারণ) অরুণ বর্ণ অঙ্গ।

(অন্তর্নিহিত) খুব স্নেহশীল এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার। যে নিকটে আসে সে-ই মজে। অঙ্গ হইতে যেন প্রেমের জ্যোতি বহিয়া চলিয়াছে।

ত্রিনেত্রম্ - (সাধারণ) তিনটি চক্ষু।

(অন্তর্নিহিত) ন্যায় পক্ষ, অন্যায় পক্ষ এবং ভগবান (বা সত্য) তিন দিকে সর্ব্বদাই নজর রাখেন। সূর্য্য স্বর্গ, মর্ত্ত এবং পাতালের দ্রষ্টা। স্বর্গ দৈবলোক, মানবসমাজ মর্ত্তলোক এবং অসুর সমাজকে পাতাললোক বুঝিতে হইবে।

(জ্ঞানিগণ, ভগবানকে ও নিজেকে এবং ভক্তকে একসঙ্গে পাইতে চাহেন।)

"ভালোবাসা শক্তির ঈশ্বরীয় কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহারা শত্রুমিত্র দুই পক্ষেই শান্তি প্রচার করেন। গুরুর মত স্নেহশীল এবং অভয়দাতা হন। জ্ঞানে তাঁহারা রাজার তুল্য পূজ্য হন। তাঁহাদের সঙ্গে এমন স্নেহময় প্রভাব, যে কেহ নিকটে আসে সেই আকৃষ্ট হয়। ইহারা শত্রু মিত্র ভগবান (বা সত্য) তিন দিকেই নজর রাখিয়া কথা বলেন বা কর্ম্ম করেন।"

এ স্তরের মহাপুরুষগণ প্রায়ই জগৎপূজ্য হন। তাঁহাদের দর্শনেই শতসহস্র লোক তাঁহাদিগকে গুরু মানিয়া লয়। ইহারা শিষ্য না করিলেও শিষ্যের অভাব হয় না। ইঁহারা অহিংসা এবং শান্তির প্রচারক হন। ইঁহারা যে কোন স্থানেই গমন করুন না কেন, ইঁহাদের বন্ধুর অভাব হয় না। সঙ্গপ্রভাবে ইঁহারা বনের পশুকেও বশ করিতে পারেন।

এই স্তরের মহাপুরুষগণ সত্যপ্রিয় এবং স্পষ্টভাষী হন। ইঁহারা সকলের মন রক্ষা করিয়া সত্য কথা বলিতে পারেন। প্রীতিপূর্ণ বাক্যই ইঁহাদের প্রধান সম্পদ। এ স্তরের সংযুক্ত ব্যক্তিগণ শিক্ষা বিভাগের পরিচালক হইয়া থাকেন। শিক্ষা দ্বারা মানুষকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবার জন্য ইঁহারা অগ্রসর হন। ইঁহাদের প্রচার কৌশল অতি সুন্দর। গণেশস্তরে সংযুক্ত মানবগন আবিষ্কার করেন, সূর্য্যস্তরের মানবগণ প্রচার করেন। সূর্য্যস্তরে সংযুক্ত কর্ম্মিগণ জগৎকে জাগাইয়া দেন, গণেশস্তরের কর্ম্মিগণ জগতকে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসেন। গণেশস্তর কঠোর স্বভাব-বিশিষ্ট এবং সূর্য্যস্তর কোমল স্বভাব-বিশিষ্ট। সহিষ্ণুতা সূর্য্যশক্তির বিশেষত্ব, কঠোরতাপূর্ণ সত্য গণেশশক্তির বিশেষত্ব। একটু অন্যায়ও গণেশ ক্ষমা করেন না। যে যেমন অন্যায় করিবে তাহাকে তেমনই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। গণেশ স্তরের কর্ম্মিগণকে জনসাধারণ পুত্রের মত ভালোবাসে। সূর্য্যস্তরের কর্ম্মিগণকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে।

সূর্য্যশক্তির একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা এই যে, অন্যায়কে সূর্য্য ঢাকা দিয়া রাখেন না, বরং প্রয়োজনের বেশী শক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যায়কে স্পষ্ট করিয়া দেন। গণেশ অন্যায়কে ক্ষমা করেন না, অন্যায়ের গতি বুঝিয়া বরং একটু বেশী শক্তি প্রয়োগে তাহাকে দমন করিয়া দেন। সূর্য্যের সংগঠন প্রকাশ্যে, গণেশের সংগঠন গোপনে। সূর্য্য নিজের দোষটুকু পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে প্রকাশ করেন। গণেশের ইচ্ছা না হইলে, কেহই তাঁহার একটি কথাও বাহির করিতে পারিবে না। গণেশ কঠোর এবং স্বাধীন, সূর্য্য অধীন হইলেও সত্য বক্তা। সূর্য্য সমাজের শিক্ষা এবং সেবা বিভাগ। গণেশ সমাজের বিচার বিভাগ। সূর্য্য সেবা দ্বারা আত্মবিকাশ করিতে চাহেন, গণেশ ত্যাগের মধ্য দিয়া নিজেকে বিলাইয়া দেন। সূর্য্য ত্যাগের বিনিময়ে কিছু আশা করেন, গণেশ কেবলই ত্যাগের মূর্ত্তি।

সূর্য্যস্তরের মানুষগণ শত্রুমিত্রে সমান ব্যবহার করেন। ইঁহারা উভয় পক্ষ হইয়া কথা বলিতে পারেন। শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, উকিল, মোক্তার, রাজদূত, ধর্ম্মপ্রচারক, বক্তা, মন্ত্রী, সংবাদপত্রসেবী, পুরোহিত, গায়ক, কবি গ্রন্থকার প্রভৃতি এ স্তরের শক্তির বিকাশস্থল। ইঁহারা চেষ্টা করিলে খুব সহজে সূর্য্যস্তরের পূর্ণ বিকাশের স্থল হইতে পারেন। এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত সাধক এবং কর্ম্মিগণ মুক্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা অধীন থাকিয়াই সুখী হন। অধীন থাকাটা মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এ স্তরের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মিগণ খুব দুর্ব্বলচিত্ত এবং ভাবপ্রবণ হন। ইঁহারা অসংকোচে সত্য ব্যক্ত করেন, প্রয়োজন হইলেও ইঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। এ স্তরের মহাপুরুষগণ খুব দয়ালু হন। অন্যের দুঃখ ইঁহারা খুব অনুভব করিয়া থাকেন। ইঁহারা জীবনব্যাপী বিদ্যার্থী বা ছাত্র। কপটতাহীন। ইঁহারা বিপক্ষেরও মন্ত্রিত্ব করিতে পারেন। এ স্তরের মহাপুরুষ জগতে আসিলে জগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। মানুষ যখন অস্বাভাবিক শিক্ষার প্রভাবে নিজের মনুষ্যত্ব হারাইয়া আবার মানুষের মত ব্যবহার পাইবার জন্য মাথা তুলিতে চায় তখন আসুরিক রাজশক্তি বা সমাজ তাহাদিগকে অস্বাভাবিক

অত্যাচারে দমন করিতে চাহে। সেই সময়ই এ স্তরের মহাপুরুষগণের জগতে জন্মগ্রহণের প্রকৃত সময়। ইঁহারা কাহাকেও আক্রমণ করেন না। আপন অধিকার স্থাপনের জন্য অসীম কষ্ট সহ্য করেন, এ স্তরের সংগঠন যদি আক্রমণের পথ ধরেন তবে নিশ্চয়ই পরাজিত হইবেন।

এই শক্তির পতাকা অরুণ বর্ণ, পদ্মচিহ্নিত, ইহার বিস্তারিত প্রয়োজন 'প্রয়োগ' পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে ইঙ্গিত :– ওঠো, জাগো, দেখো, অশান্ত হইও না। মানুষ যখন রোগে শোকে অত্যাচারে নিস্তেজ হয়, তখন এই পতাকা মানুষকে উৎসাহ দান করে। মানুষ যখন নিজেকে ভুলিয়া অন্যের কথায় নিজেকে হীন মনে করে, তখন এ পতাকা মানুষকে স্বরূপের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। মানুষ যখন দুঃখে জর্জ্জরিত হয় তখন এই পতাকা তাহাকে প্রফুল্ল করে, আশার আলো প্রাণে ঢালিয়া দেয়। এই পতাকা যখন মানুষের অন্তরে জাগিয়া উঠে, তখন বহুদিনের তমঃ অবসানে মানুষ আবার নবীন হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি - বিষ্ণু

গণেশ এবং সূর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, এবার আমরা নারায়ণ চরণে প্রণত হইব। তিনি যুগে যুগে ধরাধামে আসিবেন বলিয়া (গীতায়) প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দেখিব তিনি কে? তিনি আমাদের অন্তরে কোন সূত্রে নিজেকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিব। দেখিব, তিনি হৃদয়ের কত গভীর স্তরে আসিয়া মূর্ত্ত হন। আজ সহস্র বৎসর আমরা কাঁদিয়াছি, সহস্র বৎসর পদাঘাত, অপমান, অত্যাচার, অনাচার, মা ভগিনীর করুণ ক্রন্দন তাঁহাকে শুনাইয়াছি। কই, সাড়া তো পাইলাম না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হইবে? না, ব্যর্থ হইবে না। তিনি আছেন, তিনি আসিবেন, তিনি আসেন। আমরাই তাঁহাকে চাহি না। তাই আমাদের দুঃখ কাটে না।

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সবই আমাদের অন্তরস্থিত শক্তি দ্বারা। অনুভব করিবার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে অনেক কেন্দ্র বা পীঠ আছে। এক একটি কেন্দ্রে অনেকগুলি অনুভব শক্তি একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সমস্ত শক্তি আমাদের ইপ্সিত বস্তুগুলির সূক্ষ্ম ভাব নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং আমাদের সঙ্গে সেই বস্তুর পরিচয় করাইয়া দেয়। যতক্ষণ সেই নির্দ্দিষ্ট শক্তির সাহায্যে আমরা অনুভব করিব না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অনুভব ঠিক হইবে না। আমাদের স্বরূপের এক প্রান্তে স্থূল শরীর, অন্য প্রান্তে আত্মা। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহু শক্তিপীঠ আছে। আমরা আমাদের আত্মস্বরূপের কেন্দ্র হইতে বহুদূরে কোন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এ জগতের সঙ্গে আদান প্রদান করিতেছি। আমরা যখন যেমন কেন্দ্রে স্থিত হইয়া জগতের সঙ্গে আদান প্রদান করিব, আমাদের কর্ম্মধারা, বিচারধারা, তেমনই রূপ প্রকাশ করিবে। এমন একটি কেন্দ্র আছে যেখানে স্থিত হইয়া বা যাহাকে প্রবল করিয়া জগতের সহিত আদান প্রদান করিলে কেবলই স্বার্থ এবং পরপীড়া উৎপন্ন করে। আবার এমন একটি কেন্দ্র আছে সেখানে থাকিয়া জগতের সহিত ব্যবহার করিলে কেবলই ত্যাগ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। এই চক্ষু দ্বারা একদিন যে বস্তু দর্শন করিয়া লোভে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, অন্যদিন সেই বস্তু দেখিয়া আর তেমন ভাবটি হইল না। অনুভূতির কেন্দ্র পরিবর্ত্তনে সবই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। এই অনুভূতির কেন্দ্র পরিবর্ত্তনই আত্মোন্নতি বলিয়া খ্যাত। কেন্দ্রের পরিবর্ত্তনে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। কর্ম্ম, উপাসনা, ও জ্ঞান ইহার যে কোন একটিতে আন্তরিক নিষ্ঠা হইলে কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন আসে। গণেশ, সূর্য্য, নারায়ণ আমাদেরই অন্তরস্থিত বিভিন্ন শক্তি সমন্বিত বিভিন্ন অনুভূতি-কেন্দ্র মাত্র। আমরা যখন আমাদের মনের সঙ্কোচ আবরণ ভাঙ্গিয়া সেইসব কেন্দ্রে স্থিত হইতে পারি, তখন আমাদের মধ্যে সেইসব শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের কর্ম্মে তখন নিশ্চয়ই

সেরূপ শক্তির বিকাশ হইবে। (বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী পাওয়া যাইবে যাঁহারা আদর্শ রক্ষার জন্য নাকি অজ্ঞানীর মত আচরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন)। গণেশ আদি এই সব শক্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, কিন্তু যতক্ষণ আমরা অনুভূতির কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারিব না, ততক্ষণ আমরা সেইসব শক্তির পরিচয় পাইব না।

যাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী অথবা ভগবদ্দ্রষ্টা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, আর ভাবে, ব্যবহারে বা কর্ম্মের মধ্যে সেই জ্ঞানের কোনও প্রকার বিকাশ পাওয়া যায় না, এমন লোককে ভণ্ড বলিয়া জানা উচিত। এমনও অনেক লোক আছে, যাহারা পত্রিকায় খুব বড় দার্শনিক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু নজর পড়িয়া আছে ভাগাড়ে – জাতি, নাম, পয়সা, স্ত্রী পুত্রের জন্য; এমন লোকের কাছেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ সঙ্গ দ্বারা মানুষ চিনিতে হয়।

আমরা ভগবৎ শক্তিকে যখন অনুভব করি তখন আমরা বিভিন্ন শক্তি পীঠের সহিত সংযুক্ত হই। যাঁহারা দ্বৈতবাদী অর্থাৎ ভগবানকে নিজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহারাও সেই শক্তিপীঠে উপস্থিত হইলেই ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। ভগবানকে মূর্ত্তি মনে করিলেও ভগবদ্দর্শন-বিজ্ঞানের এই বিশেষত্বটুকু মানিতে হইবে।

বিভিন্ন বস্তুকে বুঝিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের শক্তিকেন্দ্র আমাদের অন্তরে সজ্জিত আছে। রূপকে বুঝিবার জন্য দর্শনকেন্দ্র এবং রসকে বুঝিবার জন্য রসনার কেন্দ্র আছে। দর্শনকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত না হইলে নিকটে শত বস্তু থাকিলেও দেখিতে পাইব না। রসনার কেন্দ্রে না আসিলে মিষ্ট কি তিক্ত রস বুঝিতে পারিব না। এই দর্শনশক্তি আদি শক্তি গুলিকে যদি আমরা স্থূল পার্থিব পদার্থগুলিকে দেখিবার বা বুঝিবার জন্য নিয়োজিত না করিয়া অন্তরস্থিত শক্তিপীঠে অবস্থিত শক্তিসমূহের রূপ দেখিবার বা বুঝিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারি, তবে অন্তরস্থিত শক্তিক্রিয়াগুলিও দেখিতে বা বুঝিতে পারিব। আমাদের অন্তরে অনেক শক্তিপীঠ আছে। এক একটি পীঠে এক এক প্রকারের শক্তির খেলা পাওয়া যাইবে। সেই শক্তির সহিত সংযোগই ভগবৎশক্তি সংযোগ বলা হইয়াছে। লক্ষ বৎসর কীর্ত্তন কর, জপ কর বা যোগ কর, যতক্ষণ সেই কেন্দ্র পৌঁছিলে না ততক্ষণ কিছুই পাইলে না।

বহু পরিশ্রমে সেই কেন্দ্রের সন্ধান পাইলে, কিন্তু সেই স্তরের দৈবীসম্পদগুলি অবলম্বন করিতে পারিলে না, কর্ম্মক্ষেত্রেও সেইরূপ শক্তি অবলম্বন করিলে না, তাই সেই শক্তির খেলা তোমাতে আর বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। এই ভাবেই ঈশ্বরীয় শক্তি ভারতের আর্য্যসমাজ হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

কোনও তত্ত্বের সন্ধান চারি প্রকারে করিতে হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে সেইগুলিকে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা এই রকমে ভাগ করিয়াছেন। উপরিউক্ত চারি প্রকারের পন্থার যে কোন পন্থায় নারায়ণকে বোঝ, তিনি কে? আর সেই ছাঁচে নিজে গঠিত হও, আর সেই ভাবকে জগতে মূর্ত্ত করিবার জন্য কর্ম্মে লাগিয়া যাও। তবেই নারায়ণ মূর্ত্ত হইবেন, প্রত্যক্ষ হইবেন। সমস্ত জীবনের চেষ্টায় যদি একটি মানুষও অনুভূত সত্যের ছাঁচে গড়িতে পার, তবে সত্যই জগতে কিছু করিয়া গেলে। আবার জন্মান্তরে জগতে আসিয়া দেখিবে শত শত নারায়ণ তোমার সঙ্গী হইয়া দর্শন দিয়াছেন। আর যদি মিথ্যা জাগতিক মোহে ভ্রান্তির পথ করিয়া নিজেকে পশুই প্রস্তুত করিতে

লাগিয়া গেলে, তবে অন্যকে পশু ভিন্ন অন্য কি গড়িতে পারিবে? জন্মান্তরে জগতে আসিয়া দেখিতে পাইবে শত শত পশু তোমাকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতেছে, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন বহু জন্মের সাধনায় তিনি দর্শন দেন। সত্যই বলিতেছি, কিছুদিন নিজে সত্য পথে চলিতে চেষ্টা কর, দেখিতে পাইবে এই পৃথিবী কি ভীষণ নরক হইয়া রহিয়াছে। দেখিতে পাইবে আত্মবিকাশের কোন অনুকূল পথই তোমার জন্য উন্মুক্ত নাই, প্রত্যেকটি মানুষের ব্যবহারে জর্জ্জরিত হইবে। যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িবে, আত্মবিকাশ আর করা হইবে না। তাই বলিতেছি নিজে ঈশ্বরীয় শক্তি অর্জ্জন কর, অন্যকেও ঈশ্বরের মত প্রস্তুত করিতে সাহায্য কর, জন্মান্তরে আসিয়া দেখিবে বন্ধু নারায়ণ তোমার সঙ্গী জুটিয়েছেন। জানিয়া রাখিও যতক্ষণ নিজে পূর্ণভাবে আত্মবিকাশ করিতে পারিবে না ততক্ষণ আসা যাওয়ারও শেষ নাই, নিজে আত্মবিকাশের কেন্দ্রগুলি অনুভূতির মধ্যে ফুটাইয়া তোল এবং বাছিয়া বাছিয়া মানুষকে সেই ছাঁচে গড়িতে চেষ্টা কর। দেখিবে জন্মান্তরে তোমার সাধনার কত সুবিধা হইয়া গিয়াছে। যদি তাহা না করিতে পার, তবে তুমি উৎপীড়ক হইবে, না হয়তো উৎপীড়িত হইবে। জগতে জন্ম লইয়া ইহা ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্য আর থাকিবে না। আজ জগতের দিকে তাকাও, চোখের সামনে ভারতের দিকে তাকাও, দেখিবে যত শক্তি আছে সবই উৎপীড়ন নাম ধারণ করিয়াছে, শক্তিশালী মানেই উৎপীড়ক, মানুষ নামধারী যত হতভাগা এই ভারতে বাস করিতেছে সকলেই উৎপীড়িত, তাই নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া কাঁদিলে কি হইবে, তিনি কোথায় আসিবেন? প্রথম নিজের হৃদয় পাতিয়া দাও তাঁহারা আসনের জন্য, নিজে নারায়ণের কেন্দ্রস্থিত দৈবী সম্পদ অবলম্বন কর। ভাবিও না এইটা খুব সহজ। সহজ মোটেই নহে, যদি নিজেকে শরীর বলিয়া ধারণা থাকে। আবার নিজেকে যদি আত্মার ভাবে গড়িতে পার, তবে দেখিবে তোমার কাজ কত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। জন্ম জন্মান্তরের অসৎ চেষ্টায় এই পৃথিবীকে আমরা উৎপীড়নের নরকশালা করিয়াছি। তাই শিক্ষা, সমাজ, রাজশক্তি, ধর্ম্মশক্তি কেবল এই শিক্ষাই দিতেছে, পীড়ন কর, না হয় অত্যাচার সহ্য কর, চাহিয়া দেখ ইহা ভিন্ন কোন পথ আছে? এক গণ্ডুষ জল পান করিবার পূর্ব্বেই তাহাতে টেক্স বসিয়া গিয়াছে, যদি খোঁজ, সেই অর্থ কোথায় যায়, দেখিতে পাইবে – উৎপীড়নের জন্য।

বিচার, বিতর্ক, আনন্দ এবং অস্মিতা এই চারি প্রকারের পন্থা দ্বারা কোন বস্তুকে বুঝিতে হয়। সর্ব্বাবস্থায় বিবেকের কষ্টিপাথরে নিজের কর্ম্মের এবং কর্ত্তব্যের দোষগুণ বিচার করিব। কোনও একটি বস্তুকে জানিতে হইলে ইহা একটি সুন্দর পথ। এ পথে কিছুদিন চলিলে আমরা গণেশের কেন্দ্রে আসিতে পারি। তখন এই বুদ্ধিশক্তিদ্বারা আমরা লৌকিক-অলৌকিক সর্ব্ব বিষয়ের বিচারপূর্ণ গবেষণা করিবার জন্য উপযুক্ত হই। নিত্য ঠিক এক নিয়মে চলিতে না পারিলে, এ পথে পা ফেলিয়া অকারণ অভিমানকে বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। শয্যাত্যাগ, শৌচ, স্নান, ব্যায়াম, আহার, নিদ্রা এবং নিজের কর্ত্তব্য নিয়মিত সম্পন্ন করিতে হয়। ইহার উপর আমরা যে বস্তুটি বুঝিতে চাহি তাহার একটি মোটামুটি সাধনা বা বিচার অবলম্বন করিতে হয়। নিজের শরীরে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, নিজে করিয়া বুঝিব, ইহা কি? কোন কিছু জানিবার ইচ্ছার মূলে এইরূপ একটি মানসিক বেগের নাম বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা।

কোন বিষয় শাস্ত্রগ্রন্থ বা যিনি জানেন এমন একজন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টাকে বিতর্কানুগত জানিবার চেষ্টা বলা যায়। বহু মহাপুরুষের পরীক্ষিত বিষয়ের আলোচনাকে অবলম্বন করিতে হয়। শাস্ত্রগ্রন্থ বা বই এবং শিক্ষক এই বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। বিদ্বেষহীন হইতে না পারিলে এই পথে পা ফেলিয়া লাভ নাই। এই পথে যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত নিত্য নিয়ম বজায় রাখিবেন। এ পথে যাঁহারা সত্য সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহারা বহু বিষয় জানিতে পারেন। কিন্তু নিজে যদি সেই বিতর্কলব্ধ সত্য আচরণ অবলম্বন না করেন, তবে বৃথা তার্কিক হইয়া সমাজের জঞ্জালে পরিণত হন। ইহা সম্পূর্ণরূপে সূর্য্য কেন্দ্রের শক্তি। এ পথে যাঁহারা আত্মোন্নতি করেন তাঁহারা উপলব্ধিতে সূর্য্যকেন্দ্রের উপরে আসিতে পারেন না। যাঁহারা বিচারের পথে বস্তু বা তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা স্বভাবতই সেইরূপভাবে জীবন পরিচালনা করেন। আবার যাঁহারা বিতর্কের সাহায্যে প্রকৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা নিজের জীবন তো সেইরূপে পরিচালনা করেনই, অধিকন্তু তাঁহারা অন্যকেও সেই বিষয় সুমীমাংসিত ভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা রাখেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষায় এইসব এক একটি সমাধির অবস্থা। ভারতের ভাগ্যাকাশ যাঁহাদের দ্বারা নির্ম্মল হইবে তাঁহারা যেন যোগদর্শনের অন্ততঃ এই দুইটি পন্থারও চর্চ্চা করেন। কারণ ভারতের সর্ব্বত্র এখন কর্ম্মী হইতে সমালোচকের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক সমাধি কাহাকে বলে, সে কথাও সকলের জানা প্রয়োজন। কোন বস্তুকে বা তত্ত্বকে এমন ভাবে জানিতে হইবে, যে জানায় কোনও প্রকার সন্দেহ আর আসিতে পারে না, চরিত্রেও সেই ভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। জানার এই বিশুদ্ধ অবস্থার নাম সমাধি।

কোন বিষয় সাধনানুগত উপলব্ধি দ্বারা জানার নাম আনন্দানুগত জানা। চিনি কেমন? একটু মুখে ফেলিয়া দেখ। এই স্তরের জানাটা সিদ্ধ হইলে সাধকের বাহ্য স্থূল বিষয়ের আর প্রয়োজন থাকে না। যে কোন বিষয়ের স্পর্শ আমরা একবার লাভ করি, তাহার সুখস্মৃতি আমাদের চিত্তে জমা থাকে। সেই সুখস্মৃতিকে অন্তরে জাগাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সেইখানেই সেই ভোগের বাসনা মিলাইয়া যায়। সাধারণ লোক সেই বিজ্ঞানটুকু জানে না বলিয়া সেই স্মৃতিটুকু অন্তরে জাগাইয়া বিষয়ভোগের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সাধন এ স্তরে আসিলে তাঁহার পতনের সম্ভাবনা খুব বৃদ্ধি হয়। আবার এ স্তরে অবস্থান করিয়া সুখের স্মৃতিটুকুকে কিভাবে ভোগ করিতে হয় তাহা জানিতে পারিলে, সেই ভোগ বাসনা সেখানেই মিলাইয়া দিতে পারেন। তাহা হইলেও ব্যাপার মোটেই সহজ নহে। সাধকের জীবনে এ স্তরটি খুবই বিপদসঙ্কুল; আবার এ স্তরটি কাটাইতে না পারিলে ভোগ ব্যাপারে মোটেই নিরাপদ নহেন। খুব শক্ত গুরু না জুটিলে ইহার উপরের স্তরে প্রবেশ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ইহাই বিষ্ণুর স্তর। এই বিষয়ে এখন আলোচনা হইবে। সাধনা এবং যোগাভ্যাসের পথ ধরিয়া আনন্দ এবং অস্মিতায় বুঝিবার শক্তি লাভ করিতে হয়।

যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা বিতর্ক এবং বিচারের পথ ধরুন। শিক্ষার পথে বুঝিবার জন্য যে পন্থা আছে, তাহারই নাম বিতর্ক। আর একটি পন্থার নাম বিচার। মানে, যেমন বোঝা তেমনটি করা। বিবেক যেমন বলেন তেমনটি কর, তেমনই ভাব। যাঁহারা আনন্দ এবং অস্মিতায় বুঝিতে চাহেন, তাঁহারাও প্রথমোক্ত দুইটি পন্থাকে ছাড়িবেন না।

ডাকিলেই তিনি আসেন না, কাঁদিলেই তিনি আসেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসাইয়া দাও, তিনি আসিবেন না। তোমার অন্তরে কি আছে দেখ; তোমার অন্তরে কি আছে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা ফুটাইয়া তোল। ছলনা করিলে দু দশ জন বালক ভুলিবে, তিনি বুঝিবেন না, তিনি আসিবেন না। যদি বিতর্ক দ্বারা তাঁহাকে পাইতে চাও তবে প্রচার কর। তাঁহাকে সর্ব্বঘটে জাগাইয়া তোল। তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজমান। নিজেরা মেষ থাকিয়া, চালকের জন্য ভগবানকে ডাকিলে চলিবে কেন? এমন অবস্থায় মেষপালকই যথেষ্ট। প্রেমের কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া জগতকে সংগঠনের জন্য আহ্বান কর। দেখিবে তোমাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে সংঘবদ্ধভাবে তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। সত্যের কেন্দ্রে গিয়া সত্য কথা বল, দেখিবে অসুরের দল অন্তরের অন্তস্থলে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। যদি বিচারের দ্বারা তাঁহাকে জগতে মূর্ত্ত করিতে চাও, তবে তাঁহারই মত অজ্ঞানহীন হও, সেইরূপ কর্ম্ম কর। দেখিতে পাইবে শত শত মানুষের মধ্যে তাঁহার স্ফুরণ দেখা দিয়াছে, তিনি আসিয়াছেন। আবার আনন্দানুগতভাবে যদি তাঁহাকে জানিতে পার, তবে শত শত মানুষের প্রাণে তাঁহার স্বরূপের ব্যাপক অনুভূতি জাগাইয়া দিতে পারিবে। দেখিতে পাইবে, তিনি সকলের হৃদয়ের অনন্ত শয়নে আর নিদ্রিত নাই, তিনি প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। যে অজ্ঞানতা মানুষকে আত্মবিকাশে বাধা প্রদান করিতেছিল সেই অজ্ঞানতা আর নাই।

আমাদের অন্তরস্থিত সুখশক্তির ঈশ্বরীয় শক্তির নাম বিষ্ণু। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাই আনন্দের অনুভূতির কেন্দ্র। এই সুখের স্থূলরূপটির নামই সমাজ। প্রত্যেক জীবে সমাজশক্তি আছে, সূর্য্যশক্তির কেন্দ্রস্থলে এই শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সূর্য্যশক্তি যেন এই শক্তির একটি আবরণমাত্র। সাধকগণ অন্তরে প্রকাশিত সূর্য্যজ্যোতির পথে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে এ শক্তির কেন্দ্রে উপস্থিত হন। ইনি চণ্ডীবর্ণিত বিষ্ণুমায়া। হিরণ্ময় জমাট জ্যোতির অনুভূতিতে সাধক সর্ব্বপ্রথম এ স্তরের অনুভূতির সহিত সংযুক্ত হন। ইহা জন্মজন্মান্তরের সর্ব্বপ্রকারের স্মৃতিপুঞ্জের কেন্দ্র। ইনি বেদবর্ণিত পুরুষসূক্তের সহস্রশীর্ষা পুরুষ। ইনি হিরণ্যগর্ভ। সমস্ত সৃষ্টি এই বিষ্ণুপ্রাণে ধৃত রহিয়াছে। অনুভূতির কথা লইয়া এই অধ্যায়ে বেশী সময় লাগাইব না। ভারতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং রীতিনীতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। এই জন্যই অনুভূতির কথাও আলোচনা করিতে হইতেছে। একটি স্তরের কথাই কর্ম্মিগণ একভাবে কর্ম্মে লাগাইতেছেন, উপাসকগণ আরও একভাবে গাহিতেছেন, আবার জ্ঞানিগণ অন্য একটি ধারা ধরিয়া অনুভব করিতেছেন এবং প্রচার করিতেছেন, অসুরগণ সেই শক্তিকেই আয়ত্ত করিয়া শক্তিশালী হইতেছে এবং জগৎকে ভোগ করিতেছে। তুমি চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইলে অসুর ভুলিবে না। ভিতরে প্রবেশ কর। শক্তিশালী হও, তাঁহাকে নিজের অন্তরে মূর্ত্ত কর। ভাব, ভণ্ডামীর যুগ চলিয়া গিয়াছে। নিজে নিজের বিবেকের নিকট সরল হও। বিশ্বাসী হও। যাহা ঠিক বোঝ তাহা নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত কর। কর্ম্মে তাহা মূর্ত্ত হওয়া চাই। প্রত্যেক স্তরের কর্ম্মী আছেন, উপাসক আছেন, জ্ঞানী আছেন এবং অসুরও আছে। আমাদের এই অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইবে। এখন এই কথা প্রত্যেককে জানিয়া রাখিতে হইবে শক্তিমত্তার বিচারে একই কেন্দ্রে যুক্ত কর্ম্মী,

উপাসক, জ্ঞানী এবং অসুর কেহই অন্য হইতে ন্যূন নহে। কাহাকেও কেহ হেয় বলিতে পারিবে না।

এবার ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। একই দেবতার বহু প্রকারের ধ্যান শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। পূজা পদ্ধতিতে পঞ্চ দেবতার ধ্যানপ্রসঙ্গে যে ধ্যান আছে, তাহাই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। পঞ্চদেবতার ধ্যান প্রসঙ্গে যে ধ্যান আছে অনেক নূতন গ্রন্থকার সেই প্রাচীন পদ্ধতির উপর নিজেদের মনোমত ধ্যান সাজাইয়া পুস্তক ছাপাইয়া প্রচার করিতেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, সেইগুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। ঠিক পঞ্চদেবতার ধ্যানই বৈজ্ঞানিক, সেই জন্যই যে কোন পূজার পূর্ব্বে সেই নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি ধ্যানই প্রাচীনকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কেহই বিজ্ঞানের মর্য্যাদা নষ্ট করিবেন না। এবার নারায়ণের ধ্যানের মধ্যে কর্ম্মের কি গুপ্ত সংকেত নিহিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে।

নারায়ণের ধ্যান – ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

ধ্যেয়ঃ সদা – (সাধারণ) সর্ব্বদা ধ্যান কর্ত্তব্য।

(অন্তর্নিহিত) সর্ব্বদা (জ্ঞানিগণ) ধ্যান করেন। কেবল পূজার সময় একটু চক্ষু বন্ধ করিয়া ফাঁকি দিলে এ শক্তির কেন্দ্রস্থলে আসা যায় না। বহুদিন ধ্যানাবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিলে এই শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যাঁহারা ধ্যানের বিস্তারিত বিজ্ঞান বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা যোগদর্শনে তাহা জানিতে পারিবেন। শক্তি অংশে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এই কেন্দ্রে আসা আর ধ্যানাবস্থা লাভ করা এক কথা। মূর্ত্তির কল্পনা ধ্যান নহে। বরং সুখ বা দুঃখের স্মৃতিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে এই কেন্দ্রের খবর শীঘ্র লওয়া যায়। ঘটনার অংশ ত্যাগ করিয়া সেই সুখ বা দুঃখের স্মৃতিতে তন্ময় হইলে বিষ্ণুকেন্দ্রে আসা যায়। বিষ্ণুকেন্দ্রে আসিলে ধ্যানাবস্থা আপনিই পাওয়া যায়। যিনি ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই এই কেন্দ্রে আসিয়া গিয়াছেন। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই তিনটি শক্তি যথাক্রমে সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিবের কেন্দ্রের সংযোগশক্তি। ইঁহারা একই অবস্থার গভীর, গভীরতর, এবং গভীরতম অবস্থা। যাহা হউক, ইহার সার কথা হইল যে, জ্ঞানিগণ ধ্যানাবস্থিত। (ঈশ্বর চিন্তনের নাম ধ্যান, মূর্ত্তি চিন্তন নহে)।

সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী – (সাধারণ) সবিতৃমণ্ডল মধ্যস্থিত।

(অন্তর্নিহিত) সূর্য্য ধ্যানে যে রক্তাম্বুজাসনের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণু সেই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যস্তরের অনুভূতির পথে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে বিষ্ণুকেন্দ্রে আসিতে হয়। ধ্যানে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

নারায়ণং – (সাধারণ) বিষ্ণু।

(অন্তর্নিহিত) সর্ব্বভূতের অন্তর এবং বাহির ব্যাপ্ত চৈতন্য সত্তা যাহা জনমণ্ডলীর আশ্রয়।

সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ – (সাধারণ) কমলাসনে উপবিষ্ট।

(অন্তর্নিহিত) আনন্দ রস সাগরে উৎপন্ন আসনে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট। তিনি তখন আর কোন বস্তুরই খবর রাখেন না। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তরস্থিত সেই রসের মাধুর্য্যে মজিয়া যায়। এ স্তরের অনুভূতির বিশেষত্ব এই যে অহংটি থাকে। অহংটি ইন্দ্রিয়গণের সহিত একাকারে যুক্ত হইয়া অন্তঃকরণস্থিত সুখস্মৃতির কেন্দ্রস্থলে মজিয়া যায়। যাঁহারা খুব নিবিষ্ট হইয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর যাঁহারা সেই অনুভূতির কেন্দ্রে আসিতে চাহেন, তাঁহারা প্রেমময়ের ধ্যানে যে আনন্দটুকুর স্বাদ বা অনুভূতি পাওয়া যায়, তাহাতেই খুব শান্ত হইয়া খুব লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নিবিষ্ট হইতে থাকুন। কি হয়, কি না হয়, তাহা যদি বুঝিবার চেষ্টা হয়, তবে সেই কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। কিছুক্ষণ ধ্যানের আনন্দ রসটা জমাট বাঁধিয়া এই অবস্থা হয়। লৌকিক ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়াও এই কেন্দ্রে আসা যায়, যদি আসক্তির কলঙ্ক তাহাতে না থাকে।

কেয়ূরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী – (সাধারণ) হাতে কেয়ূর বা বাজু (হাতে পরিধান করা যায় এমন গহনাকে কেয়ূর বলে), কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, মাথায় মুকুট, গলায় হার।

(অন্তর্নিহিত) রাজৈশ্বর্য্যবান পুরুষ।

হিরন্ময়র্বপুঃ – (সাধারণ) স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি।

(অন্তর্নিহিত) এ স্তরের অনুভূতিটিই ঐরূপ গলিত সোনার মত রং বিশিষ্ট। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তেজবীর্য্য সম্পন্ন শরীর।

ধৃতশঙ্খ চক্রঃ – (সাধারণ) শঙ্খ এবং চক্রধারী।

(অন্তর্নিহিত) শঙ্খে সত্যের ঘোষণা বা প্রচার বুঝায়, অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। দৃঢ়তার সহিত অন্যায়ের প্রতিবাদকে শঙ্খ বলা হয়। যাহারা গোপনে অন্যায় করিতে চেষ্টা করে (অন্যায় প্রায়ই প্রথমটাতে গোপনেই হয়) তাহাদের প্রকাশ্যে নিন্দা বজ্রের মত আঘাত করে। যাহারা প্রকাশ্যে অন্যায় করে তাহাদের শক্তি বুঝিয়া তবে প্রকাশ্যে নিন্দার প্রতিবাদ করা উচিত, নহিলে বিপদ নিশ্চয়ই বরণ করিতে হইবে। প্রকাশ্যে অন্যায় সত্যই প্রতিবাদ ইচ্ছুকগণকে যুদ্ধে আহ্বান মাত্র। সেইরূপ স্থলে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গোপনে যুদ্ধই মঙ্গলকর হয়। অসুরশক্তি যখন সমাজের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে তখন তাহারা প্রকাশ্যে অন্যায় করিয়া বেড়ায়। শক্তিহীন প্রতিবাদ তাহাদিগকে বেশী শক্তিশালী এবং অত্যাচারী করে।

চক্র সংগঠনকে বুঝায়। চক্র, বুদ্ধির কৌশলে শত্রুকে এমন অবস্থায় লইয়া আসা বুঝায় যাহাতে সে নিজে নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। চক্রের অর্থ অনেক ব্যাপক, ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির গুপ্ত অস্ত্র। যাহা হউক, চক্র মানে সমাজ। সমাজই এস্তরের প্রধান শক্তি। শঙ্খ এবং চক্রের সংক্ষেপে অর্থ প্রতিবাদ এবং সংগঠন। চক্র গোপনে বেশী শক্তিশালী হয়, শঙ্খ প্রকাশ্যে বেশী শক্তিশালী জানিতে হইবে। শঙ্খ এবং চক্রের প্রয়োগ কৌশল জানিতে না পারিলে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশে লাভ নাই। মুখে খুব বড় আদর্শের কথা, কিন্তু চক্রটি এমনভাবে প্রস্তুত যে সেই কথার আদর্শের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা চক্রবিজ্ঞান বুঝিতে পারেন তাঁহারাই পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন। একটু একটু করিয়া সমস্ত পৃথিবী কি করিয়া গ্রাস করিতে হয়, তাহা কেবল বিষ্ণু শক্তি সম্পন্নগণ

বুঝিতে পারেন। গলায় হার, কানে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, মাথায় রাজবেশ মুকুট পরিধান করিতে হইলে রাজনীতি জানিতে হয়।

নারায়ণের ধ্যানও দুই ভাগে ভাগ করিয়া ইহাকে বুঝিতে চেষ্টা করা হইবে। ধ্যানের প্রথম পদটি এ স্তরের জ্ঞানিগণের অনুভূতির কথা। যাঁহারা শুধুই অনুভূতিটুকু অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এ স্থলে জ্ঞানী আখ্যা প্রদান করিয়াছি। যাঁহারা কর্ম্মের দিকটা অবলম্বন করিয়া জগতে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মী নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পদটি এ স্তরের কর্ম্মীর বিশেষত্ব।

এ স্তরের জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা ধ্যানাবস্থিত। সূর্য্যস্তরের অনুভূতিতে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে তাঁহারা এই অবস্থা লাভ করেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতের অন্তর ব্যাপ্ত হিরণ্ময় চৈতন্য সত্তায় স্থিতি লাভ করেন। তাঁহারা ধ্যানের জমাট আনন্দ রসে মজিয়া যান।

এ স্তরের কর্ম্মিগণ সমাজের কর্ত্তা হন। তাঁহারা রাজৈশ্বর্য্যবান পুরুষ সুন্দরবপুঃ। ইঁহারা সমাজের রক্ষার জন্য সত্যের প্রচার এবং সংগঠন অবলম্বন করেন।

বিষ্ণু প্রেমের শক্তি, ইহাকে পালনীশক্তিও বলা যায়। সূর্য্যস্তর এই স্তরেরই হালকা অবস্থা। সূর্য্যশক্তিতে প্রতিষ্ঠিতগণ প্রেমে একটু ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহারা প্রেমের বৃত্ত অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, তাই কথায় এবং কার্য্যে, ভালবাসায় দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে। বিষ্ণু শক্তি প্রেমের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এখানে ভালবাসার উদ্বেলন নাই। সৌম্যভাবের ভালবাসা। এই স্তরের অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া তুলসী দাসের রামায়ণ লেখা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ-ও এ স্তরের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তুলসী দাসজীর রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া এ স্তরের অনুভূতির বিস্তৃত রহস্য জানা যায়। ইঁহারা যে সত্যই ভালবাসেন একথা কখনও কাহাকেও জানিতে দেন না। এই গভীর ভালবাসার উপর এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত। জীব এই ভালবাসায় প্রতিপালিত হইতেছে। তাই ইঁহাকে ঈশ্বরের পালনীশক্তি বলা হইয়াছে। লোকে কথার ছলে ইহাকে 'মায়া' বলিয়া থাকে। বাস্তবিক "আমি কে?" এ প্রশ্নের উত্তরে মানব, যে অবস্থায় আসিতে পারে, সেখানে এমন আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী ইত্যাদি ভাব কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বলা সহজ নহে। যাহার সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই, তাহারই জন্য আমি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি, যাহা আমার আত্মবিকাশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। অথচ প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে যে মৃত্যুলীলা চলিয়াছে তাহা দেখিয়াও আমি সত্যই কে, আমার বাড়ী কোথায়, আমার সঙ্গী কে, কোন বস্তু আমার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আমাকে এ জন্মে সুখী বা দুঃখী করিয়াছে, আবার কোন বস্তু আমার সঙ্গী হইলে আবার সুখী বা দুঃখী করিতে পারিবে, ইত্যাদি ভাবনাও মনে জাগে না। ইহা মায়া নহে, ইহা বিষ্ণুমায়া। যাঁহারা অনুভবে বিষ্ণুস্তরে আসিয়াছেন, তাঁহারা এই মায়া হইতে স্বতন্ত্র হইবার কতকটা শক্তি লাভ করেন। অন্যের এখানে কিছু করিবার অধিকার নাই। এ মিষ্টি আবরণটুকু না থাকিলে এ সংসার এই মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া যায়।

সর্ব্বত্র বিষ্ণুকে চতুর্ভুজ ধ্যান করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে বিষ্ণুর দুইটি হস্তের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা আমাদের অন্তরস্থিত সমাজশক্তি কেন্দ্র। সমাজ চিরদিন সত্য এবং সংগঠনের ভিত্তির উপর স্থাপিত। কঠোর শাসন সমাজনীতি বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষ বহুদিন সামাজিক শাসনাধীনে ছিল। ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীই বহুদিন

সামাজিক শাসনাধীনে ছিল। এই সামাজিক শাসনই জীবের প্রাকৃতিক শাসন। সামাজিক শাসন বৈজ্ঞানিক শাসন নহে, এ শাসনে ভুল আছে। কেহ যেন মনে না করেন জগতকে সামাজিক শাসনাধীনে আনিতে হইবে। বিস্তারিত শক্তি অংশে বলা হইবে। সত্যের ভিত্তি যদি নষ্ট না হইত তবে এই শাসন চিরদিন চলিয়া আসিত। এ সমাজকর্ত্তাকেই রাজা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে অবস্থা বহু যুগ পরে আসিয়াছিল। সমাজের আসুরিক প্রকৃতির লোকগণ সংগঠিত হইয়া অত্যাচার শুরু করিবার পর বিষ্ণুর হস্তে গদা আসিয়াছে। তখনই সমাজ কর্ত্তা দণ্ডধর হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক শান্তিই সেই শান্তির লক্ষ্য ছিল, তাই বিষ্ণুর হস্তে পদ্মও রহিয়াছে। ইহা সমাজের উপর রাজশক্তির আবির্ভাব বা প্রথম প্রবেশ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের রাজশাসনও সামাজিক শাসনেরই অন্তর্গত ছিল। সমাজশাসনকে রক্ষা করিবার জন্য রাজশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। যাহা হউক, সামাজিক দণ্ড চিরদিন প্রেমের দণ্ড। তাই এই সমাজশক্তির কর্ম্মে কেবলই শঙ্খ ও চক্র রহিয়াছে। সমাজের নিন্দা এবং সমাজ চক্রের বিরোধিতা কখনো কেহ সহ্য করিতে পারে না।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখা দিয়াছে, যাঁহাদের শাসন বিজ্ঞান শক্তিস্তরের শাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজস্তরের শাসন, আসুরিক শাসন এবং শক্তিস্তরের শাসন বুঝা প্রয়োজন। সামাজিক শাসনকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার পরও শাসনের মধ্যে অনেক ভেদ হইয়া আসিয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে করিবার ইচ্ছা রইল।

যাঁহারা সামাজিক কর্ম্মী তাঁহাদের ঐ দুইটি অস্ত্রই অবলম্বন করিতে হইবে – সত্য এবং সংগঠন। প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হওয়া চাই। যাঁহারা সমাজশক্তি দ্বারা সংগঠিত আসুরিক শক্তিকে সংযত করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য গদার প্রয়োজন আছে। ইহাতে ভুল করিলে বিফল হইতে হইবে।

যাঁহাদের অন্তরে পালনীশক্তির বিকাশ আছে, তাঁহারা জন্মাবধি কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিসম্পন্ন হন। লোকে নির্ব্বিচারে ইঁহাদের কথা মানিয়া লয়। ইঁহারা সহজেই অন্যের উপর আধিপত্য করিতে পারেন। ইঁহারা ভুল করিলেও সহজে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় না। ইঁহারা ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু যদি একবার প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হন তবে প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া ছাড়েন না। অন্যের ভুল খুব বুঝিতে পারেন, কর্ম্মের গতি এমন ঠিক বোঝেন যে আরম্ভের সময়েই স্থির করিতে পারেন কোথায় ভুল হইবে। শত্রু দ্বারা ভুল করাইয়া শত্রুর ধ্বংস করাইয়া থাকেন। মানুষ খুব চিনিতে পারেন। খুব চিন্তাশীল এবং গম্ভীর স্বভাব। অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া কোন কাজেই নামিয়া পড়েন না। নিজের শক্তির গভীরতা এবং শত্রুর শক্তির গভীরতা দুইই বুঝিতে পারেন, অন্যের নিন্দার বা প্রশংসার খাতিরে কাজের ক্ষতি করেন না। নিজে শক্তি সঞ্চয় না করা পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করিয়াও আত্মরক্ষা করেন। অন্যায়কারীকে সৎভাবে আত্মগঠন করিবার জন্য যথেষ্ট সময় দেন, আবার খুব নজর রাখেন কতটা সে অগ্রসর হইল। ইঁহারা কখনও সামান্য শক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন না। গোপনে শক্তিশালী হন, কথায় বার্ত্তায় চাল চলনে কেহ তাহা ধরিতে বা বুঝিতে পারে না। বহুদিন ধরিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন। ইঁহাদের মানের অভাব নাই, আবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপমানের ভয় নাই।

অসুর ধ্বংসের জন্য ইঁহারা সর্ব্বপ্রকারের জঘন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারেন। ইঁহারা জন্মাবধি ভোগী, সুবিধা থাকিতে ইঁহারা ত্যাগের কঠোরতা দেখাইতে চেষ্টা করেন না। আবার প্রয়োজন হইলে ত্যাগের অভাব ইঁহাদের নাই। হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যকে ইঁহারা প্রশ্রয় দেন না।

ইঁহারা চিরদিন ভোগী, ত্যাগের পথ ইঁহারা অবলম্বন করেন না। খুব ধীর খুব বুদ্ধিমান। লোকপ্রিয় সুন্দরকান্তি। গম্ভীর স্বভাব, নিজের পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন না। নিজের উদ্দেশ্যের উপর খুব লক্ষ্য থাকে। কখনও উদ্দেশ্যে ভুল করেন না, কার্য্যপন্থা, কথা এবং উদ্দেশ্য এক প্রকারের নহে। এ স্তরের শক্তিশালিগণ প্রায়ই আসুরিক বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। দেহের সুখ, অন্যের পীড়া, অসুরবাদের কর্ম্মপদ্ধতির বিশেষত্ব। ইঁহারা যদি দৈবীসম্পদের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন করেন তবে জগতের প্রভূত কল্যাণ হয়। অনপেক্ষ স্বভাব, মোটেই আদর্শবাদী নহেন। আদর্শের প্রচার খুব করেন, কিন্তু ভোগের একবিন্দু কম হইতে পারিবে না। নিজের বংশ মর্য্যাদাকে খুব বড় সম্পদ মনে করেন।

গোপনে সংগঠন এবং শক্তিশালী হইবার অদ্ভুত ক্ষমতাই জীবনের বিশেষত্ব। কাহাকেও কিছু বুঝিতে দেন না। শত্রুকে মাথা নত করাইবেন বা সুযোগ পাইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কুটিল স্বভাব কুটিল গতি। বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ সুবিধার দিকে নজর বেশী। সর্ব্বাবস্থায় যথোচিত বুদ্ধির উন্মেষ হয়। শত্রুর মন প্রথমেই বুঝিতে পারেন। সর্ব্বদা সাবধানে থাকেন। শত্রুর নিকট মাথা নত করিলে যদি ভবিষ্যৎ প্রতিশোধের সুবিধা থাকে, তবে তাহা করিতে সঙ্কোচ নাই। কিন্তু যেখানে শত্রুর নিকট মাথা নত করিলে ভবিষ্যতের আশা নাই, সেখানে কখনও মাথা নত করেন না, বরং বীরত্বের আদর্শে আত্মদান করেন। বহুমুখী কর্ম্মী, বহুমুখী বুদ্ধি, বহুমুখী প্রতিভা। না বুঝিয়া কোন কাজে নামেন না। যদি নামেন তবে শীঘ্রই ছাড়েনও না। যাঁহারা সামাজিক কর্ম্মী তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকা প্রয়োজন।

সমাজের নেতাই কোন যুগে একদিন রাজশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজশক্তি আসুরিক ভাব অবলম্বন করিয়া সমাজের সর্ব্ববিধ আত্মবিকাশের পথ বন্ধ করিতে যখন উদ্যত হইত, তখনই তাহার নাম অসুর, রাক্ষস (মানে সমাজের রক্ত শোষণকারী), দৈত্য ইত্যাদি হইয়া যাইত। এমনিই তো সমাজ কর্ত্তার অসীম শক্তি, এই শক্তির উপর যদি এ সকল শক্তিমানের হাতে রাজশক্তিও আসিয়া যায়, তবে সে আরও শক্তিশালী হয়। এমন শক্তি যদি আসুরিক বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তবে সমাজের যে ভীষণ দুর্দ্দশা হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সমাজ যখন এ সকল অসুর রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে, তখন সমাজে গভীর আর্ত্তনাদ শুরু হয়। এ গভীর আর্ত্তনাদে শতসহস্র যুবকের মধ্যে দৈবীসম্পদের আবির্ভাব দেখা দেয়। এই দৈবীসম্পদসম্পন্ন মানববীরগণের উপর যখন অত্যাচার হইতে থাকে তখন সমস্ত দৈবীসম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। আমাদের শাস্ত্রে তাঁহাকেই অবতার বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে রাজশক্তি যখন আসুরিক ভাব অবলম্বন করিয়াছেন তখনই বিষ্ণুর অবতার আসিয়াছেন। এমন অবস্থায় দৈবী সম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষ বিষ্ণুর শক্তি লইয়াই অবতার হন। ইহা স্বাভাবিক এবং বৈজ্ঞানিক। যে কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইবেই। এখানে তাহার আলোচনার সময় নাই।

বিষ্ণু বা পালনীশক্তির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সমাজ যখন প্রপীড়িত তখন এ স্তরের অবতারের আবির্ভাব হয়। এ শক্তির অবতারগণ প্রায়ই রাজকূলে জন্মগ্রহণ করেন। শক্তির সাধনাদ্বারা শক্তিশালী হন। যোগীর শিষ্য হন। নিজেরা শক্তিশালী না হইয়া কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন না।

যত প্রকারের স্বার্থবাদী বা সুবিধাবাদী আছে সকলেই এ স্তরের বিকাশ জানিতে হইবে। দৈবীসম্পদের বিকাশ না থাকিলে এ স্তরের মানুষকে বিশ্বাস করা মঙ্গলের কারণ হয় না। অনেক বড় বড় রাজা মহারাজা জমিদার ধনবান এ স্তরের নির্লজ্জ চাটুকার বন্ধুগণের পরামর্শে নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। যে সকল মানুষে গণেশ স্তরের বিকাশ আছে, তাঁহারা একটু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধুর মত পরামর্শ দিতে পারেন। মানুষের মানসিক দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়া দৈবীসম্পদ হীন বিষ্ণু স্তরের লোকেরা বড় হইতে চেষ্টা করে। নিজের চরিত্রের বল বৃদ্ধি করিয়া ইহারা বড় হইতে পারে না। ইহারা প্রায়ই রক্ষণশীল বুদ্ধির বিকাশস্থল হয়। আবার যখন দেখে রক্ষণশীলের পাল্লা দুর্ব্বল হইয়াছে তখনই ইহারা রাতারাতি উদার হইয়া স্বার্থের দোকানটি দখল করে। এ স্তরের মানুষের দ্বারা যত ক্ষতি হয় এমন অন্য দ্বারা হয় না। দৈবীসম্পদের ভিত্তিতে যদি ইঁহারা নিজের চরিত্র গঠন করেন, তবে ইঁহাদের দ্বারাই জগতের আসুরিক শক্তি ধ্বংস হয়। অপুষ্টরা সরল প্রকৃতির লোকের বিশেষ ক্ষতি করে। ইহারা বহু প্রকারের ভণ্ডামি রচনা করিয়া অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা ভেদ বুদ্ধি দ্বারা দুইদিক হইতে শোষণ করে। ইহারা সাধুবেশে গৃহস্থ এবং গৃহস্থ হইলেও সাধুর নকল করিতে পারে। স্বার্থের সুবিধার জন্য ইহারা সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামির সাজে সাজিতে পারে। ইহাদের চাল বুঝা সহজ নহে। সরল লোকের ইহারা সর্ব্বনাশ করে। খুব মুখমিষ্টি লোক। কথায় বুঝিবার জো নাই, ব্যবহারে বুঝিতে হয়। বুঝা মাত্র নিজের মঙ্গল ইচ্ছুকগণ নির্ব্বিচারে সরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে। ইহাদের এমন কৌশল যে সরিয়া দাঁড়ান সহজ নহে। গণেশের কেন্দ্রশক্তির মধ্য দিয়া যাঁহারা এ স্তরে আসেন, তাঁহারাই বিষ্ণুর কেন্দ্রশক্তিসম্পন্ন মানুষ। ইহা ভিন্ন গণেশকেন্দ্রশক্তি বিকাশ না করিয়া যাঁহারা বিষ্ণু কেন্দ্রের পুষ্টির চেষ্টা করে, তাহারা নিজের এবং সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ছলনা এবং সঞ্চয় বিষ্ণুকেন্দ্রশক্তির বিশেষ লক্ষণ। গণেশ পুষ্টি না করিয়া শিক্ষা এবং কুসঙ্গপ্রভাবে যাহাদের মধ্যে ঐ বৃত্তির বিকাশ হয়, তাহারা বারবার অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হয়। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ইহারা জগতের চক্ষে ঘৃণিত হইতে থাকে। লৌকিক সম্পদের বৃদ্ধি এবং ভোগের চেষ্টায়ই তাহারা এমন কর্ম্মে লিপ্ত হয়। বাইরের নজরে দেখিতে তাহাদিগকে বেশ সুখী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু মনে তাহারা কখনও শান্তি পায় না। শিব অংশে এ সম্বন্ধে আবার বলা হইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু শক্তির আলোচনা করিয়াছি। বিষ্ণুশক্তিই মানুষের সমাজশক্তি। এ সমাজশক্তির রক্ষক গণেশ। গণেশ শক্তি না থাকিলে, বিষ্ণুশক্তি যেমন অসুর হইয়া যায়, সেইরূপ যে মানুষে গণেশ কেন্দ্র দুর্ব্বল সেও অসুর হয়। গণেশশক্তি কখনও অসুর হয় না। গণেশের আবিষ্কারকে অসুর দখল করে বটে, কিন্তু গণেশশক্তি সকল সময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অসত্য ধ্বংস করা গণেশের কাজ। গণেশ মুক্তির পথ দেখান। সমাজ যখন অসৎ এবং অত্যাচারের ভিত্তির উপর আপন

শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে, গণেশ তখন সে সকল ভণ্ডামির গোঁড়ামি দৃঢ় হস্তে ভাঙ্গিয়া দেন। গণেশ স্বাধীন বা সত্যের অধীন। সূর্য্য অধীন, কিন্তু সত্যের প্রচারক।

সূর্য্য সমাজের শিক্ষা বভাগ, এ বিভাগ সব সময়ই সমাজের অধীন এবং সমাজের সেবক। সূর্য্য সমাজকে সত্যের আলো দিতে চাহেন, আবার সমাজ যদি তাহা গ্রহণ না করেন, তবে সমাজের সহিত বিদ্রোহের ক্ষমতা রাখেন না। সূর্য্য গণেশের সহায়, কিন্তু গণেশের একেবারে পার্শ্বে দাঁড়াইতে সাহস পান না। সূর্য্য সমাজকে সত্যের আলো দেখাইয়া সংশোধন করিতে চাহেন। সূর্য্যালোককে অস্বীকার করিবার শক্তি সমাজের নাই, কিন্তু সমাজের স্বার্থপরগণ তাহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহে না। সূর্য্য গণেশকেও সংযত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজকে শিক্ষার প্রভাবে নির্ম্মল করিতে চাহেন। গণেশ কাহারও অন্যায় সহ্য করেন না। গণেশ জানেন চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। গণেশও যদি বিষ্ণু কেন্দ্রশক্তি আয়ত্ত না করেন তবে বিষ্ণুর কেন্দ্র পুষ্ট আসুরিক শক্তির সহিত কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবেন না।

সমাজকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য সূর্য্য বা শিক্ষা বিভাগের উৎপত্তি, আবার সমাজকে অক্ষত রাখিবার জন্য গণেশ শক্তির উন্মেষ। শিক্ষাবিভাগ সমাজ প্রথম প্রসব করিয়াছিল। যখন শিক্ষায় আর অসৎ ভাব দমন হয় নাই, তখন গণেশ বিভাগও সমাজ প্রসব করিয়াছিল। (ইহার পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগ কেবলই ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল, মানুষের স্বভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক শক্তিগুলিও পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে)।

ধন, জন, অন্ন বস্ত্র, গৃহ, জল, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, সর্ব্বোপরি ভালবাসা এবং সংগঠন, ইহাই হইল সমাজশক্তির শোভা। যাঁহারা এ স্তরের বিকাশস্থল তাঁহারা রাজা জমিদার এবং ধনবান হইয়া থাকেন। শাসনকর্ত্তা, পুলিশ কাপ্তান, সৈন্যাধ্যক্ষ, গোয়েন্দা, পোতচালক, কর্ম্মকর্ত্তা (ম্যানেজার), গহনার কারবারী, বণিক, দোকানদার, কৃষক প্রভৃতিতে এ স্তরের বিকাশ দৃষ্ট হয়। উপরিউক্ত কর্ম্মগুলি এ স্তরেরই বিকাশ। কিন্তু ঐসব কর্ম্মে যাহারা লিপ্ত বা নিযুক্ত আছে, তাহারা যে বিষ্ণু কেন্দ্রে আসিয়া গিয়াছে এমন মনে করা ভুল হইবে। দৈবীসম্পদসম্পন্ন না হইলে আত্মার উন্নত স্তরের বিকাশ বলা যায় না। আমাদের যত উন্নত স্তরের বিকাশ হইতে থাকে, আমরা ততই দুর্ব্বলতাহীন এবং উদার হইতে থাকি। আমাদের আমিত্ব সমস্ত জীবের আমিত্বে ছড়াইয়া পড়ে এবং আমাদের সমাজ ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বিরাট সমাজের অঙ্গে পরিণত হয়। এই কেন্দ্রস্থিত মানুষকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক, দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু শক্তিসম্পন্ন মানুষ। ধ্যানে যে সব কর্ম্মলক্ষণ আছে তাহা পূর্ণভাবে তাঁহাদের চরিত্রে বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সত্যই মানুষের বেশে দেবতা। দ্বিতীয়, আসুরিক শক্তিসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষ। ইহারাও খুব কর্ম্মী। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা ইহাদের স্বভাবে বেশ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় প্রকারের বিষ্ণু কেন্দ্রস্থিত অপুষ্ট* মানুষের বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহারা কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিসম্পন্ন হয় না। প্রায়ই নির্লজ্জ, তোষামোদকারী, আত্ম-প্রশংসাকারী, খল এবং স্বার্থপর হইয়া থাকে।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ‘‘পুষ্ট’’ শব্দস্থলে ‘‘অপুষ্ট’’ শব্দ গৃহীত হল।

বিষ্ণুর পতাকা নীলবর্ণ এবং চক্রশোভিত। সাম্যভাব (নীলবর্ণ) সমাজের স্বরূপ, সংগঠন (চক্র) সমাজের শক্তি। যখন মানব সমাজ হিংসা দ্বেষ অভিমান অবলম্বনে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া যায়, তখন এই পতাকা সকলকে সমানভাবে ব্যবহার করিবার ইঙ্গিত প্রদান করে এবং একতায় সংঘবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী করে। বিক্ষিপ্ত মানব সমাজ যখন সংঘবদ্ধ ভোগপরায়ণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া থাকে তখন এ পতাকা মানবকে প্রেমের সংগঠনে সংঘবদ্ধ করে। সমাজচক্র যদি ব্যূহের মত মজবুত হয় তবে কাহার সাধ্য সমাজের আত্মবিকাশের পথে বাধা প্রদান করে? সমাজচক্র যদি দৃঢ় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে কখনও বাহির হইতে কোন শত্রু সমাজে প্রবেশ করিতে পারে না। সমাজ যখন বিক্ষিপ্ত হয় তখন এই পতাকা সমাজের স্বরূপ চিত্র মানুষের চক্ষের নিকট ধরিয়া দেয়। সাম্য এবং সংগঠনই সমাজ। ইহাই এই পতাকার মর্ম্মকথা। এই পতাকা যাঁহার অন্তরে মূর্ত্ত হয়, তিনি হিংসা, দ্বেষ, উচ্চ, নীচ ভেদভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সাম্য হন, মানুষও তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া একতায় সংবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হয়, সমাজ রক্ষা পায় ও অসুর নাশ হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি - শিব

আমাদের অন্তরস্থিত ধর্ম্মভাবের ঈশ্বরীয় শক্তিকে শিব বলা হয়। এই ধর্ম্মভাব এবং শান্তিভাব এককথা। এই শান্তির উৎকর্ষের জন্যই শত শত ধর্ম্মমত মানব সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। সমস্ত জীব এই শান্তির খোঁজে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু এই শান্তি আমাদেরই অন্তরের বস্তু। বাহিরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া জীব বহু জন্ম শ্রান্ত হয় মাত্র, পরে নিজেরই অন্তরে এই বস্তুর সন্ধান পাইয়া তৃপ্তি লাভ করে। যাঁহারা এই শান্তির কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাঁহাদের কথা, কার্য্য এবং বাসস্থানের নিকটস্থ হইলে আমাদেরও মন প্রাণ শান্তির প্রবাহে শান্ত হয়। শান্তি মানবের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেই মানবাত্মা প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মী, ভোগী, ধনী প্রভৃতি সকলকেই এক দিন এই শান্তির খোঁজ করিতে হইবে। ইহাকে না পাইয়া কাহারও তৃপ্তি নাই। এই শান্তির উৎকর্ষের জন্যই বহু লোক সংসারের সর্ব্বাধিক সুখের বনিয়াদকে ধূলি মুষ্টির মত ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে ভিক্ষুক যোগীর চরণে শরণ লয়। কাহারও অন্তরাত্মা এই শান্তির চাওয়াকে উপেক্ষা করিতে পারে না। এই শান্তির চাওয়াকে পূর্ণ করিবার জন্য আমরা যাহা করিতে চেষ্টা করি, এই শান্তির চাওয়াকে পূর্ণ করিবার জন্য মহাপুরুষগণ যে সব নীতি এবং বিধি বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া খ্যাত। মঠ মন্দির লইয়া ঝগড়া ধর্ম্ম নহে। তুই নীচ আমি উচ্চ এইরূপ ব্যবহারও ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম 'শান্তি'। এই শান্তির যিনি ঈশ্বর, এই শান্তির যিনি বিরাট শরীর ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার শরীরের সর্ব্ব অঙ্গই শান্তিতে গঠিত, তিনি শিব, তিনিই ধর্ম্ম। আমার তোমার মধ্যে যে বিশুদ্ধ আমিত্ব তাহা এই শিব ভগবানের বিরাট দেহে এক একটি বিন্দু মাত্র। অনুভূতির কেন্দ্রে যখন আমরা ঐ বিন্দুতে লীন হই, তখন ঐ বিন্দুই আমাদের অন্তরে বিরাট রূপে ফুটিয়া উঠে। আমাদের চক্ষে, মুখে, সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গে তখন সেই শান্তির সুখ ধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। আমরা তখন সত্যই জানিতে পারি, আমরা ধার্ম্মিক হইয়াছি। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সেই শান্তির স্নিগ্ধ ধারা নিকটস্থ আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়। যে কোনও জীব নিকটে আসে সেই (অবশ্যই আসুরিক সম্পদ সম্পন্ন মানুষ ভিন্ন) তাঁহার স্পর্শ পাইয়া সাময়িকভাবে শান্ত হয়। আমাদের এই মলিন অভিমানের (দেহাত্মবুদ্ধির অভিমান) বিন্দু অন্তরস্থিত সেই শান্তির সিন্ধুকে ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের অন্তরস্থিত আসল চৈতন্যসত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও আমরা কতকগুলি অজ্ঞানতাকে অবলম্বন করিয়া সেই বিশুদ্ধ অবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। এই অজ্ঞানতার আবরণগুলিকে আর্য্য শাস্ত্রে পঞ্চকোষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ।

অন্নময় কোষ

সব চেয়ে স্থূলতম কোষকে অন্নময় কোষ বলে। মাতৃরজঃ, পিতৃবীর্য্য এবং অন্ন, জল, বায়ু আদিতে ইহার পুষ্টি হয়। প্রত্যেক জীবই এই কোষটিতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া ভ্রান্ত পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে এই স্থূল কোষটাকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। জীবিত অবস্থায় এইকথা বুঝিয়াও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জীবিত অবস্থায় মানুষ মাত্রই যদি এইকথা বুঝিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিত তবে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইত। কত শত মহাপুরুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের এই অজ্ঞান গ্রন্থিটি খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু পৃথিবীর দিকে নজর ফিরাইয়া দেখ "যেই তিমির সেই তিমিরই"। একজন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর নিত্য সংঘটিত বহু সাধারণ ঘটনা দেখিয়া কেহই ভাবিতে পারিবে না যে এই মানুষগুলি একদিন এই শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এ শরীরটি যেন তাহাদের নিকট যুগ-যুগান্তরের স্থায়ী সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। এই অজ্ঞানতাকে অবলম্বন করিয়া মানুষের কত যে দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গৃহীর গৃহ, সন্ন্যাসীর আশ্রম সর্ব্বত্রই এই অজ্ঞানতাটুকু অবলম্বন করিয়া অশান্তির লীলা-নিকেতন হইয়া রহিয়াছে।

প্রাণময় কোষ

ইহা অন্নময় কোষ হইতে সূক্ষ্ম। ইহার কেন্দ্রটি আমাদের মনোময় শরীরে অবস্থিত। প্রাণশরীরের কেন্দ্রটির সহিত আনন্দময় শরীরেরও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মনোময় কোষ সাময়িক ভাবে স্তব্ধ থাকিলেও (সুষুপ্তিতে) প্রাণ স্তব্ধ থাকে না, ইহা তখন আনন্দময় কোষের অধীন হইয়া নিজের কাজ করিয়া থাকে। মনোময় কোষকে প্রাণ কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, আমাদের ইচ্ছা শক্তি আর হাত পা চালাইতে পারিবে না। সেই সময় শরীরে আঘাত করিলেও মনোময় কোষে সেই আঘাতে বেদনা প্রবেশ করিবে না। মনোময় কোষকে বাদ দিলে বেদনা গ্রহণ করিবার মত কোন যন্ত্র আমাদের অন্তরে আর থাকে না। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণের কাজ বন্ধ থাকে না। আনন্দময় কোষের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা রহিল। মনোময় শরীরকে কেন্দ্র করিয়া এই কোষটী সমস্ত স্থূল শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান) এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) কার্য্যকলাপগুলি বুঝিতে পারিলে এই প্রাণময় কোষকে বুঝা যায়। আমাদের স্থূল শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে প্রাণ শরীরটা ব্যাপ্ত। প্রত্যেক পেশীতে প্রাণময় শরীরের সংযোগ আছে। খুব সূক্ষ্ম তন্তুসমষ্টির মধ্য দিয়া আমাদের প্রাণশরীরের খেলা চলিয়াছে। মস্তিষ্কে মনের কেন্দ্র হইতে প্রাণের এই প্রবাহিকা নাড়ীগুলি আরম্ভ হইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পেশীতে যুক্ত হইয়াছে। প্রাণশরীর ক্রিয়াময় শরীর। এই ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টাগুলিই প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান এবং উদান নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই প্রাণশরীরটি খুব বিস্ময়কর ক্রিয়ার ক্ষেত্র। এই শরীর (বা কোষটি) মনের সহিত পার্থিব পদার্থের সংযোগস্থলে বিদ্যমান। এই স্থূল শরীরের অন্তরালে

থাকিয়া এই প্রাণ শরীরই মনের সহিত বিষয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকে। এই প্রাণই প্রত্যেক স্থূল পদার্থের সঙ্গ জনিত সুখ-দুঃখময় ক্রিয়া সমষ্টিকে আমাদের মনের কেন্দ্রে বহন করিয়া আনিয়া আমাদের সহিত সেই বস্তুর সূক্ষ্ম ক্রিয়াময় স্বরূপের পরিচয় করাইয়া দেয়। বাক্, পাণি, পাদ আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে হস্ত পদাদির স্থূল আকার বলিয়া আমরা মনে করি। বাস্তবিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম প্রাণময় ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াময় চেষ্টার সমষ্টি। সেই ক্রিয়াগুলির বিশেষ বিশেষ বিকাশ আমাদের স্থূল হস্ত পদাদিতে আছে বলিয়াই আমরা স্থূল হাত পা গুলিকেই পাণি পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যখন জীবের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকলতা প্রাপ্তি ঘটে তখন আমাদের প্রাণশরীর সেই অঙ্গ হইতে নির্দ্দিষ্ট প্রাণ শক্তিকে সংকোচ করিয়া অন্য কোন অঙ্গে পরিচালনা করিয়া নিজের কর্ম্মশক্তি বজায় রাখে। আমরা সেই সব বিকলাঙ্গ জীবের চাল চলন দেখিয়া ভাবি, জীবটি না জানি নিজের অঙ্গের অভাবে কতই কষ্ট পাইতেছে; কিন্তু সে যদি সুস্থ থাকে তবে তাহার কোনই কষ্ট হইবার কারণ নাই। স্থূল শরীরের বিকলতা আসিলেও প্রাণ শরীরের বিকলতা আসে না। তাই মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় শিথিল অঙ্গ হইয়াও কাম, ক্রোধ এবং লোভাদির শৈথিল্য অনুভব করেন না। আবার বালককেও বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিলে বালক তাহা মানিয়া লইতে চাহে না। আমাদের প্রাণশরীর সর্ব্বাবস্থায় যুবার ন্যায় কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন এবং তেজঃপূর্ণ। ইহা স্থূল শরীরে অণু পরমাণুতে ব্যাপ্ত। আবার স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহার শক্তির খর্ব্বতা আসে না। এই প্রাণ-শরীরও স্থূল, কিন্তু স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম। বাস্তবিক হস্তের আকার বিশিষ্ট অস্থি মাংস সমন্বিত হাতটি প্রকৃত হাত নহে। গ্রহণ শক্তি, দান শক্তি এবং কর্ম্ম শক্তিই প্রকৃত হাত। মরণ কালে সেই সব শক্তিগুলি আমাদের সঙ্গেই চলিয়া যায়। মৃত্যুর পর জীবমাত্রই সূক্ষ্ম শরীরী বা প্রাণ-শরীরী হইয়া থাকে।

সৃষ্ট জীবের মধ্যে অন্নময় কোষ বৃক্ষাদিতে বেশী পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বৃক্ষাদিও আমাদের মত জীব। তাহাদের শরীরে অন্নময় কোষের দৃঢ়তা বেশী। তাহারা এমন সব ভোগ্য পদার্থ গ্রহণ করে যাহাতে তাহাদের অন্নময় কোষটি বেশী পুষ্টি লাভ করে। পশ্বাদিতে প্রাণময় কোষের দৃঢ়তা বেশী। তাহারা প্রাণময় কোষের তৃপ্তিকেই ধর্ম্ম মনে করে। স্ত্রী এবং খাদ্যই তাহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্য পদার্থ। মানুষও যদি উন্নত কোষের পুষ্টির চেষ্টায় যত্নশীল না হইয়া স্ত্রী এবং খাদ্যে তৃপ্ত থাকে, তবে পশু বলিয়া অবজ্ঞাত হইতে থাকে। যাহা হউক মৃত্যুর পর সকলেই প্রাণ-শরীর ধারণ করিয়া থাকে। আমরা যতক্ষণ জীবিত ততক্ষণ স্থূল শরীরী। স্থূল শরীর হারাইয়া আমরা প্রাণ-শরীরী হই। সেই অবস্থাই মৃত্যু বলিয়া পরিচিত।

মনোময় কোষ

মনোময় কোষটি প্রাণময় কোষ হইতে সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক। মনোময় কোষটিকে আমরা মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অভিমান নামক চারিটি ভাগে আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। পূর্ব্বে “আমাদের অন্তরস্থিত অমুক শক্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে। “মনোময় কোষ”, ‘অন্তঃকরণ’ এবং ‘অন্তর’ একার্থক শব্দ জানিতে হইবে। পূর্ব্বে

ব্যবহৃত 'অন্তরস্থিত' শব্দের স্পষ্ট অর্থ মনোময় কোষস্থিত। পূর্ব্বে আলোচিত সূর্য্য, গণেশ এবং বিষ্ণু শক্তি মনোময় কোষেরই বিভিন্ন শক্তি।

মনোময় এবং প্রাণময় কোষের ভেদটি স্পষ্ট করিয়া দিতেছি। প্রাণময় কোষটি অন্নময় কোষের (বা স্থূল শরীরের) অণুপরমাণুতে ব্যাপ্ত। ইহারই একটি প্রান্ত (বা কেন্দ্র) মনোময় কোষের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহার আকার এবং ঠিক স্থূল শরীরটির মত। কিন্তু স্থূল শরীরের মত রক্ত মাংস অস্থি আদি পার্থিব পদার্থ সম্পন্ন নহে। আমাদের স্থূল শরীরটির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আধিপত্য আছে। কিন্তু স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলে প্রাণ শরীরটির উপর মাধ্যাকর্ষণ কোনই অধিকার স্থাপন করিতে পারে না। আমরা যখন স্থূল শরীরে অবস্থান করি তখন আমরা সর্ব্ব সময়েই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বদ্ধ। স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া প্রাণ শরীরে আসিলেই আমাদের স্বাধীনতা খুব বৃদ্ধি হয়। প্রাণ শরীরটি আলো এবং ছায়া মিশ্রিত ক্রিয়াময় শরীর। ইহার একটা জ্যোতির বিকাশ আছে। সেই জন্য ইহার আকার স্থূল শরীরে অবস্থান কালে স্থূল শরীরকে অতিক্রম করিয়া একটু বড় হইয়া থাকে। সকল মানুষের প্রাণ শরীরের রং একরূপ নহে। মনের অবস্থার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও রং বদলাইয়া যায়। হীনমনোবৃত্তি সম্পন্ন মানবের সূক্ষ্ম শরীর এবং উন্নত বিকাশ সম্পন্ন মানুষের সূক্ষ্ম শরীর একই রং বিশিষ্ট নহে। তবে সকলেরই প্রাণ শরীরের উপাদান আলো ছায়ার মত একটা ক্রিয়াশীল উপাদানে প্রস্তুত। প্রাণশরীরের ব্যাপ্তি সমস্ত স্থূলশরীরে। ইহার তেজটি স্থূলশরীরকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা বেশী দূর ব্যাপ্ত পদার্থ নহে। স্থূল শরীরেরই মত ইহার ব্যাপ্তি কতকটা নিয়মিত। অবশ্যই স্থূল শরীরের মত এত নিয়মিত নহে। আগুন, জল, কাঠ, পাথর, মাটি আদি যে কোন স্থূল পদার্থকে (অবশ্যই মৃত হওয়া চাই) আমাদের সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। যাহা হউক প্রাণময় কোষের কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারিলে সাধক এ কথা বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন যে প্রাণ শরীরই স্থূল শরীরের মধ্যস্থিত শক্তি। এই প্রাণ শরীরই আমাদের স্থূল শরীরকে বহন করিয়া বেড়ায়। স্থূল শরীরের মধ্যে মানুষের বিশেষ শারীরিক শক্তির যে বিকাশ দেখা যায় তাহা প্রাণ শরীরেরই পরিপুষ্টির বহির্বিকাশ। যাহাদের প্রাণ শরীর দুর্ব্বল তাহাদের স্থূল শরীরও ক্ষীণ হইয়া থাকে। আমাদের মনোময় শরীর এই প্রাণ শরীর হইতেও ব্যাপক এবং প্রাণ শরীরের আশ্রয়।

আমাদের মনোময় শরীর আকাশের মত ব্যাপক। আমাদের চক্ষু যতটা দেখিতে পায়, কর্ণ যতদূরস্থিত শব্দ শুনিতে পায়, মনোময় শরীর তাহার চেয়েও বৃহৎ। অনেকে হয় তো এই সব কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিবে না যে এই বিরাট মনটি কিভাবে আমাদের মস্তিষ্কে অবস্থিত হইতে পারে। সাধনার সাহায্যে মনোময় কোষে প্রবেশ করিলে ইহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মনোময় শরীরের এইরূপ বৃহত্ব এবং ব্যাপকত্ব বিতর্ক সাহায্যেও বুঝা যাইতে পারে। দেহাত্ম বুদ্ধির মলিনতা আমাদের মনোময় শরীরের এইরূপ সুন্দর অবস্থাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। সত্যই আমাদের মনোময় শরীর আকাশের সঙ্গে মিশিয়াই অবস্থিত। তাহা না হইলে দিগন্তব্যাপী নদী প্রান্তর সমুদ্রাদির সীমাহীন দৃশ্য যুগপৎ ধরিয়া রাখিবার স্থান আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কোথায়? বড় বড় বন ও জঙ্গল শহরাদির দৃশ্য চিত্র এবং বহু বৎসরের ঘটনাবলী ধরিয়া রাখিবার

স্থান নিশ্চয়ই মনে হইত না, যদি মনের এইরূপ ব্যাপকত্ব না থাকিত। আমাদের প্রাণ শরীরে এবং স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি মনের এই ব্যাপকত্বকে সংকোচ করিলেও চিন্তাশীল মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, মনের ব্যাপকত্ব এই সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ শরীরটা হইতে অনেক বড়। সমস্ত পার্থিব পদার্থই আমাদের মনোময় শরীরের মধ্যে অবস্থিত। মনোময় শরীরের কেন্দ্রস্থলে স্থিত হইলে আমাদের নিকট কোন বস্তুই আর দূরে অবস্থান করে না। সমস্ত বস্তুই তখন মনের আধারে অবস্থিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রাণ শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর দূরত্ব প্রতীত হইতে থাকে। সাধক মনের কেন্দ্রে স্থিত হইবার পর এইজন্য দূরশ্রুতি দূরদর্শনের বহু বিস্ময়কর ঘটনার পরিচয় পাইয়া থাকেন। অনেক সময় অনেক ঘটনার পূর্ব্ব দর্শনও তাঁহার হইয়া থাকে। পরমুহূর্ত্তে সেই জ্ঞাত ঘটনার সংঘটন চক্ষের সামনে দেখিয়া বিস্মিত হন। অনেক সাধারণ মানুষের জীবনেও এরূপ বহূ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে সেই মানুষ প্রাকৃতিক গতিতে মনোময় শরীরের নিকটস্থ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, মনঃশরীর ব্যাপক। মনঃশরীরে অবস্থানকালে কোন বস্তুই আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে না। কিন্তু প্রাণ শরীরে এবং স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক হইয়া পড়ি। তখন প্রাণ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সব বস্তুর সহিত আমাদের সংযোগ সাধন করে। এই প্রসঙ্গে আমরা আর বেশি আলোচনা করিতে চাহি না। তাহা হইলে বিষয়টি জটিল হইয়া যাইবে। সকলেই যেন চিন্তাশীল হইয়া এ সব বিষয়ের আলোচনা করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনোময় কোষকে চার ভাগে ভাগ করিয়া আমরা ইহার আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। এখন এই চার ভাগের অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অভিমানের সীমাগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সকলেরই পক্ষে এই কোষটিকে বুঝিতে সুবিধা হইবে। আমরা শিবের স্বরূপের সম্মুখীন হইবার জন্য এই শিব অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছি। মনোময় শরীরের ভাগগুলি বুঝিতে পারিলে শিব অংশ বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

মনের এমন একটি শক্তি আছে যাহা প্রাণ শরীরের সহিত সংযুক্ত লৌকিক ভোগ সম্বন্ধে জড়িত থাকে। এইরূপ ভোগের চেষ্টায় মন জড়িত থাকিবার দরুণ, মনের ব্যাপকত্ব সংকুচিত হইয়া যায়। এইরূপ একটি শক্তি আমাদের মনঃশরীরে আছে বলিয়াই আমরা আমাদের ভাবনাটাকে কেবলই স্ত্রী, পুত্র, সংসার, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি সসীম চিন্তাতে আবদ্ধ করিয়া ফেলি। বাস্তবিক স্ত্রী, পুত্র, সংসার, গৃহাদির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা প্রাকৃতিকভাবে এমন নহে যাহাতে আমরা এমনভাবে ভাবিয়া মনের ব্যাপকত্বের সঙ্কোচ করিতে পারি। আমরা ভোগ করিতে চাই, আবার ভোগে বাধা আসিবে ভাবিয়া চিন্তিত হই। যাহা হউক তাহা লইয়া বেশী ভাবনার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা মনঃ শরীরের চারিটা ভাগ করিয়াছি, আর সেই চারিটা ভাগের সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাই। মনকে কতকগুলি লৌকিক ভোগের সম্বন্ধে জড়িত করিয়া মনের ব্যাপকত্বকে সংকোচ করি। এইরূপ প্রত্যেক মানুষই এমন কতকগুলি ভাবনা দিন রাতই ভাবিয়া থাকে; যাহা ভোগ সম্বন্ধে জড়িত হইবার দরুণ অনুদার। এইরূপ ভাবনার দরুণ প্রত্যেক

মানুষের মনোজগৎ অন্য হইতে পৃথক হইয়া যাইতেছে। আমাদের মনঃশরীরের বা অন্তঃকরণের এই সঙ্কোচ অংশের নাম 'মন'।

মন এইরূপ সঙ্কোচ হইয়া পড়িতে চায়। গন্ধে, রসে, রূপে, স্পর্শে এবং শব্দে, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধুতে বা গৃহাদিতে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়; কিন্তু মনের আরও একটা শক্তি আছে যাহা এইসব সঙ্কোচ ভাব সহ্য করে না। এই সঙ্কোচ ভাবকে প্রতিমুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া দিতে চায়। মনের সেই শক্তিটাকে আমরা ''বুদ্ধি'' নাম দিয়াছি। এই ''বুদ্ধি'' বিচার শক্তি। ইহা গণেশ অংশে আলোচিত ''গণেশ''। বুদ্ধির শক্তি ধারা যখন মনের মধ্যে আসে তখন মনের বিষয়চিন্তা মুহূর্ত্তে মুছিয়া দিয়া মনকে আকাশের মত স্বচ্ছ এবং ফাঁকা করিয়া দেয়। মানুষের জীবনে এইরূপ অনুভব করা সত্যই খুব সুখময় অবস্থা। যাহা হউক সকলেই বুদ্ধির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন না, যদিও ইহা প্রত্যক্ষ করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। তবে মনের সঙ্কোচ বা গোঁড়ামীকে যে বুদ্ধি বা বিচারশক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে চাহে একথা দৃঢ়চিত্ত অনেক ব্যক্তিই অনুভব করিয়া থাকিবেন। মনের দুর্ব্বলতাকেই দৃঢ় হইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া নিজেকে দৃঢ়চিত্ত বলিয়া ভাবিয়া যেন কেহ ভুল না করেন। মন এবং বুদ্ধিশক্তিতে অনেক ভেদ। মন অজ্ঞান বা সঙ্কোচ-প্রধান, বুদ্ধিশক্তি জ্ঞান এবং উদারতা পূর্ণ। আমরা চলিত কথায় ''বিবেক'' বলিতে যাহা বুঝি তাহাই 'বুদ্ধি'।

মনের 'চিত্ত' অংশের আলোচনা করিব। আমাদের মনের একটা শক্তি আছে, যে শক্তি আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ঘটনাগুলি এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের সঙ্গ জনিত সুখ দুঃখের স্মৃতিগুলি ধরিয়া রাখে। মনের এই শক্তি সম্পন্ন অংশটির নাম 'চিত্ত'। 'বিষ্ণু' অংশে অন্তঃকরণের যে অংশ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে সেই অংশই চিত্ত। 'চিত্ত' অংশ 'মন' অংশের পশ্চাতে থাকিয়া মনের বিষয় ভোগের ব্যাপারগুলিকে বহুগুণে গুণিত করিয়া ফেলে। মনের কেন্দ্রের বিষয় ভোগ ভোগই মাত্র। তাহা সমস্ত প্রাণীতে একরূপ। কিন্তু চিত্ত যখন মনের বিষয় ভোগের সহায়ক হয় তখন ভোগ কেবলই ভোগ নহে, ভোগের সঙ্গে বিলাসিতাও আসিয়া মিলিত হয়। আমাদের অন্তঃকরণস্থিত চিত্ত অংশটী স্মৃতিপুঞ্জের কেন্দ্র। এই স্মৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক অংশকে পূর্ব্বে 'সূর্য্য' অংশে সূর্য্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য অংশকে বিষ্ণুকেন্দ্রে বিষ্ণু বলিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। সূর্য্য এবং বিষ্ণু কেন্দ্রের স্মৃতির ভেদটুকু জানা প্রয়োজন। আমাদের স্মৃতিতে কতকগুলি ঘটনার অংশ থাকে, আবার কতকগুলি দুঃখ, সুখ, শোক, আনন্দ, রাগ, দ্বেষের অংশ থাকে। ঘটনার অংশগুলি সূর্য্য কেন্দ্রের স্মৃতি, এবং সুখ দুঃখের স্মৃতিগুলি বিষ্ণু কেন্দ্রে অবস্থান করে। যে কোন ব্যাপারে লীলার স্মৃতিগুলি সূর্য্য কেন্দ্রে অবস্থান করে, আবার সেই ঘটনার সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখগুলি বিষ্ণু কেন্দ্রে থাকিয়া যায়। সাধকগণ সূর্য্য কেন্দ্রের অনুভূতির পর বিষ্ণু কেন্দ্রে আসিয়া থাকেন। সূর্য্য কেন্দ্রে অনুভূতির সঙ্গে মূর্ত্তির সম্বন্ধ থাকে। বিষ্ণু কেন্দ্রে আসিলে মূর্ত্তি এবং লীলার ভাগ আর থাকে না, সুখ দুঃখের অনুভূতিটুকু মাত্র থাকে।

সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যেও সুখ দুঃখ পূর্ণ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াতে অন্তঃকরণে যে ভাব লহরী উত্থিত হইয়া মানুষকে অভিভূত বা বিচলিত করিতে থাকে, তখনকার

ঘটনা মনে জাগাইয়া বিষ্ণু এবং সূর্য্য কেন্দ্রের ভেদ বুঝিতে পারা যায়। মা ছেলেতে, বন্ধু বন্ধুতে, স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে এবং গুরু শিষ্যে যেখানে ভালোবাসা খুব গভীর স্থানে জমিয়া যায় সেই সব স্থলে ব্যবহারের তারতম্যে মানুষের মনোজগতে অসংখ্য ঘটনাবলী পর পর জাগিতে থাকে। যখন বিদ্বেষকে অবলম্বন করিয়া এই মানলীলা চলে (বিদ্বেষকে অবলম্বন করিয়া হইলেই বেশী জমাট হয়) তখন লক্ষ লক্ষ ঘটনা ঐ একই বিদ্বেষের আলোর নিকট ধরিয়া ধরিয়া দিন রাত বিচার চলিতে থাকে। সেই সময় মানুষের অন্তর ক্ষেত্র বিমর্দ্দিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দুইজনের একজন নিজের অভিমানকে খর্ব্ব করিয়া মিলন ঘটাইয়া দেয় সেই মুহূর্ত্তে সেই ঘটনা রাশি সেই মিলনের কেন্দ্রে আত্মসমর্পণ করে। যাহা হউক মানুষ যদি সেই বিদ্বেষ বা ভালোবাসা মাত্রে স্থিত হইয়া ঘটনার কথা মনে আর না উঠান, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুকেন্দ্র প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ঘটনার উৎপত্তি যতগুলিই হউক না কেন, বিদ্বেষ কিন্তু একটি। এইরূপে মা যখন পুত্র শোকে কাঁদিতে থাকেন তখন সেই পুত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট শত শত ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার যখন ভাবিতে ভাবিতে শোকের কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হন, তখন সব ভুলিয়া সেই শোকস্পর্শের কেন্দ্রে মজিয়া যান। মুখ দিয়া কথাটিও ফোটে না। আমরা ভাবি ব্যথায় মূর্চ্ছা গিয়াছেন। বাস্তবিক, ব্যথায় মূর্চ্ছা যান নাই। শোকের কেন্দ্রে (অজ্ঞাতসারে) সমাধিস্থ। যতক্ষণ ঘটনার অংশ অন্তরে খেলিতে থাকে ততক্ষণ সেই ব্যথা যতই হউক না কেন মূর্চ্ছা কিন্তু হয় না; এই শোকময় ঘটনার অংশগুলি সূর্য্যকেন্দ্রের দান। কিন্তু ঐ শোকটি বিষ্ণু কেন্দ্রস্থিত অন্তঃকরণের শক্তি। সাধনার সাহায্যে এই সব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে ইহাদের রহস্য জানা যায়। তাই সাধকগণ এইরূপ কোন ব্যাপারেই আর ব্যথিত হন না। যাহা হউক সুখ এবং দুঃখ মিশ্রিত প্রাণের ভোগ এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ঘটনারাজি, যে কেন্দ্রে পূঞ্জীভূত হইয়া অবস্থান করে, আমাদের অন্তরের সেই কেন্দ্রের নাম ‘চিত্ত’।

আমাদের অন্তরের একেবারে নির্ম্মল অবস্থার নাম ‘অভিমান’। ইহা আমাদের অন্তরের শান্তির অবস্থা এবং প্রশান্ত অবস্থা। আমাদের অন্তঃকরণ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন আমরা বিজ্ঞানময় কোষের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকি। মনোময় কোষটার খাঁটি স্বরূপই ‘অভিমান’। প্রাণ শরীরের ভোগের কালিমা এই নির্ম্মল অবস্থাকে মলিন এবং সঙ্কোচ করে। সেই মলিন ভাবটাই ‘মন’ নামে অভিহিত করিয়াছি। প্রাণ শরীরের ভোগময় সঙ্গের সংস্রবে বহু বিষয়ের স্মৃতি আমাদের মনঃশরীরের আরো একটি অংশে জমিয়া থাকে। মনোময় শরীরের এই স্মৃতির ভাণ্ডারই ‘চিত্ত’ নামে খ্যাত। এই স্মৃতিই দুইভাগে বিভক্ত। একটিতে সুখ দুঃখের সংস্কার, অন্যটিতে লীলার অংশ অবস্থান করে। যেখানে লীলা, তাহাই সূর্য্য কেন্দ্র। যেখানে সুখ দুঃখের অনুভূতি অবস্থান করে তাহাই বিষ্ণু কেন্দ্র। মনে এবং চিত্তে এই মাত্র ভেদ যে, মন পার্থিব জগতের সহিত সংযোগ রাখে এবং পার্থিব ভাবরাশি উঠাইয়া উঠাইয়া চিত্তে জমা করিয়া দেয়। চিত্ত সেইগুলিকে যেন সাজাইয়া গুছাইয়া জমা করিয়া রাখে। প্রয়োজন হইলে চিত্ত সেই ঘটনারাশিকে মাকড়সার সূতা উৎপন্নের মত অফুরন্ত প্রসব করিতে পারে। মন প্রাণ অংশের খুব নিকটে অবস্থান করে। চিত্ত অংশ প্রাণ অংশ হইতে একটু দূরে অবস্থান করিলেও

প্রাণের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ রাখে অর্থাৎ প্রাণ সম্বন্ধযুক্ত বহু ঘটনাকে এবং সুখ দুঃখকে জমা রাখে। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে অন্তঃকরণের চিত্ত অংশ ভোগেই সাহায্য করে, ত্যাগে সাহায্য করে না। তাই এই চিত্ত অংশ হইতে মানুষের সমাজ আসিয়াছে। সমাজের দুইটা দিক, একটা ভোগ অন্যটা সংগঠন। মনের ভোগ একজনের ভোগ, চিত্তের ভোগ সংগঠিত ভোগ। 'বুদ্ধি' অংশের কাজ মনের বিষয়-সংযোগ কাটিয়া দেওয়া। বুদ্ধির কষাঘাতে মন বিষয়ের (স্থূল জগৎস্থিত) সংযোগ একদিন নিশ্চয়ই কাটিতে বাধ্য হইবে। ধীরে ধীরে সে এমন অবস্থায় আসিবে যাহাতে সে আর স্থূল জগৎস্থিত বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলেও মন ক্ষান্ত হইবে না। সে তখন চিত্তস্থিত সঞ্চিত বিষয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। বুদ্ধি মনের বিষয়চিন্তা সহ্য করিবে না। তাই সে মনকে আবার ছাঁটিতে কাটিতে আরম্ভ করিবে। ধীরে ধীরে চিত্তের মধ্যস্থিত ঘটনার অংশ আর মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সাধক তখন চিত্তের কেন্দ্রে সমাধি লাভ করেন। ইহাই বিষ্ণু কেন্দ্রস্থিত হিরণ্ময় তৈজস অনুভূতি। এখানে ঘটনার অংশ কাটিয়া গেলে বিষয়ের সঙ্গে প্রাণের মিলন জনিত সুখ দুঃখের স্মৃতি মাত্র থাকিয়া যায়। শ্বেতবর্ণ শান্তিস্বরূপ অভিমানের আধারে সেই প্রাণের স্পর্শবোধগুলি হিরণ্ময় জমাট জ্যোতির আকারে এই কেন্দ্রের অনুভূতিতে ফুটিয়া উঠে। অনুভূতিটাকে বিশ্লেষণ করিলে শান্তি ও সুখ দুইটী বস্তুই পাওয়া যায়। বিষয়ের স্পর্শে সুখ হয়। সেই সুখস্পর্শ বোধগুলিই চিত্তকেন্দ্রের অনুভূতির উপাদান। সেই সুখটুকু বাদ দিলে আমরা কেবল শান্তির কোলে আসিয়া যাই। বুদ্ধি সেই সুখটুকুর স্বাদকেও বিষময় করিবে। কিন্তু সে কত দিনে তিক্ত বা বিষময় করিয়া দিবে তাহা বলা যায় না। তাই পঞ্চ কোষের ক্রমগভীরতার পথে আমরা কতদিনে যে কেবল এই নির্ম্মল শান্তির কোলে স্থিত হইতে পারিব তাহা বলা সহজ নহে। যাহা হউক, আমাদের অন্তঃকরণের যে অবস্থার নাম অভিমান দিয়াছি, তাহা অন্তঃকরণের একেবারে নির্ম্মল অবস্থা। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান অধ্যায়ের আলোচনার বস্তু শিব। অন্তঃকরণস্থিত শান্তির ধারা ধরিয়া আমরা সহজে এই কেন্দ্রে আসিতে পারি। আর তাহাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। উপাসনার পথ অর্থাৎ সন্ধ্যা পূজাদি এই বৈজ্ঞানিক পন্থার অনুকূল। সমস্ত গণিতই যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ নামক চারিটা বিজ্ঞানে নিয়ম করা হইয়াছে। গণিত-আবিষ্কারকগণ মনের এই চারিটি ক্রিয়াকেই গণিত বিজ্ঞানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রাণ শরীরে ভোগের যোগই যোগ। এইরূপ প্রাণ শরীরের ভোগে বহু যোগই পূরণ। প্রাণ শরীরের ভোগ ত্যাগই বিয়োগ। এইরূপ বহু বিয়োগে ভাগ সিদ্ধ হয়। প্রাণ শরীরের ভোগকে নিঃশেষে ভাগ করিয়া দিলে আমাদের অন্তরে যে অবস্থাটুকু অবস্থান করে তাহারই নাম শান্তি। ইহাকে আমরা অভিমান নাম দিয়াছি। বিয়োগকে অবলম্বন করিলে ভাগ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ত্যাগের পথে জীব শিব হয়। ত্যাগের পথে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়।

মনোময় শরীরের এই চারিটা ভাগের নাম লইয়া শাস্ত্রে নানা মতভেদ আছে। কেহ এই চারিটি ভাগকেই মন নাম দিয়াছেন, কেহ বুদ্ধি নাম দিয়াছেন, কেহ চিত্ত নাম দিয়াছেন, কেহ বা অভিমান বলিয়াছেন। নামের বা শব্দের গোলমালে নজর না দিয়া অন্তঃকরণটি বুঝিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। অন্তঃকরণের প্রত্যেকটি স্পন্দনের সহিত

প্রত্যেকটি বিভাগের ক্রিয়া জড়িত আছে। তবে ভাবের প্রাধান্যেই এইরূপ ভাগ বুঝিতে হইবে।

জীব যখন প্রাণময় কোষের পুষ্টিতে যত্নশীল থাকে, ততক্ষণ তাহাদিগকে 'প্রাণী' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। জীব যখন মনোময় কোষের পুষ্টির চেষ্টায় নিযুক্ত হয় তখন সেই জীবই মানুষ, মানব এবং মনুষ্য নাম ধারণ করে। প্রাণময় কোষের পুষ্টিতে নিযুক্ত জীবগণকে বা সৃষ্টিধারাস্থিত প্রাণময় কোষের জীবগণকে প্রাচীন জ্ঞানিগণ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ মোটামুটি এই চার ভাগে ভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এর এক একটির বিশেষ প্রাধান্যের জন্য চার ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রাণের তমের আধিক্যে উদ্ভিজ্জ, প্রাণের তমঃ + রজঃ স্বেদজ, প্রাণের রজঃ + সত্ত্বে অণ্ডজ এবং প্রাণের সত্ত্বগুণের আধিক্যে জরায়ুজ জীবগণের সৃষ্টি বুঝিতে হইবে। এইরূপে জীবের মনোময় কোষের বিকাশেও মনের বা অন্তঃকরণের চারিটা ভাগ পাওয়া গেল। মন যেখানে ভোগের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে সেটা মনের তামস অবস্থা। মন যেখানে বহু ভোগের সম্বন্ধে যত্নশীল সেটা মনের তমঃ + রাজস্ অবস্থা। মন যেখানে ভোগের বিরুদ্ধে অভিযান করে সেটা মনের রজঃ + সত্ত্বের অবস্থা। মন যেখানে ভোগের সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করে সেখানে মনের সাত্ত্বিক অবস্থা। মনের তামস্ অবস্থায় স্থিত মানুষই প্রাচীন জ্ঞানিগণের ভাষায় 'শূদ্র' (ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ), তমঃ + রাজস্ অবস্থায় স্থিত মানুষ 'বৈশ্য', মনের রজঃ + সাত্ত্বিক অবস্থায় স্থিত মানুষই 'ক্ষত্রিয়' (ক্ষত্রিয় শক্তিস্তর পর্য্যন্ত বিকাশ করিবে), এবং মনের সাত্ত্বিক অবস্থায় স্থিত মানুষই 'ব্রাহ্মণ'। মনোময় কোষস্থিত জীবগণকে এই ভাবেই ভাগ করা যাইতে পারে। যাহা হউক মন যখন প্রশান্ত, উদার, সাম্য এবং ভোগের স্পন্দনহীন অবস্থা লাভ করে, সেই সময় মানুষ শিব হন। এই শান্ত অবস্থার উপরই বিজ্ঞানময় কোষ অবস্থিত।

অনুভূতির মধ্য দিয়া সাধকগণ মনের কেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরে (বহু দিনের কঠোর সাধনায়) এই 'অহং' এর কেন্দ্রে আসিতে পারেন। বিষ্ণু বা প্রেমের অনুভূতির কেন্দ্র হইতে যখন প্রথম এই ধর্ম্মভাবের কেন্দ্রের অনুভূতি আসিতে থাকে তখন সাধক উভয় কেন্দ্রের আংশিক অনুভূতি এক সঙ্গে পাইতে থাকেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে এই অবস্থাকে হরিহরাত্মক ঈশ্বরানুভূতি (বা অর্দ্ধ-নারীশ্বর) বলা হইয়াছে। হরি বলিতে বিষ্ণুকে বুঝায়, হর বলিতে শিবকে বুঝাইয়া থাকে। যাহা হউক পরে ঐ শিবের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা শান্তির কেন্দ্র, সুতরাং এখানে স্থিত হইবার পর সাধকের অন্তরের প্রত্যেকটি বৃত্তিতে একই 'শান্তি' ফুটিয়া উঠে। আবার হরিহরাত্মক অনুভূতির কেন্দ্রে স্থিত থাকিলে অন্তরে প্রত্যেকটি বৃত্তির সহিত 'আমি' রূপ ধরা পড়ে। ''সকলেতে আমি, আমিই সকল'' এই উপলব্ধিটি সহজ হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে ''বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতার'' কথা বলা হইয়াছে। ইহাই 'অস্মিতার' অনুভূতির কেন্দ্র। সমস্ত প্রকারের অনুভূতি এখানে 'আমিরই' স্বরূপে পরিণত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই সাধক শিবের কেন্দ্রের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হন।

মনের এই ''আমির'' গ্রন্থিটী ভেদ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন মানুষেরই গর্ব্ব নষ্ট হয় না। সাধক যখন এই অস্মিতার কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হন, তখন অনেক সাধকের জ্ঞানের

অভিমান খুব বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অনেক শান্তচিত্ত যোগ পরায়ণ সাধুরও জ্ঞানের অভিমান বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সাধারণ লোক ইহা দেখিয়া সেই সাধককে অজ্ঞান মনে করে। এইরূপ অভিমান অজ্ঞান তো নিশ্চয়ই। বাস্তবিক অভিমানের কেন্দ্র ভেদ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অজ্ঞানাভিমানের আক্রমণ হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অভিমানের সাত্ত্বিক অবস্থাই 'শিব'। রাজস্ অবস্থায় অভিমান অবস্থান করিলে মানুষ কর্ম্মী হইয়া থাকেন, সেই অবস্থাগুলিই "বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণেশ" অবস্থা। কর্ম্মী অবস্থায় যে অভিমানের যথেষ্ট বেগ থাকে তাহা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু জগতের হিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবার কারণে সেই অজ্ঞানটী সহজে ধরা পড়ে না। অভিমানের তামস্ অবস্থায় মানুষের দেহাত্ম-অভিমান বৃদ্ধি হয়। এইজন্য সত্ত্বভাবের সামান্য বিকাশেই হঠাৎ কর্ম্মভাব ত্যাগ করা ঠিক হয় না। অন্তঃকরণের সত্ত্বভাবের বিকাশের পর আন্তর বৃত্তিগুলি অনেক সময় সাধককে ভুল পথে লইয়া যায়। সত্ত্ব এবং তমঃ ভাবের ভেদ ভাল রূপে বুঝিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও রজঃভাব বা কর্ম্মাবস্থা ত্যাগ করিতে নাই (প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে ত্যাগ করা চলে)। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিলে দেখিতে পাইবেন, শান্তির নেশা কাটিয়া গিয়াছে। আবার কর্ম্মে থাকিলেই শান্তির বিঘ্ন হয় না। এই অস্মিতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সাধকের অন্তরে অনেক সময় প্রবলভাবে অজ্ঞান অভিমানের আক্রমণ হয়। বুদ্ধিমান সাধক সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে চিরদিনের মত এই বৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যে সব সাধকের পূর্ব্বেই তোষামোদকারী ভক্তের দল গড়িয়া গিয়াছে তাঁহারা এ জন্মে এইখান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত হন, এবং ধীরে ধীরে ভোগের সুখে নজর বাড়াইয়া দিতে থাকেন। সাধকগণ এবং কর্ম্মিগণ প্রথম অবধিই এমনভাবে সংযম অবলম্বন করিবেন যাহাতে এই ভীষণ শত্রুর আক্রমণকে যথা সময় প্রতিরোধ করিতে পারেন।

শাস্ত্রে অষ্টপাশের* কথা আছে। এই অষ্টপাশ এই 'অস্মিতা'কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অনেক ভাল সাধক এই 'অস্মিতা'র প্রচ্ছন্ন অভিমানকে কাটিতে না পারিয়া অষ্টপাশ হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারেন না। সেজন্য বিজ্ঞানময় কোষের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া এই স্তরেই অবস্থান করেন। 'অস্মিতা' ভেদ করিয়া শিবস্বরূপে স্থিত হইলে সাধকের ক্ষুদ্র অভিমান নষ্ট হয়। চিত্ত বা ভালোবাসার কেন্দ্রে স্থিত হইলে প্রত্যেক জীবের প্রাণের মধ্যে নিজের প্রাণের বিকাশ দেখিতে বা বুঝিতে পারেন। বুদ্ধির কেন্দ্রস্থলে আসিলে সত্যে এবং ত্যাগে দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিষয় ভোগের টান নষ্ট হয়। এই তো মোটামুটি আলোচনা, বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন মনে হয় না।

প্রথম অধ্যায়ে আসুরিক সম্পদের কথা বলা হইয়াছে। এই আসুরিক সম্পদগুলি এই 'অস্মিতা'কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। যাহারা আসুরিক বলে বলবান তাহারা মনোময় কোষটির প্রায় সবটাই শক্তি অধিকার করিতে পারে (অর্থাৎ হরিহরাত্মক অবস্থার অনুভূতির কেন্দ্র পর্য্যন্ত সবটা)। তাহারা বুদ্ধিশক্তি, শিক্ষাশক্তি, প্রেম বা

* (১) ঘৃণা, (২) লজ্জা, (৩) ভয়, (৪) নিন্দা, (৫) কুল, (৬) শীল, (৭) শোক, (৮) জাতি।

সংগঠনশক্তি, ধর্ম্মশক্তিরও কতকটা অংশ আয়ত্ত করিয়া সবটাই শরীরের বা প্রাণের সুখের জন্য নিয়োজিত করিতে পারে। তাহারা বিতর্ক সাহায্যে ঐসব শক্তি পীঠগুলি বেশ বুঝিতে পারে। অনেকে বিষ্ণুকেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করিয়াও আবার আসুরিক ভাবে এবং ভোগে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবের কেন্দ্রের অনুভূতি আসিলে মানুষের আসুরিক বিকাশ নষ্ট হইয়া যায়। জীবনের এক অন্য রকমের বিকাশ দেখা দেয়। ইহার পর বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশের অধিকার হয়। আসুরিক বিকাশ থাকিতে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রবেশ কোন যুগেই হইবে না।

বুদ্ধিশক্তি, ত্যাগশক্তি বা গণেশের শক্তি ভিন্ন কেহই শিবের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যাহারা দৃঢ়তার সহিত সত্য, ত্যাগ এবং নিরভিমানকে অবলম্বন করে না তাহাদের পক্ষে শিবের কেন্দ্রস্থলে আসা সম্ভব নহে। মনোময় কোষের যাহারা নিম্নস্তরে অবস্থান করে, তাহারা অন্তঃকরণের সবটা শক্তিই ক্ষুদ্র স্বার্থের সুবিধার জন্য নিয়োজিত করে। তাহাদের সংগঠন বা সমাজ, বিচার, শিক্ষা সবটাই কেবল শরীরের সুখের জন্য হয়। তাহাদের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে স্বার্থের দুর্গন্ধ ধরা পড়ে। যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহারা কিছুতেই ইহাকে বুদ্ধিমান লোকের নিকট গোপন করিতে পারিবে না।

মনোময় কোষের বুদ্ধির অংশ যাঁহারা প্রবল করিয়া ধরিয়া বসিয়াছেন তাঁহাদের অন্তঃকরণের সর্ব্বপ্রকারের শক্তি ত্যাগকে মূর্ত্ত করিবার জন্য সাহায্য করে। যাঁহাদের মধ্যে চিত্তের অংশ প্রবল তাঁহাদের অন্তঃকরণের সর্ব্বশক্তি প্রেমকে এবং সংগঠনকে মূর্ত্ত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্তরের অভিমানে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা কেবলই শান্তি খুঁজিতে থাকেন। ত্যাগ, ভোগ, হিংসা, অহিংসা, ভালবাসা, দ্বেষ প্রভৃতির একটিতেও ইঁহারা মুগ্ধ নহেন। ইঁহারা ইহাদের কোনটিই অবলম্বনে দৃঢ়তা দেখান না বা ত্যাগ করেন না। কোন কথাই ইঁহারা ভাবেন না, কাহারও কথা ইঁহারা ভাবেন না। কেবলই শান্তির সুবিধাটুকুর অনুকূল সুবিধা দেখেন।

বিজ্ঞানময় কোষ

শিবের ধ্যানে শিবকে 'পঞ্চবক্ত্র' বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষই শিবের স্বরূপ একথা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য এই 'পঞ্চমুখ' শব্দটি বিশেষ সহায়ক হইবে। শিবের পাঁচ মুখই নহে শিবের মুখ ছয়টি। পাঁচমুখ বিজ্ঞানময় কোষেরই কথা। ষষ্ঠ মুখটিই আমাদের মনোময় কোষ অংশে 'অভিমান' নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অভিমানটিই মনোময় কোষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা মনের বা অন্তঃকরণের প্রশান্ত অবস্থা। এই সাত্ত্বিক শান্ত অভিমানই মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যস্থলে বিদ্যমান থাকিয়া মনোময় কোষের সহিত বিজ্ঞানের বোধকে সংযোগ করিয়া দিতেছে (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র দেখ)। স্থূল জগতের সৃষ্টির তাত্ত্বিক উপাদানগুলি এই বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই আমাদের সঙ্গে সংযোগ রাখে। এই বিজ্ঞান শরীরকে বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষিতি আদি স্থূল তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞানেরই স্থূল বিকাশরূপে সাজাইয়া দেওয়া যায়। বিজ্ঞান হইতেই স্থূল বিশ্বের উৎপত্তি। তাই বিজ্ঞান শরীরের সঙ্গেই স্থূল বস্তুর সংযোগ প্রথমে হয়।

বোধ, অনুভূতি, উপলব্ধি বা জ্ঞান যে কেন্দ্রে বা কোষে বিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে, সেই কোষটার নামই "বিজ্ঞানময় কোষ"। এই 'বোধ' অর্থে বাহিরের জগতস্থিত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দাদির 'বোধ' বুঝিতে হইবে। অভিমান (শিবের ষষ্ঠ মুখ), সংস্কার (বিষ্ণু), শিক্ষা (সূর্য্য), বিচার (গণেশ) এবং বিষয় ভোগের ইচ্ছা আমাদের বিজ্ঞানের বোধকে বিকৃত করিয়া ফেলে। বোধ বিজ্ঞান ক্ষেত্রেই প্রথম হয়, পরে সেই বোধটি অভিমানে (বা শিবের ষষ্ঠ মুখে) চলিয়া আসে। সেখান হইতে চিত্তে (বা বিষ্ণুকেন্দ্রে), ইহার পর সূর্য্যকেন্দ্রে, পরে মনে আসে। মন হইতে সেই বোধ প্রবাহটি বুদ্ধি কেন্দ্রে যায়। বুদ্ধি হইতে আবার মনে আসে, পরে কোন একটি কাজ ইন্দ্রিয় দ্বারা হইয়া থাকে। মনোময় কোষের খুব স্থির অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত এই গুপ্ত পরামর্শ গৃহের অনেক ব্যাপারই যোগী সাধকের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বিজ্ঞানময় কোষের আবরণহীন বোধকে ভোগমুখী মন খুব ছোট আকারে (অর্থাৎ বিষয়ের আকারে) পরিণত করে। বুদ্ধি সেই ছোট আকারের (বা সঙ্কুচিততম) পরিণতিকে বড় করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে চেষ্টা করিবার পর মন নিজের অধিকার ছাড়িয়া দেয়। বুদ্ধি তখন চিত্তের দুর্ব্বলতা কাটিবার চেষ্টা করে। চিত্ত নিজের ভোগের জন্য বহু সংগ্রহ জমা রাখে। চিত্তের বেগ ভোগের দিকেই বেশী। বুদ্ধি প্রথমটা চিত্তের ভোগের সমর্থনই করে। কারণ, বুদ্ধি জানে ঐখানেই চিত্তের অস্তিত্ব। তাই সে চিত্তস্থিত সেই সঙ্কুচিততম ভোগ্য বস্তুগুলিকে সকলের সঙ্গে সমানভাবে ভোগে বিলাইতে চেষ্টা করে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ভেদটুকু স্পষ্ট করিয়া দিতেছি। বৈশ্য ভোগী, বহু ভোগী এবং সঞ্চয়ী। ক্ষত্রিয় যদি ভোগী হয় তবে বহু লোককে সঙ্গে লইয়া ভোগ করিতে চায়। বৈশ্য = মন + চিত্ত। ক্ষত্রিয় = বুদ্ধি + চিত্ত। বৈশ্য বদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ জীব। ক্ষত্রিয় মুক্ত এবং উদার মানব। ক্ষত্রিয় ক্রমোন্নতিতে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন। যথাস্থানে একথা আবার বলা হইবে। অভিমানের কেন্দ্রে আসিলে সেই বোধই শান্তির স্বরূপতা লাভ করে। যাহা হউক বুদ্ধির চেষ্টায় বিজ্ঞানের বোধ যতই উদারতা লাভ করুক না কেন, মনোময় কোষে বিজ্ঞানের বোধ বিকৃতই বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞানময় কোষ হইতে বোধের ধারা ধীরে ধীরে যেমন মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্রে আসিতে থাকে, তেমনই সেই বোধের স্বরূপটি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে বোধের ধারা প্রথমে অভিমানের কেন্দ্রে আসে। তখন তাহা একটা 'অস্তি' বোধ মাত্র। ইহার পর বোধটি চিত্তের কেন্দ্রে যায় তখন সেই বোধটি 'প্রিয় বা অপ্রিয়' ভাবের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। চিত্তের দ্বিতীয় কেন্দ্রে (সূর্য্য কেন্দ্রে) গেলে সেই প্রিয় অপ্রিয় বোধটির সহিত মিল হয় এইরূপ বহু ঘটনা বা 'লীলা' জাগিয়া উঠে। ইহার পর সে বোধটি বুদ্ধির কেন্দ্রে যায়। বুদ্ধি যদি সেই নজির দেখিয়া কোন কিছু স্থির করিতে না পারে, তবে সে বোধটি মনের কেন্দ্রে যায়। মন তখন ইন্দ্রিয় সংযোগে বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে ইহার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়া বোধটি আবার বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে। (এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিজ্ঞানময় কোষের সম্পত্তি হইলেও মনোময় কোষেরও অধীন হয়।) বুদ্ধি তখন 'নিশ্চয়' করিয়া দেয়। মনের কেন্দ্রে সেই বোধটি 'বিষয়ের' (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ সংযুক্ত)

আকার লাভ করে। (অন্তঃকরণের মধ্যে প্রত্যেকটি বোধের খেলা যে কত ভাবে কেন্দ্রে কেন্দ্রে চলিতে থাকে তাহা এখানে বলিবার সময় নাই।)

এই বিষয়টি লইয়া বেশী আলোচনা করিলে অনেক কথা লিখিতে হয়। তাই চিন্তাশীল ব্যক্তির স্ববিধার জন্য একটি সংক্ষেপ পরিচয়ের সূত্রপাত করিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি - আমাদের বিজ্ঞানশরীর চিরজাগ্রত অবস্থায় আছে। মনোময় কোষই নিদ্রিত হয় মাত্র। স্বষুপ্তির অবস্থায় আমরা আমাদের অন্তঃকরণ স্থিত অভিমানের কেন্দ্রে আসিয়া থাকি। আবার স্বপ্নাবস্থায় মনোময় কোষের সূর্য্য, বিষ্ণু অংশও জাগ্রত হয়। স্বপ্নের এমন অবস্থাও আছে যাহাতে বিষ্ণু অংশ জাগ্রত থাকে এবং সূর্য্য অংশ নিদ্রিত থাকে। সেই অবস্থায় স্বপ্নে লীলার অংশ বিকশিত হয় না। কিন্তু স্বখ-দুঃখের বোধ জাগ্রত হইয়া থাকে। নিদ্রার ক্রম-গভীরতায় আমাদের অন্তঃকরণের বিভিন্ন অংশগুলি পরিপুষ্টি লাভ করে। যে সময় চিত্তের কেন্দ্র পুষ্টিলাভ করিতে থাকে সেই সময় কাহাকেও জাগাইলে তাহার খুব কষ্ট হয়। লোকে এই অবস্থায় জাগাইয়া দেওয়াকে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেওয়া বলে। স্বষুপ্তি হইতে জাগিবার সময়ও ক্রমে বিষ্ণু কেন্দ্র জাগ্রত হইয়া সূর্য্য কেন্দ্র জাগ্রত হয়। পরে মনের অংশও জাগিয়া উঠে। জাগিবার সময়ও যখন বিষ্ণু কেন্দ্র জাগিতে থাকে তখন কাহাকেও জাগাইলে তাহার খুব কষ্ট হইয়া থাকে! যাহা হউক যে কথা বলিতেছিলাম তাহা বলিতেছি। গভীর রাতে একটা শব্দ শুনিয়া তিন জন লোক জাগিয়া উঠিল। সকলেই নিদ্রিত ছিল, আবার তিন জনেই জাগিল। একজন বলিল - "কি একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে, আমি জাগিয়া গিয়াছি।" দ্বিতীয় জন বলিল - "বোধহয় বন্দুকের আওয়াজ, আমার প্রাণটা ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে।" তৃতীয় জন বলিল - "আওয়াজটা দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়াছে, আওয়াজ শুনিয়াই মনে হইল বাবুর বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে।" প্রথম ব্যক্তির কথা শুনিয়া বুঝা যায় যে সে স্বষুপ্তিতে ছিল। তাহার অন্তঃকরণের বিষ্ণু এবং সূর্য্য অংশ নিদ্রিত ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শুনিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহার অন্তঃকরণে চিত্ত বা বিষ্ণু অংশ জাগ্রত ছিল। তৃতীয় ব্যক্তির কথায় বুঝা যায়, তাহার অন্তঃকরণের সূর্য্য অংশ জাগ্রত ছিল। যদি বিজ্ঞান অংশ জাগ্রত না থাকে তবে প্রথম ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গই হইত না। এখন একটু বিচার করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে বোধের প্রত্যেকটি ধারা বিজ্ঞানময় কোষ হইতে নামিয়া ক্রমে মনোময় কোষের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করে। (যাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করেন তাঁহারা অন্তঃকরণটী বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।)

আমরা যখন স্বষুপ্তিতে অবস্থান করি সে সময় আমরা আমাদের অন্তরস্থিত অভিমানের কেন্দ্রে অবস্থান করি। অনেক দার্শনিকের মতে আমরা স্বষুপ্তিতে আনন্দময় কোষে অবস্থান করি। বাস্তবিকই তাহা ঠিক নহে। আমাদের বিজ্ঞানশরীর চির জাগ্রত। আনন্দময় শরীর তাহার উপরে অবস্থিত। এই জাগরণের পুরীকে ভেদ করিয়া মনঃশরীর কেমন করিয়া আনন্দময় কোষে যাইবে? আনন্দময় শরীর চিরকর্ম্মময় শরীর। এই শরীর কোন অবস্থায়ই বদ্ধ নহে, কর্ম্মহীনও নহে। আমাদের নিদ্রা অর্থে মনোময় কোষের নিদ্রা মাত্র। নিদ্রাবস্থায় মনের বিষয়-চিন্তা, বুদ্ধির বিচার, চিত্তের প্রেম, সবটাই অভিমানের কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয়। এই অভিমানটি আমাদের অন্তঃকরণের বীজাবস্থা। জাগরণে সেই

বীজ হইতেই মনোজগৎ ফুটিয়া উঠে। এত বড় সংসার, এত বিচার, এত প্রেম, এত সংগঠন, সব তখন আমাদের অন্তরস্থিত 'আমির' গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। 'আমিত্বের' বিন্দুতে সকলে আত্মদান করে। আবার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নিমিষে প্রকাণ্ড সংসার বৃক্ষে পরিণত হয়। সুষুপ্তিতে আমরা যে সুন্দর শান্তি ভোগ করি, সাধকগণ যখন অভিমানের কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তখন জাগ্রত অবস্থায়ই সেই শান্তিটুকু ভোগ করেন। এখানে আবার বলা প্রয়োজন, আমাদের অভিমান যাহা এত শান্তির আধার (যাহার বিস্তৃতি এত প্রকাণ্ড সংসার) তাহা শিব-ঈশ্বরের বিরাট শরীরের এক একটি বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। যত প্রকারের জীব আছে, সকলের আমিত্বের সহিত এই শান্তি বোধের বিরাট আধার শিব বা ধর্ম্মভাব গ্রথিত আছে। অন্তরস্থিত শান্তিবোধের এই কেন্দ্রে সকলেই কর্ম্মান্তে প্রাকৃতিক গতিতে আসিয়া বিশ্রাম করে। এই অমৃতের আধারে নিজের কর্ম্মের করণগুলিকে ডুবাইয়া দিয়া তাহাদের কর্ম্মশ্রান্তি অমৃতের স্পর্শে ভুলাইয়া লয়। তাহারা আবার কর্ম্ম করিবার বিপুল শক্তি এই অমৃত কুণ্ড হইতে লাভ করে। তাহারা আবার নবীন হয়। ইহাই লোকের ভাষায় 'নিদ্রা' বলিয়া খ্যাত। যাহা হউক প্রত্যেক মানুষই এই ধর্ম্মকেন্দ্রকে জাগ্রত অবস্থায়ও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, যদি তিনি অন্তরস্থিত 'অভিমানের' নির্ম্মল কেন্দ্রে সাধনা সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমিত্বের এই অমৃত ভাণ্ডারে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার মলিন অভিমান (গর্ব্ব) চিরতরে বিলীন হইয়া যায়। তিনি 'জীবত্ব' হইতে 'শিবত্ব' লাভ করেন।

বিজ্ঞানময় কোষের প্রধান বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। বিজ্ঞানের প্রধান বিষয় - পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ এবং কর্ণ), পঞ্চ তন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ) এবং বিজ্ঞাতা। খুব ধীর হইয়া আমরা এই কোষটি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যিনি বোধ করেন তিনি "বিজ্ঞাতা", যাহাকে বোধ করা যায় তাহা "বুধ্যবিষয়", তাহাই বিজ্ঞানময় কোষের 'পঞ্চ তন্মাত্র' বলিয়া খ্যাত। এই 'বিজ্ঞাতা' এবং বোধিত পদার্থের মধ্যস্থানে যে 'বোধশক্তি' অবস্থান করে তাহারাই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহারা পঞ্চ মহাভূত। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ ইহারা পঞ্চ মহাভূতের গুণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় - ইহারা আমাদের বিজ্ঞানশরীরস্থিত শক্তি, যাহাদের দ্বারা যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ 'তন্মাত্র'কে অনুভব করি। ইহারাই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বিজ্ঞানের সাত্ত্বিক অংশ 'বিজ্ঞাতা', রাজস অংশ 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' এবং তামস অবস্থাই 'তন্মাত্র'। অর্থাৎ একই বিজ্ঞানশরীর তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রাণময় কোষের আলোচনায় বলা হইয়াছিল, পাণি পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি আমাদের প্রাণশরীরের বিশেষ ক্রিয়াময় চেষ্টার সমষ্টি। স্থূল শরীরে পাণি পাদাদিতে সেই প্রাণশরীরেরই চেষ্টা বিশেষ আছে বলিয়া স্থূল আকার বিশিষ্ট পাণি পাদাদিকেই আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয় মানিয়া লইয়াছি। (প্রাণময় কোষ অংশ পাঠ করিয়া লও)। বিজ্ঞানময় কোষস্থিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি বিজ্ঞানশরীরস্থিত বিজ্ঞাতার তন্মাত্রকে বোধ করিবার জন্য পাঁচ প্রকার শক্তি মাত্র। আমাদের স্থূল শরীরস্থিত নাসিকায়, রসনায়, চক্ষে, ত্বকে এবং কর্ণে সেই শক্তিগুলির

বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ আছে বলিয়া আমরা এই গুলিকেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। স্থূল চক্ষুঃকর্ণাদির বিকৃতিতে বিজ্ঞাতার ঐ শক্তিসম্পদ নষ্ট হয় না। স্থূল চক্ষুঃকর্ণাদির বিকৃতি হইলে বিজ্ঞাতা সেই শক্তিকে সংকোচ করিয়া নিজের মধ্যে টানিয়া লয় এবং অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আংশিক কাজ করাইয়া লয়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি চেষ্টা করিলে বহু জন্মান্ধ এবং জন্মবধিরগণের দর্শন এবং শ্রবণ শক্তির অদ্ভুত বিকাশ তাহাদের অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে দেখিতে পাইবেন। তাহা দেখিয়া বিজ্ঞানময় কোষস্থিত এই বিজ্ঞানশক্তির মূল কোথায় তাহা বুঝিতে পারিবেন। অন্ধকার রাত্রিতে পায়ে কাঁটা ফুটিয়া গেলে আমরাও আলোর অভাবে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা (ত্বক দ্বারা) কাঁটাটি দেখিতে চেষ্টা করি। অনেক সময় দাঁতের ফাঁকে খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া গেলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তাহার দর্শনের চেষ্টা হয়। সেই সময় চক্ষু হইতে দর্শনশক্তি উঠিয়া আসিয়া যে অঙ্গুলির এবং রসনার অগ্রভাগে চলিয়া আসে তাহা সামান্য চিন্তাতেই বুঝিতে পারিবেন। তখন যেন সেই প্রতিনিধিচক্ষে ধ্যানস্থ হইয়া আমরা তাহা দেখিতে থাকি।

বিজ্ঞানের অনুভূতিগুলি অর্থাৎ গন্ধ রসাদির বোধগুলি বিজ্ঞানময় কোষে প্রথম প্রবেশ করে। পরে সেই অনুভূতিগুলি মনোময় কোষে প্রবেশ করে। ধ্যানে শিবের পাঁচ মুখের উল্লেখ আছে। পাঁচ প্রকারের বিজ্ঞানানুভূতি পাঁচটি মুখের সহিত গ্রথিত আছে। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি এবং মনোময় কোষের অনুভূতি এক প্রকারের নহে। বিজ্ঞানের অনুভূতি বিশুদ্ধ অনুভূতি। মনোময় কোষের অনুভূতি মিশ্রিত অনুভূতি। মনোময় কোষের অনুভূতিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, আমার, তোমার, দেশ, কাল, পাত্র, জাতি ইত্যাদি বহু ব্যাপারের মিশ্রণ থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুভূতিতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ বা শব্দের মাত্র একটি থাকে। নিজের মনোময় কোষটার সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকে স্তব্ধ করিয়া দাও বা মনোময় কোষের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বিজ্ঞানময় কোষে স্থিত হও। পরে বিজ্ঞানময় কোষকে বুঝিতে চেষ্টা কর।

ভোগের ইচ্ছা (মন), বিচার (বুদ্ধি), সংস্কার (চিত্ত বা পূর্ব্বস্মৃতি এবং পরে শিক্ষা) এবং অভিমানকে বা মনোময় কোষের ক্রিয়াগুলিকে ত্যাগ কর। এইরূপে স্থিত হইলে বিজ্ঞানের কেন্দ্রে স্থিত হওয়া যায়। এইরূপে স্থিত হইয়া যাহা কিছু শ্রুত হয় সবই 'শব্দ তন্মাত্র'। দর্শনমাত্রই 'রূপ তন্মাত্র' হয়।

বিজ্ঞান-কেন্দ্র এবং বিচার-কেন্দ্র মস্তিষ্কের একস্থানেই অবস্থিত। অনেকেই বুদ্ধিকেই বিজ্ঞানময় কোষ নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি কেন্দ্র একই স্থানে অবস্থিত। বিজ্ঞানের যে অংশ মনোময় কোষের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাকে আমরা 'বুদ্ধি' নাম দিয়াছি। বুদ্ধির যে অংশ মনোময় কোষের প্রভাবমুক্ত সেই অংশই বিজ্ঞান বলিয়া জানিতে হইবে। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্র দেখিয়া বিজ্ঞানময় কোষ এবং মনোময় কোষ বুঝিতে চেষ্টা করুন।

বিজ্ঞানের কেন্দ্রে আমরা বোধ করি অতি সামান্য মাত্র। আমাদের মনোময় কোষ সেই বোধমাত্রকে একটা প্রকাণ্ড জঞ্জালে পরিণত করে। ধারণাশক্তি যাঁহাদের খুব স্থির,

যাঁহারা একটা স্পন্দনকে অবিচলিত ভাবে বা একভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের অনুভূতি বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞানক্ষেত্রে বোধ একটা স্পর্শমাত্র। মনঃক্ষেত্রে সেই স্পর্শ বহু কেন্দ্র স্পর্শ করিয়া এক লম্বা-চওড়া ঘটনার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া দেয়। বিজ্ঞানের অনুভূতি তো অনেক উন্নত স্তরের কথা। আরও নিম্নস্তরের একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই বিষয়টাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। একটা সবুজবর্ণের সমষ্টি যাহা উজ্জ্বলতা এবং ছায়া দ্বারা একটু বিচিত্র হইয়া দৃষ্টিপথে রহিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আমাদের (অভিমান, যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত একই আত্মাকে বহুভাবে ভেদ করে) মিষ্টি আমের গাছটা (স্মৃতি সংস্কার) দূরে (বিচার) দেখা যাচ্ছে।" দেখিলাম ছায়া মিলানো একটা সহজ বর্ণের সমষ্টি, কিন্তু বলিবার সময় বলিলাম 'অভিমান' 'চিত্ত' 'বুদ্ধি' ইত্যাদি। বাস্তবিক ঐ দৃশ্যটিতে সবুজ বর্ণ এবং ছায়া ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই। এইরূপেই আমাদের বিজ্ঞানের বোধকেও মনোময় শরীর বিকৃত করিয়া দেয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাহিরের জগতস্থিত পদার্থের বোধ বিজ্ঞানশরীরেই প্রথম হয়, পরে সেই বোধটি মনোময় কোষের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে চলিয়া আসে। মনোময় কোষস্থিত যে কোন কেন্দ্রশক্তি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজের কাজে লাগাইতে পারে। ইহার কারণ বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহিত (মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্র দেখো) মনোময় কোষের প্রত্যেক কেন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিজ্ঞানের যতটা অংশ মনোময় কোষের সহিত সম্বন্ধ রাখে ততটা অংশকে আমরা বুদ্ধি নাম দিয়াছি। বুদ্ধির যে অংশ মনোময় কোষের প্রভাবমুক্ত সেই অংশই বিজ্ঞান বলিয়া জানিতে হইবে। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র দেখিয়া বিজ্ঞানময় কোষ এবং মনোময় কোষ বুঝিতে চেষ্টা করুন। মনোময় কোষ নিদ্রাবস্থায় জড় অবস্থা লাভ করে; কিন্তু বিজ্ঞান অংশ জাগ্রতই থাকে। বিজ্ঞান অংশ জাগ্রত থাকে বলিয়াই আমরা গভীর নিদ্রার সময় কোন শব্দ বা আলোকাদির বিশেষ কম্পনে জাগিয়া উঠি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে মনোময় কোষের যে কোন কেন্দ্রশক্তি নিজের কাজে লাগাইতে পারিলেও বাহির হইতে কোন স্পন্দনের প্রথম সংযোগ বিজ্ঞান কেন্দ্রেই প্রথম হয়। পরে বোধটি অভিমানের কেন্দ্রে আসিয়া পর পর মন পর্য্যন্ত চলিয়া আসে। মনোময় কোষ যখন নিষ্ক্রিয় (নিদ্রাবস্থায়) হয়, বা বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত থাকে তখন বিজ্ঞান হইতে বোধধারা বিশুদ্ধ অভিমানের কেন্দ্রে বার বার আসিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। পরে যখন মনোময় কোষ অবসর পায় তখন সেই বোধধারা মনের বিভিন্ন কেন্দ্রে চলিয়া আসে। এসব রহস্যপূর্ণ এবং কৌতুহলপূর্ণ অন্তরজগতের খেলা সত্যই আনন্দপ্রদ। খুব স্থির গম্ভীর এবং শান্ত হইলে সময় সময় এসব খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বিজ্ঞান শরীর যদি সদা জাগ্রত না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের নিদ্রা এবং জাগরণ একটা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া যাইত। সময় না হইলে কেহই কাহাকে জাগাইতে পারিত না। কারণ বোধকর্ত্তা যদি নিদ্রিতই থাকেন তবে জাগরণের সাড়া গ্রহণ করিবে কে? (গুরু পাদুকা স্তোত্রের ভাব লইয়া কিছুদিন লয় যোগের অনুশীলন করিলে মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্য্যাবলীর অনেক আভাস পাওয়া যাইতে পারে।)

মন হইতে অভিমান পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের সবটা অংশই আমাদের অজ্ঞান অবস্থা। ইহা বিজ্ঞানকে ঢাকা দিয়া আমাদিগকে ভ্রান্ত অবস্থায় ভ্রমণ করায়। বিজ্ঞানই জীবের এবং পঞ্চভূতের খাঁটী স্বরূপ। তাই যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা জ্ঞানের পথে খুব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নহেন। যে কোন মুহূর্ত্তে ভোগে, মোহে বা অজ্ঞানে আকৃষ্ট হইতে পারেন। বিজ্ঞানময় কোষে 'বিজ্ঞাতা', 'বোধ শক্তি' (জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলির বিশুদ্ধ স্বরূপই বোধ শক্তি), এবং 'বুধ্যবস্তু' (পঞ্চতন্মাত্রই বিজ্ঞানের বুধ্যবস্তু) একরূপতা প্রাপ্ত হয়। মনোময় কোষে যিনি বিশুদ্ধ অভিমান বিজ্ঞানময় কোষে তিনিই 'বিজ্ঞাতা'। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, এবং শব্দ, ইহারাই বিজ্ঞাতাকে পাঁচ প্রকার বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত করে। ''ইহারাই শিবের পাঁচমুখ''।

একটি পাকা আম লও। ইহার গন্ধ, ইহার রস (স্বাদ), ইহার রূপ (রং), ইহার স্পর্শ (ঠাণ্ডা কি গরম) এবং ইহার নাম তুমি অনুভব করিলে। এই অনুভূতিগুলি বিজ্ঞানময় কোষে প্রথম প্রবেশ করিবে। যত শীঘ্রই ইহারা প্রবেশ করুক না কেন একটি একটি করিয়াই যাইবে। বিজ্ঞাতা ঐ পাঁচটি বোধে পাঁচ প্রকার রূপ ধারণ করিবে। ইঁহারাই শিবের পাঁচ মুখ। শিবের ষষ্ঠ মুখ হইতে সমস্ত জীবের অভিমান আসিয়াছে। শিবের পাঁচ মুখ হইতে পঞ্চতন্মাত্র (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের সূক্ষ্মতম অবস্থার নাম তন্মাত্র) এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা যদি অজ্ঞানতা বা মনোময় কোষকে ছাড়িয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমরা বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। এই বিজ্ঞানই সমস্ত জীবের বীজাবস্থার স্বরূপ এবং পঞ্চভূতেরও সূক্ষ্মতম স্বরূপ। বিজ্ঞানে আসিলে আমরা আমাদের স্বরূপের বীজাবস্থা এবং পঞ্চভূতের বীজাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

বিজ্ঞাতা যখন গন্ধ তন্মাত্রা বোধ করেন, তখন বিজ্ঞাতা পীত বর্ণ বোধের মূর্ত্তি হইয়া যান। এই পীত বর্ণ বোধই শিবের প্রথম মুখ। শিবের এই মুখের নাম 'তৎপুরুষ'। বিজ্ঞাতার সহিত রসের মাত্রার স্পর্শে বিজ্ঞাতা শুভ্র বর্ণ বোধস্বরূপ হন। শিবের এই মুখের নাম 'সদ্যোজাত'। বিজ্ঞাতার সহিত রূপ তন্মাত্রের সংযোগ হইলে বিজ্ঞাতা লোহিত বর্ণ বোধের রূপ ধারণ করেন। বিজ্ঞাতার এই মুখের নাম 'বামদেব'। স্পর্শ তন্মাত্রা সহযোগে শিবের চতুর্থ মুখ। এই মুখের নাম 'অঘোর'। ইনি ধূম্র বর্ণ বোধের মূর্ত্তি। শব্দ তন্মাত্রা সহযোগে পঞ্চম মুখ। ইহা স্ফটিক বর্ণ, সর্ব্ব বর্ণ বা বর্ণহীন। ইনি বোধের বিশুদ্ধ অবস্থা। ইঁহাকে বোধের স্বরূপ না বলিয়া বোদ্ধার স্বরূপ বলাই ঠিক হইবে। ইনি শিবের শ্রেষ্ঠ মুখ 'ঈশান'।

শাস্ত্রে শিবের এই সব মুখের বর্ণ সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, তাহাতে আমাদের দেওয়া বর্ণের সহিত স্থানে স্থানে অমিল হইবে। নিজের অনুভূতি এবং গুরু পরম্পরা লব্ধ সাধনার কঙ্কালকে অবলম্বন করিয়া এই বইয়ের অনেক কথা লিখিতে হইয়াছে। শাস্ত্রে এই সব মুখে যে কয়টি রং-এর উল্লেখ আছে, আমার দেওয়া রং-এ প্রায় সেই কয়টি রংই আসিয়া যাইবে, তবে নামের ভেদ হইতেছে মাত্র। এখানে বেশী কিছুই বলিতে পারি না। কারণ সাধনার কঙ্কালের সহিত তাল রাখিয়াই আমাকে পা ফেলিতে হইবে।

মনোময় কোষের মনের অংশে অবস্থানকালে আমাদের দর্শনে স্থূল ভাব প্রত্যক্ষ করায়। ইহাকে ‘জাগ্রত’ অবস্থা বলিয়া দার্শনিকগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। মনোময় কোষের প্রেমবিকাশের অংশে অবস্থান কালে (অর্থাৎ সূর্য্যকেন্দ্রে অবস্থান কালে) আমাদের দর্শনের মধ্যে আর স্থূল ভাব ফোটে না। এখানে স্থূল জগতের মূর্ত্তিগুলি ছায়া আলোর মিশ্রিত মূর্ত্তি হইয়া দৃষ্ট হয়। ইহা দার্শনিকের ভাষায় ‘স্বপ্নাবস্থার’ অনুভূতি। চিত্তের কেন্দ্রে যখন আমরা স্থিত হই তখন আমাদের দর্শনের মধ্যে স্থূলভাব অর্থাৎ রক্ত, মাংস, অস্থ্যাদির ভাব বা মাটি জলাদির ওজনের ভাব তো ফোটেই না, অধিকন্তু মূর্ত্তিও ফোটে না। তখন দর্শনে আঁকা বাঁকা ক্রিয়াময় রেখা সমষ্টির বিরাট মূর্ত্তি আদি-অন্তহীন হইয়া দর্শন দেয়। ইহাই হিরণ্ময় অনুভূতি। ইহাও স্বপ্নাবস্থার অন্তর্গত। মনোময় কেন্দ্রের বিশুদ্ধ অভিমানের কেন্দ্রে স্থিত হইলে বরফের মত জমাট শীতল অনুভূতি ফুটিয়া উঠে। ইহাই সুষুপ্তির অনুভূতি। এই শান্ত স্নিগ্ধ অনুভূতির উপরই বিজ্ঞানের বোধ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক বিষয়ের সংযোগ বিজ্ঞানময় কোষে প্রথম হয়। তাই এখন বিজ্ঞানের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এই মাত্র ইঙ্গিত দিতে পারি যে মনোময় কোষে বোধের ধারা আসিবার পূর্ব্বেই বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাহা ধরিয়া ফেলিতে হয়। জীবের আত্মবোধকেন্দ্র পশু পর্য্যন্ত প্রাণময় কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। মানুষের সেই আত্মবোধ সহজ অবস্থায় মনোময় কোষে অবস্থান করে। মানুষের আত্মবোধ বিজ্ঞানময় কোষে যখন অবস্থান করে তখন মানুষ বিজ্ঞানের বোধ সহজেই ধরিতে পারেন। বিজ্ঞানের অনুভূতিতে স্পন্দন তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে স্পন্দন কোন রেখা গতিতে গমন করে না। ইহার স্পন্দনের একটা ঠিক ভাষা দিতে পারিতেছি না। সীমেন্টের বস্তা ঢালিয়া দিলে যেমন অসংখ্য সীমেন্ট পরমাণু ধুঁয়ার আকারে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে চারি দিকের আকাশে স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, বিজ্ঞানের বোধের স্বভাবটাও যেন সেইরূপ। মাত্রার স্পর্শটি বিজ্ঞানে আসিয়া পড়িতেই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রং-এর একটা ব্যাপ্তি বোধে বিজ্ঞাতা রঞ্জিত হইয়া যান। এখানের বোধের পরমাণুগুলি যেন স্বাধীন। ঐ সীমেন্টের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। বিজ্ঞানময় কোষের পরিচয় এতক্ষণ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আনন্দময় কোষের পরিচয় শক্তি অধ্যায়ে লইব। এবার আমরা শিবের ধ্যান অবলম্বন করিয়া এ স্তরের অন্যান্য কথা বলিব।

শিবের ধ্যান

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতি-হস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরাগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিংবসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।

ধ্যায়েৎ = ধ্যান করিবে।

ধ্যানের কথা বিষ্ণুর ধ্যানে আলোচনা করা হইয়াছে। শিবের ধ্যানে ধ্যানাবস্থা না বলিয়া যোগাবস্থা বলা ভাল। উপাসনাকাণ্ড সাধককে ধ্যানাবস্থা হইতে উন্নত স্তরে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না বলিয়া খুব উন্নত স্তরের কথাও ‘ধ্যানের’ সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধনা এবং যোগের পথকে ত্যাগ করিয়া শিক্ষার পথে বেদান্ত এবং সাংখ্যাদি দর্শনের জ্ঞান যেমন সূর্য্য স্তরের অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানের সীমার মধ্যে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ উপাসনা কাণ্ডের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানও ধ্যানাবস্থারই একটা অংশ বলিয়া মানিয়া হওয়া হয় মাত্র। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই বুঝা যায়। ধ্যানগুলি উপাসনা কাণ্ডেরই অঙ্গমাত্র। উপাসনার স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ‘ধ্যান’ হইতে উচ্চস্তরের শব্দ প্রয়োগই চলে না। এখানে এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না।

নিত্যং = যাহা সকল সময় একরূপ। নির্ব্বিকার।

মনোময় কোষের অনুভূতির সহিত বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতির ভেদটুকু এখানে স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান কেন্দ্রের অনুভূতিগুলি সব সময়ই একরূপ। মনোময় কোষের অনুভূতি নিত্যই বদলাইয়া যায়। মনোময় কোষে একটি বস্তুই বার বার পর্য্যালোচনা করিলে তাহার রূপ বদলাইয়া যাইবে। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি সব সময়ই একই রূপ হইয়া ধরা দিবে। মনোময় কোষের যত অনুভূতি আছে সবকেই স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতিগুলি স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারে না। স্মৃতিতে এই স্তরের অনুভূতিটির দাগ থাকে না। এ স্তরের অনুভূতি এ স্তরে আসিলেই অনুভূত হয়। এই জন্যই এ স্তরের সমস্ত তত্ত্ব নির্ব্বিকার বা নিত্য।

মহেশং = পরমেশ্বরকে

ইনি মহেশ্বর বা জ্ঞানেশ্বর। স্থূল এবং দৈব জগতের ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। ইনি জ্ঞান এবং বিজ্ঞান জগতের ঈশ্বর, তাই মহেশ্বর। জ্ঞানে এবং বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষকে সব যুগেই মহেশ্বর বলিয়া মানা হইয়া থাকে।

রজতগিরিনিভং = রজত পাহাড় সদৃশ।

ইহা বোধের জমাট অবস্থা। শান্তির বোধটা জমাট বাঁধিয়া এইরূপ অবস্থা হয়। সন্ধ্যা, পূজা আদিতে অন্তঃকরণে শান্তির ভাব আসিয়া থাকে। সেই শান্তির বোধটার একটা রং আছে। তাহা শুভ্রবর্ণ। সেই শান্তির ভাবটাকে খুব স্থির হইয়া অবলম্বন করিতে হয়। যখন শান্তির সেই বোধটাতে সাধক একেবারে আত্মসমর্পণ (Surrender) করিতে পারেন তখন ঐ বোধটাই রজত-পাহাড় সদৃশ হইয়া বোধে ফুটিয়া উঠে।

চারুচন্দ্রাবতংসং = কপালটি সুন্দর চন্দ্রসমন্বিত।

কপাল অর্থে জ্ঞানাধার। বুদ্ধির স্থানকে কপাল বলে। বুদ্ধির স্থান, কপাল স্থান, বিবেক স্থান এবং গণেশ স্থান একই স্থানকে নির্দ্দেশ করে। বুদ্ধিই মনোময় কোষকে পূর্ণভাবে বিকাশ করে। সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধিরই ক্রমবিকাশ জানিতে হইবে। বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ মহত্তত্ত্বে। অর্দ্ধ বিকাশ বিশুদ্ধ অভিমানে, এখানেই শিবত্বের আরম্ভ। শিবের কেন্দ্রে বুদ্ধি সুন্দর চন্দ্রের প্রভা ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধি যেন এখানে কতই আনন্দিত হইয়াছে। শিবের কপালের চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র।

বুদ্ধিই অন্তর্জ্যোতি - বিবেক। যেখানে তমঃকে ধ্বংস করিবার প্রয়োজন সেস্থানে তিনি রজোগুণের মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই জন্যই ভোগের বিরুদ্ধে এবং ভোগীর বিরুদ্ধে ‘গণেশ’ অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রাণ হইয়া অগ্রসর হন। যেখানে ভোগের রজোগুণকে ধ্বংস

করিবার প্রয়োজন হয় (বা বহু ভোগকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয়) সেখানে সত্ত্ব + রজঃ গুণের মূর্ত্তি বা নারায়ণ মূর্ত্তি হইয়া দেখা দেন। বিষ্ণু বাস্তবিক সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি। কিন্তু পঞ্চ দেবতার ধ্যানে বিষ্ণুকে সত্ত্ব + রজঃ গুণের মূর্ত্তি করা হইয়াছে। ইহার কারণ আমরা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। প্রাণময় কোষের তৃপ্তি বা পাশবতৃপ্তি মানবশরীরে বা মনোময় কোষের বিকাশে সত্যই অশোভন। মানুষ যখন অল্পভোগে আকৃষ্ট হয় তখন গণেশ শক্তিই যথেষ্ট, কিন্তু মানুষ যদি বহু ভোগী এবং সংগঠিত ভোগী হয় তখন গণেশ শক্তি অতি সামান্য। তখন গণেশ + বিষ্ণু মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিষ্ণুকেন্দ্র আর হিরণ্ময় থাকে না। নীলবর্ণ ধারণ করে। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপের তেজোময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করাইয়া নীলবর্ণ চতুর্ভুজ হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। আসুরিক উৎপাত প্রশমনের জন্য বিষ্ণুমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত হন। আবার আসুরিক উৎপাত প্রশমিত হইলেই বিষ্ণু শান্ত নীল-বর্ণ হইয়া যান। দেশে আসুরিক উৎপাত যদি থাকে তবে সমাজকর্ত্তার শান্তি কোথায়? তিনি তখন সর্ব্ববিধ দৈবীসম্পদ, দেবতাশক্তি, বা যুদ্ধ শক্তি অবলম্বন করেন। আসুরিকতার বিরুদ্ধে এইরূপ তেজঃসমন্বিত যুদ্ধভাব বা রজোভাবের যখন প্রয়োজন শেষ হয় তখনই আমরা শিবের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হই। তাহার পর বিজ্ঞানময় কোষের সহিত সংযোগ হয়। এখানে বুদ্ধি চারু চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহা অমৃতের জ্যোতি, শান্তির জ্যোতি। এখানে অবস্থিত হইবার পর সাধকের বা যোগীর বিচার শক্তি খুব শান্তিমাখা হইয়া থাকে। খুব শান্তিমাখা বিচারের অবলম্বন না থাকিতে বিজ্ঞানস্তরে অবস্থানই চলে না।

বুদ্ধিশক্তি আমাদিগকে উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার সহজ অবস্থায় আমাদিগকে এমন অবস্থায় রক্ষা করেন যাহাতে আমরা নিম্নস্তরের ভাবধারায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বিজ্ঞানময় কোষের কথা বলিয়া শক্তিস্তরের কথা বলা হইবে। সেই স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধকের শান্তির ভাব আর জোর করিয়া অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না। সেই উপলব্ধির পর (গীতা নির্দ্দিষ্ট) তিনগুণের অতীত অবস্থা লাভ হয়। শিবের কপালের চন্দ্রটি অষ্টকলা সংযুক্ত চন্দ্র।

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং = শরীরটি রত্নের মত উজ্জ্বল।

অনুভূতিতে ইহাও স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই উজ্জ্বলতা স্ফটিকের উজ্জ্বলতার মত নির্ম্মল, স্নিগ্ধ এবং জমাট। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি আসিলে সাধকগণ বিষয়ের সঙ্গপ্রভাবে মলিন হন না। ইন্দ্রিয়সঙ্গ জনিত সুখ-আকর্ষণ মনোময় এবং প্রাণময় কোষে আত্মবুদ্ধি স্থাপনের ফল। বিজ্ঞানের অনুভূতি আসিলে সাধকের বিষয়-সঙ্গে বিকার বা আকর্ষণ আসে না। কারণ বিজ্ঞানের কেন্দ্রে কোন বোধই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয় না। এখানে বোধ 'বিশুদ্ধবোধ'। মনোময় কোষেই তাহা বিষয়ের রূপ লাভ করে। বিজ্ঞানের কেন্দ্রে বোধটি বিজ্ঞাতার সহিত একরূপতা লাভ করে। সেই বোধই অভিমানের কেন্দ্রে আসিলে বোদ্ধার সহিত দ্বৈতবোধ উৎপন্ন করে, চিত্তের কেন্দ্রে প্রিয় অপ্রিয় ভাব জাগায়, সূর্য্যের কেন্দ্রে লীলার স্মৃতি উৎপন্ন করে, মনের কেন্দ্রে এই সব নজীরের বলে ভোগের ইচ্ছা উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানের কেন্দ্রে ভোগ্য বস্তুর 'তন্মাত্র' অনুভূত হয়। বিজ্ঞাতার

সহিত সেই মাত্রার ভেদই থাকে না। তাই এত নিকটে বা স্বরূপে যাহাকে পাওয়া যায় তাহাকে স্থূলে ভোগ করিবার আর অস্বাভাবিক চেষ্টা হয় না। সেই কারণে সাধক এই স্তরে রত্নের মত উজ্জ্বল। রত্নের মত উজ্জ্বল বলিবার আরও কারণ এই যে - বিজ্ঞানের অনুভূতির পর সাধকগণ স্বর্ণ এবং রৌপ্যাদির মত বাহিরের সঙ্গ প্রভাবে মলিন হন না। অর্থাৎ কাম, ভোগ, এবং মোহের সম্বন্ধযুক্ত পার্থিব বস্তুকে ত্যাগ করিবার পূর্ণ শক্তি অর্জ্জন করেন। (সাধক শক্তি-স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিষয়ের সঙ্গ করিয়া স্বরূপের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিতগণের কর্ম্মশক্তির লক্ষ্য আস্তরিকতার বিরুদ্ধে থাকিবেই। ইহা ভিন্ন যাঁহারা কামিনীকাঞ্চন সঙ্গ করেন তাঁহারা মনোময় কোষের ‘চিত্তের’ অংশের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহেন জানিতে হইবে।) পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল জল, অগ্নি এবং ধূলিকণা দ্বারা ব্যাপ্ত। প্রত্যেক বস্তুর উপর অগ্নি এবং জলসংযোগ হেতু এক প্রকার ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়া নিত্যই প্রত্যেক বস্তুকে একটু একটু করে পোড়াইয়া, পচাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া রূপান্তর করে। ধূলিকণার সংযোগ তাহাদিগকে মলিন করে। অগ্নি এবং জলকণা সংযোগের ক্রিয়া রত্নাদিকে রূপান্তরিত করিতে পারে না। আর ধূলিকণা হইতে স্বর্ণাদির কণা সূক্ষ্ম এবং জমাট হইবার দরুণ ধূলিকণা তাহাদের গায়ে আশ্রয় লইতে স্থান পায় না। বিজ্ঞানময় কোষে সাধক আসিলে তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ হয়। তাঁহারা সদাই নির্ম্মল থাকেন। ভোগেচ্ছা, মোহ এবং অভিমান তাঁহাদের উজ্জ্বল শরীরে স্থান পায় না।

পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং = শিবের হাতে কুঠার, মৃগমুদ্রা, বরমুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা রহিয়াছে।

বর এবং অভয় মুদ্রা সম্বন্ধে সূর্য্যধ্যানে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্তরে আবার সেই কথা আসিয়াছে। বর এবং অভয় গুরু-চরিত্রের ভূষণ। এই আশীর্ব্বাদ এবং স্নেহটুকু না থাকিলে শিষ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাই যায় না। কেবল শিষ্যই যে ভক্তি করিবে তাহা নহে, গুরু বর এবং অভয় দান করিয়া তাহা আকর্ষণ করিয়া লইবেন। শিবস্তরের গুরুতে এবং সূর্য্যস্তরপুষ্ট গুরুগণে এই শক্তি স্বভাবতঃই থাকে। একজনকে গুরু হইতে হইলে, তাঁহাকে প্রথম এই শিব স্তরে আসিতে হয়। ইহার পর তিনি গুরু হইতে পারেন। যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষে আসিতে পারেন, তাঁহাদের জীবত্বের অভিমান থাকে না। অষ্টপাশকে অবলম্বন করিয়া অভিমান জীবিত থাকে। এই অষ্টপাশের বন্ধন যাহারা কাটাইতে পারে নাই তাহাদের গুরু হইবার অধিকার নাই। যাহারা নিজেরা (অষ্টপাশ) বদ্ধ তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া অনেক মুক্তিকামী সাধককে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়। মনোময় কোষের আবরণকে ভাঙ্গিবার জন্য একমাত্র অবলম্বন গণেশশক্তি। সেই শক্তি যাহারা সাধনায় প্রবেশের সময়ই দৃঢ় হইয়া অবলম্বন করে না তাহারা কিছুতেই বিজ্ঞানময় কোষে আসিতে পারে না। যাহারা আদর্শের বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার মিষ্টি কথা শুনাইয়া নিজেদের দুর্ব্বলতা ঢাকিতে চেষ্টা করে, এমন সঙ্গ হইতে খুব দূরে অবস্থানই শ্রেয়ঃ। ভোগের ইচ্ছা, মোহ (পুত্র পরিবারে আকর্ষণ) এবং অহঙ্কার এই তিনটি বৃত্তি যাহাদের কার্য্য কলাপে ধরা পড়ে তাহাদের বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে প্রবেশ কোন যুগেই হয় নাই জানিতে হইবে। যাহাদের স্বভাবে ক্রোধের উদ্দীপন আছে তাহাদের অন্তরে কাম, মোহ এবং অভিমানের বেগ নিশ্চয়ই আছে। তবে ক্রোধে এবং তেজে যে ভেদটুকু আছে তাহা

জানিতে না পারিলে বিচার ভুল হইবে। এখানে মুক্তি ইচ্ছুক সাধকগণকে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে শক্তিশালী গুরুর কৃপা সাধনার পথে বিশেষ সহায়ক হইলেও নিজেকে দৈবীসম্পদের আশ্রয়ে কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মোন্নতির পথ খুলিয়া লইতে হয়। দীক্ষা গ্রহণের পর অবধি নিত্য নিয়মিত সাধনা যথা নিয়মে সম্পন্ন করিবেন। অন্তরের অনুভূতির পরিচয় পাইলে সাধনার পথে বিশেষ বুদ্ধিমান শিষ্যের আর বাহিরের গুরুর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তখন ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অনুভূতির দিগ্‌যন্ত্র (শান্তিই) পথ দেখাইয়া দিবে। তবুও নিত্য সাধনার অবলম্বন এবং গুরুর সংযোগ সহজে ত্যাগ করিতে নাই।

যাঁহার নিকট আমরা লেখাপড়া শিক্ষা করি তিনিও আমাদের গুরু। তিনিই সূর্য্যস্তরের গুরু। সূর্য্যস্তরের গুরুগণের চরিত্রে সূর্য্যস্তরের কর্ম্মলক্ষণ এবং জ্ঞানলক্ষণ থাকিলে ভাল হয় এবং থাকাও প্রয়োজন। এই শিক্ষা গুরুকেই প্রাচীনকালে আচার্য্য বলা হইত। তিনিই ছাত্রের উপনয়নদীক্ষা প্রদান করিতেন। তাহার পর নিজের আশ্রমে লইয়া যাইয়া বেদ এবং বেদাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান সময় আর্য্যের সেই সুন্দর শিক্ষাপ্রথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময় শিক্ষার সেই ভিত্তি পুনরায় স্থাপন হইবার সুবিধা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বর্ত্তমান সময় মানুষের মনোজগৎ বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে অন্যরূপে গঠিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান রাজনীতি এবং অর্থনীতি মানুষের চিন্তাধারাকে এমনভাবে বদলাইয়া দিয়াছে যে মানুষ বর্ত্তমান সময় এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত হইয়া ভাবিতে পারিতেছে না, পথ কি? মানুষের জীবনে এমন বিপদ বোধহয় পৃথিবীতে কোনো যুগেই আসে নাই। সূর্য্যগুরুর হস্তে 'কমল' আছে। তাহা শিষ্যকে কিভাবে আকর্ষণ করিতে হয় তাহারই ইঙ্গিত। বিদ্যার্থী শিষ্যকে গুরু সর্ব্বদা স্নেহের এবং শান্তির ভাব দেখাইয়া মনটি আয়ত্ত করিবেন। ভাল মন্দ বিচার শক্তির উন্মেষের জন্য খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন। কখনও কঠোর শাসন অবলম্বন করিবেন না। মানুষ চিরদিন (?) বিচার শক্তির অধীন। বালকেরও সরলভাবে বিচার করিবার শক্তি আছে। তাহা জাগ্রত করিবার জন্য অন্তরের সহিত চেষ্টা করিবেন। বিদ্যার্থীকে বেতমারা, রোদে রাখা প্রভৃতি যাবনিক শাসন বহুদিন পূর্ব্বে আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। জানিয়া রাখিবেন, ইহাতে শিষ্যের মধ্যে উচ্চজ্ঞান বিকাশে বাধা প্রাপ্তি ঘটায়। ছাত্রের অন্তরে দৈবীসম্পদের বিকাশের জন্য শিক্ষক সর্ব্বদা নজর রাখিবেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করা এবং নিত্য যথা নিয়মে নিত্য-কার্য্য (শয়ন, জাগরণ, শৌচ, উপাসনা, স্নান, আহার, পাঠ, ব্যায়ামাদি) সম্পন্ন করিবার জন্য যাহাতে নিজেই উৎসাহিত হয় সেই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিবেন। যাহাদের মধ্যে নিত্যকার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন করিবার উৎসাহ জাগ্রত হয় নাই তাহাদের দ্বারা বিশেষ উন্নতির আশা করা যায় না। যাহা হউক শিক্ষক বিশেষ স্নেহ দ্বারা ছাত্রের সমস্ত চিন্তাশক্তি আয়ত্ত করিয়া লইবেন। মনোজগতের মধ্য দিয়াই শিষ্যকে ঈপ্সিত পথে পরিচালনা করিতে হয়। ইহা শিক্ষকগণের জানা প্রয়োজন। একটু সাধনশক্তি না থাকিলে শিক্ষকগণের মধ্যে সেই শক্তি আসা সহজ নহে। ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট কৌমার্য্যব্রত, নিষ্ঠা বা সংযম ও নিয়ম-নিষ্ঠ গার্হস্থ্য জীবনের অবলম্বন না থাকিবার দরুণ অনেক স্থানেই শিক্ষকগণ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয় চরিত্রবল আয়ত্ত করিতে পারেন না। ইহাতে শিক্ষক এবং ছাত্রগণের মধ্যে অনেক স্থলেই বিশেষ অশান্তির কারণ সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে।

ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ - প্রত্যেক বুদ্ধিমান ছাত্রই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবেন। ইহাতে প্রত্যেক ছাত্রই লাভবান হইবেন। গুরুর স্নেহ কত নির্ম্মল, কত গভীর, তাহা জ্ঞানাধারকে জ্ঞান গ্রহণে কত সাহায্য করে তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে স্নেহ এবং শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া জ্ঞান বিনিময়ের এই সৌন্দর্য্য যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে সত্যই ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। গুরুর স্নেহের যে কত গভীরস্পর্শ তাহা কেবল শ্রদ্ধা রাখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সত্যই শিক্ষকের স্নেহস্মৃতি প্রাণে জাগিলে প্রাণ বিনয়রসে পূর্ণ হইয়া উঠে। যাঁহারা জীবনে উন্নতির আশা রাখেন, তাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিচারশক্তি নিয়োজিত করিতে অনুরোধ করিতেছি। গুরুজনের স্নেহ যে একটা অলৌকিক ভোগ্য বস্তু, তাহা দ্বারা যে মানুষ শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে বিশেষ সহায়তা লাভ করে, ইহা যে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। শিক্ষাগুরু নীতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে বুদ্ধিমান ছাত্র বিশেষ বিনয় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাগুরুর দোষ সংশোধন করিলে মধুময় হইবে। যাহাদের গুরু সূর্য্য কেন্দ্রপুষ্ট পুরুষ নহেন তাহাদের অবশ্যই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যাহা হউক গুরুমাত্রই যেন সূর্য্যস্তরটী বুঝিতে চেষ্টা করেন।

বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশের পর সাধক জ্ঞানেচ্ছু সাধারণ মানুষের জ্ঞান উন্মেষের সহায়ক হন। ইনিই আমাদের দীক্ষাগুরু। চলিত কথায় ইঁহাকেই কৌল-গুরু বলে। কৌল-গুরু মানে সাধনা সাহায্যে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন এমন গুরু। বিজ্ঞানের অনুভূতি না থাকিবার দরুণ গুরুগণ এমনভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চলিয়াছেন যাহাতে আর্য্য-ধর্ম্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে প্রবেশের ইচ্ছা নাই বা জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি ইচ্ছা নাই তাহাদের দীক্ষারও প্রয়োজন নাই। গায়ত্রী-দীক্ষা বা উপনয়ন-দীক্ষা সাধারণের জন্য যথেষ্ট। গায়ত্রীকে বুঝিবার জন্যই কৌল-দীক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। উপাসনা কাণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ভারতেই গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ দেখা দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য নিত্য যথা নিয়মে সন্ধ্যোপাসনাতে নিষ্ঠা খুব কম লোকের দেখা যায়। বহু অর্থব্যয় করিয়া পিতামাতা বালকের উপনয়নদীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু তাহার শতকরা বোধ হয় দশটি বালকও সন্ধ্যা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে না, ইহা কি! সন্ধ্যা পূজাদিতে আমাদের অন্তরস্থিত শান্তির কেন্দ্রটি পুষ্টি লাভ করে। ইহাতে আমাদের বিচারশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মেধাশক্তি এবং ধৈর্য্যশক্তি বৃদ্ধি হয়, স্বভাব নির্ম্মল হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিদ্রায় আমরা সকলেই ধর্ম্মকেন্দ্রে আসিয়া থাকি। জাগ্রত অবস্থায় এই কেন্দ্রে আসিবার বৈজ্ঞানিক উপায় সন্ধ্যা পূজা। জলসহ সন্ধ্যা করিয়া দেখিবেন, আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। সন্ধ্যাটি এমন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সমষ্টিতে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে যে আপনাকে অজ্ঞাতসারে শান্তির কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিবে। সন্ধ্যোপাসনায় মনোময় কোষের সবগুলি কেন্দ্রপুষ্টি লাভ করে। নিদ্রায় মনোময় (এবং প্রাণময়) কোষের কেবলই শ্রান্তিই দূর করে।

গুরুগিরির ব্যাপার লইয়া সমস্ত ভারতে যেরূপ ব্যাপার চলিয়াছে, তাহা ভাবিতে ভয় হয়। বড় বড় দল গজাইতেছে এবং সন্ধ্যোপাসনা ত্যাগ করিয়া নিত্য নতুন ভজনবিধি সর্বত্র উৎপন্ন হইতেছে। সকলকে সেই সব ভজন কিছুদিন করিয়া দেখিয়া তাহার ফলাফল সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

দীক্ষাগুরুর হস্তে ‘কুঠার’ এবং ‘মৃগ’ রহিয়াছে। কুঠার বৃক্ষচ্ছেদক অস্ত্র। ‘বৃক্ষ’ স্থূল দেহাভিমানী জীব - অত্যন্ত জড়ত্ব প্রাপ্ত জীব। ধর্ম্ম জীবের জড়ত্ব নষ্ট করে। ধর্ম্মগুরুর ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য যে অজ্ঞানতা বা জড়ত্ব নষ্ট করিতে যত্নশীল হইবেন। নিজের জড়ত্ব নষ্ট না করিয়া যদি অন্যের জড়ত্ব নষ্ট করিতে হয় তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। শিবের অন্য হস্তে মৃগ রহিয়াছে। ‘মৃগ’ ভোগমুখী মনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করিলে সাধকের বিষয় ভোগের ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা প্রকৃতই সিদ্ধগুরু তাঁহারা খুব সহজে এবং শীঘ্র শিষ্যের ভোগমুখী মনের গতিকে সংযত করিয়া দিতে পারেন।

শিবের হস্তে মৃগ থাকার কারণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর পৌরাণিক গল্প আছে। এক সময় ব্রহ্মা (মনই ব্রহ্মা) সুরা পান করিবার দরুণ কামভাবে মত্ত হইয়া নিজের কন্যাকে ধরিতে চেষ্টা করেন। পিতার অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখিয়া কন্যা হরিণীর রূপ ধারণ করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মাও হরিণের রূপ ধরিলেন। তখন কন্যা ভয়ে শিবের নিকট গমন করিলেন। শিব বুঝিতে পারিয়া হরিণরূপধারী ব্রহ্মাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ইহাই শিবহস্তে মৃগের পৌরাণিক কারণ। যাহা হউক বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ হইলে মনের ভোগমুখী গতি রুদ্ধ হয়।

প্রসন্ন = প্রফুল্ল।

বিজ্ঞানময় কোষে আসিলে সাধক উদ্বেগশূন্য, নিশ্চিন্ত এবং পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত হন। সেইভাবই সাধকের মুখে ফুটিয়া উঠে। তাই প্রফুল্ল।

পদ্মাসীনং - পদ্মের উপরিস্থিত।

যোগারূঢ়। সূর্য্য এবং বিষ্ণু স্তরেও পদ্মের কথা ছিল। সূর্য্যস্তরে পদ্মটি সাধকের ভাবাবেশের অবস্থা, বিষ্ণুস্তরে পদ্মাসন - ধ্যানের জমাট ভাব। শিবস্তরে পদ্মাসন - প্রজ্ঞার জমাটভাবে যোগারূঢ়ভাব। সূর্য্যের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সাধক ভাবাবিষ্ট থাকেন। বিষ্ণুর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সাধক ধ্যানাবস্থিত হন। শিবের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সাধক যোগারূঢ়।

সাধক দেখিলেই বুঝা যায়, কাহার মধ্যে কোন স্তরের অনুভূতি ফুটিয়াছে। সে সময় সাধকের একটা বিশেষ আকর্ষণশক্তি জন্মে। সাধকগণের উচ্চ অবস্থার লক্ষণ যখন বাহিরে ফুটিয়া উঠে, তখন বহুলোক তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সেই সময় তাঁহারা যদি লোকের আকর্ষণে নজর দেন, তবে উন্নত বোধের ক্ষেত্র হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। শিষ্যগণও আসল কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানের অনুষ্ঠানময় জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া একদেশী আচার অবলম্বন করিয়া নাচানাচি, কাঁদাকাঁদি, আহা-উহু করিয়া জগৎকে এবং নিজেকে ফাঁকি দিবে। তাই উন্নত সাধকগণ খুব সাবধানে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিবেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে, সাধারণ ভাব অবলম্বন করিয়া মিলিয়া মিশিয়া জগদ্ধিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন। জগতের সহিত কর্ম্মাবলম্বন করিয়া মিশিতে হয়। অনুভূতির ঢং ঢাং বা স্বকৃত গ্রন্থের মধ্য দিয়া কাহারও সহিত পরিচয়ের চেষ্টা করিবেন না। ইহাতে নিজের বিকাশপথ মিথ্যা যাদুগিরির মধ্যে রুদ্ধ হইবে। নিজের অভিমানকে আত্মার নির্ম্মল, উদার এবং মহান কোলে ছাড়িয়া দিবেন। নিজের

অনুভূতির কেন্দ্রটি এমন সহজ করিয়া লইবেন, যাহাতে মিথ্যার একবিন্দুও অন্তঃকরণে না আসিতে পারে। জানিয়া রাখিবেন মনোময় কোষকে ত্যাগ করিলে ঢং ঢাং আর আপনার নিকট আসিবে না। মনোময় কোষই (বা অজ্ঞানই) সমস্ত ঢং এর জন্মদাতা। তাহার পর আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে একদেশী জীবনধারা জগৎ এবং নিজের ক্ষতির কারণ হয়। যাহারা এমন জীবন অবলম্বন করে তাহারা নিজেদের শত্রু, যাহারা মানুষকে এমন কর্ম্মে আকর্ষণ করে তাহারা মানুষেরও শত্রু। কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানের অনুষ্ঠানময় (বাক্যময় নহে) জীবন হওয়া চাই। সকলেই কর্ম্মের দিকে অধিক নজর দিবেন। উপাসনার জন্য ঋষিগণ প্রতি সন্ধ্যায় মাত্র দুইদণ্ড সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন। যাঁহারা উপাসনা করিবার জন্য অধিক সময় লাগাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মধ্যরাত্রি বা শেষরাত্রি হইতে সেই সময়টা লইতে চেষ্টা করিবেন। জাগ্রত অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে হইবে, এই জন্যই উপাসনার প্রয়োজন। খুব শান্ত হইয়া নির্জ্জন মাঠে বা নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যা করিলে তাহা শীঘ্র পাওয়া যায়। সাধনেচ্ছু এবং কর্ম্মিগণকে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন, ঐ সব ভাবলাগানো মহাপুরুষের নিকট হইতে বিশেষ কিছু পাইবার আশা করিবেন না। যিনি যত সুনিপুণ কর্ম্ম করিতে পারেন তিনি তত উন্নত স্তরের বিকাশস্থল হন। ভাবের মধ্য দিয়া যাঁহারা সাধনশক্তির বিকাশের চেষ্টা করেন তাঁহারা বিশেষ দুর্ব্বল। সাধনশক্তি কর্ম্মের মধ্যে প্রস্ফুটিত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন গুরুগণ সেইরূপই ছিলেন।

সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ - চারিদিকে দেবতাগণ স্তুতি করিতেছেন।

স্তুতি মানে প্রশংসা। দেবতার কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অন্তরস্থিত তেজের ভাব, প্রকাশের ভাব এবং অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভাবকে দেবতা বলা হইয়াছে। যাঁহারা নিঃস্বার্থ কর্ম্মী তাঁহারাই দেবতা। যাঁহাকে পাইয়া এই সব কর্ম্মিগণ সংগঠিত হইয়া পড়েন তাঁহাকেই কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। যাঁহার শক্তি প্রভাবে শত শত দেবতা প্রস্তুত হয়, যিনি নিজের অপার্থিব শক্তি দ্বারা বহু লোকের মধ্যে দৈবভাব বা আসুরিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, তাঁহাকেই পার্থিব ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ম্মিগণ রজোগুণের মূর্ত্তি। তাঁহারা কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা শান্তির ইচ্ছা করেন। যোগীর সঙ্গ প্রভাবে সহজে এবং শীঘ্র কর্ম্ম শ্রান্তি দূর হয়। অথবা নিষ্কাম কর্ম্মিগণ বিজ্ঞানের শান্ত প্রবাহ পাইতে ইচ্ছা করেন। স্তুতি অর্থে তোষামোদ নহে। যে উন্নতগুণ লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রাণ আকৃষ্ট হয়, তাহা পাইবার জন্য যে আমাদের অন্তরের চেষ্টা ইহারই নাম প্রশংসা। (যাহারা জীবনের উন্নত অবস্থার স্বাদ বোঝে না, যাহাদের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কার্য্য বিবেকের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত নহে, তাহাদের দেওয়া প্রশংসাতে যাহাদের প্রাণ নাচিয়া উঠে তাহাদের মনুষ্যত্ব লাভের এখনও বহু জন্ম বাকী আছে)। যাহারা উন্নত নীতির অনুসরণ না করিয়া উন্নত নীতিমান্ মানুষের প্রশংসা করে, তাহারাই চাটুকার। তাহাদের দেওয়া ঐ প্রশংসার নাম চাটুকারিতা। এইরূপ ধরণের লোক সাধারণতঃ পরনিন্দা পরায়ণ হয়। ইহাদের সঙ্গ কালসর্পের সঙ্গের মত বিপজ্জনক। ইহারা সমাজের ভীষণ অনিষ্টকারী শত্রু। দৈব জগৎ সদাকর্ম্মময় জগৎ। এখানে অবস্থান করিয়া (আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া) কাহারও বিশ্রাম নাই। যাঁহারা পরার্থে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের বিশ্রাম কোথায়? তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই

অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। নিন্দা, অপমান, তিরস্কার তো তাঁহাদের মস্তকের নিত্য আশীর্ব্বাদ। অনাহার, অনিদ্রাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা যে ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করেন, তাহা চিরদিন লোকনয়নের অগোচরে থাকিবে। তাঁহারা জগতের জন্য অমৃত আনয়ন করেন। জগতের বিষ তাঁহারা তাহার বিনিময়ে ভোগ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ইত্যাদি আসুরিক সম্পদ সম্পন্ন মানুষগণ বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই শিবের চারিদিকে কেবল দেবতাগণই স্তুতি করিতেছেন। বাস্তবিক কর্ম্মের অন্তেই শান্তির বিমল সুধার প্রকৃত মূল্য বুঝা যায়। দৈব ভাবের পরই শান্তিভাব স্বাভাবিক। দৈবভাব অবলম্বনের পূর্ব্বে শান্তিভাব অর্থে জড়ভাব। মানুষের সমাজে ইহার অবলম্বন থাকিলে মানুষকে শূদ্র প্রস্তুত করে। আসুরিক ভাবসম্পন্ন মানুষ যোগীর স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের মিথ্যা নিন্দা মাত্র করিতে পারে। কর্ম্মী মাত্র এই স্তরের প্রকৃত মূল্য জানেন। তাই শিবের চারিদিকে কেবলই দেবগণ স্তুতি করিতেছেন। এখানে দেবগণ অর্থে দৈবীসম্পদ সম্পন্ন মানবগণকে জানিতে হইবে।

ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং - ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন বস্ত্রাবলম্বন। লজ্জা নিবারণ করিয়াই তৃপ্ত, কৌপীনবন্ত। বিলাসিতাশূন্য সাধারণ জীবন।

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং - ইনি বিশ্বের আদি ছিলেন এবং বিশ্বের বীজস্বরূপ।

আকাশের অঙ্গস্থিত এই স্থূল জগতের সমষ্টিকে 'বিশ্ব' বলে। বিশ্ব যখন এই স্থূলরূপ প্রাপ্ত হয় নাই, সেই অবস্থার নাম শিব। অর্থাৎ শূন্য আকাশই শিবের স্বরূপ।

প্রত্যেক স্থূল বস্তুরই তিনটি অবস্থা - বীজাবস্থা, সূক্ষ্মাবস্থা এবং স্থূলাবস্থা। বীজাবস্থা হইতেই স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্মাবস্থা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। বিশ্বসংসারস্থিত সমস্ত জীবগণের অভিমানগুলি এই শিব-ঈশ্বরের বিরাট শরীরের এক একটি বিন্দু মাত্র। যেন সমস্ত অভিমানগুলিকে সাজাইয়া শিবের শরীরটি গঠন করা হইয়াছে। ক্ষিতি আদি পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থার কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের সংযোগ, বিয়োগ বা মিশ্রণে সমস্ত সংসার মূর্ত্ত হইয়াছে। এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন, আমরা যেমন এক একটি জীব, গ্রহ পৃথিবীগণও এক একটি জীব। তাহাদের প্রত্যেকেরই জন্ম মৃত্যু আছে, বাল্য যৌবন বৃদ্ধাবস্থাও আছে, ক্ষয়বৃদ্ধিও আছে। আমরা যেমন আমাদের অন্তরস্থিত সূক্ষ্মতম অভিমানেরই বিকাশ অবস্থায় নিজ নিজ শরীর লাভ করিয়াছি, তাহারাও সেইরূপ নিজের অন্তরস্থিত সূক্ষ্মতম অভিমানেরই বিকাশ অবস্থায় নিজ নিজ শরীর লাভ করিয়াছে। লয় কালে সকলে আকাশেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া বহু পণ্ডিত বহু প্রকারের গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তাধারা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৃথা তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা বা ঝগড়া করিবার মতলব লইয়া সেই সবের আলোচনায় কাহারও কোন প্রকার কাজ হইবে না। চিন্তাশীলগণের চিন্তাধারা পর্য্যালোচনা করিলে নিজের চিন্তাধারা নির্ম্মল এবং মার্জ্জিত হইয়া থাকে। যে নিয়ম খুব ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা চলে না সেই নিয়মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুব মজবুত নহে। জীবনের লক্ষ্য কোন্ দার্শনিকের মতে কিরূপ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

সেইরূপ লক্ষ্যই সেই দার্শনিকের নিজের জীবনের লক্ষ্য কিনা তাহাও বুঝিতে হইবে। সেই ভাবের অনুরূপ সেই দার্শনিকের জীবন নিয়মিত কিনা তাহা জানিয়া লইবেন। তবে সেই জীবনের ছাঁচে নিজের জীবন পরিচালনা আরম্ভ করিবেন। সকলেই নিয়মনিষ্ঠ হইবেন। জগতের চিন্তাশীলগণের প্রত্যেকের জীবনেই অনেক বিশেষত্ব আছে। কাহাকেও আঘাত করিয়া বড় হইতে চেষ্টা করিবেন না। প্রত্যেককেই নিজের বিবেকের নির্দ্দেশমত তাহার নিজের জীবন গঠনের সাহায্য করিবেন। প্রাচ্যমতে সৃষ্টির কৌশল সমস্ত জীবে এবং সমস্ত ভূতে একরূপ। প্রাচ্যমতে সৃষ্টির সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া অসম্ভব।

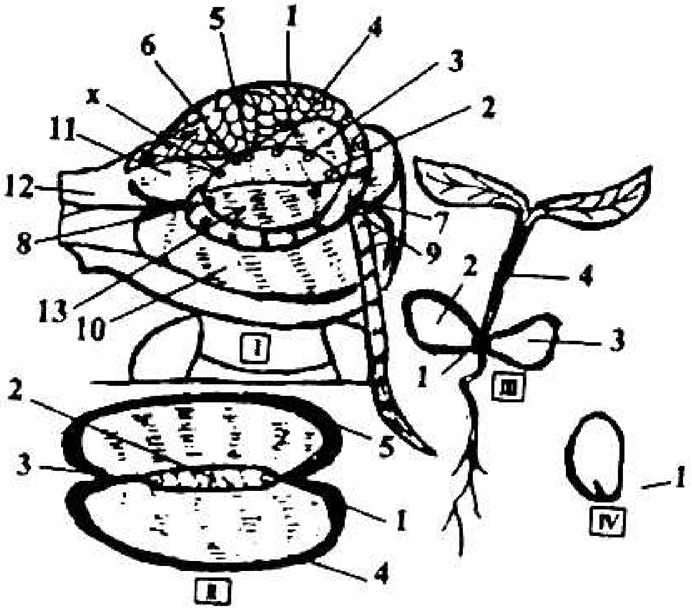

সকলেই শিবমূর্ত্তি দেখিয়া থাকিবেন। মূর্ত্তিটির স্থাপন এবং নির্ম্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তি সকল খুবই সুন্দর। মূর্ত্তিটি একটি বীজের আকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই বিশ্বসংসারে যে বীজাবস্থা আছে সেই বীজাবস্থাই শিব। মূর্ত্তির পীনেটটি উত্তর দিকে রাখিয়া স্থাপন করিতে হয়। পৃথিবীর উত্তরে ধ্রুব রহিয়াছে। ধ্রুবই সত্যলোক। এই ধ্রুবের সঙ্গে পৃথিবীর একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্রিয়া চলিয়াছে। ইহার একটি বুঝিতে পারিলে, বিচার সাহায্যে অন্যটিও বুঝিতে পারা যায়। চলিত কথায় যাহাকে চুম্বক ক্রিয়া বলে ইহা সেই বস্তু। এই দুইটি ক্রিয়াই পৃথিবীর জীবন। এই ক্রিয়ার সহিত পরিচয় লাভ করিবার জন্যই যোগিগণ উত্তর দিকে মুখ করিয়া ধ্যান এবং পূজা আদি করিয়া থাকেন। অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিতে পারিলে এই ক্রিয়ার সহিত পরিচিত হওয়া খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ইহা লইয়া বেশী কিছু বলা চলে না, কারণ ইহা সম্পূর্ণরূপে অনুভূতির কথা। ধ্রুবের সঙ্গে এই সংযোগসূত্রই পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। স্থূল জগতের ইহাই শক্তি। এই চুম্বক ক্রিয়াই পৃথিবীর জীবন। বৈদিক অঘমর্ষণ (নিষ্পাপকরণ) ক্রিয়া মন্ত্রে এই বিষয়ের আভাস আছে। তান্ত্রিক অঘমর্ষণ ক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানময় কোষের সহিত সম্বন্ধ রাখে। অন্তঃকরণ নিষ্পাপ

হইলে জীবের শিবত্ব লাভ হয়। আবার নিত্য এইরূপ অঘমর্ষণ ক্রিয়া (যথাবিধি হওয়া চাই) নিষ্পাপ হইতে সাহায্য করে। যাহা হউক, পৃথিবীর মধ্য দিয়া উত্তর মুখে যেন নীরবে এই ক্রিয়া চলিয়াছে। এই ক্রিয়াই সমস্ত জগতের শক্তি। শিবমূর্ত্তিস্থিত উত্তরমুখী পীনেটটি এই শক্তিরই স্থূলরূপ। এই জন্যই শিবমূর্ত্তির স্থাপনায় এই পীনেটটি সব সময় উত্তরমুখে রাখিতে হয়। শিব পূজাও উত্তর মুখ হইয়া করিতে হয়। পূজক মাত্রই জানেন, শিবমূর্ত্তিস্থিত পীনেটের উপরই শক্তির (বা প্রকৃতির) পূজা হইয়া থাকে। এই শক্তির প্রবাহের দুইটি দিক আছে। তাহার একটি প্রবাহ উত্তর মুখে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রবাহটি পৃথিবীমুখে আসিতেছে। যাঁহার অন্তঃকরণের সমস্ত শক্তি উত্তর মুখে, সত্যের পথে, ধ্রুবের পথে, গণেশের পথে, ত্যাগের পথে বা নিবৃত্তির পথে চলিতে থাকে তিনিই শিবত্বের সম্মুখীন হইয়া থাকেন। যোগ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আজ্ঞাচক্রটিই আমাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্মরূপ। এই আজ্ঞাচক্রই শিব মূর্ত্তিস্থিত গৌরীপীঠ। আজ্ঞাচক্রের দুটি কেন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ মানা হইয়াছে। তাহার একটি আমাদের মস্তকের সম্মুখের দিকে, অন্যটি মস্তকের পিছনের দিকে অবস্থিত। সম্মুখেরটি ধ্রুবস্থান বা সত্যস্থান, পিছনদিককার কেন্দ্রটি মনের স্থান। এই মনই পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ রাখে। তাহাকেই পৃথিবী মনে করিয়া এখন ধ্রুব এবং পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বুঝিয়া লওয়া ভাল। (শিবমূর্ত্তির চিত্রটি দেখ। ১ - ধ্রুবস্থান। ২ - পৃথিবীস্থান, মনের স্থান।)

একটি বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। সেই বীজকে জানিলে বৃক্ষকে জানা হয়। ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সাধনা মানুষকে কেবলই অন্তর্ম্মুখী করিবার ইঙ্গিত দিতেছে। শিবের পূজার অর্থ আমাদের স্বরূপের বীজাবস্থার পূজা। অথবা শিব পূজা অর্থে মস্তিষ্কের পূজা। পূজা অর্থে পূর্ণতার অভ্যাসকে জানিতে হইবে। ত্যাগাদি দৈবীসম্পদ মস্তিষ্কের পূর্ণতারই লক্ষণ। আমাদের স্বরূপের বীজাবস্থার কেন্দ্রস্থলে যাইয়া বিশ্বসংসারে বীজাবস্থার অনুভূতি লাভ করিতে হয়। যে কোন বীজের আকার এবং প্রকারের সহিত একটি শিবমূর্ত্তির মিল পাওয়া যাইবে। আমাদের অন্তরস্থিত সূক্ষ্ম শরীরের বিকাশ এবং একটি বৃক্ষের বীজাবস্থা হইতে বৃক্ষের ক্রমবিকাশ ঠিক একরূপ। গীতার পুরুষোত্তম যোগাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক শিবের মূর্ত্তির সহিত একটি বীজের কি মিল আছে তাহা দেখিতে হইবে।

চিত্রে* একটি অঙ্কুর এবং একটি বীজের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। বামদিকের চিত্রটি অঙ্কুর চিত্র। ইহার মধ্যস্থানে সংযুক্ত দুইটি পুরুদল হইতে অঙ্কুরের কাণ্ড ভাগ ঊর্দ্ধমুখে বৃদ্ধি পাইয়া দুইটি পত্রে শোভিত হইয়া অবস্থিত। আবার নিম্নমুখেও ঐ সংযুক্ত দ্বিদল হইতেই মূলভাগ বৃদ্ধি পাইয়া শিকড় সমন্বিত হইয়া রহিয়াছে।

চিত্রের দক্ষিণ (ডান) অংশে একটি বীজ চিত্র আছে। এই বীজই জল এবং মাটি সহযোগে ফাটিয়া যাইয়া বামদিকের চিত্রের মত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একটি বীজে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যায় তাহার পরিচয় লইয়া বীজ এবং অঙ্কুর অবস্থা বুঝিতে সুবিধা হইবে। বীজের একটি আবরণ আছে। এই আবরণই আমাদের নিকট খোসা বলিয়া পরিচিত। ইহাকে আমরা বীজাবরণ বলিব। এই বীজাবরণের মধ্যে দুইটি

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এখানে পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রটিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

পুরু দল আছে। (একটি বীজ ভাঙ্গিয়া দেখ)। দলের সংযোগ স্থলে একটি অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুর বিদ্যমান। বীজাবস্থায় যা আছে তাহারই বিকাশ অবস্থা চিত্রে।

প্রত্যেক জাতীয় বীজই দুইটি দলবিশিষ্ট নহে। সেই সব বীজের (যেমন ধান যবাদি) অঙ্কুরগুলি একটি দলের উপাদান শাসভাগ হইতে সংগ্রহ করে এবং দ্বিতীয় দলের উপাদানটি খোসা হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্কুরিত হয়।

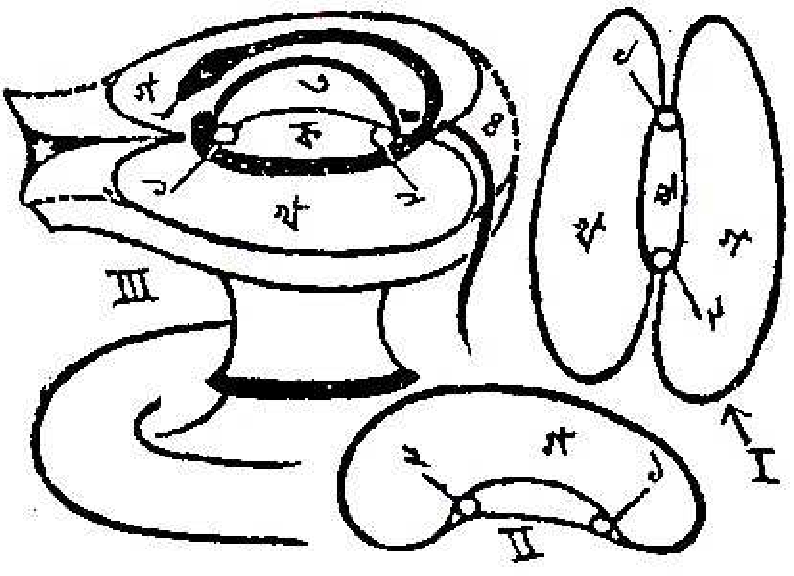

বীজ ও শিবমূর্ত্তি চিত্র

শিব মূর্ত্তিকে বীজের মত করিয়া প্রস্তুত করিবার প্রথা আছে। একটি বীজের সহিত সেই সব মূর্ত্তির কি মিল আছে তাহা জানা প্রয়োজন। যোগাঙ্গের আজ্ঞাচক্র, বৃক্ষের বীজ, মানবের (বা জীবমাত্রের) মস্তিষ্ক এবং শিবমূর্ত্তির যে সব মিল আছে তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে তিনটি চিত্র সন্নিবেশ করা যাইতেছে। পাঠকগণ চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করিয়া লইবেন। তাহা হইলে শিব অংশ বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। শিব শান্তি বা ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের দেবতা। এই জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক। উপাসনার পথ, যোগের পথ এবং স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিকে বুঝিবার পথ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে তখন সকল পথিক এক জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হইবেন। অবশ্যই পথ অবলম্বনের পার্থক্যে জ্ঞানের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তুরীয়ভাবে উপনীত হইবার পার্থক্যও হইবে। তাহা হইলেও কোন জ্ঞানই কম নহে। প্রত্যেক জ্ঞানেরই প্রয়োজন আছে। ভারতের বক্ষে জ্ঞানের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছে এমন কোন স্থানে হয় নাই। ভারতের ঋষি একাধারেই কর্ম্মী, উপাসক, জ্ঞানী এবং যোগী হইয়া থাকেন।

শিবমূর্ত্তি পরিচয়

এক (I) নম্বরের চিত্রটি যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট দ্বিদল চিত্র। আমাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম অবস্থাই যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট দ্বিদল বা আজ্ঞাচক্র। এই আজ্ঞাচক্রে ১ এবং ২ চিহ্নিত দুটি কেন্দ্র আছে। ১ চিহ্নিত স্থান বুদ্ধিস্থান। ইহা আমাদের ভ্রূমধ্য স্থানের সমসূত্র স্থানে অবস্থিত। ইহাকে যোগিগণ ধ্রুবস্থান বা সত্য স্থানও বলেন। ইহা আমাদের গ্রন্থের গণেশস্থান (ষট্ চক্র কেন্দ্র নির্ণয় কেন্দ্র দেখ)।

তিন (III) নম্বরের চিত্রটি একটি শিবমূর্ত্তির চিত্র। ইহাতে ১, ২, ক, খ, গ চিহ্নিত অংশগুলিকে এক (I) নম্বরের চিত্রস্থিত ১, ২, ক, খ, গ, চিহ্নিত অংশের সহিত মিলাইয়া লও। ইহাই শিবমূর্ত্তির অন্তর্গত আজ্ঞাচক্রের ইঙ্গিত। এই চিত্রে ৩ চিহ্নিত অংশ শিব মূর্ত্তিস্থিত শিব পিণ্ড। এই পিণ্ডই দুই ভাগে বিভক্ত মস্তিষ্কের সংযোগ স্থান। এই সংযোগ স্থানের নিম্ন অংশ আজ্ঞা এবং এই সংযোগ স্থানের উপরের অংশকে সহস্রার গর্ভস্থান বলে। সাধক সমাজে ঐ গর্ভ স্থানটী গুরুপাদুকা স্থান বলিয়া পরিচিত। গুরুপাদুকা ৬ ৫ ৪ ৩ ২ [ষট্ চক্র কেন্দ্র নিরূপণ চিত্রস্থ]* অবলম্বনে লয়যোগসঙ্কেত খুব উন্নত সাধক সমাজেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ সাধক এই সব যোগাঙ্গের বিষয় অবগত নহেন। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা সাধক নহেন, তাঁহারা এই সব বিষয় লইয়া বেশি ভাবিবেন না। আমাদের লক্ষ্য কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝিতে চেষ্টা করা। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা কর্ম্মবিজ্ঞানটি বুঝিয়া চলুন। সব কথা সকলের প্রয়োজনে আসিবে না। চিত্রে * চিহ্নিত অংশটি শিব মূর্ত্তির পীনেট। ইহা কেবলই মূর্ত্তিস্থাপনের সহিত উত্তর দিকের সম্বন্ধ স্থির রাখিবার জন্য শিব মূর্ত্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। শিব পূজা সর্ব্বদাই উত্তর মুখে বসিয়া করিতে হয়। শিব মূর্ত্তিও উত্তর দিকে পীনেট রাখিয়া স্থাপন করিতে হয়। শিবমন্দিরে যাইয়া দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য আর কাহাকেও জিজ্ঞেস করিবার প্রয়োজন নাই। দিক্‌যন্ত্রটির মত পীনেটটি উত্তর মুখেই অবস্থান করে। ৪ চিহ্নিত স্থানটি কেবলই মূর্ত্তির শোভার জন্য মূর্ত্তিতে আছে। ইহা না থাকিলেও মূর্ত্তিকে খণ্ডিত বা অপূর্ণ বলিয়া কেহ না মনে করে। চিত্রে একটি সর্প দেওয়া আছে। শিব মূর্ত্তির সহিত ঐ সর্পও থাকে। এই সর্পটি হইতেছে ব্রহ্মনাড়ী। এই সর্পটি যে কি তাহা বুঝিতে হইলে পাঠকগণকে পুস্তকের শক্তি অংশের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

দুই (II) নম্বরের চিত্রটিতে ১, ২ এবং গ চিহ্নিত তিনটি স্থান দেওয়া আছে। তাহার সহিত পূর্ব্ব পরিচিত তিন (III) নম্বর এবং এক (I) নম্বর চিত্রের ১, ২ এবং গ অংশ মিলাইয়া লইবেন। ইহা একটি বীজের চিত্র। বীজস্থিত দুটি দল খ, গ একত্রিত হইয়া 'গ' রূপে পরিণত হইয়াছে। এই বীজস্থিত ২ চিহ্নিত স্থানেই অঙ্কুরটি অবস্থিত থাকে, যে অঙ্কুরটির বিকাশ অবস্থাই তিন (III) নম্বর চিত্রস্থিত সর্প। এই সর্পই জীবনীশক্তি, আত্মা বা আত্মচৈতন্য। ইহার এক প্রান্ত শক্তিঅংশে শক্তিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য পুচ্ছ অংশ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মূলাধার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষের কাণ্ড ভাগের সহিত এই সর্পের মস্তকের অংশের তুলনা করুন এবং মূল ভাগের সহিত এই পুচ্ছের নিম্ন ভাগের তুলনা করুন। শিবের মূর্ত্তির সহিত সর্পের অবস্থান, গণেশের স্কন্ধে উপবীতের

---

* প্রকাশকের নিবেদন - স্বচ্ছতার খাতিরে এ অংশটুকু আমাদের সংযোজন।

আকারে সর্পের কল্পনা এবং নারায়ণ বা বিষ্ণুকে সর্পের কোলে শয়ন করাইয়া রাখিবার কথা কেন পুরাণে আছে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য পাঠকগণ এখন নিশ্চয়ই বহু উপাদান প্রাপ্ত হইলেন। তিন (III) নম্বর চিত্রটিকে বুঝিতে পারিলে পূজায় ব্যবহৃত কোষাকুষীগুলিকে অমন বিকৃত আকারে কেন প্রস্তুত করা হয় তাহাও বুঝিবার পক্ষে পাঠকগণের সুবিধা হইবে।

মানুষের আসল শরীর (চৈতন্যময় শরীর) মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের অন্তরস্থিত ছিদ্র পথকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। যোগশাস্ত্রের ভাষায় বলিলে সহস্রার হইতে আরম্ভ করিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত চৈতন্য শক্তিই জীবের আসল স্বরূপ। ষট্ চক্র নামে যে যোগের সাধনবিভাগ আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সহস্রার, আজ্ঞা, বিশুদ্ধাখ্য, অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান এবং মূলাধার এই সাতটী চক্রের কথা যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে সহস্রার চক্রকে বাদ দিলে অবশিষ্ট ছয়টী চক্রই ষট্ চক্র বলিয়া খ্যাত। সহস্রার চক্রকে অলৌকিক চক্র বলা যায়। সাধনার সুবিধার জন্য ইহার ধারণা অবশ্যই যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তাহা হইলেও ইহাকে ষট্ চক্রের অন্তর্গত মানা হয় নাই। এই জন্যই সপ্তচক্র না বলিয়া ষট্ চক্রই নাম দেওয়া আছে। মস্তিষ্কের উপরের ভাগই সহস্রার। সহস্রার বহু প্রকার জ্ঞানের বিকাশ স্থল। প্রত্যেক জ্ঞানের মূলস্থানের সঙ্গে আজ্ঞাচক্রের মনবুদ্ধি কেন্দ্র স্থলের সংযোগ আছে। অসংখ্য জ্ঞানের বিকাশ বলিয়াই সহস্রার বলা হয়। সহস্র + অর = সহস্রার। কোন চক্রের (চাকার) কেন্দ্র স্থান হইতে বৃত্ত স্থানের সংযোগ দণ্ডগুলিকে 'অর' বলে। (যাঁহারা যোগাভ্যাসে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা ঠিক যোগের নির্দ্দেশ মতই চলিবেন। সমস্ত মস্তকে শীতলস্পর্শ শুভ্র বা সপ্ত রং বিশিষ্ট ছত্রাকৃতি আবরণ মস্তকের নিম্ন অংশের অর্থাৎ আজ্ঞা চক্রের ঢাকনার মত রহিয়াছে এই রূপ ভাবনার অবলম্বন লইয়া আজ্ঞা চক্রের অন্যান্য কাজগুলি করিতে হয়। দেখিবেন আশ্চর্য্য ফল পাইবেন।) সহস্রারের কেন্দ্রস্থান মনঃস্থানের সহিত সবগুলি জ্ঞানবিজ্ঞানের সংযোগভাগকেই সহস্রার (সহস্র + অর) বলা হয়। আজ্ঞাচক্রকে অবলম্বন করিয়াই মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই আজ্ঞাচক্রই শিবের স্থান। (বৈদিক সন্ধ্যায় প্রাণায়ম মন্ত্রেও এই কথার উল্লেখ আছে।) আজ্ঞাচক্রে দুইটী দল আছে। সেই দুইটী দলই শিব মূর্ত্তিস্থিত গৌরীপট্ট এবং দুইটী দলের মিলন স্থানই শিবমূর্ত্তির মধ্যস্থিত পিণ্ড। এই দুইটী দলই স্থূল রূপে জীবের মস্তিষ্ক (বা Brain)। ইহাই বৃক্ষবীজের প্রথম বিকাশ অবস্থায় দুইটি পত্র সমন্বিত কচি চারা। (পূর্ব্বে প্রদত্ত চিত্র দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করুন।) এই পিণ্ডটির সহিত মস্তিষ্কের সমস্ত জ্ঞানসম্পদধারা সংযোগ রাখে। এই আজ্ঞা চক্রই স্থূল অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্ক রূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ আজ্ঞাচক্র হইতেই একটি ধারা আরম্ভ হইয়া মূলাধার পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই ভাগের সঙ্গে বৃক্ষের মূল ভাগের তুলনা করুন। অন্য ভাগটি বৃক্ষের শাখা ভাগের মত মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার প্রভৃতি রূপে সমস্ত মস্তিষ্কে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য এখানে ষট্ চক্র কেন্দ্র নির্ণয় চিত্র প্রদান করিলাম। পাঠকগণ চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করিয়া লইবেন।

ষট্ চক্র কেন্দ্র নিরূপণ চিত্র

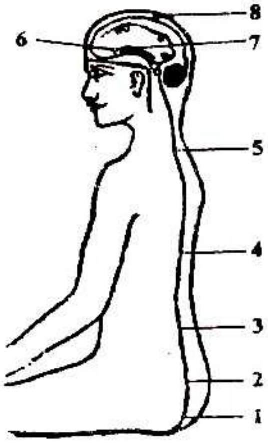

১ - মূলাধার চক্রস্থান।
২ - স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থান।
৩ - মণিপুর চক্রস্থান।
৪ - অনাহত চক্রস্থান।
৫ - বিশুদ্ধাখ্য চক্রস্থান।
৬ - আজ্ঞাচক্রস্থান। এই অর্দ্ধগোলাকার স্থানটির সহিত পূর্ব্ব আলোচিত শিব মূর্ত্তি পরিচয় চিত্রস্থিত তিন (III) নম্বর চিত্রের ৩ চিহ্নিত স্থান মিলাইয়া লউন। ইহাই শিবমূর্ত্তিস্থিত পিণ্ডাকার স্থান। পূজকগণ এই পিণ্ডের উপরেই পূজাকালে জলফুল প্রদান করিয়া থাকেন।

৭ - ইহা সহস্রারের গর্ভস্থান। ইহাকে সাধকগণ গুরুপাদুকা স্থান বলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ 'মস্তিষ্ক জ্ঞানকেন্দ্র পরিচয় চিত্রে' পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

৮ - ইহাকে এখানে অর্দ্ধগোলাকার রেখার আকারে দেখান হইয়াছে। ইহা মস্তিষ্কের সর্ব্বোপরি স্থান - ইহাই সহস্রার স্থান। ইহা মস্তিষ্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ এবং সমস্ত মস্তিষ্কের উপরে সরের মত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সাধকগণ ইহাকে মস্তিষ্কের উপরে শান্তিস্পর্শ ছত্রাকৃতি আবরণ রূপে ধারণা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান যুগের শরীর তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সকলেই যদি কিছু কিছু প্রাচীন কালের সাধনতত্ত্ব আলোচনা করেন, তবে প্রত্যেকেই বেশী লাভবান হইবেন। সাধনার আলোচনাকে অনুভূতির ভিত্তির উপর স্থাপন করা হইয়াছে। তাই অনুভূতির সুবিধার জন্য ধারণাকে অনুভূতির অনুকূল করিয়া সহস্রার আদি চক্রগুলি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সাধনার পথে প্রবেশার্থীর পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরে সাধক বেশ বুঝিতে পারেন, সেই কেন্দ্রগুলি কতগুলি অনুভূতির কেন্দ্র মাত্র। দুঃখের বিষয় অনেকে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া সেই সব চক্রগুলিকে দেখিবারও আশা রাখেন। যোগের প্রক্রিয়াগুলি সাধককে অন্তরস্থিত শক্তির সহিত সংযোগ করিবার জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুভূতির সহিত সংযোগ হইয়া গেলে সেইসব চক্রে কল্পনা আর থাকে না। তখন

অনুভূতির সুখ এবং শান্তিস্পর্শে তন্ময় হইয়া সাধক সেইসব চক্রের জ্ঞান লাভ করেন। কল্পনার অংশটুকু তখন শেষ হইয়া যায়। এই দিকে বর্ত্তমান যুগের আলোচনা স্থূল শরীরকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া দেখিয়া দেখিয়া সাজানো হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে প্রাচ্যের অনুভূতির মূল কেন্দ্রগুলিকে (অর্থাৎ আজ্ঞা হইতে আরম্ভ করিয়া মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত অনুভূতিকেন্দ্র বা ষট্‌চক্রকে) তাঁহারাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই আমরা দেখিতেছি, স্থূলবিজ্ঞান, সাধনবিজ্ঞান এবং দর্শনের সিঁড়িই প্রস্তুত করিতেছে। স্থূল যে স্থানে শেষকালে যাইয়া দাঁড়াইতেছে, সাধকগণ সেইস্থান হইতেই নিজের লক্ষ্যের পথ আরম্ভ করিয়াছেন। যখন আমরা এই সব সামঞ্জস্যের কথা ভাবি তখন প্রাণে কতই আনন্দ পাই। প্রত্যেক ছাত্রকে আমরা স্থূল এবং সাধনাশাস্ত্র দুই দিকই দেখিতে এবং বুঝিতে অনুরোধ করি। তবে কেহ যেন সাধনার সম্পদকে স্থূলের ছাঁচে ফেলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত না হন। কারণ একজন যে স্থানে যাইয়া গন্তব্য শেষ করিতেছেন, অন্যজন সেখানেই পথ শুরু করিয়াছেন। সাধনার মধ্যে (অনুষ্ঠান সহ) প্রবেশ করিলে শান্তি পাইবে, অশান্তি দূরে যাইবে। আবার স্থূলকে অবলম্বন করিয়া যতই জ্ঞানলাভ কর না কেন, প্রাণে শান্তি কখনও পাইবে না। মন অন্তরস্থ না হইলে শান্তি পাওয়া যায় না।

রজঃ এবং বীর্য্যের মিশ্রণ অবস্থাই বীজাবস্থা। রজঃ, বীর্য্য এবং চৈতন্য তিনটি বস্তু মিলিয়া একটি বীজ হয়। যে কোন জীবের প্রথম অবস্থা একটি শিবমূর্ত্তির অনুরূপ। ঐ চৈতন্যই উভয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকে। এইরূপ একটি বীজাবস্থাই মায়ের গর্ভে শিশুরূপে পরিণত হয়। আবার ঐরূপ একটি বীজই পৃথিবীগর্ভে বৃক্ষরূপে আত্মবিকাশ করে। আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের বিকাশকে যখন বুঝিতে চেষ্টা করি তখন দেখিতে পাই, 'আজ্ঞা' হইতেই নিম্নস্থিত পাঁচটি চক্র বিকশিত হইয়াছে, আবার আজ্ঞা হইতেই মস্তিষ্কস্থিত সমস্তগুলি জ্ঞানকেন্দ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এখানে একটি গুহ্য কথা প্রকাশ করা যাইতেছে। অনুসন্ধিৎসুগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শিবমূর্ত্তিটি আমাদের মস্তিষ্কেরই স্থূলরূপে প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করা হইয়া থাকে। শিব জ্ঞান এবং শান্তির দেবতা। মস্তিষ্ক জ্ঞান এবং শান্তির আধার। যে কোন প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরে (শিবলিঙ্গ) মূর্ত্তির উপর জল ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে নিজের মস্তিষ্ক শীতল হইয়া আসিবে। যদি বেলপাতা দিতে হয় তাহাও ভিজাইয়া দিবেন। মস্তিষ্কের শক্তি যাঁহারা বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন। জল ঢালিয়া ২-৫ মিনিট বসিলেই যথেষ্ট। নিত্য এক নিয়মে স্নানান্তে বা পবিত্র বস্ত্রে করিতে হয়। জল ঢালিয়া দিবার পর দুধ ঢালিয়া দিলে আরও অধিক ফল পাইবেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রভাবে যাহারা এসব বুঝিতে না পারিয়া এসবের উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে এই সব সম্পদ কোন যুগে বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে যোগনিরত ঋষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই সব সম্পদ সমাজে প্রচারিত হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের অনাদরে ইহা সমাজ হইতে লুপ্ত হইলেও প্রকৃত সাধকসমাজে জ্ঞান এবং শান্তির উৎকর্ষের জন্য ইহার প্রয়োজন সমানভাবেই থাকিবে। আবার যখন সময় আসিবে তখন সমাজের প্রয়োজনের জন্য ইহা আবার সমাজে প্রচলিত হইবে। সত্য বিজ্ঞান সম্পদ নষ্ট হয় না।

শিব যোগের দেবতা। এই যোগ অর্থে লয়যোগ। যেখান হইতে বিকাশ হয়, অনুভূতির পথে সেইস্থানে আসিতে পারিলে লয়ও হয়। যাঁহারা এই ভাবে আজ্ঞাকেন্দ্রে আসিতে পারেন তাঁহারাই যোগী বলিয়া খ্যাত। শিবই বীজাবস্থা। তাই শিব 'বিশ্বাদ্যং' এবং 'বিশ্ববীজং'।

নিখিলভয়হরং = সমস্ত প্রকার ভয় নষ্ট করেন।

জ্ঞানে এবং বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের ভয় নষ্ট হয়। ভয় একটি সংস্কার মাত্র। বিষ্ণু কেন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া গেলে ভয় কম হইয়া যায়। ভয় অনেক সময়ই কাল্পনিক হইয়া থাকে। মৃত্যু ভয়ে মানুষ খুব ভীত হয়। বাস্তবিক আসুরিক অত্যাচারই ভয়ের কারণ হওয়া উচিত। পাশবিক ভোগিগণ নিজের ভোগের উপকরণ সহজে পাইবার জন্য সমাজের আত্মবিকাশে বাধা দেয়। আত্ম বিকাশের পথে বাধা মানিয়া লওয়াই ভয়ের কারণ। সেই ভয়ের প্রতিকার বীরত্বে হয়। যিনি নিজেকে আত্মরূপে, চৈতন্যরূপে বা ঈশ্বররূপে জানিতে পারেন তাঁহার মৃত্যুভয় থাকে না। বাস্তবিক যম বলিয়া কোন দণ্ডধর আমাদের মরণের পথ চাহিয়া অপেক্ষা করেন না। আর শরীরত্যাগকে রুদ্ধ করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং মৃত্যুভয় একটা মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র। আমাদের শরীরত্যাগ স্বাভাবিক, কিন্তু আত্মা অমর। সেই আত্মভাব শরীরে সংক্রমিত হয় বলিয়া আমরা কিছুতেই শরীরত্যাগকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আমাদের দৃঢ় ধারণা, আমরা এই শরীরেই যুগ যুগান্তর বাঁচিব। এ শরীরটীকে লইয়াই খেলা করিব। শিক্ষার দোষে আমরা নিজেকে আত্মা মনে না করিয়া শরীরই মনে করি। এইরূপ বিরুদ্ধ ধারণাই আমাদের নিকট একটি যম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। শরীরকে আত্মা মনে করিয়া যমের ভয় সৃষ্টি করিয়াছি। শরীরকে অমর ভাবিয়া সমাজে সহস্র প্রকার অশান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। অবশ্যই শরীরটি আমাদের খুবই প্রিয় বস্তু। ইহার যত্ন আদর হওয়া প্রয়োজন। তাহা করিতে যাইয়া আমরা আত্মবিকাশের আদর্শ নষ্ট করিতে পারি না। আত্মা ব্যাপক, তিনি সকলের মধ্যে অবস্থিত। আমরা শরীরকে আত্মা ভাবিয়া তাঁহার ব্যাপ্তিকে খর্ব্ব করিয়াছি। তিনি সকলের মধ্যে, তাই আমরা কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতে পারি না, সংগঠিত বা সমাজ ভুক্ত হইয়া বাস করিতে বাধ্য হই। তিনি আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারেও ব্যাপক হইয়া পড়িতে চাহেন। ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হওয়া প্রয়োজন। যাহা হউক যাঁহার মধ্যে এরূপ প্রশ্ন উদিত হয়, তিনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন আত্মা কি। তাই তিনি ক্রমে অনুভূতির গভীরতায় শিবের কেন্দ্রে আসিয়া স্থিত হইলে জানিতে পারিবেন ভয় বলিয়া কোন বস্তু নাই। তখন তিনি জানিতে পারেন জরা, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি ও মৃত্যু আত্মার অমরত্ব এবং ব্যাপকত্ব নষ্ট করে না। তখন তাঁহার চিন্তাও কোন সমাজবিশেষের সুবিধার জন্য বদ্ধ থাকে না।

ইতিপূর্ব্বে প্রাণময় কোষের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাণময় কোষের জ্ঞান হইলেও মৃত্যুর ভ্রান্তি কাটিয়া যায়।

বিজ্ঞান ক্ষেত্র অভেদবোধের ক্ষেত্র। যেখানে দুইজনের ভেদজ্ঞান নাই সেখানে ভয় হইবে কি দেখিয়া?

পঞ্চবক্ত্রং = পাঁচটি মুখ।

শিবের পাঁচ মুখের আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ইহা তন্মাত্রানুভূতির কেন্দ্র। এখানে অনুভূতিগুলি অমিশ্র অবস্থায় অবস্থান করে। রূপ তন্মাত্রের কেন্দ্রে রস তন্মাত্রের বোধ আসিবে না। রস তন্মাত্রের কেন্দ্রেও অন্য কোন তন্মাত্রের বোধ ফুটিবে না। তারের যন্ত্রের মিলের মত যে তারের সহিত যে তার মিলাইয়া বাঁধা আছে, তাহার যে কোন একটিতে ঝঙ্কার দিলে মিলের দ্বিতীয় তারটি মাত্র বাজিবে। এক একটি মুখের সহিত মাত্রার স্পন্দন যেন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

ত্রিনেত্রং = তিনটি চক্ষু।

শিব সূক্ষ্ম, স্থূল এবং কারণজগতের দ্রষ্টা। (শক্তি অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইবে।)

এখানে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ধ্যানমধ্যস্থিত যে কোন একটি অনুভূতিকে অবলম্বন করিতে পারিলে ধ্যানমধ্যস্থিত অন্যান্য অনুভূতিগুলি পর পর আপনিই ধরা পরিবে। সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উপর মোটেই নজর দিবেন না। অনুভূতিটিকে বেশ দৃঢ় হইয়া অবলম্বন করিবেন। সেই অনুভূতিই ধ্যানের বিভিন্ন শব্দস্থিত অনুভূতিগুলিকে স্পষ্ট জাগাইয়া দিবে। গণেশ কেন্দ্রের অনুভূতি হইতেই অনুভূতির গভীরতা আসিতে থাকে। একটি অনুভূতিই অন্য স্তরের অনুভূতির সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিবে। আমাদের স্বরূপের সঙ্গে অনুভূতিগুলি পরপর সজ্জিত রহিয়াছে। যাঁহারা সত্যই আত্মার খোঁজে চলিয়াছেন, যাঁহাদের দল, নাম ও যশের মোহ নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতে পারিবেন। যে কোন একটি সত্য অনুভূতি পাইলে তাহাকেই নিজের ইষ্ট দেবতার রূপ মনে করিয়া সর্ব্বদা আত্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। নিজের নিত্য সাধনা এবং লোকহিতকর কর্ম্মও যথা নিয়মে সম্পন্ন করিবেন।

এবার ধ্যান অনুসারে জ্ঞানী এবং কর্ম্মিগণের লক্ষণ বলা হইবে।

"পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং" এবং "ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং" এই অংশটুকু মাত্র এ স্তরের কর্ম্মীর লক্ষণ। এ স্তরের কর্ম্মিগণ গুরু হন (বরাভীতি), তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় প্রফুল্ল (প্রসন্নং) থাকেন। তাঁহারা মানুষে দেহাভিমান নষ্ট করিয়া আত্মাভিমান প্রতিষ্ঠিত করেন (পরশু)। তাঁহারা শিষ্যের ভোগমুখী মনের বেগকে আকর্ষণ করিয়া লন (মৃগ)। তাঁহারা বিলাসিতাহীন সরল জীবন যাপন করেন (ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং) অর্থাৎ বেশভূষার পারিপাট্য নেই।

দুঃখের বিষয় গুরুগণ এখন আর ত্যাগীর জীবন যাপন করিতে চাহেন না। মানুষের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টাও করেন না। দীক্ষার প্রচলন বোধ হয় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকই বোধহয় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ৮/৯ বৎসর বয়সে দীক্ষা নেওয়া বেশী মঙ্গলকর। এখানে দীক্ষা অর্থে বৈদিক বা তান্ত্রিক দীক্ষা, পৌরাণিক নহে। দীক্ষা মন্ত্রের মধ্যে 'র'কার সংযুক্ত বীজমন্ত্র কর্ম্মোদ্দীপক। বর্ত্তমান সময় এরূপ মন্ত্রোপাসনা বেশী কার্য্যকরী জানিতে হইবে। অনেকে মনে করেন, একবার যাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট বিকাইয়া গিয়াছি। সেখানে জ্ঞানের উন্মেষ না হইলে, বা নকল গুরু হইলে নিঃসন্দেহে অন্য গুরু গ্রহণ

করিতে হয়। জ্ঞানের পূর্ণাবস্থায় আসিতে হইবে, এই জন্য দীক্ষার প্রয়োজন। যতক্ষণ নিজের মনের পূর্ণ তুষ্টি আসে নাই, ততক্ষণ জ্ঞানেরও পূর্ণাবস্থা লাভ হয় নাই জানিতে হইবে। নিজে সাধনা না করিয়া গুরুর দোষ ভাবিলেও তাহার ফল ভাল হয় না। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিত্য এক নিয়মে দুই মিনিটও যদি জপ করা যায়, তাহাই যথেষ্ট। মানুষের জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য মন্ত্রজপ সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়। গায়ত্রী মন্ত্র বা তন্ত্রের বীজমন্ত্র বেশী শক্তিশালী জানিতে হইবে। ধর্ম্মের সংস্কার বহু লোকে গ্রহণ করে, কিন্তু ধর্ম্মের শাসন বোধহয় খুব কম লোকেই বর্ত্তমান সময় পালন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম যে সমাজের একটি শাসন বিভাগ ইহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। সমাজ এবং রাজশাসন অপেক্ষা এই শাসনের প্রয়োজন অনেক গভীর। মানুষ আইনকে ফাঁকি দিতে পারে, সমাজকে ফাঁকি দিয়া গোপনে অন্যায় করিয়া নিজের এবং মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজেকে, নিজের বিবেককে বা ধর্ম্মকে ফাঁকি দিতে পারে না। এমন অনেক ভণ্ড লোক আছে যাহারা বাহিরে কথার চাতুর্য্যে জ্ঞানী সাজিয়া সরল লোককে শিষ্য করিয়া লয়, পরে তাহাদ্বারা অত্যন্ত ঘৃণিত স্বার্থ সিদ্ধি করাইতে চেষ্টা করে। ধর্ম্মের পথে কেহই অধর্ম্মের সহায়ক হইও না। ধর্ম্ম শাসনের অভাবে মানুষের মনোবৃত্তি যে কত হীন হইয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ যদি কেহ চাহেন, তবে তাঁহাকে বলিব এক পয়সার খাঁটী ঘী ক্রয় করিবার চেষ্টা করুন। হায়! আত্মবিকাশের পথে কি প্রতারণাই চলিয়াছে! মানুষকে ঠকাইলে যে নিজেকেই ঠকানো হয় তাহা কে বুঝাইবে? ভেজাল দ্রব্য যে সমাজের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতেছে ইহা বুঝিবার মত শক্তি গুরুরও নাই, চেলারও নাই। ভারতের মনুষ্যত্ব বিকাশের সমস্তগুলি বিভাগই আজ প্রাণহীন! তবে ভাবুন, মানুষ কোথায় দাঁড়ায়! আজ গুরুগিরিও বিলাসিতা ও ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

ধ্যানের বাকী অংশটি জ্ঞানিগণের অনুভূতির বিষয়! এ স্তরের জ্ঞানিগণ যোগারূঢ়, নির্ব্বিকার এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বিশুদ্ধবোধে আত্মহারা থাকেন। কথায় এবং ব্যবহারে তাঁহারা শান্তিপূর্ণ ভাব অবলম্বন করেন। কাম, লোভ এবং মোহের বস্তু তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহারা সদাই প্রফুল্ল এবং উদ্বেগশূন্য। তাঁহাদের আসুরিক ভাব নাই। সৃষ্টির স্থূল অবস্থায় যাহা আছে, তাহা যে কারণ বা বীজ অবস্থারই বিকাশ ইহা তাঁহারা জানেন। তাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি লাভ করেন। তাঁহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ জগতের দ্রষ্টা হন।

এ স্তরের অনুভূতিগুলিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ স্তরের জ্ঞানিগণকে প্রায়ই মৌনী হইতে দেখা যায়। মানুষ এ স্তরের অনুভূতিতে আসিলে জীবন্মুক্ত হন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণকে ঈশকোটী এবং ব্রহ্মকোটি দুই প্রকারে পাওয়া যায়। যাঁহারা ব্রহ্মকোটির মহাপুরুষ, তাঁহারা কর্ম্ম করেন না। যাঁহারা ঈশকোটির মহাপুরুষ তাঁহারা কর্ম্ম করেন। এ স্তরের মহাপুরুষগণ প্রায়ই ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের আচরণ অবলম্বন করিয়া বনজাত ফুলের মত শুকাইয়া যাইবার ভাব অবলম্বন করেন। জগতের লোক প্রায়ই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। এ স্তরের কর্ম্মিগণ গুরু হন এবং মানুষকে শক্তি স্তরের আদর্শে গঠন করিতে চেষ্টা করেন।

শিবের শ্রেষ্ঠ মুখটির আলোচনা আবার করিতেছি। এই মুখটির নাম 'ঈশান' মুখ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইনিই বোদ্ধার স্বরূপ। এই মুখের সঙ্গেই শব্দ তন্মাত্রার বিশুদ্ধ বোধ জড়িত। শব্দের সূক্ষ্মতম মাত্রাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। 'ম্' ' ং' বা নাদের যাহা খাঁটি স্বরূপ তাহাই শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থা। যে কোন শব্দই ঐ ' ং'এ লয় প্রাপ্ত হয়। একটু স্থির হইয়া যে কোন শব্দের গতিতে লক্ষ্য করুন বুঝিতে পারিবেন। স্থিরভাবে প্রথম ঘণ্টার শব্দের গতির সহিত মনঃসংযোগ করিলে বিষয়টা বুঝিতে সুবিধা হইবে। পরে যে কোন শব্দের গতিতে মনঃসংযোগে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইবেন।

" ং" অনুস্বার, " ঃ" বিসর্গ এবং "অ"কার সমস্ত শব্দের মূল উপাদান। এই অনুস্বার অর্থে 'অং' বুঝিতে হইবে। সাধারণ পাঠকগণ এ বিষয় লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবেন না। যাঁহারা গভীর ভাবে সাধনা করেন এবং যাঁহারা এরূপ বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য এসব কথা লিখিত হইল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে কত গভীর চিন্তাশীল ছিলেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। বিশুদ্ধ বোধের কেন্দ্রে আসিলে অনুস্বারের যে স্বরূপ তাহাই বোদ্ধার সহিত একাকারে ধরা পড়ে। এই অনুস্বারের অনুভূতি স্ফটিকবর্ণ। এই স্ফটিকবর্ণ আবরণের অন্তরে (কৃষ্ণবর্ণ) বিসর্গের রূপটিও লুকাইয়া অবস্থান করে। অনুস্বারের স্বরূপই 'মহত্তত্ত্ব' এবং এই কৃষ্ণবর্ণ বিসর্গই 'অব্যক্ত তত্ত্ব'। যাঁহারা তন্ত্রের বীজমন্ত্রের সাধনা করেন, তাঁহারা হয় তো জানেন শিবের বীজ 'হৌঁ' এবং আকাশ তত্ত্বের বীজ 'হং' কার। 'হং' কারে ঃ + অ + ং এই তিনটি বর্ণ আছে। ইহার মধ্যে ' ং'কারের কথা আমাদের আলোচনা করিতে হইতেছে। ইহার অনুভূতিটিই বিজ্ঞানময় কোষের আলোচনায় ঈশানমুখের অনুভূতিতে দেওয়া হইয়াছে। 'হৌঁ'কার মন্ত্রে ঃ + অ + উ + ং চারটি বর্ণ আছে। এই ' ঃ' = অব্যক্ত তত্ত্ব, ইহা কৃষ্ণবর্ণ বোধ। ং = মহত্তত্ত্ব, ইহা স্ফটিকবর্ণবোধ। 'উ' = বিশুদ্ধ অভিমান বা প্রশান্ত অভিমান, ইহা শুভ্রবর্ণ বোধ। ' ং'কে আমরা ইতিপূর্ব্বে অং (অ + ং) মানিয়া লইয়াছি। 'অ'কারকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরিলে ইহার বোধ অরুণবর্ণ হইবে। ইহাই বিষ্ণু এবং সূর্য্য কেন্দ্রের বোধ। আমরা 'হৌঁ' বীজে অব্যক্ত + মহৎ + বিশুদ্ধ অভিমান মানিয়া লইলাম। অর্থাৎ শিব স্তরের সমস্ত অনুভূতিই এই 'হৌঁ' বীজের অন্তর্গত জানিতে হইবে।

' ং (অনুস্বার), ম্ (ম্ কার) বা ঁ (চন্দ্রবিন্দু বা নাদ) এই তিনটি বর্ণ একই তত্ত্বের রূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি সমস্ত শব্দ অনুস্বারে লীন হয়। এইদিকে বোধের দিক দিয়া বিচার করিলেও আমরা দেখিতেছি সমস্ত বোধ এই ' ং'কারে বা শিবের ঈশান মুখেই যাইয়া বিলীন হইয়া থাকে। সাধক যদি ঈশান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন তবে যত শব্দই তিনি শ্রবণ করুন না কেন, তিনি ' ং'কার ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রত্যেকটি বোধই 'বিশুদ্ধ বোধ' হইবে। ইহা বিশুদ্ধ বোধের কেন্দ্র। গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শবোধও এই স্তরে আসিলে একই বিশুদ্ধ বোধে পরিণত হইবে। ইহা স্ফটিক

বর্ণের বোধ। ইহাই সাংখ্য* বর্ণিত মহত্তত্ত্ব। এই মহৎ বা ‘ঈশান’কেই উপাসকগণ জ্ঞানশক্তি সরস্বতী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

---

* সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটী আভাষ দিতেছি। ভারতের সমস্ত দর্শনের চাবি সাংখ্য। সাংখ্যের আদিবক্তা কপিলই আদিগুরু এবং আদিজ্ঞানী। সাংখ্যের মতে সমস্ত সৃষ্টি নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির সমষ্টি।

(১) পুরুষ (জ্ঞ)। শক্তি অংশে পুরুষোত্তম দেখুন।

(২) অব্যক্ত। শক্তি অংশে অব্যক্তের কথা বলা হইয়াছে।

(৩) মহৎ (ব্যক্ত)। ইনি আমাদের গ্রন্থে শিবের ঈশানমুখ। উপাসকের সরস্বতী। ইহা বোধের সর্ব্বশেষ কেন্দ্র। ইহাই জ্ঞানের অবস্থা।

(৪) পঞ্চ তন্মাত্র। ইহা আমাদের গ্রন্থে পঞ্চমুখ শিব।

(৫) অহং তত্ত্ব। ইহা আমাদের গ্রন্থে শিবের ৬ষ্ঠ মুখ। মনোময় কোষের বিশুদ্ধ অভিমান অংশ ‘অহংতত্ত্বের’ স্বরূপ।

(৬) মন। আমাদের গ্রন্থে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অভিমান রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৭) পঞ্চ মহাভূত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহারা পঞ্চ মহাভূত। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমাদের গ্রন্থে হয় নাই। শাস্ত্রে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কথা আছে। যাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এইমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ অভিমানের কেন্দ্রে স্থিত হইয়া পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত। ইহারা অভিমানেরই পাঁচপ্রকার স্বরূপ রূপে ধরা পড়িবে। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সম্পূর্ণরূপে মনোময় কোষে অবস্থান করিয়া পঞ্চ মহাভূতকে বুঝিবার একটা চেষ্টা মাত্র। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত স্থূল মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশের সম্বন্ধে একটা যুক্তিপূর্ণ বিচার মাত্র।

এই পঞ্চীকৃত অর্থে মিশ্রিত এবং অপঞ্চীকৃত অর্থে অমিশ্রিত। অপঞ্চীকৃত আকাশ অর্থে - বায়ু, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতি বা মাটিহীন আকাশ; বায়ু অর্থে - মাটি, জল ও তেজহীন বায়ু; তেজ অর্থে - বায়ু, বাষ্প, ক্ষিতিহীন তেজ। জল অর্থে বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি হীন জল। মাটি অর্থে বায়ু, অগ্নি, জলহীন মাটি। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে ইহারা মিশ্র। এখানে আকাশ অর্থে (আকাশ ৮ (ভাগ) + বায়ু ২ + অগ্নি ২ + জল ২ + মাটি ২) আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মাটির মিশ্রণে আকাশ। আমরা আমাদের চারিদিকে ও শূন্যে যে আকাশ দেখিতেছি তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই রূপে বায়ু অর্থে বায়ু ৮ + আকাশ ২ + অগ্নি ২ + জল ২ + মাটি ২, জল অর্থে জল ৮ + আকাশ ২ + বায়ু ২ + অগ্নি ২ + মাটি ২। তেজ অর্থে তেজ ৮ + আকাশ ২ + বায়ু ২ + মাটি ২ + জল ২। মাটি বা ক্ষিতি অর্থে মাটি ৮ + আকাশ ২ + বায়ু ২ + অগ্নি ২ + জল ২।

মনোময় কোষের মিশ্রজ্ঞান বিজ্ঞানের বোধকে বিকৃত করিয়া আমাদিগকে ভ্রান্ত পথে ভ্রমণ করায়। মনোময় কোষে অবস্থান কালে আমাদের যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞানেরই আকার বলিতে হইবে। বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞানই "বিজ্ঞান" এবং বিজ্ঞানের শেষ প্রান্তে 'জ্ঞানের বিকাশ'। অজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং জ্ঞান এই তিনটি অবস্থার ভেদ এখন আমরা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলাম।

এই মহত্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সাধকের সমস্ত বোধই শব্দ তন্মাত্রায় বা জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত সাধক বিকারহীন হন। মনোময় কোষই বিকারের জন্মদাতা। বিজ্ঞানক্ষেত্রে বোধকে ধরিতে পারিলে বিকার আসিতেই পারে না। লৌকিক ভাব উৎপন্ন করাইয়া মনোময়কোষই সর্ব্ব বোধকে বিকৃত করে। তাই সাধকও মনের স্তরে বিকারে রঞ্জিত হইয়া যান। যাহা হউক মহতের কেন্দ্রে সাধকের সর্ব্ববোধই শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাই এখানে তিনি নির্ব্বিকার। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বোধগুলি তন্মাত্রের স্পর্শ, জ্ঞান ক্ষেত্রে সেইগুলি শব্দ মাত্র। একটি স্পর্শজ্ঞান, অন্যটী শব্দজ্ঞান। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে ইহাদের ভেদ নির্ণয় করা সহজ নহে। দুইটী প্রায় এক কথা হইলেও একটির অনুভূতি মহতের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ধরিতে হয়, অন্যটির অনুভূতি অহংতত্ত্বের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুভব করিতে হয়।

বিষয়টি একটু পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। যে কোন বোধই শব্দ স্বরূপ (বা স্পন্দন স্বরূপ)। স্পন্দন বা ক্রিয়া না হইলে বোধ হয় না। ক্রিয়া হইলেই শব্দ হইবে। যে কোন ক্রিয়াই ধ্বনি স্বরূপ। মনোময় কোষের ক্রিয়া বা মানস ক্রিয়া হইতেও বিজ্ঞানময় কোষের ক্রিয়া বা কম্পন সূক্ষ্ম। সেই সূক্ষ্ম কম্পনের অনুভূতির দুই দিক বলা যাইতেছে। একটা স্পর্শাত্মক, অন্যটি ধ্বন্যাত্মক। স্পর্শাত্মকই বিজ্ঞানের স্তর, ধ্বন্যাত্মকই জ্ঞানের স্তর ধরিতে হইবে। যাহা হউক ক্রিয়ার বা স্পন্দনের গতির কমবেশীতে বোধে বা অনুভূতিতে রং-এর পরিবর্ত্তন হয়। ক্রিয়া হইলেই শব্দও হইবে। বাস্তবিক ক্রিয়া এবং শব্দ প্রায় এক বস্তু। জ্ঞানক্ষেত্রে আসিলে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান অনুভূতিগুলি শব্দমাত্রে পরিণত হইবে। বিজ্ঞানময় কোষে যে সব বোধগুলির রং দেওয়া হইয়াছে, জ্ঞানক্ষেত্রে সেইগুলিই বিভিন্ন শব্দ রূপে ধরা পড়িবে। জ্ঞানক্ষেত্রে শব্দই সমস্ত সৃষ্টির মূল উপাদান। বাস্তবিক শব্দই বস্তুর সূক্ষ্মতম স্বরূপ। যাঁহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন। অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৫০টি বর্ণ অবলম্বনে যে সাধনার ভিত্তি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই তান্ত্রিক সাধনা। স্ত্রী, মদ, গাঁজা তান্ত্রিক সাধনার ভিত্তি নহে, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। শব্দই সমস্ত সৃষ্টির মূল উপাদান। শব্দই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ। শব্দই সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি এবং সাধনার ভিত্তি।

---

(৮) দশ ইন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শিব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিলেই ইহাদিগকে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি প্রাণ শরীরের শক্তি। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিজ্ঞান শরীরের বিভিন্ন প্রকার শক্তি।

একমাত্র তন্ত্রে তাহার সাধনেঙ্গিত আছে। কর্ম্মী মাত্রকেই শক্তি বৃদ্ধির জন্য খুব গোপনে সেই সাধনা অবলম্বন করিতে হয়।

বিজ্ঞান এবং জ্ঞান ক্ষেত্রের অনুভূতির ভেদ বলিতেছি। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে 'ক্ষিতি' তন্মাত্র পীতবর্ণ বোধের স্বরূপ, জ্ঞানক্ষেত্রে তাহা 'লং' শব্দ মাত্র। বিজ্ঞানক্ষেত্রে 'রস' তন্মাত্র শুভ্রবর্ণ বোধমাত্র, জ্ঞানক্ষেত্রে তাহা 'বং' শব্দমাত্র। বিজ্ঞানক্ষেত্রে 'রূপ' তন্মাত্র লোহিত বর্ণ বোধের স্বরূপ, জ্ঞানক্ষেত্রে তাহা 'রং' শব্দ মাত্র। বিজ্ঞানক্ষেত্রে 'স্পর্শ' তন্মাত্র ধূম্রবর্ণ বোধ মাত্র, জ্ঞান ক্ষেত্রে তাহা 'যং' শব্দ মাত্র। বিজ্ঞানক্ষেত্রে 'শব্দ' তন্মাত্র শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ। ইহাই বোধের শেষ স্তর। ইনি 'হং' কারের স্বরূপ। এই পূর্ণজ্ঞান এবং অব্যক্তের আবরণে অবস্থিত থাকিয়া পুরুষ (শক্তি অংশে পুরুষোত্তম দেখুন) অনুভব করেন। এই 'হং'কারে ' ঃ' এবং 'অং' এই দুইটি বর্ণ আছে। এই অনুস্বারই (' ং') জ্ঞানশক্তি মহত্তত্ত্ব এবং ' ঃ ' অব্যক্ত তত্ত্ব। এই জ্ঞান শক্তির সহায়তা ভিন্ন পুরুষ বোধ করিতে পারেন না। যাহা হউক এই জ্ঞান তত্ত্বই সমস্ত প্রকাশজগতের আশ্রয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং বিজ্ঞানক্ষেত্র ঐ জ্ঞাতা পুরুষের আবরণ। সাধক এস্তরে আসিলে পূর্ণ হন। ইনি জ্ঞাতা পুরুষ (শক্তি অংশে পুরুষোত্তম দেখুন)।

এই মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত সমস্তগুলি তত্ত্বই ব্যক্ত (অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে প্রস্ফুটিত এবং যোগিগণ ইহাদিগকে জানিতে পারেন। বিতর্ক সাহায্যেও বুঝা যায়।) এই মহত্তত্ত্বেরই পর অব্যক্ত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার খুব সহজ ভাষা "প্রকাশহীন তত্ত্ব" (অর্থাৎ আলোহীন তত্ত্ব)। তাহাই বিসর্গের (ঃ) স্বরূপ। প্রকাশ অংশে সমস্ত সৃষ্টি রহিয়াছে। অপ্রকাশ অংশটি স্পন্দনহীন চিরবিরাম। এই দুইয়ের যিনি সাক্ষী তিনি "পুরুষ"। তিনি সাংখ্যের ভাষায় "জ্ঞ"। তিনি আমাদের প্রত্যেক জীবস্থিত বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্ত্বা "আত্মা"। সাংখ্য বহু পুরুষ বলিয়াছেন। বাস্তবিক পুরুষ বহু নহেন। অভিমান বহু। জ্ঞাতাপুরুষ, বিজ্ঞাতাপুরুষ, শান্তপুরুষ, কর্ম্মীপুরুষ এবং বদ্ধপুরুষ। পুরুষের এই বিভিন্ন অবস্থাগুলি বুঝিয়া রাখিলে শক্তি অংশে পুরুষোত্তম বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

মহত্তত্ত্বের অংশই সর্ব্ব জীবের অন্তরস্থিত শান্তির আধার। এই মহত্তত্ত্ব বা জ্ঞান তত্ত্বকে অনন্ত ভাগে ভাগ করা যায়। (ইহাকে মোটামুটি পনের ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।) এই শক্তির বা জ্ঞানের অংশটুকুর তারতম্যেই অনন্ত প্রকার জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক জীবে সাংখ্য বর্ণিত সমস্তগুলি তত্ত্বই রহিয়াছে, (মহত্তত্ত্বও রহিয়াছে), কিন্তু মহত্তত্ত্ব সর্ব্ব জীবে সমান অংশে নাই। মহত্তত্ত্ব সর্ব্বত্রই অংশের তারতম্যে কোথাও কম কোথাও অধিক অংশে রহিয়াছে।

মহত্তত্ত্বের অংশের তারতম্যে আমাদের অন্তরের বা আত্মার যেরূপ বিকাশ হইয়া থাকে তাহা জানা প্রয়োজন। শিবের কপালে যে চন্দ্র আছে তাহা মহত্তত্ত্বের ইঙ্গিত। যে কোন দেবতার কপালে চন্দ্র দেওয়া আছে, তাহাকেই আমরা মহত্তত্ত্বের অংশ হিসাবে ভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির স্বরূপ স্থির করিতে পারি। বিশুদ্ধ অভিমানের কেন্দ্রে পূর্ণ 'জ্ঞানের' বা মহত্তত্ত্বের অর্দ্ধবিকাশ। বিশুদ্ধ অভিমানেই শিবত্বের আরম্ভ হয়। এই জন্যই শিবের কপালে অর্দ্ধচন্দ্র রহিয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্র অর্থে আট কলার চন্দ্র বা অষ্টমীর চন্দ্র।

(৭৷৷০ কলার উপরে জ্ঞানের বিকাশ হইলে জীব শিব হন)। ইহাই জীবন্মুক্তির স্তর। ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্তও অভিমান মলিন। ৭৷৷০ কলার উপরে আসিলে অভিমান আর মলিন থাকে না। আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি শিক্ষিত, আমি নেতা, আমি উচ্চশ্রেণীর, আমি শূদ্র ইত্যাদি বৃত্তি মনে যতক্ষণ উঠে ততক্ষণ আমাদের বিকাশ ৭৷৷০ কলার অন্তর্গত জানিতে হইবে। আটকলার বিকাশে আমাদের তন্মাত্র তত্ত্ব অনুভূতির শক্তি হয়। মনোময় কোষের পূর্ণ বিকাশে আমরা বিশুদ্ধ অভিমানের কেন্দ্রে আসি। সেই অভিমানই ৮ কলার বিকাশের শক্তি সম্পন্ন হইলে 'বিজ্ঞাতা' নাম ধারণ করে। এই ভাবে জ্ঞানের আরও পূর্ণতা লাভ করিয়া এই অভিমানই মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে আসিলে জ্ঞানের পনের কলা পুষ্ট হয়। তখন এই অভিমানই 'জ্ঞাতা' নাম ধারণ করে। যাঁহার অভিমান পনের কলায় আসিয়াছে তিনি প্রাচীন পণ্ডিতগণের ভাষায় 'মহৎ' নামে খ্যাত। অভিমান আট কলার বিকাশে আসিলে, 'শান্ত' নামে পরিচিত। ৭৷৷০ কলার নিম্নে অভিমান শান্ত নহে, চঞ্চল। অভিমানে ৭ কলার বিকাশ হইলে অভিমানের চিত্তকেন্দ্রে অবস্থান হয় - ইহাই বিষ্ণুকেন্দ্র। ৬ কলার বিকাশে সূর্য্যশক্তি সম্পন্ন। ৫ কলার বিকাশে গণেশ শক্তির স্বরূপ হন। ৫ কলার নিম্নে সাধারণ মানুষ। এইরূপে চার কলায় আসিলে পশু (জরায়ুজ)। তিন কলায় পাখী (অণ্ডজ)। দুই কলায় কৃমি কীট (স্বেদজ)। ঐ অভিমানই যখন এক কলার বিকাশ লইয়া অবস্থান করে তখন বৃক্ষ হয়। (স্থলচর এবং জলচর দুই দিকেই চার কলা পর্য্যন্ত বিকাশ আছে)। মন হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত এই সমস্তগুলি কেন্দ্রের নাম লইয়া পণ্ডিত সমাজে অনেক মতভেদ আছে। কেহ সবটাকেই মন নাম দিয়াছেন। কেহ সবটাকেই বুদ্ধি নাম দিয়াছেন। কেহ বা চিত্ত নামে সবগুলি কেন্দ্রের অনুভূতিকেই প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ অভিমান, জ্ঞান ইত্যাদি নামে সবগুলি কেন্দ্রকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন নামের গোলমালে ঝগড়া করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের স্বরূপকে বুঝিবার জন্য পথ ধরিয়াছি। ধীর হইয়া তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমাদের জ্ঞানসম্পদ (শাস্ত্রাদি) অনন্ত। বহু সম্প্রদায়ে সেই সব জ্ঞানের সাধনা বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে। সুতরাং এখন কিছুতেই ঐ সব নামের সাধারণ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা চলে না।

গুরু প্রণামে "বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এইরূপ একটি বাক্যাংশ আছে। এই 'বিন্দু' আমাদের বিশুদ্ধ অভিমানকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে (ইহাকে আমরা শিবের ষষ্ঠমুখ বলিয়াছি)। 'নাদ' ঐ ম্ (ং)আত্মক মহত্তত্ত্ব বা শিবের ঈশানমুখ। এখানে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। এই পনের কলা জ্ঞানের স্থূল মূর্ত্তি আমাদের ভাষার মধ্যে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং রূপে অবস্থিত। এই পনেরটি স্বর এবং বিসর্গকে (ঃ) অবলম্বন করিয়া অন্যান্য বর্ণগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। সুবিধা আসিলে এ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা অন্য কোন সময় করা হইবে।

এই 'ম'ই 'ওঁ' কারে (অ + উ + ম্ কারে) 'ম'। ইনিই শিব বলিয়া প্রণবতত্ত্বে ব্যক্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক এই নাদাত্মক (ঁ) 'ম' কার শিব নহেন। এই 'ম্' কার জ্ঞান-শক্তি (সরস্বতী)। এই জ্ঞান শক্তির আবরণে শিব অবস্থিত। তাই 'ওঁ' কারের 'ম্'

কারকেই ‘শিব’ বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক জ্ঞানশক্তির সহিত ‘শিব’ অভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত।(‘শক্তি’ অংশে এ বিষয়ে আবার আলোচনা হইবে)।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে মহদ্ ব্রহ্মের কথা আছে। এই মহত্তত্ত্ব এবং মহদ্ ব্রহ্ম একই তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মহদ্ ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের এবং সর্ব্ব জীবের উৎপত্তি স্থান। মহদ্ ব্রহ্মই সমস্ত জীবের মাতৃস্থান। এ স্থান হইতেই জীবগণ উৎপন্ন হয়। তাই এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই জীবগণের পূর্ণতার বিকাশ হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীব মুক্ত হইয়া যায়। সেই জন্যই শাস্ত্রেও বলে জ্ঞানে মুক্তি হয়।

প্রত্যেক জীবই প্রবলবেগে এই মহতের অভিমুখে ছুটিয়াছে। জীব স্তরে স্তরে মহতের কোলে আসিয়া থাকে। এই ক্রমোন্নতির সৃষ্টির ক্রমই উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ বিকাশ। এইভাবে মানুষ পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা অন্তঃকরণের বিভিন্ন শক্তির (পূর্ব্ব কথিত গণেশাদির) বিকাশে যত্নশীল হই। আন্তরশক্তির বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ‘মহত্তত্ত্ব’। আমাদের সকলের লক্ষ্য জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ। এখন দেখা যাইতেছে এই মহত্তত্ত্বে আসিবার জন্য যে সাধনা তাহারই নাম ‘ধর্ম্ম’। জীব পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে বা জীবমাত্রই পূর্ণতার দিকে ছুটিয়াছে। পূর্ণতার দিকে জীবের এই গতির নাম ‘ধর্ম্ম’। জীবকে পূর্ণতার পথে সাহায্য কর, ইহাই ‘ধর্ম্ম’। জীবকে পূর্ণতার পথে বাধা দিবার চেষ্টাই ‘অধর্ম্ম’।

মহত্তত্ত্বের অংশের তারতম্যেই সৃষ্টির মধ্যে ছোট বড় হইয়া যাইতেছে, এই কথা কয়েকবারই বলা হইয়াছে। পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বের মিলনে অনন্ত জীবের বীজ সৃষ্টি হইতেছে। (এই কথাটাই গীতাতে আছে - “মহৎ ব্রহ্ম আমার স্ত্রী স্বরূপ, এই স্ত্রীর গর্ভে আমি বীজদান করিয়া থাকি, ইহাতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।” গীতা ১৪শ অধ্যায়, ৩ শ্লোক।) এই মহত্তত্ত্বই মহৎ ব্রহ্ম। যাঁহারা সাধক তাঁহারা শিবমূর্ত্তির মূল কোথায় তাহা এখানে আসিলে বুঝিতে পারিবেন। তন্ত্র নির্দ্দিষ্ট শ্রীযন্ত্র অবলম্বন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। এই মহতের কেন্দ্রেই সাধকগণের সোমচক্র। পুরুষ এখানে সোমনাথ শিব। পুরুষের মিলনে সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টির বীজ এই মহৎ ব্রহ্মে উৎপন্ন হইয়া শিবের ষষ্ঠ মুখে বা বিশুদ্ধ অভিমান কেন্দ্রে অবস্থান করে। (আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে যদি আলোচনা করিবার সুযোগ হয় তবে আবার বলা হইবে)। শিবের ষষ্ঠ মুখটি সর্ব্বজীবের অভিমানের সমষ্টি। বীজাকারে (বা বিন্দুরূপে) সমস্ত জীব এখানে অবস্থান করে। এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে স্থূল দৃষ্টিতে যত স্থূল শরীরধারী জীব আছে, বীজশরীরে তাহার চেয়ে অনেক বেশী জীব আছে। স্থূল শরীরধারী জীব অপেক্ষা সূক্ষ্ম শরীরধারী জীবের সংখ্যাও অধিক। এই মহত্তত্ত্বের এক কলার শক্তি লইয়া যে সব জীবের বীজ শিবের ৬ষ্ঠ মুখে (বা অভিমানজগতে) অবস্থিত আছে, তাহারাই স্থূল জগতে (পৃথিবীতে) বৃক্ষাদি রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে দুই কলার মহত্তত্ত্বের শক্তিসম্পন্ন বীজ কৃমিকীট হইয়া স্থূল জগতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিন কলার শক্তি সম্পন্ন বীজগুলি অণ্ডজরূপে স্থূল জগতে আসিয়া থাকে। ঐ মহত্তত্ত্বের চার কলার শক্তি

সম্পন্ন বীজগুলিই স্থূল জগতে জরায়ুজ রূপে আবির্ভূত হয়। চার কলার বেশী শক্তিসম্পন্ন বীজগুলি মানুষের আকারে জগতে জন্মগ্রহণ করে।

এখানে অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন, এই যে বীজজগৎ ইহা কত দূরে আছে? কতদূরে বা কত নিকটে তাহা বলা যায় না। তবে ইহার সঙ্গে আমাদের অভিমান সংযুক্ত আছে। অভিমানের কেন্দ্রে আসিলে এই জগতের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ হইয়া থাকে। এইরূপে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সূক্ষ্মজগৎ বা দৈবজগৎ সম্বন্ধ রাখে। স্থূল জগতের পর আরও একটা সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব আমরা একটু বিচার করিয়াই বুঝিতে পারি। জীবের বীজাবস্থা নিশ্চয়ই আছে। বীজাবস্থা না থাকিলে একটা রজঃকণা এবং একটা বীর্য্যকণার মধ্যে জীব আবদ্ধ হইতে পারিত না। অনেকের ধারণা রজঃ এবং বীর্য্যের সংযোগেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ধারণা ভূল। রজঃ এবং বীর্য্যের সংযোগস্থলে জীবাত্মা স্থূলশরীরের সহিত বদ্ধ হয় মাত্র। সম্ভোগে নিযুক্ত স্ত্রী পুরুষের অভিমান দুইটি একই আনন্দে কেন্দ্রস্থ হয়। সেই সময় তাহাদের অভিমানের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া বীজজগৎ হইতে বীজ আকর্ষিত হইয়া রজঃ এবং বীর্য্যে বদ্ধ হইয়া থাকে। বহু আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। তাহারা সম্ভোগ রত স্ত্রী-পুরুষ মিলন সুখে আকৃষ্ট হয়। সেই মিলনবৃত্তে কেন্দ্রস্থ হইয়া বীজরূপ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীরধারী আত্মাও অভিমানের আকর্ষণেই বীজাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের শিব অংশের এই সব কথা লইয়া তর্ক করা উচিত হইবে না। যাহা প্রকৃত সত্য তাহা বলা হইল। ইহাতে যদি কাহারও বিচারে কিছু সাহায্য করে, তবেই সুখের কারণ হইবে। এখানে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বলা হইল না। যাঁহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারা এই বই পড়িয়া হয় তো সুখী হইতে পারিবেন না। তাঁহারা নিজেদের স্বাধীন মতে চলুন। একদিন জানিতে পারিবেন।

যে কোন বস্তুর স্থূলাবস্থা মানিলে, তাহার বীজাবস্থাও মানিতে হয়। কার্য্যাবস্থা কারণ অবস্থারই স্থূলরূপ। ইহা লইয়া আর বেশী আলোচনার ইচ্ছা নাই।

একটি ঘাস মহত্তত্ত্বের এক কলার শক্তি (বা তাহারই অংশশক্তি) সম্পন্ন বীজেরই স্থূলমূর্ত্তি। সেই ঘাসটীও ধীরে ধীরে জন্ম জন্মান্তরে মহত্তত্ত্বের দিকে ছুটিতে থাকিবে। সেই ঘাসটি ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে। পরে সে কৃমি কীট, পাখী, পশু হইয়া তাহার পর মানুষের আকারে ধরাধামে আসিবে। যতদিন সে মহত্তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না ততদিন তাহার বিশ্রাম নাই। বীজ জগতে যে বীজটি যেমন শক্তি সম্পন্ন স্থূল জগতে তাহার প্রথম আরম্ভ সেই কলার জীবে হইবে। কিন্তু সকলেরই শেষ বিকাশ মহত্তত্ত্বে। বৃক্ষ হইতে পশু পর্য্যন্ত মহত্তত্ত্বের চার কলার বিকাশ। মানুষে ইহার উপর আরও চার কলার বিকাশ স্বাভাবিক। ইহারাই গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুস্বভাব সম্পন্ন মানুষ। ইচ্ছা করিলে যে কোন মানুষ খুব সহজে উক্ত চার কলার বিকাশ করিতে পারে। অথবা মানুষের স্তরের জীবগণে স্বভাবতঃই ৪৷৹ কলা হইতে আট কলা পর্য্যন্ত বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৫ কলায় গণেশ, ৬ কলায় সূর্য্য, ৭ কলায় বিষ্ণু এবং ৮ কলায় শিব। এই অষ্টম কলার বিকাশ হইলে মানুষে জীবত্বের অভিমান থাকে না। অভাবের তাড়নাও থাকে না। মন যাহাদের অপুষ্ট তাহারাই অভাবের চিন্তায় জর্জ্জরিত। তাহাদের লক্ষ থাকিলেও তৃষ্ণা যায় না। মন যাঁহাদের আট কলায় আসিয়াছে,

তাঁহারা জীবত্বের দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রে এবং লোকমুখে যে বড় বড় সাধু, যোগী ও মহাপুরুষের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, নির্জ্জনস্থানে অবস্থান করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাঁহারা সকলেই আট কলা হইতে এই পনের কলার বা মহত্তত্ত্বের বিকাশের চেষ্টাতে নিযুক্ত থাকেন। সাধুগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় কৈলাস, মানস সরোবর এবং ধবলগিরিতে এইরূপ সন্ন্যাসী আছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। এ সব লইয়া আমরা আর আলোচনা করিতে চাহি না। চিন্তাশীলগণের চিন্তার সুবিধার জন্য এই পর্য্যন্তই রহিল।

শিবত্বের (বা ধর্ম্মের) পূর্ণ বিকাশ মহত্তত্ত্বে হয়। অভিমান (জীবত্বের অভিমান) ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার আরম্ভ জানিতে হইবে। জীবত্বের অভিমানই সর্ব্ববিধ ভেদ এবং অশান্তির কারণ। অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্ববিধ আসুরিকসম্পদ জীবিত থাকে।

এই স্তরের মানব চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধার জন্য "মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয়" চিত্র নামক একখানা চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ ইহার পরিচয় অংশ পাঠ করিয়া লইবেন।

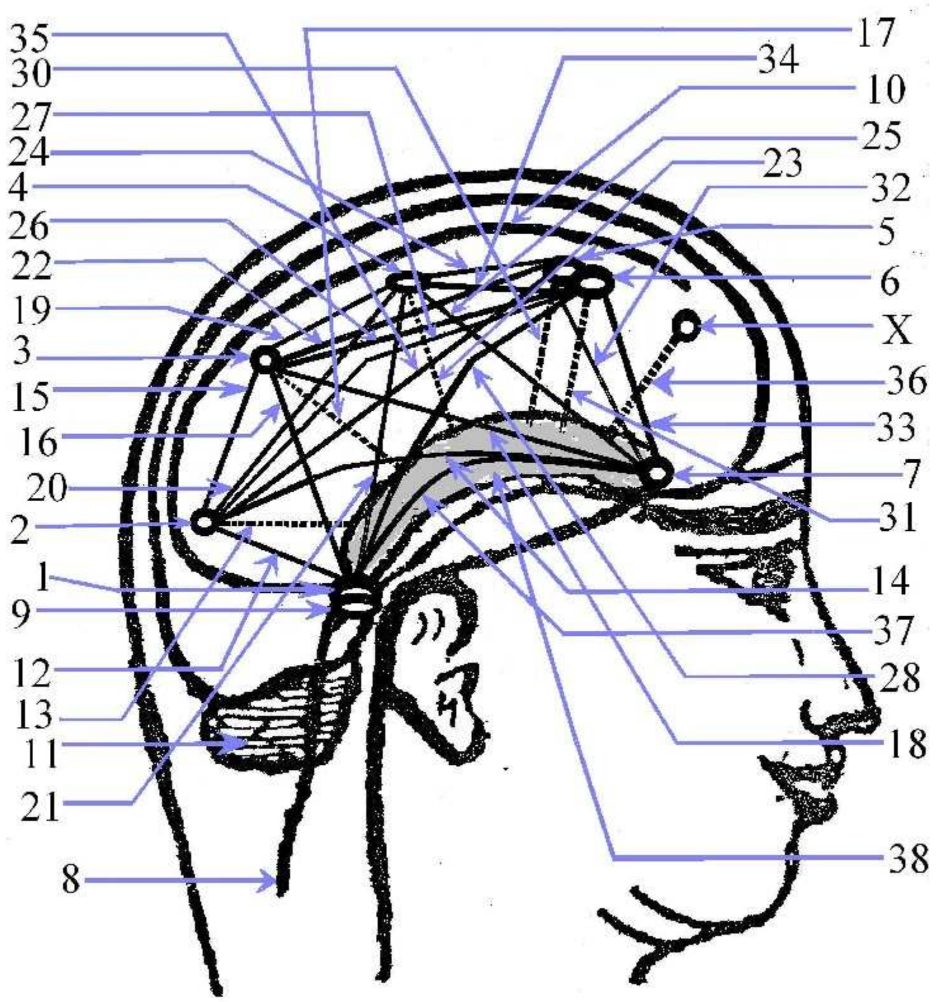

মস্তিষ্ক চিত্র পরিচয়

এই চিত্রে সহস্রারের গর্ভাংশ এবং আজ্ঞাংশ সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। মস্তিষ্কের নিম্নাংশ 'আজ্ঞা' এবং উপরের অংশ সহস্রার। মধ্যাংশই গর্ভাংশ। ইহার মধ্যে ১, ৯ এবং ৭ চিহ্নিত কেন্দ্র লইয়া আজ্ঞাংশ জানিতে হইবে। ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ১০ চিহ্নিত কেন্দ্র সহস্রারের গর্ভাংশের অন্তর্গত জানিতে হইবে। এই গর্ভাংশের উপরে দুইটি রেখা দ্বারা সহস্রার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১ - ইহা মনের কেন্দ্র। পুরাণাদিতে ব্রহ্মা বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা তন্ত্রের দৃষ্টিতে মনকেই জানিতে হইবে।

২ - ইহা সূর্য্যকেন্দ্র। ইহা আমাদের অন্তঃকরণস্থিত ভালবাসা, অনুসন্ধিৎসা এবং শিক্ষার কেন্দ্র। এখানে স্মৃতির সহিত সংযুক্ত ঘটনার অংশ বিদ্যমান থাকে। ইহা ছয় কলার বিকাশস্থল।

৩ - ইহা বিষ্ণুকেন্দ্র। ইহাকে চিত্তকেন্দ্রও বলা যায়। এখানে স্পর্শজনিত সুখ বা দুঃখস্মৃতি অবস্থান করে। ২ এবং ৩ কেন্দ্র স্বপ্নাবস্থারই অন্তর্গত। ইহা সাত কলার বিকাশ স্থান।

৪ - ইহা শিব কেন্দ্র। শান্তিই ইহার স্বরূপ। সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনাদিতে স্বভাবতঃই এই কেন্দ্রটি পুষ্ট হয়। ইহা যোগের কেন্দ্র। সুষুপ্তিতে মানুষ এই কেন্দ্রে স্থিত হয়। ইহা আট কলার বিকাশস্থল।

৫ - ইহা মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র। এখানে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। ইহাকে আমরা শিবের ঈশানমুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এখানে পনের কলা জ্ঞানের বিকাশ।

৬ - অব্যক্তের কেন্দ্র। শক্তি অংশে এ সম্বন্ধে বলা হইবে।

৭ - ইহা গণেশকেন্দ্র। ইহাই বুদ্ধিস্থান। যোগশাস্ত্রে ইহাই ভ্রূমধ্যস্থান।

৮ - ইহা মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্নাপথ। ইহার এক অংশ ৯ চিহ্নিত কেন্দ্রে (প্রাণ কেন্দ্রে) যুক্ত আছে; অন্য কেন্দ্র মেরুদণ্ডের অস্থিশ্রেণীর মধ্য পথ ধরিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শক্তি অংশে করিবার ইচ্ছা আছে। মেরুদণ্ড মধ্যপথে বহু নাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়।

৯ - ইহা প্রাণকেন্দ্র। প্রাণময় কোষ অংশে ইহার কথা বলা হইয়াছে। ইহার শাখা প্রশাখাগুলিও মেরুদণ্ডের ছিদ্রপথকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত শরীরের পেশীতে সংযুক্ত হইয়াছে।

১০ - ইহা শক্তিরেখা। শক্তি অংশে ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইবে।

মনোময় কোষ ১, ২, ৩, ৪ এবং ৭ চিহ্নিত কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। বিজ্ঞানময় কোষটি ৭, ৫, ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত জানিতে হইবে। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে ৭ এবং ৫ চিহ্নিত কেন্দ্র জানিতে হইবে। অব্যক্ত বিকাশ ৫ এবং ৬ চিহ্নিত কেন্দ্রে অবস্থিত।

শিব স্তরের মানুষ সম্বন্ধে এখন আলোচনা হইবে। ইহাদিগকে ঠিক বিপরীত দুই প্রকারে পাওয়া যায়, এক জ্ঞানী এবং অন্য 'অজ্ঞানী'। এ স্তরের মানবের সাধারণ লক্ষণ সরলতা সত্যবাদিতা এবং শান্তি। (বর্ত্তমান সময় শিক্ষা এবং সঙ্গদোষে বহুস্থলে ইহারা

মিথ্যা শিখিয়াছে)। এ স্তরের মানুষ বেশি বুদ্ধি চালনা করিতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ বুদ্ধি চালনার সামর্থ্য অল্প ততক্ষণ তাহাদিগকে শিবের স্তরের মানুষ বলিয়া জানিতে হইবে। আবার মানুষ যখন বহুজন্ম কর্ম্ম করিয়া শ্রান্ত হইয়া, সাধনা বা যোগাভ্যাস দ্বারা আপনার অন্তঃকরণকে একেবারে প্রশান্ত করিয়া ফেলেন সেই অবস্থার মানবকেও শিবের স্তরের মানুষ বলিয়া জানিতে হইবে। সাধনার মধ্য দিয়া মানুষ যখন প্রথম প্রথম শিবের স্তরের সন্ধান পান, তখন তাঁহারা অশান্তির বেগ সহ্য করিতে পারেন না। বাহিরের জগতের গোলমালের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার শক্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে থাকে না। অনেকে সেই সময় এত দুর্ব্বল হইয়া যান যে, অশান্তির কারণ ঘটাইলে সহজে ক্রুদ্ধ হইয়া যান। দেখিতে প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখমণ্ডল। যেন কোন্ যুগেই পৃথিবীকে ভুলিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁহার আর প্রিয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিদ্রাকালে আমরা আমাদের অন্তঃকরণের যে কেন্দ্রের সহিত যুক্ত থাকি জাগ্রতে উহার সহিত সংযোগ চেষ্টাই ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। নিদ্রা যাঁহার পাকে নাই এমন লোককে জাগাইলে তিনি যেমন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যান, ঠিক সেইরূপ অন্তরে যাঁহার ধর্ম্মকেন্দ্র পুষ্ট হইয়া চলিয়াছে, তাঁহাকেও শান্তির বিঘ্ন করিলে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্যই এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। শীঘ্রই তিনি নিজের অন্তরকে শক্ত করিয়া ফেলেন। তারপর যাঁহাদের কর্ম্মের বেগ আছে, তাঁহারা স্বভাবতঃই কর্ম্মে নামিয়া পড়েন। আর যাঁহারা ব্রহ্মকোটির মহাপুরুষ তাঁহারা শান্তির আরও গভীর স্তরে চলিয়া আসেন। যতদিন শরীর থাকে ততদিন তাঁহারা সেই অবস্থায়ই অবস্থান করেন। এ স্তরের মানুষ খুবই নিশ্চিন্ত। ইঁহারা আজ আহার করিয়া কালকের ভাবনা করেন না।

মুটে, মজুর, ভৃত্য, মেষপালক, পশুপালক, গাড়োয়ান, চাপ্রাসী, বেহারা, পেয়াদা, সেবক, ঝাড়ুদার, মেথর, রাঁধুনি, পূজারী, ভিক্ষুক, জন্মগত অলস, উচ্চলক্ষ্যহীন মানুষ, ইঁহারা শিবের স্তরের মানুষ। ইঁহাদের স্বাধীন চিন্তা নাই। বিচার শক্তিও কম। ইঁহাদিগকে সহজেই মনুষ্যত্বহীন করিয়া দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লওয়া যায়। বুদ্ধির জড়ত্ব এ স্তরে লোকের খুব বেশী। শান্তিভাব এ স্তরের লোকের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। শান্তির বিঘ্ন সহ্য করিতে পারেন না। আবার প্রয়োজন ইঁহাদের এতই কম যে সহজে শান্তির বিঘ্নও হয় না। ইঁহারা অন্যের জন্য ভাবিতে পারেন না। এক তরফা বুদ্ধির বিকাশ। অন্যের প্রয়োজনটা অনুভব করিয়া তাহার জন্য ভাবিবার শক্তি ইঁহাদের কম। নিজের স্বভাবটুকুর উপর নির্ভর করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমানকে দেখিয়া ভবিষ্যতের ধারণা ইঁহারা করিতে পারেন না। এ স্তরের লোক স্বাধীনভাবে সংগঠন করিতে পারেন না, অথচ স্বভাবতঃই সংগঠিত। এ স্তরের মানুষ শিক্ষিত হইলেও বিচারে স্বাধীন হইতে পারেন না। ইঁহারা অন্যের নিকট শোনা কথাকে ভিত্তি করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন। বহুদূর পর্যন্ত ভাবিবার শক্তি নাই। ইঁহাদিগকে সহজে যে কোন দলে টানিয়া লওয়া যায়। ইঁহারা অন্যের বিচারকে খুব প্রকাণ্ড একটা শক্তি বলিয়া মনে করেন। যে বেশী জোরে তর্ক করিতে পারে, তাহাকেই ইঁহারা খুব বড় লোক মনে করেন। যাহার সঙ্গ বেশী করেন, তাহাকেই বেশী বুদ্ধিমান এবং শক্তিমান মনে করেন। অপমানবোধ খুবই কম। ইঁহাদের জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব এই যে ইঁহারা অকপটে প্রভুভক্ত হন। প্রভুভক্তির বলে ইঁহাদের বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তির অদ্ভুত উন্নতি হইয়া থাকে। নিজেদের স্বাধীন বিচারশক্তি

না থাকিলেও প্রভুর উপর একনিষ্ঠ ভক্তির বলে প্রভুর বিচারশক্তি ইঁহাদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই বিচারের বলে ইঁহারা খুব সহজে বিশেষ কঠিন কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এ স্তরের মানুষ দ্বারা যত অসাধ্য সাধন করান যায় এমন আর কাহারও দ্বারা হয় না।

অনেকে ইঁহাদিগকে বিদ্বেষবুদ্ধি প্রদান করিয়া দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাতে সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। মানুষ আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবে, ইহাই হইল চিরন্তন নিয়ম। সেই পথে আনুকূল্যলাভের সুবিধার জন্য রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও শিক্ষাশক্তির উদ্ভব হইয়াছে। এখন একদিকে ভাঙ্গিতে যাইয়া অন্যদিকে যে বিষ উৎপন্ন হইতেছে ইহার প্রতিকার কি ভাবে হইবে? যে অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য কোমর বাঁধিবে, সে নিজের অন্যায়ের উপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখিবে। বিদ্বেষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত করিতে হইবে। সে অন্যায় আমিও করিতে পারি, আমার শত্রুও করিতে পারে। আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য মিথ্যা, ছলনা সাময়িকভাবে কূটনীতি হিসাবে প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু একটা সংগঠন যদি নিজের মধ্যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করিয়া তাহারই পুষ্টির চেষ্টাতে নিযুক্ত হয় তবে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া যখন আরম্ভ হইবে তখন সমাজের যে দুর্দ্দশা আরম্ভ হইবে, ইহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

শারীরিক এবং মানসিক শক্তির ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে সর্ব্বপ্রথম। বিদ্বেষকে অবলম্বন করিয়া কোন যুগেই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রথম অন্যায়কে ঘৃণা করিব, পরে অন্যায়কারীকেও ঘৃণা করিবার প্রয়োজন হইলে ঘৃণা করিব। প্রথম নিজে দেবতার মত উজ্জ্বল হইব, পরে বা সঙ্গে সঙ্গে আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গণেশশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়াই মানুষের আত্মবিকাশ হইয়া থাকে। ত্যাগ, সত্য এবং অন্যায়ের উপর চিরবিরোধিতা, ইহারাই হইল গণেশশক্তির বিশেষত্ব। যে নিজে আপন কর্ত্তব্য একদিনও বিবেকের নির্দ্দেশে সম্পন্ন করে নাই, সে কি করিয়া অন্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার করিতে পারে? যিনি যে কোন ক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন সকলের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ "মানুষমাত্রকে গণেশের পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য করুন।" ব্যক্তিগতভাবে হউক, সংগঠিতভাবে হউক, বা সামাজিকভাবেই হউক মানুষ মাত্রেরই লক্ষ্য গণেশ। মানুষ শিবের স্তরে থাকুন. সূর্য্যস্তরে থাকুন, বা বিষ্ণুস্তরে থাকুন, সকলের সঙ্গে গণেশকে যোগ করিয়া দিবার চেষ্টা করুন। বাল্যকাল অবধি মানুষের বিচারশক্তির মধ্যে গণেশ দেবতার প্রতিষ্ঠা যাহাতে হয় তাহারই চেষ্টা করুন। বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্মীমাত্রেরই ইহা কর্ম্ম হওয়া উচিত।

যাঁহারা মজুর সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, ভারত কৃষকপ্রধান দেশ, এখানে মজুরের সংখ্যা খুব কম। তাঁহারা যেন ভুল না করেন। ইহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইতেছে, এবং হইবে। দায়িত্বজ্ঞান যাহাতে জাগ্রত থাকে সেই দিকে পূর্ণ নজর রাখিয়া মানুষকে উন্নতির পথে সাহায্য করুন। আইনে কানুনে দুইটা চারিটা সুবিধা দেখাইয়া পত্রিকায় নাম উঠিতে পারে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে কোন পরিবর্ত্তনই আসিবে না। যে নিজের কাছে দায়িত্বশীল নহে, কর্ত্তব্যশীল নহে, বা সত্যপরায়ণও নহে, তাহার উন্নতির পথে সে দৃঢ় কখনও থাকিতে

পারিবে না। প্রথম মনুষ্যত্বের বিকাশকে জাগ্রত করিতে হইবে। পরে অন্য কথা। মানুষ যে কোন অবস্থায়ই বাঁচিয়া আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করা যায়। এতো মজুরদের কথা। কৃষকদের কথা আরও সমস্যাপূর্ণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি কৃষিকর্ম্ম বিষ্ণুশক্তির কর্ম্মবিকাশ। কৃষিকর্ম্ম বিষ্ণুশক্তির বিকাশ হইলেও বুদ্ধির প্রখরতায় ভারতের কৃষকগণ শিবের স্তরের মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। বিষ্ণুশক্তির বিশেষত্বই এই যে সর্ব্বদাই স্বার্থের পিছনে পিছনে চলে। মজুরদের সহিষ্ণুতা হইতে ইহাদের সহিষ্ণুতাও কম। ইহারা যে কোন মুহূর্ত্তে স্বার্থের সুবিধার জন্য দেশের, সমাজের এবং মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। কর্ম্মিগণকে আমাদের বিশেষ নিবেদন, গণেশের পথে যে পা ফেলিতে বা বিচার করিতে অক্ষম তাহার জন্য একবিন্দু শক্তিক্ষয় করিবার এখনও প্রয়োজন নাই। বিদ্বেষকে ডাকিয়া আনিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করিবেন না। মানুষ নিজেই নিজের উন্নতি করিবে। যতদিন তাহার নিজের মধ্যে সেই বিকাশ আসে নাই ততদিন তাহার মধ্যে শুধু সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যই চেষ্টা করুন। একদিন দেখিতে পাইবেন, দেশের, দশের, সমাজের এবং ধর্ম্মের, সর্ব্ববিষয়ের একমাত্র বন্ধু গণেশই দাঁড়াইয়া আছেন। আর সকলেই স্বার্থের দোকানদার মাত্র। মানুষ ভাবিলে সবকিছুই করিতে পারে। যাহার মনুষ্যত্বই জাগ্রত হয় নাই, যে নিজের অধিকারই বুঝে না, লক্ষ্য জানে না, সে দেশের বা সমাজের কি করিবে? প্রথম মানুষ ভালবাসিতে শিখুক। দেশকে, সমাজকে, আত্মাকে ভালবাসিলে তাহার পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব হইবে। সাবধান, বিদ্বেষ কখনও অবলম্বন যেন না হয়। ব্রাহ্মণকে সভায় দাঁড়াইয়া দশটা গালি দিলেই সমাজসংস্কার হইবে না। জমিদারীটা কাড়িয়া প্রজার* হাতে দিলেও প্রজার সুখ বৃদ্ধি হইবে না। যাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আসিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে দুইটা শাস্ত্রের বচন বা দুই তিনটা আইনের নাগপাশের বাঁধনে আটকানো যায় না। যে সজীব মানুষ সে বুদ্ধির কৌশলে এবং কর্ম্মের কৌশলে সবকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে। কর্ম্মিগণ জানিয়া রাখিবেন, যখন সময় আসিবে তখন ঐ শাস্ত্রের বচন আর ঐ আইন কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু সমাজের মধ্যে স্বার্থ এবং বিদ্বেষের বীজ যদি দেওয়া হয়, তবে সেই স্বার্থ এবং সেই বিদ্বেষই "উল্টা সম্‌ঝিলি রাম" হইয়া দাঁড়াইবে। সেই বিদ্বেষকে অবলম্বন করিয়া বিপক্ষ তাহাদিগকে একদিন দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়া দিবার রাস্তা পাইবে। অন্যায় কাহাকে বলে তাহা মানুষ কর্ম্মে এবং জ্ঞানে প্রথমে জানুক, পরে যেখানে অন্যায় আসিবে সেইখানেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারিবে। মানুষের আত্মবিকাশে বাধা দিবার নীতিই অন্যায়। সজীব মানুষ, সজীব সমাজ এবং সজীব ধর্ম্ম গড়িয়া উঠুক ইহাই অন্তরের ইচ্ছা। সত্যি যদি বিদ্বেষ ভিন্ন কোন সংগঠন গড়িয়া উঠিবে না বলিয়া কর্ম্মিগণের ধারণা থাকে তবে একথা স্পষ্ট বলা প্রয়োজন এখনও সংগঠনের সময় আসে নাই। কর্ম্মিগণও যদি বিদ্বেষ ভিন্ন অন্য কিছু ভিত্তি প্রচারের জন্য না পাইয়া থাকেন তবে এই কথাই বলা প্রয়োজন যে কর্ম্মী এখনও ভারতে আসেন নাই, ভারতকে এখনও অপেক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই নিন্দুক এবং বিদ্বেষীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। একটা জাতির জাগরণের সন্ধিক্ষণে এই লক্ষণ বড়ই বিপজ্জনক বলিতে

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের "রাজার" স্থলে "প্রজার" শব্দটি গৃহীত হল।

হইবে। যে নিজে সত্যাশ্রয়ী নহে তাহার অন্যের সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার কি অধিকার আছে? নিন্দা একটি সামাজিক অস্ত্র। ইহার দ্বারা সমাজের বিশেষ সংশোধন হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিন্দুক এবং অন্যায় দুইই বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। চালুনী যদি সূচের ছিদ্রের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করে তবে ইহার ফল কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা কয়েকটি মানুষ দেখিতে চাই, যাঁহারা কর্ম্মে, বিচারে এবং চরিত্রে নির্ম্মল। যাহারা অন্যায় করে তাহারা নিশ্চয়ই দোষী, কিন্তু যাহারা নিজেদের দোষ না দেখিয়া অন্যের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় তাহারা আরও ঘৃণিত। যদি এইরূপ লোকই দেশ, সমাজ এবং ধর্ম্মের কর্ণধার হয়, তবে দেশের মঙ্গল কোথায়?

যাহা হউক শিবস্তরের মানুষের কথা বলিতে ছিলাম। শিবস্তরের মানুষ সব সময়ই বিষ্ণুস্তরের মানুষের অধীন হইয়া থাকেন। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুস্তরের মানবগণ ইঁহাদের সংগঠিত শক্তিকে হাতে পাইয়া জগতে অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। কৃষকগণকেও যদি দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানব সংগঠন করিয়া লইতে পারেন তবে বিশেষ উপকার হয়। এখানে আরও বলা প্রয়োজন, সংগঠন কখনও পত্রিকার মধ্য দিয়া হয় না। সংগঠন সব সময়ই প্রত্যক্ষে করিতে হয়। শিবস্তরের মানুষ সবদিনই বিষ্ণুকেন্দ্রের শক্তিসম্পন্ন মানবগণের অধীন থাকিয়া সুখী হন বা থাকিতে বাধ্য হন। যাহাদের বুদ্ধির গভীরতা কম তাহাদিগকে স্বার্থ এবং বিদ্বেষ শিক্ষা দিলে, সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। বিষ্ণু-অধ্যায়ে বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক ভাগ দৈবীসম্পদ সম্পন্ন বিষ্ণুশক্তি। তাঁহারাই প্রকৃত বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ। আসুরিক সম্পদসম্পন্নগণও বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট বলা যায়। তবে তাহারা কেবল ভোগ এবং অত্যাচার করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের শেষ পরিণাম ধ্বংস। তবে তাহাদের অস্তিত্ব ততদিন লুপ্ত করা সহজ নহে যতদিন সমাজে শক্তিস্তরের বিকাশ লইয়া কেহ জন্ম গ্রহণ না করিতেছেন, অথবা সমাজ সেই স্তরের আদর্শ মানিয়া না লইতেছে।

সমাজের পরিচালকগণ যখন আত্মবিকাশের পথকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের নামে ভোগ এবং ছলনার মধ্য দিয়া একদল মানুষকে বিকাশে বাধা দিতে আরম্ভ করে তখনই আসুরিকশক্তিসম্পন্ন রাজশক্তি দেশের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। সমাজ এবং ধর্ম্ম চিরদিন মানুষকে আত্মবিকাশের পথে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। মানুষ সেই কথা ভুলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি তাহা ভুলেন না। মানুষ সেই শক্তিটি ভোগের দিকে ফিরাইয়া দিলেও প্রকৃতি তাহা সহ্য করেন না। তিনি ধীরে ধীরে আসুরিকভাবসম্পন্ন মানুষকে, সেই দুর্জ্জনসমাজকে, শাসন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। যতক্ষণ সমাজ আত্মবিকাশের ভিত্তির উপর নিজের ভিত্তি স্থাপন করিবে না, ততক্ষণ সমাজ যতই আস্ফালন দেখাক না কেন আসুরিকশক্তির নিকট তাহার মূল্য কিছুই নাই। আসুরিক বিকাশ যদি প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ না হইত তবে মানুষ কিছুতেই সাত কলার উপরে আত্মবিকাশ করিতে পারিত না। আসুরিক বিকাশই সমাজের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলিয়া দিবার একমাত্র প্রাকৃতিক অস্ত্র। মানুষ চায় ভোগ করিতে, কিন্তু প্রকৃতি চায় বিকাশ করিতে। এক বিরাট প্রকৃতি আমাদের চক্ষের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া এই জগৎটা নিয়মিত করিয়া চলিয়াছেন। নিজের অন্তরস্থিত দৈবী-সম্পদের সহিত পরিচয় লাভ করিলে সহজে সবই বুঝা যাইবে। সেই প্রকৃতি মানুষের বিকাশই চান। মানুষ

প্রকৃতির ইঙ্গিত সহজে বুঝিতে পারে না। ভুলে মানুষ চায় ভোগ করিতে, যুগযুগান্তর বাঁচিয়া থাকিতে এবং অন্যকে ঠকাইতে। প্রকৃতি জানেন, মানুষের বিকাশ সেই জন্য হয় নাই। তাই মানুষকে নিত্য নূতন বিপদে ফেলিতে আরম্ভ করেন। বিপদের পর বিপদেও মানুষের চৈতন্য হয় না। মানুষও এত মনুষ্যত্বহীন হইয়া যায় যে শেষকালে মনুষ্যত্বের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ ত্যাগ করিয়া শুধুই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তবু আত্মবিকাশ চাহে না। প্রকৃতি শেষকালে মানুষের সেই বাঁচিবার মোহটুকুও কাটাইবার পন্থা আবিষ্কার করিয়া তাহা অসুরের হাতে তুলিয়া দেন। অসুরও সেই শক্তিটুকুর ব্যবহার করিয়া বা নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া মানুষের আত্মবিকাশের পথে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় যাত্রা করিবার উৎসাহ জাগ্রত করিয়া দেন। মানুষ তখন বুঝিতে পারে মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য বাঁচিবার প্রয়োজন। মনুষ্যত্বহীন হইয়া মানুষের জীবনের কোনই মূল্য নাই। এদিকে অসুরের প্রয়োজনও শেষ হইয়া আসিতে থাকে, শীঘ্রই অসুর ধ্বংস হইয়া জগতে প্রাকৃতিক বিক্ষোভ [প্রশমিত হইয়া]* শান্তি স্থাপিত হয়। আসুরিক বিকাশ এমনই চতুর বিকাশ যে সে কিছুতেই নিজের ভোগকে ছাড়িবে না। যতক্ষণ ইহাদের সঙ্গে সমাজ সন্ধির কথা ভাবিয়া নিজেদের বাঁচিবার পথ খুঁজিবে ততদিন ইহারা আনন্দে ভোগ করিবে। একবিন্দু দুর্ব্বলতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া অসুরের প্রভুত্ব ধ্বংস করা যায় না। আসুরিক বিকাশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান বিকাশ। বিষ্ণুস্তরের পূর্ণবিকাশ ইহাদের আছে। যাঁহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন তাঁহারা গীতা, মহাভারত এবং চণ্ডী পাঠ করুন। অথবা যে কোন অত্যাচারী রাজশক্তির পরিণাম চিন্তা করুন।

যাহা হউক বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট তৃতীয়লক্ষণসম্পন্ন মানুষ সম্বন্ধে এখানে বলিবার রহিয়াছে। সকলেরই জানা প্রয়োজন শিবের স্তর হইতেই মানুষের প্রথম বিকাশ আরম্ভ হয়। শিব হইতে আরম্ভ আবার শিবে যাইয়াই সমাপ্তি। শিবস্তরের মানবই প্রথমে ধরাধামে আগমন করেন (ক্রমে এ সম্বন্ধে আরও বলা হইবে)। আবার শিবের স্তরের পুষ্টি হইলেই মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করেন। শিবই মানবমাত্রেরই পিতা জানিতে হইবে। শিবের স্তরের বিকাশই জগতে আদিবিকাশ। ইহার পর গণেশ স্তরের বিকাশ আরম্ভ হয়। এই জন্যই মানুষকে গণেশের পথে পরিচালনা করিতে হয়। সত্য, ত্যাগ এবং বীরত্ব গণেশ কেন্দ্রের বিশেষত্ব। ভোগ, বিদ্বেষ, অসত্য ও ছলনা যদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে গণেশের কেন্দ্র পুষ্ট না হইয়া বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট হইতে থাকে। গণেশের মধ্য দিয়া না আসিলে বিষ্ণুকেন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হইতে থাকে। বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ জন্মাবধি কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হন। কিন্তু গণেশের শক্তি ত্যাগ করিয়া মানুষকে অসত্য, বিদ্বেষ, ছলনার মধ্য দিয়া পরিচালনা করিলে মানুষে অস্বাভাবিকভাবে বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট হইতে থাকে। ইহাতে সমাজের ভীষণ ক্ষতি হইয়া থাকে। এসব মানুষ খোসামুদে, নির্লজ্জ, স্বার্থপর, চাটুকার বা চোর হইয়া সমাজের ভীষণ ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহারা দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষের কুপরামর্শদাতা বা সর্ব্বনাশকর্ত্তা হয়, অথবা আসুরিকসম্পদসম্পন্ন মানষের হাতের পুতুল হইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে। ইহারা অস্বাভাবিকভাবে বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট হওয়ায় দায়িত্ববুদ্ধিহীন এবং নির্লজ্জ হয়। তাই কর্ম্মীমাত্রকেই এখানে

* প্রকাশকের নিবেদন - [...] অংশটুকু পূর্ণতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। যাহারা এরূপ অন্যায়ভাবে বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট হয়, তাহাদের আত্মবিকাশেও এক ভীষণ কণ্টক প্রস্তুত হইয়া যায়। কারণ তাহাদিগকে আবার গণেশের মধ্য দিয়াই পথ করিতে হয়। তাহা ভিন্ন উন্নত বিকাশ সম্ভব হয় না। কুগুরুর সঙ্গে পড়িয়া তাহারা যাহা শিক্ষা করে, তাহা তাহারা বহুদিনের চেষ্টায় ভুলিবার শক্তি লাভ করে। সেই ভুল শেষ হইলে, তবে তাহাদের আবার উন্নত বিকাশ গণেশের মধ্য দিয়াই করিতে হয়। অস্বাভাবিকভাবে বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট হইলে মানুষ কেবল সমাজেরই ক্ষতি করে না, নিজেরও আত্মবিকাশে বাধার কারণ হইয়া থাকে।

যাঁহারা দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রের বিকাশস্থল হন, তাঁহারা শিবের স্তরের জ্ঞানীদিগের অনুগত হন। আবার যাঁহারা শিবস্তরের সাধারণ মানুষ তাঁহারাও দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট মানুষের অধীন থাকিয়া সুখী হন। বাস্তবিক শিবস্তরের জ্ঞানিগণই দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানবগণকে শক্তিস্তরের আদর্শে গড়িয়া দেন। শিবের স্তর এবং বিষ্ণু স্তরের মানুষের স্বভাবের এই সুন্দর বিনিময় সত্যই ভাবিবার বিষয়। মধ্যযুগে ভারত তপঃশক্তিহীন হইয়া গিয়াই ভারতের এত অধঃপতন হইয়াছে। তপঃশক্তির তত্ত্বাবধানতার অভাবে ক্ষাত্র শক্তি স্বেচ্ছাচারী বা ভ্রান্তিচালিত হইয়া ছিলেন। যোগী তপস্বিগণের চিন্তা দ্বারাও সমাজের নূতন জীবন ফুটিয়া উঠিতে পারে। ভোগ, মোহ এবং অভিমানহীন না হইলে যোগশক্তি লাভ হয় না। ভোগ, মোহ ও অভিমানবদ্ধ চিন্তাদ্বারা বিশেষ কাজ হয় না।

যাহারা বিষ্ণুকেন্দ্রের আসুরিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাহারাও শিবের স্তরের মানুষকে অধীনে রাখিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখে। ইহাদের প্রধান সহায় গণেশ কেন্দ্রপুষ্টিহীন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ। তাই তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে এমন নীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসে যাহাতে গণেশ কেন্দ্রপুষ্টিহীন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ বেশী প্রস্তুত হয়। এই সব নির্লজ্জ এবং স্বার্থপর মানুষ না থাকিলে বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট আসুরিক শক্তি অসহায় হইয়া যায়। ইহারা শিবস্তরের সাধারণ মানুষকে এমনভাবে গড়িয়া রাখে যাহাতে তাহাদের বিচারবুদ্ধি জাগ্রতই হইতে পারে না। আর আদেশ মানিবার কৌশলটি এমন সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়া থাকে, যেন তাহার একটুকুও এদিক ওদিক হইতে না পারে। শিবস্তরের মানুষ স্বভাবতঃই একটু ধর্ম্ম-বিশ্বাসী হইয়া থাকেন। বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট স্বার্থবাদিগণ ধর্ম্মসংস্কারটি এমন ভাবে এই সব সরল লোকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে যাহাতে ধর্ম্ম-সংস্কারকে সম্মুখে রাখিয়াও স্বার্থসিদ্ধি বজায় থাকে। স্বার্থবাদিগণ খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান হইয়াই থাকে। ইহারা যে কোন মানুষের যে কোন দুর্ব্বলতা বুঝিয়া লয় এবং সেই দুর্ব্বলতার আড়ালে থাকিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে ও মানুষকে বিকাশের পথে বাধা দিতে চেষ্টা করে।

বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ প্রায়ই স্বার্থের অধীন অথবা দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট হইলে নিজের লক্ষ্যের অধীন। গণেশকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ বিবেকের অধীন। সূর্য্যস্তরের মানুষ আদর্শের অধীন। শিবের স্তরের মানুষ যাহার অধীনে কাজ করে, তাহারই অধীন। ইহাদের স্বাধীন বিচারশক্তি না থাকিবার দরুণ বড় লোক বা নামী লোকের বেশী অধীন হইয়া থাকেন। শিবস্তরের আরও একপ্রকারের মানুষ আছেন তাঁহাদের কথাও বলা হইবে।

যাঁহারা শান্তিকামী যোগী বা জ্ঞানী তাঁহারা শিবের স্তরের মানুষের সঙ্গে ভাল থাকেন। প্রাচীন সভ্যতা, আদিযুগের সভ্যতা এবং সরল সভ্যতার সৌন্দর্য্য শিবের স্তরের মানুষের নিকট সব যুগেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যোগী, জ্ঞানী এবং অন্যান্য শিবের স্তরের মানবে আদি সরল ভাব সর্ব্বদাই বিরাজ করে। শিবের স্তরের মানুষকে শাসন করিবার জন্য আইন কানুনের প্রয়োজন হয় না। ইঁহারা স্বভাবতঃই কোন লোকের অনিষ্ট করেন না। বিষ্ণুস্তরের মানুষ ইঁহাদিগকে হাত করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। স্বার্থেরই জন্য আসুরিকসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ ইঁহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির বীজ প্রদান করিয়া থাকে। এই ভেদবুদ্ধি ইঁহাদেরই ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু স্বার্থ-বুদ্ধি সম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানবের মনোবৃত্তি এমনই কলুষিত যে তাহারা সমাজ বা মানুষের কল্যাণের কথা কখনও ভাবিতে পারে না। স্বার্থই তাহাদের লক্ষ্য এবং অবলম্বন। শিবকেন্দ্রপুষ্ট মানব স্বভাবতঃই সহিষ্ণু, সরল, বিলাসিতাশূন্য এবং কতকটা নিশ্চিন্ত। ইঁহারা কাহারও সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে চাহেন না। মানুষও ক্রমোন্নত বিকাশে শেষকালে যখন ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবের স্তরে আসিয়া যান, তখন সেই আদি সরল জীবনই অবলম্বন করেন। সাধারণ গৃহী সেইসব সরলতার জীবন দেখিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগী মনে করেন। বাস্তবিক যদি যোগীর স্তরে আসা যায়, তবে সরল জীবনের যে কত সুখ এবং কত শান্তি তাহা নিজেই উপভোগ করা যায়। সত্যই বিলাসিতা এবং ভোগের জীবন কাল্পনিক এবং কৃত্রিম। বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানব বাগ-বাগিচা সাজাইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কোলে আত্মসমর্পণ করেন না। আট কলা পূর্ণ হইলে তখন ঐ কৃত্রিমতাটুকু আর থাকে না। আদি যুগ বা বৈদিক যুগের সহিত স্মৃতির যুগের এই মাত্রই ভেদ বিদ্যমান। ইহা মানুষের স্বাভাবিক জীবন নহে। যতদিন মানুষে এই কৃত্রিম জীবনের মোহ থাকে ততদিন তাহার জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ আসিতেই পারে না। মানুষ সরল, উদার এবং শান্ত প্রকৃতির নগ্ন শিশু, তাই প্রকৃতির কোলেই সে জ্ঞানের সন্ধান পায়। এই সরল প্রকৃতিই তাহাকে একদিন সেই আদি যুগে নিজের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই মানুষ বহুজন্ম নিজের বহুপ্রকার বুদ্ধির এবং কল্পনার প্রভাব দেখাইয়াছে, বহু কেরামতি সৃজন করিয়া তাহা ভোগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই। শেষ কালে তাহার আবার মায়ের কথা মনে পড়িয়াছে; তাই কৃত্রিমতা ত্যাগ করিয়া, কাল্পনিককে ধুলি মুষ্টির মত ফেলিয়া দিয়া হাত ঝাড়িয়া প্রকৃতির উদার শান্ত সৌন্দর্য্যে মজিয়া যান। আমরা বলি তিনি ত্যাগী হইয়াছেন। তিনি জানেন তিনি মায়ের কোলে আসিয়াছেন; ধার্ম্মিক হইয়াছেন, বহু যুগ পরে আবার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ধর্ম্ম মানবকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন এবং বিলাসিতাশূন্য করিয়া আকাশের মত স্বাধীনই করে। আজ মানুষ এই ধর্ম্মকেই নিজের কল্পনা, স্বার্থ এবং মোহের আবরণে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। শিবের স্তরটিতে খুবই সরলতার বিকাশ। এ স্তরের মানুষ মনে মনে সাজাইতে পারেন না, তাই মিথ্যা কথাও বলিতে পারেন না। আবার শিক্ষার দোষে মিথ্যা কথা বলিলেও তাহা বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারেন না, সহজেই ধরা পড়িয়া যান। বর্ত্তমান সময় ম্লেচ্ছ সভ্যতার সংঘর্ষে এই স্তরের বহু মানুষ অত্যন্ত মিথ্যুক ও ছল হইয়া উঠিয়াছে। বরং শিক্ষিত লোকের মধ্যে সত্যের বিকাশ সহজ, এখনও আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সত্যের প্রচার এবং সত্যের জাগরণ অত্যন্ত

অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। কর্ম্মিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং চিন্তা করিয়া দেখিবেন ইহার প্রতিকার কি আছে।

এই স্তরের মানুষের জীবন যাপন একেবারে প্রাকৃতিক। ইঁহারা পেট ভরিয়া খাইয়াই সুখী। বৃক্ষতলে, বনে, পাহাড়ে, নির্জ্জন প্রান্তরে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে ইঁহারা দিন কাটাইয়া দেন। ইঁহাদের পোষাকের পারিপাট্য নাই। কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণের নীতি মাত্র ইঁহাদের অবলম্বন আছে। ইঁহারা প্রয়োজনের বেশী বস্তু সংগ্রহ করেন না। ইঁহাদের অনেক স্বাধীন উপজীবিকা ছিল; বর্ত্তমান রাজশক্তি তাহার অনেকগুলি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন বা কাড়িয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের হইয়া বলিবার কে আছে? বলিলে শুনেই বা কে?

ইঁহাদের একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে, যাহা চাকচিক্যময় সভ্যতা হইতে সুন্দর। ইঁহাদের ব্যবহার অতি সুন্দর, মিষ্ট এবং সরল। ইঁহারা লোকের উপকার এবং অতিথির সৎকার, খুব সুন্দর এবং সুগঠিত ভাবে সম্পন্ন করেন। ইঁহারা কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাও আসুরিকতা। ইঁহারা শান্তিতে এবং প্রাকৃতিক ভাবে জীবন যাপন করেন। বনের ফল, ফুল, লতা, পাতা, ঔষধের গাছ, কাঠ, মধু, কন্দ-মূলাদি ও মাটি হইতে লবণ সংগ্রহ করা চিরদিন ইঁহাদের জীবিকা ছিল। ইঁহারা সাহসী, বীর, শান্ত এবং সরল। ইঁহারা মানুষের আদি সভ্যতার বীজ। ইঁহাদিগকে এবং যোগী, ঋষি, মুনিগণকে শিবস্তরের অকৃত্রিম বিকাশ বলিতে হইবে।

ইঁহাদের সামাজিক নিয়মও প্রাকৃতিক এবং সত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। ইঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাঁহারা সভ্য সমাজের মানুষ বলিয়া আপনাদিগকে দাবী করেন তাঁহারা কিন্তু অনেক স্থলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছেন। স্ত্রীর উপর সন্দেহই যে ইহার বিশেষ কারণ ইহা বলিতেই হইবে। ইঁহারা কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা করেন নাই। ইঁহাদের মেয়েদেরও সতীত্বের গৌরব আছে। অথচ যাহাদের ভুল ভ্রান্তিতে পতন হয়, তাহাদিগকে সমাজ হইতে নিষ্ঠুরের মত বহিষ্কারেরও ব্যবস্থা নাই। ইঁহাদের জীবনের সচ্ছলতার বহু উপাদান সভ্য সমাজ হরণ করিলেও ইঁহারা নিজেদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেন নাই।

আর্য্যশাস্ত্রমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চার যুগের উল্লেখ আছে। সত্য যুগ প্রথম যুগ। এই যুগে ব্রহ্মার মানস পুত্র রূপে মানুষ সর্ব্বপ্রথম ধরাধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাই সপ্ত ঋষি বলিয়া খ্যাত। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক যুগ। খাওয়া, পরা, চলা, বলা, শোয়া, বসা এবং বাসের ঘর ইত্যাদি সবই প্রাকৃতিক। এ যুগে মানুষ শান্ত, সরল, সত্যবাদী এবং সর্ব্বপ্রকার সংস্কাররহিত ছিলেন। এ যুগের মানুষ ঋষি, যোগী, তপস্বী বা পূর্ব্ববর্ণিত (শিব অংশে বর্ণিত) লক্ষণসম্পন্ন সরল মানব ছিলেন।

মানুষের আদি পুরুষ ঋষি ইহা আর্য্য শাস্ত্রের মত। খ্রীষ্টান মুসলমান আদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলিতেও মানুষের আদি পুরুষকে শান্ত এবং প্রাকৃতিক লক্ষণ যুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী বিচার করিয়া মানুষের আদি পুরুষকে ঋষি বা ঋষির মত স্বভাবসম্পন্ন মানুষ বলিয়া প্রমাণ করা যায় কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মানবের আদি পুরুষকে ঋষি মানিতে চাহেন না। আমরা কিন্তু আদি মানবকে কিছুতেই ঋষি ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা প্রকৃতির স্থূল রূপটাই দেখিয়াছেন এবং ঐরূপ দেখিবার দরুণ তাঁহারা প্রকৃতির এক অংশ মাত্র দেখিয়াছেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ প্রকৃতির চারিটা অবস্থাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির স্থূলরূপ (যে অংশটুকু অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছেন), প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ (গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু অংশে আমাদের সূক্ষ্ম রূপের আলোচনা করা হইয়াছে; আমাদের সূক্ষ্মরূপ এবং প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ একই কথা জানিতে হইবে কারণ প্রকৃতিরই ক্ষুদ্র বিকাশ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, প্রকৃতির বিকাশ আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা প্রকৃতিকে জানিবার জন্য শক্তি পাইতে পারি না), প্রকৃতির কারণ রূপ (বিশুদ্ধ অভিমান হইতে আরম্ভ করিয়া শিবের ঈশানমুখ পর্য্যন্ত আলোচিত সমস্ত অংশ) এবং প্রকৃতির তুরীয় রূপ (শক্তি অংশে আলোচনা আছে) তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই প্রাচ্য পণ্ডিতগণ ক্রমবিকাশকে আলোচনা করিতে যাইয়া একাংশ দর্শিতার পরিচয় দেন নাই।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার মীমাংসা করিয়া না দিলে পাঠকগণের ভ্রান্তি হইতে পারে। এখানে বলা হইয়াছে প্রথম সৃষ্টির সময় প্রথম মানব ঋষি হইতেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে জন্ম গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন, কিম্বা ধীরে ধীরে জ্ঞানী হইয়া ছিলেন। ইহার উত্তর এই যে তাঁহারা পৃথিবীতে একটি মানব হইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বভাবে জানিবার জন্য এক প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসা ছিল। ‘কি’ এবং ‘কেন’ ইত্যাদি প্রশ্নের আবেশ তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়াছিল। তাই সে সব প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তাঁহারা অন্তরে বা বাহিরের জগতে খুঁজিবার চেষ্টা করিতেন। এই খোঁজার চেষ্টার নামই ‘তপস্যা’ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ তপস্যা দ্বারাই তাঁহারা ধীরে ধীরে জ্ঞানী হইতেন। তাঁহাদের স্বভাব এবং চালচলন অনেকটা শিব-কেন্দ্র-পুষ্ট মানবের মতই ছিল। কিন্তু শিব-কেন্দ্র-পুষ্ট সাধারণ মানুষের মত তাঁহারা ‘কি এবং কেন’ ইত্যাদি প্রশ্নহীন জাড্যভাবসম্পন্ন অন্তঃকরণবিশিষ্ট ছিলেন না। আদি যুগের সভ্যতা যাঁহারা ভোগ করিতে চাহেন বা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা নদীতটে নিত্য বৈদিক সন্ধ্যা করুন এবং উদাত্ত অনুদাত্ত আদি স্বরে কিছু দিন বেদ গান করুন। সেই সভ্যতার যে কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য এবং আকর্ষণ তাহা অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। শিবপূজা করিয়া উঠিয়াও সাধকগণ আদি যুগের শান্তির নেশা কিছুক্ষণ ভোগ করিতে পারেন। যাঁহারা ইচ্ছা করেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

প্রকৃতির প্রকাশাংশকে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অপ্রকাশ অংশই অব্যক্ত। প্রকৃতির এক অংশ অব্যক্ত, সেখানে সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ অব্যক্ত আকারে রহিয়াছে। সেই অব্যক্ত সম্পদের কতক অংশ প্রথম প্রকাশ-অংশে বীজাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির প্রকাশ অংশে অবস্থিত বীজগুলির কতক অংশ দ্বিতীয় প্রকাশ অংশে সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হয়। এই অংশে বীজগুলি ক্রিয়াময় অবস্থা লাভ করে। ক্রিয়াময় অবস্থার দুইটি অনুভূতির কেন্দ্র দেওয়া আছে। একটি বিষ্ণুকেন্দ্র, এখানে আঁকা বাঁকা ক্রিয়াময় রূপে জীবের অবস্থান। দ্বিতীয়টি সূর্য্যকেন্দ্র, এখানে সেই

ক্রিয়াময় স্বরূপগুলি মূর্ত্তির আকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্থূলত্ব আসে না। তাহার পরে সেই ক্রিয়াময় অবস্থাই প্রাণসংযুক্ত মনের কেন্দ্রে আসিলে স্থূল মূর্ত্তি হইয়া যায়। এই মনই প্রকৃতির স্থূল রূপ। ইহাই প্রকৃতির তৃতীয় প্রকাশ অংশ। এই তৃতীয় প্রকাশ অংশের ক্রমবিকাশকেই মহাত্মা ডারউইন মস্ত বড় প্রকাণ্ড আকার করিয়া সাজাইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকৃতির প্রকাশ অংশের তৃতীয় অংশকেই পৌরাণিকগণ ব্রহ্মা সাজাইয়াছেন। এখন বোধহয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন ব্রহ্মার মানসপুত্র কাহাকে বলে। প্রকৃতির প্রকাশ অংশের তৃতীয় অংশ সমস্ত বস্তুকেই স্থূলরূপে গড়িয়া দেয়। মনে মনে গড়িয়া পরে স্থূল আকারে গড়িতে হয়। এই স্থূলরূপ দেওয়াকেই 'মানসপুত্র' উৎপাদন বলা হইয়াছে।

আমাদের স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বিচার পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করুন, সুমীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। আমাদের এই পঞ্চদেবতা-অধ্যায় সমস্ত প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি নীতি, কলা শিল্প প্রভৃতি বুঝিবার পক্ষে একমাত্র সাধারণ পন্থা। ইহা জানা থাকিলে যে কোন বিচারের ভুল খুব সহজে ধরিয়া দেওয়া যায়। যে কোন জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মূল বাহির করিয়া লওয়া যায়। মানুষ কখন কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া কোন্ কথা বলেন তাহা পর্য্যন্ত সেই কথার গভীরতাকে ওজন করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। এই জন্যই উপাসনা কাণ্ডে পঞ্চদেবতাকে যে কোন পূজার সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠানের অন্তর্গত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষই অন্তরস্থিত শক্তিসম্পদের পরিচয় লইবার উপযুক্ত। আর্য্যসন্তান যেন তাঁহার পিতৃভাণ্ডারের খবর লইতে চেষ্টা করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আদি মানব সরল ছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে তাঁহারা ঋষি বলিতে সাহস পান নাই। ইহার কারণ তাঁহারা অন্তরস্থিত শক্তি-সম্পদের পরিচয় লইবার সুযোগ এখনও পান নাই। অন্তরস্থিত শক্তির কথা বলতে গেলে তাঁহারা হয় তো বলিবেন, তাহাও বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে অন্তরে শক্তিসম্পদ জন্মে না। বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি অর্জ্জন করে মাত্র। বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত কখনও (পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট) বিষ্ণুকেন্দ্র অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে না। বাহিরকে অন্তর হইতে পৃথক দেখা দার্শনিকদৃষ্টির লক্ষণও নহে। আবার যদি শুধুই অন্তরকে মানিয়া লইয়া বাহিরকে উপেক্ষা করা হয় তবুও ভুল করা হইবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তুরীয় সব অবস্থাই আছে। জীবের সম্বন্ধ কেবলই স্থূলে আবদ্ধ নহে। প্রকৃতি পূর্ণরূপে আমাদের নিকট ধরা দিবার জন্যই বাহিরে ঘাত প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশুদ্ধ অভিমানের কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবার পর বাহিরের প্রকৃতি আমাদের অন্তর বিকাশের জন্যই আর কোন ঘাত প্রতিঘাত প্রস্তুত করিতে পারে না। তখন অন্তর জগতের তৃপ্তিই সাধককে অগ্রসর করিয়া দিতে থাকে।

প্রকৃতি মানুষকে নিজের পূর্ণ পরিচয় দিবেন বলিয়াই মানুষের আদি পুরুষকে আট কলার শক্তি সম্পন্ন বীজের স্থূলাবস্থার ঋষি রূপে জগতে মূর্ত্ত করিয়াছেন। সেই সব ঋষিগণেরই সন্তানগণ আজ সমস্ত পৃথিবীতে মানবাকারে বিচরণ করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক বিকাশ সম্পন্ন পিতা মাতার সন্তান বলিয়াই মানুষ একে অন্যের ভাষা বুঝিবার মত শক্তি

অর্জ্জন করিতেছেন। মানুষের আদি পুরুষের এই জ্ঞানশক্তিকে প্রত্যেক মানুষই জন্মগত অধিকার রূপে অর্জ্জন করেন। এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টির কোন জীবে নাই। প্রত্যেক জীবেই প্রকৃতির দেওয়া একটি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। মানুষে প্রকৃতির দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ জ্ঞান। এই জ্ঞান কি তাহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মহত্তত্ত্ব অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। মহত্তত্ত্বে জ্ঞানের পনের কলার বিকাশ এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং ইহারাই পনের জ্ঞান কলার স্থূল ধ্বনি-প্রতীক। ইহা ভিন্ন বিসর্গও (ঃ) রহিয়াছে। অ ই উ ঋ ঌ এ ও এবং অং (ং) ইহারাই আট কলার স্থূল রূপ। ঋষিগণ এই আট কলার বিকাশের শক্তিসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের স্বরযন্ত্রেও ঐ ধ্বনিগুলির বিকাশ ছিল। এই জন্যই মানবমাত্রই ঋষিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভাষার জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ণ শক্তি লাভ করেন। অ ই উ ঋ ঌ এ এবং ও ইহাদের প্রত্যেকের দীর্ঘ স্বর গুলিই আ ঈ ঊ ৠ ৡ ঐ এবং ঔ। এই ১৪টি স্বর এবং (সমষ্টিবর্ণ) ং (বা অং) মিলাইয়া ১৫টি স্বরই পনের কলা। এই ১৫টির মধ্যে যাঁহার অন্তরে হ্রস্ব ৮টি শক্তির বিকাশ আছে তাঁহাতে বাকী সাতটির বিকাশ সহজেই আসিয়া যাইবে। পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ঃ সহ ঐ ১৬টি স্বর বর্ণে নিয়মিত রহিয়াছে।

পৃথিবীর সমস্ত প্রকার বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ঐ আটটি বর্ণের মধ্যেই নিহিত আছে। ইহারাই জ্ঞানের আট কলা। এই আট কলাই বৈজ্ঞানিক প্রকাশ। মানুষ আট কলায় আসিলেই বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে। ঐ আটটি বর্ণই সূর্য্যের সপ্ত বর্ণ এবং সমস্ত বর্ণের সমষ্টিতে অষ্টম শ্বেত বর্ণও হয়। ঐ আটটি বর্ণই সঙ্গীতের স্বরের সাতটি স্বর এবং একটি মিশ্র স্বর লইয়া আটটি হয়। ঐ আটটি ধ্বনিই মানবমাত্রের ভাষার একমাত্র সাধারণ উপাদান। এই জন্যই মন্ত্রশক্তি দ্বারা সমস্ত প্রকার জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। এই জন্যই জীব মাত্রই সঙ্গীতের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়। এই জন্যই সঙ্গীতের স্বরের মাধুর্য্য সমস্ত প্রকার মানব সমাজ এক ভাবেই বুঝিয়া থাকেন। ধ্বনি (নাদ) হইতেও সূক্ষ্ম বিকাশ আছে। তাহা ছন্দ বিজ্ঞানে নিয়মিত হইয়া থাকে। 'ছন্দঃ' স্পন্দনের মধ্যে সাধারণ উচ্চ নীচ ভাব। এই ছন্দঃ হইতেই তাল আসিয়াছে। ধ্বনি বা নাদকে অবলম্বন করিয়া সাধক ধীরে ধীরে ক্রম সূক্ষ্ম পথে মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে আসিতে পারেন। ছন্দঃ বা স্পন্দনকে অবলম্বন করিতে পারিলে সাধক ধীরে ধীরে শক্তিস্তর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিবেন। ছন্দঃ হইতেই তালের উৎপত্তি হইয়াছে। তাল বুঝিবার ক্ষমতাও সর্ব্বজীবে সমান। আট কলার বিকাশ সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই ঋষিগণ জন্মাবধি স্বর এবং ছন্দোবিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন। বেদ ঋষিগণের তপস্যালব্ধ মন্ত্ররাশির সংগ্রহ। ঋষিগণ যে ছন্দবিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন তাহার প্রমাণ বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রের সঙ্গে ছন্দেরও উল্লেখ আছে। ছন্দঃ হইতেই তাল এবং তাল হইতেই গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। গণিত শক্তিস্তর হইতেই আসিয়াছে (শক্তিস্তর সম্বন্ধে এখনও আলোচনা হয় নাই)। এই গণিতই সমস্ত বস্তুকে নিয়মিত করে। এই গণিতের শেষ বিকাশ ঈশ্বরত্বের পূর্ণাবস্থার কেন্দ্রে (গণেশ শক্তির পুত্র বলিয়া গণেশ স্তরেও গণিতের বিকাশ আছে) বা শক্তিস্তরে। এই গণিতই সূক্ষ্মতম অবস্থায় ছন্দঃ। যাঁহারা মানবের আদি পুরুষকে অসভ্য বলিতে সাহস পান তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাই মাত্র বলিতে পারি তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী। ঋষিগণের স্বভাবে মন্ত্র, নাদ, এবং ছন্দের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। সেই মন্ত্র, নাদ,

ছন্দাদির ভিত্তির উপরই মানবের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পদ অবস্থিত। যে সব জ্ঞান বিজ্ঞানের বীজাবস্থা ঋষিগণের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল, সেই সব বিজ্ঞানের বীজের উপরেই মানবের ভাষা, ভাব, স্বর, তাল, সংখ্যা (গণিত) আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়াছে। আমরা এই গ্রন্থে কর্ম্ম-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। সুতরাং এই সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এখানে হইতেই পারে না। মানবের আদি পুরুষ যে সবের বীজাবস্থা লইয়া আসিয়াছিলেন আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান তাহারই শাখাপ্রশাখারূপে অবস্থিত। আমাদের জ্ঞানে বাহাদুরি করিবার এমন কিছুই নাই যাহাতে আমাদের আদিপুরুষ ঋষিগণকে আমরা অসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। মন্ত্রজপের মধ্য দিয়া কিছু দিন সাধনা করিলে বর্ণগুলি যে জ্ঞানেরই স্বরূপ ইহা বুঝা যাইবে। তন্ত্র শাস্ত্রে এই বর্ণগুলিকে মাতৃকা-বর্ণ বলা হইয়া থাকে। এই মাতৃকা অর্থে জ্ঞানমাতা অর্থাৎ জ্ঞান প্রসবিনী। জপের দ্বারা জ্ঞানশক্তি অতি আশ্চর্য্যভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাস্তবিক মন্ত্র জপই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক সাধনা। তান্ত্রিক ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস এবং মন্ত্রচৈতন্য ক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি উপদেশ না পাইলে মন্ত্রজপের ফল খুবই কম হইয়া থাকে। তবুও জপের ফল যে একেবারে ব্যর্থ হয় না তাহার প্রমাণ যে কেহ নিজে জপ করিয়া বুঝিয়া দেখিতে পারেন।

সৃষ্টিতে বানর পর্য্যন্ত চার কলার বিকাশ। ইহার পরই ৪৷৹ কলায় মানুষের বিকাশ হইয়া থাকে। এখানে স্পষ্ট বলা প্রয়োজন শুধু আকারের উন্নতিই উন্নত বিকাশের লক্ষণ নহে। বুদ্ধির বিকাশেই বিকাশ। মানুষ ঋষির বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ভাষাজ্ঞানের সামঞ্জস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। বুদ্ধদেবকে এবং একজন সাধারণ মজুরকে একই জ্ঞানের বিকাশ বলা যাইতে পারে না। বুদ্ধদেবে জ্ঞানের ৮ কলার অনেক বেশী বিকাশ রহিয়াছে। আর একজন সাধারণ মজুরে ৪৷৹ কলার বেশী বিকাশ নাই। অথচ উভয়ের মধ্যে ভাষা বিনিময়ের একই শক্তি বিদ্যমান। আবার দেখুন একটি পাখী তিন কলার বিকাশ এবং একটি পশু চার কলার বিকাশ। উভয়ে মাত্র এক কলার ভেদ লইয়া অবস্থিত। কিন্তু উভয়ের ভাব বিনিময়ের জন্য কোন সাধারণ ভাষা নাই। অধিক কি একটি মহিষের সহিত একটি গরুর ভাষা বিনিময়ের ভিত্তি নাই অথচ উভয়েই ৪ কলার বিকাশের মধ্যে অবস্থিত। একজন অন্যজনের ভাব আয়ত্তও করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের ঐ অদ্ভুত শক্তি কোথা হইতে আসিল কোন যুক্তি আছে কি? আর্য্যঋষিগণ বলেন মানুষ মাত্রই বৈজ্ঞানিক বিকাশসম্পন্ন পিতামাতার সন্তান, যাঁহারা জ্ঞানের বিকাশের জন্য বিজ্ঞানসম্পদসম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব প্রথমে ধরা ধামে আসিয়া ছিলেন। কোন কোন আর্য্যশাস্ত্র জীবমাত্রকেই ঋষিসন্তান বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহেন। আমরা তাহার যথাযথ যুক্তি দেখিতেছি না। তবে বৈজ্ঞানিক কলার বিকাশটি এরূপ সুন্দর যে সমস্ত জীবের সহিত স্নেহ সূত্র স্থাপিত হইয়া যায়। হিংস্র জীবগণও যোগিগণকে হিংসা করে না একথা অনেকেই জানেন। সেই জন্যই মানুষের ভাষাবিনিময়ের এক সাধারণ শক্তি পৃথিবীস্থিত সমস্ত মানবে রহিয়াছে। যাহা হউক মানুষের আদি পুরুষ যে বানরের মত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুর মত মানুষ নহে তাহা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। তবে একথা সত্য যে বৈজ্ঞানিক কলা (৮ কলা) বিকাশে মানুষের বাহিরের চাল চলন খুব সরল এবং প্রাকৃতিক হইয়া যায়। তাই আদি যুগের অন্যান্য মানুষের বাহিরের চাল চলন

এবং ঋষি, যোগী ও মুনিগণের জীবন যাপন ঠিক একই প্রকারের হইয়া থাকে। আর উভয়েই শিব স্তরের বিকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা হউক আদি যুগ সেই সময়কেই বলা যাইবে যে সময় পর্য্যন্ত মানুষ সরল, শান্ত, সত্যবাদী এবং কোন প্রকার সংস্কার রহিত ছিল। ঐ যুগের মানুষ ঋষি, যোগী, তপস্বী অথবা শিব অংশে বর্ণিত শিব স্তরের অন্যান্য লক্ষণ সম্পন্ন মানব হইতেন।

পশু পর্য্যন্ত চার কলার বিকাশ এবং মানবের আদি পুরুষে আট কলার বিকাশ। ক্রম বিকাশে চার কলার পর পাঁচ, ছয়, সাত ক্রমে উন্নত বিকাশই স্বাভাবিক এরূপ ধারণা অনেকের হইবার কথা। কথাটা কতকটা যুক্তিপূর্ণও হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে, ঋযি হইতে অর্থাৎ আট কলার বিকাশ হইতে মানব সৃষ্টির আরম্ভ স্বীকার করিলে কোন ভুল হইবে না। শিবস্তরের বিকাশে চার কলার কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশসম্পন্ন মানুষ বা আট কলার বিকাশসম্পন্ন মানবই পাওয়া যায়। উভয়েই শান্তিকলার বিশেষ বিকাশ রহিয়াছে। সুতরাং শান্তির যুগে ঐরূপ বিকাশে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। ঋষির বিকাশ বৈজ্ঞানিক বিকাশ হইবার কারণ প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঋষিকে কেবলই মানবের আদি পুরুষ বলেন নাই বরং সমস্ত প্রাণীর আদি পুরুষও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা যদিও ঋষিকে সমস্ত জীবের আদি পুরুষ বলিয়া স্বীকার করি না, কিন্তু মানব মাত্রেরই আদি পুরুষ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ঋষিতে বৈজ্ঞানিক বিকাশ হইবার দরুণ ৪।০, ৫, ৬, ৭ কলার বিকাশ সেই ক্ষেত্রে হইতে পারে। যে কলায় বিকাশ যত ব্যাপক ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে সেই কলাকেই বৈজ্ঞানিক কলা বলা যাইতে পারে। ঋষি বৈজ্ঞানিক কলার বিকাশ সুতরাং যে কোন বিকাশ সম্পন্ন মানুষ ঋষির ক্ষেত্রে আসিতে পারে। পশুগণ জরায়ুজ বিকাশ; কিন্তু সেখানে চার কলার বেশী বিকাশ হয় নাই। এদিকে ঋষির বিকাশ আট, সাত, ছয়, পাঁচ এবং চারের প্রায় নিকটবর্ত্তী চলিয়া গিয়াছে; ইহার নিম্নে যায় নাই। ঐদিকেও বৈজ্ঞানিক বিকাশ হইবার দরুণ ঋষি বংশধরগণ ষোড়শ কলার বিকাশেও যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিকাশের বিশেষত্বই এইরূপ যে উহা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বহুকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে।

ঋষিদের স্বভাব এবং চাল চলন শিবকেন্দ্রপুষ্ট অন্যান্য মানবেরই মত, উভয়েই শান্ত ভাবের ক্ষেত্র, তাই প্রথম মানুষ ঐ দুই প্রকারেরই ছিলেন। ঋষিগণ প্রকৃতির রহস্য এবং নিজেদের কর্ত্তব্য জানিবার জন্য তপস্যার বেগ সম্পন্ন হইতেন। শিবযুগের অন্যান্য মানব সেইরূপ ছিলেন না। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিদধিক চার কলার বিকাশ ছিল। এদিকে ৫, ৬ এবং ৭ কলা সব সময়ই রাজস কলা। ইঁহারা কর্ম্মের বিকাশসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ততদিন জন্মগ্রহণ করেন না যতদিন কর্ম্মের কোন ক্ষেত্র ইঁহাদের জন্য না হইতেছে। ইঁহাদের আগমনে পৃথিবীতে যুগান্তরের সূচনা হইয়া থাকে। যুগসন্ধিক্ষণেই ৫, ৬, ৭ কলা পুষ্ট মানব অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কিঞ্চিদধিক চার কলা অজ্ঞানীর বিকাশ। অজ্ঞানী না থাকিলে কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্র থাকে না, কর্ম্মের কোন সুবিধাও থাকে না। আবার কর্ম্মীমাত্রই কর্ম্মশ্রান্তি দূর করিবার জন্য শান্তির খোঁজ করেন। জ্ঞানী বা ঋষি না থাকিলে কর্ম্মীকে শান্তির আলো দিবেন কে? তাই ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম কলা পুষ্ট মানব ৪।০

(সওয়া চার) এবং আট কলা পুষ্ট মানবের মধ্য স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। চিন্তাশীলগণ এখন এ বিষয়ে নিজেরা ভাবিয়া লইবেন।

মনোময় কোষের চারিটা ভাগ করা হইয়াছে। তাহারই এক প্রান্তে অভিমান অন্য প্রান্তে মন। মনোময় কোষের বিকাশ লইয়া জীব মানুষের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষও ধরাধামে অন্তঃকরণের অভিমান ভাগ বা শান্তিভাগের বিকাশ লইয়া প্রথম আসিয়াছে। শেষকালে মানুষ মন অংশে গিয়া দাঁড়াইবে। মন অংশে অর্থে ভোগের বেগ সম্পন্ন অংশে বুঝিতে হইবে। ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতগণের ভাষায় কলিযুগ। ইহার মধ্য স্তরে চিত্ত এবং বুদ্ধির যুগ অবস্থিত। যাহা হউক যে কোন স্তরের আদি পুরুষ প্রকৃতিই প্রসব করেন। অবশ্য বাহ্য প্রকৃতিই উন্নত স্তরের প্রথম পুরুষকে প্রসূত হইতে বাধ্য করে। প্রকৃতি নিজ অঙ্কস্থিত উন্নতবিকাশসম্পন্ন বীজকে নিজের স্থূল অঙ্কে স্থূল মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করেন। পরে যে বীজের মধ্যে উন্নত বিকাশের চেষ্টা আসিয়া যায়, সেই উন্নত বিকাশে বিকশিত জীবের ক্ষেত্রে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে।

পশু পর্য্যন্ত প্রাণময় কোষটি পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া গিয়াছে। এখন মনোময় কোষের বিকাশের সময় আসিয়াছে। তাই বিরাট প্রকৃতিতে মনোময় কোষের পূর্ণ বিকাশসম্পন্ন জীব ধরাধামে আসিল। আট কলায় মনোময় কোষ পূর্ণতা লাভ করে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের ভাষায় তাঁহারাই মানুষের আদিপুরুষ, ঋষি। তাঁহাদেরই বংশে যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, অথবা জড়তাপূর্ণ শান্ত মানব হইত। এখনো বহু মানুষের আন্তরবিকাশ অত্যন্ত জড়তাপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক স্তরেই যত জীবের সৃষ্টি হয় তাহারা দুই দিক হইতে আসে। এক অনুলোম গতিতে, অর্থাৎ শিবের ৬ষ্ঠ মুখ হইতে, বা বীজ জগৎ হইতে আসিয়া থাকে। আবার এক ধারা প্রতিলোম গতিতে নিম্ন স্তরের জীব হইতে উন্নত স্তরের জীবে আসিয়া থাকে। (যাঁহারা জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী নহেন তাঁহাদের বুঝিতে গোলমাল হইবে।) যাহারা প্রতিলোম গতিতে আসিয়া থাকে তাহারা স্বভাবতঃই একটু চঞ্চল এবং ভোগী প্রকৃতির হয়। যাহারা অনুলোম গতিতে শিবের ষষ্ঠ মুখের বীজ হইতে আসে তাহারা একটু শান্ত প্রকৃতির হয়। প্রতিলোম জীব একটু অসহিষ্ণু হয়। ইহার কারণ তাহাদিগকে খুব কঠোরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া উন্নতির পথে পা ফেলিতে হইতেছে। যাহারা অনুলোম জীব তাহারা খুবই সহিষ্ণু হয়। তাহারা বীজ জগৎ হইতে আসে তাই খুব শান্ত, যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহা যাহাই হউক না কেন, একই কলাস্থিত অনুলোম এবং প্রতিলোম জীব একই প্রকারের হইয়া থাকে। উভয়ের স্বভাবে সামান্য ভেদ মাত্র অবস্থিত। এইরূপ উভয় প্রকারের জীব উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ সব ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। স্বভাবের এই ভেদটুকুর জন্যই একই কলাস্থিত জীবগণে দ্বন্দ্বের প্রভাব দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বই যুগান্তর আনয়ন করে। (এইখানে অনেক কথাই বলিবার ছিল, কিন্তু গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে।)

শিবের যুগের পর বিষ্ণুর যুগ আসিয়াছিল। অর্থাৎ মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিষ্ণুস্তরের বা চিত্তকেন্দ্রপুষ্ট মানবের বিকাশ হইয়াছিল। সেই যুগটাই চিত্তের যুগ বা স্মৃতির যুগ (স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন)। এই যুগে বহু মানব সামাজিক শাসন এবং সামাজিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিল। কৃষি, পশুপালন, ছোট ছোট

সমাজগঠন, বনের মধ্যেই ছোট ছোট কুঁড়েঘর প্রস্তুত করা, বস্ত্র ব্যবহার এবং বিবাহাদির উন্মেষ হইয়াছিল।(এখানে খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। সেই সবের মীমাংসা করিয়া শেষ করা যাইবে না। একটা মোটামুটি জ্ঞান সাজাইয়া লওয়া প্রয়োজন।) বিষ্ণুযুগের সঙ্গে সঙ্গে বা শেষ ভাগে শিক্ষার যুগও আসিয়াছিল। এইযুগে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি যুগের আচার ব্যবহার তো ছিলই, ইহার উপর শিক্ষারও প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

শিক্ষার যুগের পর বুদ্ধির যুগও আসিয়াছিল। এই যুগে কারুকার্য্য, রীতিনীতি, আইন এবং রাজশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। সমাজের কর্ত্তা শেষকালে রাজা হইয়া বসিলেন। প্রত্যেক যুগেই উভয় দিকের জীব সমাগমই এইরূপ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছিল। রাজ শাসনের যুগে শাসনলক্ষ্য কখনও সমাজের অনুকূল বা প্রতিকূল হইতেছিল। বর্ত্তমান সময়ে রাজশক্তি শক্তিশালী হইয়া সমস্ত শক্তি মনের ভোগমুখী গতির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভাষায় সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ বা ভোগতন্ত্রবাদ রূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, বুদ্ধিশক্তি এবং ভোগশক্তি সবগুলিই বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে। একের সহিত অন্যের শক্তির বিনিময়ে সকলেই বিশেষ শক্তিমান হইয়াছে। আর সকলেই ভোগের দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষা এবং বুদ্ধির বিকাশের পর মানব সভ্যতায় মনেরও বিকাশ হইল।

এক যুগে ধর্ম্মই মানবকে শাসন করিয়াছিল। তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শাসিত হইত অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতঃই শান্ত ছিল। সেইটাই ধর্ম্ম শাসনের যুগ ছিল। নিম্ন কলার প্রতিলোম জীব সমাগমে সেই ধর্ম্ম শাসনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চঞ্চল প্রকৃতির জীবসমাগমে মানুষ সামাজিক শাসন গ্রহণ করিয়াছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে যে সামাজিক শাসনের আভাস পাওয়া যায় তাহা সামাজিক শাসনের শেষ অবস্থার কথা। সমাজ শাসনের অস্ত্র সত্য এবং সংগঠন (বিষ্ণু অংশ দেখ)। সামাজিক শাসনে অন্য কোন অস্ত্র নাই। এই সামাজিক শাসনের ফলে আর্য্য জাতি লক্ষ লক্ষ সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ শাসনের শেষ অস্ত্র বর্জ্জন (বয়কট)। যে অন্যায় করিত তাহাকেই বর্জ্জন করা হইত। তাহারই এক নূতন বংশ পত্তন হইত। এখনও ভারতীয় আর্য্য সমাজে তাহাই হইয়া চলিয়াছে। বাস্তবিক প্রত্যেকটি মানুষ ঋষি হইতে আসিয়াছে। কিন্তু সামাজিক শাসনের ফলে আর্য্য সমাজ বর্ত্তমানে এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই সমাজ শাসনের সীমা তখনই শেষ হইল যখন দেখা গেল বর্জ্জিত মানবগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচার করা আরম্ভ করিতেছে। এই বর্জ্জিত আর্য্যবংশধরগণই অনার্য্য বলিয়া আর্য্যগণের ভাষায় তিরস্কৃত হইয়াছিল। এখনও যে জাতিচ্যুত হয়, সে অজাত বলিয়া তিরস্কৃত হয়। সেখানেই মানব সভ্যতায় বুদ্ধিশক্তির উন্মেষ হইল। তখন সমাজকর্ত্তা শঙ্খ ও চক্রের সঙ্গে গদা গ্রহণ করিলেন। ইহাই মানব সভ্যতায় রাজশক্তির উন্মেষ। আবার ইহাই মানব সভ্যতায় অনার্য্য সমাজের অত্যাচারের সূত্রপাত। ইহা অন্যায়েরই প্রতিক্রিয়া বলিতে হইবে। একজন অন্যায় করিলে তাহার বংশধরগণকেও যে অনার্য্য বা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করা হয়, ইহা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কথা। এইদিকে ধর্ম্মের শাসন তো রহিলই, সমাজ শাসনের একটা ধারাও সমাজ কর্ত্তাদের হাতে রহিল। পরে রাজশাসনও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সমাজশাসনের ভুল ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রাজশাসন

প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই মানব সভ্যতায় বুদ্ধির বিকাশ বলিতে হইবে। পরে রাজশাসনও বিগড়াইয়া গেল। রাজা ভোগী হইলেন; প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। রাজার হস্তে শঙ্খের স্থানে (সত্যের অবলম্বনের স্থানে) মিথ্যার আগমন ও চক্রের (প্রেম ও সংগঠনের) স্থানে কুমন্ত্রী বা কুচক্রীর প্রতিষ্ঠা হইল। রাজার হাতের গদা (সৈন্য বিভাগ) হইল সৎ লোকের মাথা ভাঙ্গিবার অস্ত্র। পদ্ম বা শান্তি বিভাগ (পুলিশ বিভাগ) হইল গুণ্ডার লীলা নিকেতন। ভারতের আর্য্য পণ্ডিতগণ সেই সব রাজাকে দৈত্য (নিষ্ঠুর শাসক), রাক্ষস (প্রজার রক্ত শোষণকারী), এবং অসুর বলিয়া ঘৃণাসূচক ভাষায় তাহাদের চরিত্র বর্ণনা করিয়া ছিলেন। যে সব রাজা প্রজার আত্মবিকাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে ছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা লাভ করিতেন। এই রাজশাসন বহুদিন পৃথিবীর বক্ষে হইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান সময় রাজশাসন অর্থনৈতিক শোষণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা ধনবানগণের মনগড়া শাসনই বলিতে হইবে। ইহা দেখিয়া পাশ্চাত্য জন সমাজ নূতন তন্ত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন, যাহা বর্ত্তমানে গণতন্ত্র বলিয়া লোকে জানে। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যেভাবে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, তাহাতে ইহা যে ভোগেরই সাম্যবাদ হইবার পথে চলিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই এখনও জগতে ভোগের যুগই চলিয়াছে। মানব সভ্যতার এই ভোগলক্ষ্য যুগ কতদিনে শেষ হইবে তাহার সময় দেওয়া অসম্ভব। তবে ভোগের কুফলই ভোগের যুগকে অন্য যুগে রূপান্তরিত করিবে। শোষণ এবং পীড়ন সাম্রাজ্যবাদের মূলমন্ত্র হইয়াছে। সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব আর বেশি দিন নাই। সমাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়া শেষকালে জাতিবিদ্বেষ আসিয়াছে। আর রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শেষকালে শোষণ এবং পীড়ন আসিয়াছে। সাম্যবাদের লক্ষ্য এই দুই এরই উচ্ছেদ একথা সত্য। কিন্তু সাম্যবাদ যদি দেহাত্মবাদ বা ভোগবাদ গ্রহণ করে তবে এই সাম্যবাদও বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। কারণ শুধু ভোগকে অবলম্বন করা মানুষের মনুষ্যত্ব নহে। ভোগের সাম্যবাদ মনস্তত্ত্বের বিচারেও অসম্ভব। মানুষকে রাজাই শাসন করুন, বা সমাজ শাসন করুক বা গণতন্ত্রই শাসন করুক, শাসনের আদর্শ যতদিন শক্তিস্তরের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে না ততদিন শান্তি নাই। (এ সম্বন্ধে শক্তি অংশে বলা হইবে।)

এ পর্য্যন্ত আমরা যত প্রকারের মানুষ পাইয়াছি, তাহাদিগকে চারিভাগে ভাগ করা গেল। সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু এবং শিব। প্রত্যেক চরিত্রেরই এক একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহাকে ভাল এবং কাহাকে মন্দ করিতে চাহি না। সেইরূপ করিবার সাধ্যও নাই, প্রয়োজনও নাই। পতাকা অসুরের বিরুদ্ধে এবং কর্ম্মবিজ্ঞান বিকাশের পথে রোপন করা হইয়াছে। যে আত্মবিকাশে বাধা দেয়, যে ভোগের সুবিধার জন্য অন্যের আত্মবিকাশে কণ্টক প্রস্তুত করে এবং যে নিজের আত্মবিকাশ ত্যাগ করিয়া অন্যের পথ রুদ্ধ করিয়া ভোগ বিকাশে যত্নশীল সেই ‘অসুর’। পতাকা তাহারই বিরুদ্ধে স্থাপন করা হইয়াছে। মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ পতাকা কোন দিনই ঘোষণা করিবে না। মানুষ যে কোন স্তরের বিকাশ লইয়াই ধরাধামে আসুক না কেন তাঁহার লক্ষ্য হইবে নিজের মধ্যে দৈবীসম্পদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আসুরিকতাকে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা। এখানে প্রত্যেক মানুষকে মনে রাখিতে হইবে - মানুষ স্বাধীন, মানুষের অন্তরস্থ প্রকৃতি স্বাধীন, মানুষের আত্মা স্বাধীন। মানুষের এই

নিজ স্বাধীনতায় যেখানে মানুষ ভুল করিবে সেখানেই মানুষ আত্মবিকাশে বাধা প্রাপ্ত হইবে। (স্বাধীনতার মোহে পড়িয়া উচ্ছৃঙ্খল যেন কেহ না হয়। দৈবীসম্পদের অবলম্বন হওয়া চাই।) মানুষ একজনকে শাসক সাজাইয়াছে, আবার ভুল করিয়াছে সেইখানে, যেখানে অনুপযুক্ত শাসককে দেবতা ও ঈশ্বরজ্ঞানে অন্ধের মত আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের আত্মা স্বাধীন (কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল নহে)। তাহাকে ছোট করিতে গেলে বিরাট প্রকৃতি তাহা সহ্য করিবে না। সেই প্রকৃতি মানুষকে বিপদগ্রস্ত করিয়া নিশ্চয়ই একদিন মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিবেন। তাই মানুষকে বলিতে হইতেছে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন আছে, ভোগের প্রয়োজন আছে, সমাজের প্রয়োজন আছে, শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আবার ধর্ম্মগুরুরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভাবপ্রবণতায় সকলকে অবতার বা ঈশ্বর মনে করিয়া নিজেকে মূর্খের মত সর্ব্বত্র ছাড়িয়া দিও না। তুমি নিজে আত্মা (আত্মাকে ঈশ্বরাংশও বলা যায়) ঈশ্বর বা ব্রহ্ম স্বরূপ। তোমাকে সেই অবস্থায় আসিবার জন্য ত্যাগ, ভোগ (প্রয়োজনীয় ভোগ), সমাজ, শিক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে। তুমি কর্ম্মহীন হইও না, উপাসনাহীন হইও না, শিক্ষাহীন, সমাজ বা সংগঠনহীন, অর্থহীন, শস্ত্রহীন, জ্ঞানহীন এবং বিচারবুদ্ধিহীন হইও না। তুমি সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা নিজের হাতে তুলিয়া লও। সংসারে যাহার যাহা ন্যায্য দাবী তাহাকে তাহা দাও (শ্রদ্ধা, স্নেহ, আশ্রয়, উপদেশ, অন্ন, জল, সেবা, দণ্ড ইত্যাদি)। দেখিবে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবীভাণ্ডারের সর্ব্বসম্পদ সকলের আত্ম বিকাশের পথে সহায়তার জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা কেহ অন্যায় ভাবে নষ্ট করিও না। আত্মবিকাশের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সবই লইও, আবার অন্যের আত্মবিকাশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা আনন্দের সহিত শক্তি অনুসারে দিও। দেখিবে সুখের দিন আসিয়াছে।

শিবের পতাকা বা ধর্ম্মের পতাকা শ্বেতবর্ণ এবং ত্রিশূল অঙ্কিত। শ্বেতবর্ণ শান্তির বর্ণ, সমষ্টির বর্ণ এবং জ্ঞানের পূর্ণাবস্থার বর্ণ। ধর্ম্মের পতাকা তলে সকলেই শান্তি লাভ করে। ধর্ম্ম মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়া থাকে যে সকলে একেরই বিকাশ। ধর্ম্ম মানুষকে পূর্ণাবস্থায় লইয়া যায়। ত্রিশূল সমূলে ধ্বংসের অস্ত্র। ত্রিশূল তিনটি অজ্ঞানতাকে সমূলে ধ্বংস করিবার ইঙ্গিত দিয়াছে। প্রথম অজ্ঞানতা 'ভোগের ইচ্ছা' (মনের অস্বাভাবিক ভোগমুখী গতি)। ইহাকে নিয়মিত না করিলে পূর্ণতার গতি আসিতে পারে না। দ্বিতীয়টি 'মোহ', ইহা চিত্তকেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতা। 'মোহ' নষ্ট হইলে চিত্তকেন্দ্র খুব সহজেই ভেদ হইয়া যায়। ইহা চিত্তকেন্দ্রস্থিত অজ্ঞানতা। এই মোহের ফাঁসে বদ্ধ হইলে, মানুষ নির্লজ্জের মত নিজের দুষ্ট ছেলের সুবিধার জন্য অন্যের ভাল ছেলেটিকেও অচ্ছ্যুত প্রস্তুত করে। তৃতীয়টি 'অভিমান' (জীবত্বের অভিমান)। ইহারা ধর্ম্মজগতে প্রবেশের শূল। ইহা থাকিতে ধর্ম্মজগতে প্রবেশ অসম্ভব। ভোগের ইচ্ছা থাকিলে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয় না। মোহ থাকিলে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ অসম্ভব। অভিমান থাকিতে রুদ্র গ্রন্থি ভেদ হয় না। যে কোন নামজাদা মহাপুরুষকে এই ত্রিশূলে মাপিয়া লওয়া যায়।

ধর্ম্মের পতাকাতলে সকলে সমান, সকলে এক। ভোগেচ্ছা, মোহ এবং অভিমান শান্তির বিরোধী, ধর্ম্মের বিরোধী, আত্মবিকাশের বিরোধী। ধর্ম্ম এবং পূর্ণতার পথে এই

গুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিবের কেন্দ্রের অনুভূতিও থাকা চাই। 'ত্রিশূল' এই তিনটি অজ্ঞানতাকে নষ্ট করিবার জন্য বিশেষ নজর রাখিবার ইঙ্গিত দিতেছে। মনোময় কোষের শেষস্তরে ধর্ম্মের আরম্ভ এই কথা বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য ত্রিশূল শান্তির (শ্বেতবর্ণের) সহিত যুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক মানুষের এই কথাগুলি স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা ধর্ম্মের নামে ঝগড়া করিবার জন্য কোমর বাঁধে, তাহারা অবশ্যই ভাবিয়া দেখিবে তাহা ধর্ম্ম কী গুণ্ডামী। যাহারা মন্দিরকে পবিত্রতার নামে ভক্তের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দল বাঁধে তাহারাও ভাবিয়া দেখিবে তাহা 'ধর্ম্ম' কি 'মোহ'। ধর্ম্মের ক্ষেত্র এত ছোট নহে। যাহা হউক ধর্ম্ম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধনাই ধর্ম্মের পথে প্রধান অবলম্বন। শিক্ষাশক্তি, বীরশক্তি (গণেশ শক্তি) এবং সমাজ শক্তি ইহার সহায়ক।

পূর্ব্বোক্ত গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব এই সব শক্তি সকল মানবের অন্তরেরই শক্তি। এই অন্তরস্থিত শক্তিগুলিকে মানুষ জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মবিকাশের সহায়তা গ্রহণ করিতেছেন। এ সব প্রতিষ্ঠিত শক্তি মানুষকে রক্ষা করিতেছে, পুষ্ট করিতেছে এবং আত্মবিকাশের পথে সাহায্য করিতেছে। মানুষ স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতিতে উপরি উক্ত সমস্তগুলি শক্তিরই বিকাশস্থল হইবে। মানব-সমাজও স্তরে স্তরে (শিবের যুগ হইতে আরম্ভ) উপরি উক্ত শক্তিগুলি স্থাপন করিয়াছে। ইহার একটি শক্তিও মানুষের কল্পনা-প্রসূত নহে। মানুষ কল্পনা করিয়া ঐ সব শক্তিগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্থান দেয় নাই। মানুষের অন্তরে ঐসব শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশ আছে। মানুষের অন্তর-প্রকৃতিতে যখন যেমন স্তরের শক্তি খেলিতেছে, মানুষ তখন সেই স্তরের শক্তিতে আত্মসমর্পণ করিতেছে, সেই শক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতেছে, আবার সেই শক্তিকে জগতে প্রচার করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছে। নিম্ন স্তরের মানুষ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই উন্নত স্তরে আসিতেছে। মানব প্রকৃতির কি সুন্দর বিনিময় ধারা ! এক সঙ্গে অন্তরস্থিত সমস্ত শক্তি মানবে বিকাশ হয় না। বহু জন্ম ধরিয়া মানুষ এক একটি স্তরের বিকাশে আত্মনিয়োগ করে এবং পূর্ণভাবে সেই স্তরের বিকাশস্থল হইয়া অন্য স্তরের বিকাশে যত্নশীল হয়। এইরূপ হওয়াই প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক। মানব যখন যে স্তরের বিকাশস্থল হয়, তখন সেই স্তরটাই শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্য স্তরের নিন্দাও করে (জানে না বলিয়া)। কেহ কেহ নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া অন্য স্তরের শক্তিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্য স্তরকে কিছুতেই গ্রাস করিতে পারে না। সহস্র সহস্র বৎসর ধস্তাধস্তির পর আবার অন্য স্তরের শক্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে।

মানুষের মনোবিজ্ঞান বা অন্তর বিজ্ঞানের সর্ব্ব সম্পদই ভারতের জ্ঞানে ধরা পড়িয়াছে। ভারতের ঋষি উপাসনা কাণ্ডে তাহা অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। উপাসনার সিঁড়ি ধরিয়া সাধনা দ্বারা মানব মাত্রই অন্তরের সম্পদ রাশির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। ইহাতে জাতিভেদ, দেশভেদ এবং সমাজভেদের কোনই প্রশ্ন নাই।

প্রথম সৃষ্টিতে মানুষের আদি পুরুষ ঋষি। তাঁহারা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পূর্ণ ক্ষেত্র ছিলেন। আট কলায় মানুষের অভিমান পূর্ণ হয়। তাঁহারা পাশহীন (অষ্ট পাশের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে), সংস্কারহীন এবং ভোগেচ্ছা বিহীন মানব ছিলেন। তাঁহারা

প্রাকৃতিক জীবন যাপন করিতেন। সত্য, সরলতা এবং তুষ্টি তাঁহাদের স্বাভাবিক সম্পদ ছিল। ঋষিগণ শিবের স্তরের মানুষ। শিবের স্তরের অন্যান্য মানুষের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একদল একেবারে বন-জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত নিবাসী। ইঁহারাও উৎকট অভিমান, উৎকট সংস্কার এবং ভোগের উৎকট চেষ্টাবিহীন মানব। শিবের স্তরের আরও বিশেষত্ব এই যে, বুদ্ধির চালনা করিতে পারেন না। শিবের স্তরের মানুষ বেশ নিরীহ প্রকৃতির মানুষ হন। ইঁহাদিগকে কেহ যেন ছোট মনে না করেন। বাস্তবিক ইঁহারা খুব ভাল মানুষ হইয়া থাকেন। ইঁহাদের দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে সমস্ত বিভাগের কর্ম্মশক্তি ইঁহারাই হইয়া থাকেন। ইঁহারা জগতের কোন অনিষ্ট করেন না। ঋষিগণ আট কলা শক্তি সম্পন্ন মানব কিন্তু শিব স্তরের অন্যান্য মানব ৪ কলার একটু বেশী শক্তি সম্পন্ন। ত্যাগ (৫ কলার শক্তি), শিক্ষা (৬ কলার শক্তি), সংগঠন (৭ কলার শক্তি) এবং শান্তি (আট কলার শক্তি) কে পূর্ণরূপে অন্তরে পাইয়া ঋষিগণ এইসব মানবত্বের সম্পদের অধীন হন না। আবার এই শিবের স্তরের অন্যান্য লক্ষণ সম্পন্ন মানবে উপরি উক্ত কলা চতুষ্টয়ের পুষ্টির অভাবে পূর্ণ মানব সম্পদের (গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু আদির) বিকাশই দেখা যায় না। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, গণেশের পথ ধরিয়া আত্মগঠনে তৎপর হইতে আরম্ভ করিলে যে কোন মানুষ অন্তর সম্পদগুলি নিজ চরিত্রে শীঘ্র বিকাশ করিতে পারেন।

এই জগৎ যদি ধর্ম্মশাসন (নিজ নিজ শাসিত, শাসকহীন শাসন) মানিয়া লয় তবে এই পৃথিবীর মানব সকল ধীরে ধীরে শিবের স্তরের মানুষ হইয়া যাইবেন। শিবের স্তরের মানুষ ভিন্ন ধর্ম্মশাসন সুন্দর ভাবে অন্য কেহ মানিতেই পারেন না। এই শাসন জগতে প্রতিষ্ঠিত হইলে জগৎটী বৈদিক যুগের জগৎ হইয়া দাঁড়াইবে। একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এইরূপ যুগ আর আসিতেই পারে না। অনেকে বৈদিক যুগের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় আছেন। এখানে পরিষ্কার বলা ভাল যে বৈদিক যুগ প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টিতে আবার আসিবে। এই সৃষ্টিতে আর আসিবে না। তবে এ কথাও জানিয়া রাখা ভাল শিবের স্তরের মানুষ চিরদিনই বৈদিক যুগ ভোগ করেন। যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসী এবং পাহাড় পর্ব্বত নিবাসী বা অন্যান্য সরল প্রকৃতির মানুষের নিকট বৈদিক যুগ সব দিনই বিদ্যমান। এইরূপ প্রত্যেক স্তরের মানুষই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেদের যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন। সকল মানুষের নিকট বৈদিক যুগ আসিলে মানুষের ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সকলের নিকট বৈদিক যুগ আসিলে গণেশশক্তি, সূর্য্যশক্তি এবং বিষ্ণুশক্তি সম্পন্নগণ কোথায় যাইবেন? আমরা শক্তির যুগ বা পূর্ণতার যুগ আনিতে চাই।

আট কলা শক্তিসম্পন্ন মানবই প্রথমে ধরাধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিতে আট কলা বা ৪৷৹ কলা শক্তি সম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ প্রাকৃতিক বিকাশই মানুষকে ৫, ৬ এবং ৭ কলায় পুষ্ট করিবে। মানুষের মধ্যে উন্নত কলা পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যুগেরও পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। ৪৷৹ কলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ কলা শক্তিসম্পন্ন মানুষ তো নিশ্চয়ই থাকিবে, ইহার উপরেও বিকাশ আছে। সে কথা শক্তি স্তরে বলা হইবে। সুতরাং শুধু ধর্ম্মশাসন চলিবার পথ নাই।

বর্ত্তমান সময় সর্ব্বত্রই যুবকগণের মধ্যে ধর্ম্মবিরোধিতার কথা শুনা যায়। বাস্তবিক সকলেই যে ধর্ম্মের বিরোধী একথা স্বীকার করা চলে না। প্রকৃত ধর্ম্ম যে কি তাহা শিবের স্তরের মানুষের সঙ্গ (বিশেষ করিয়া যোগী এবং তপস্বীর সঙ্গ) না করিলে বুঝা যাইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময় ধর্ম্ম কতকটা অজ্ঞান সংস্কারে, মনগড়া কল্পনায় বা ভাবের আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে আশ্রয় করিয়া স্বার্থ এবং ভাবের ঘরে চুরিই বেশী চলিয়াছে। যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের স্বার্থে বা আঁতে ঘা পড়িতেছে তাহারা সেই সব যুবকগণকে নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যেখানে যুবকগণ নিজেরা সত্যবাদী, ত্যাগী, সংযমী, কর্ম্মনিষ্ঠ, সেখানে এইরূপ বিরোধিতা স্বাভাবিক, কারণ ক্রম-বিকাশে গণেশস্তরের মানুষ অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে নাস্তিক বলিলে অন্যায় হইবে। কিন্তু যুবকগণের মধ্যে অনেকে নিজেরা উচ্ছৃঙ্খল, মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন, পরনিন্দা পরায়ণ এবং কর্ত্তব্যে দায়িত্বহীন। এমন যুবকে এবং স্বার্থবাদী ধার্ম্মিকে বিশেষ ভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। সত্যবাদী এবং কর্ম্মনিষ্ঠ যুবকগণ যেন দুই দিকই সংযত করিবার চেষ্টা করেন।

শিবের স্তরে আসিয়া যেরূপ মানুষ পাইলাম তাঁহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা হইল। এক তো যোগী, ঋষি, মুনি, সন্ন্যাসী প্রভৃতি। দ্বিতীয় পূজারী, মুটে, মজুর, চাকর, রাঁধুনী, চাপরাসী প্রভৃতি। তৃতীয় বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত নিবাসী সাধারণ মানব। প্রথম বিভাগে সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না কারণ তাঁহারা সংগঠনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলেও তাঁহারাই মানুষকে শক্তিস্তরের আদর্শের সন্ধান দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময় শিবের স্তরের উপলব্ধিবান মহাপুরুষ খুবই কম আছেন, সংস্কার-এর উপরের স্তরের মানুষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বেশী প্রয়োজন। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্পন্ন মানবের সংগঠিত শক্তির পরিচালক বিষ্ণুশক্তি সম্পন্ন হওয়া চাই। তৃতীয় লক্ষণসম্পন্ন মানুষের সংগঠন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া করিলে ভাল হয়। এই সব মানুষ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারেন এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকের (স্বার্থহীন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট বীর পুরুষ হইলেই ভাল হয়) অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চলিতে পারেন।

তৃতীয় ভাগ

গীতার পুরুষোত্তম

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি - দুর্গা

এতক্ষণ আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বরীয় অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছি। সেই সব ঈশ্বরীয় শক্তি খণ্ড বা অপূর্ণ। এক শক্তির সহিত সংযোগলাভে অন্য শক্তির সহিত বিচ্ছেদ করিতে হয়। যদিও এক শক্তি অন্য শক্তিতে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, তবুও এক শক্তি যে অন্য শক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের শক্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং স্থূল জগতে বা কর্ম্ম জগতে উহারা কেমন বিভিন্ন স্বভাবের মানব চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমরা মোটামুটী বুঝিয়া লইয়াছি। মানুষ যখন যেমন স্তরে আত্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহার কর্ম্মে, ভাবে এবং বিচারে সেই কেন্দ্র-শক্তির দৃঢ় বিশ্বাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহজে তাঁহাদিগকে আপন দার্শনিক অবস্থা হইতে বিচলিত করা যায় না। যিনি সত্যই কর্ম্ম এবং অনুভূতির মধ্য দিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি নিম্ন স্তরে দার্শনিক অবস্থায় এবং কর্ম্মে যে দুর্ব্বলতাটুকু আছে তাহা দুই একটি প্রশ্ন দ্বারাই ধরাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহার দল জমিয়া যায় এবং যশে ও দলে যাঁহার মোহ আছে তাঁহার পক্ষে উন্নত স্তরের সত্যকে গ্রহণ করা মোটেই সহজ নহে। তাহা করিতে হইলে তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে। মানুষের আত্মবিকাশের পথে এই মোহ এক ভীষণ শত্রু।

কি কর্ম্মী, কি উপাসক, কি জ্ঞানী, প্রত্যেককেই ভোগের ইচ্ছা, মোহ এবং অভিমানকে ত্যাগ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যদি মানব-কল্যাণ এবং আত্ম-কল্যাণ তাঁহার লক্ষ্য হইয়া থাকে। সত্যই যিনি আত্ম-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তিনি সত্য, প্রেম, শান্তি, এবং আন্তরিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি প্রয়োগের আদর্শ গ্রহণ করিবেন। কর্ম্মীমাত্রই এইরূপে নিজের জীবন-লক্ষ্য স্থির করিবেন। নিজে এই সব দুর্ব্বলতার পরপারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধীনস্থিত সকলকে এইভাবে গড়িয়া লইবেন। প্রথম প্রথম নিজেকে গড়িয়া লওয়া যেমন কঠিন মনে হইবে, তেমনি নিজেকে গড়িয়া না লইলে অন্যকে গড়িয়া লওয়া সহজ হইবে না। শক্তি-কেন্দ্রই (বা আত্মার পূর্ণতম অবস্থার কেন্দ্রই) আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম বিকশিত অবস্থার কেন্দ্র। অভাবের তাড়না, হারাইবার ভাবনা এবং মৃত্যুর যন্ত্রণা এখানে নাই। এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একদিকে নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টক জীবন লাভ করি আবার অন্যদিকে কর্ম্ম করিবার বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকি। এখানে দাঁড়াইয়া আমরা যেমন দুর্ব্বলতা হীন হই তেমনি দুর্ব্বলতার আড়ালে সুবিধা ভোগ করিবার মত দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলি আমাদিগকে ছাড়িয়া একটু দূরেই অবস্থান করে।

আমরা না বুঝিয়া নিজেদের কর্ম্মশক্তিগুলিকে অন্যায় ভাবে নষ্ট করিয়া থাকি। আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, হিংসা ও দ্বেষকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের স্বাভাবিক শক্তির

সহজ অবস্থাকে ভুলিয়া গিয়া দিনরাতই ব্যস্ত হইয়া থাকি। ভোগের দিকে কাল্পনিক বেগ, মোহ এবং অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের অশান্তি এবং উদ্বেগের কারণগুলি জীবিত থাকে। আমাদের লক্ষ্য কিরূপ অস্বাভাবিক ভাবে অসত্যের ভিত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছে তাহা সত্যই ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জীবন-সংগ্রামের সম্মুখে বেশীর ভাগ অশান্তিই বিষ্ণু-কেন্দ্রের দুর্ব্বলতাগুলিকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। আমরা বাঁচি খুব বেশী হইলে শত বৎসর মাত্র; কিন্তু আমরা ভাবি ২/৫ শত পুরুষের কথা। নিজের তৃপ্তি দেখি না, নিজের নিশ্চিন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবি না, ভাবি সেই কল্পনা-জগতের কথা। আমরা ভাবি যে আমাদের ছেলেরা সুখে স্বচ্ছন্দে এবং নিজেদের মধ্যে সংগঠিত ভাবে থাকে, কিন্তু আমরা নিজেরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিশিয়া থাকিতে চাহি না। আমাদের ছেলেরা যে আমাদেরই মত একদিন নিজেদের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে পারিবে না একথা আমরা বুঝিয়াও যেন বুঝি না। মোহ আমাদের এমনই প্রবল যে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য তাহা উপেক্ষা করিয়া কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ভাবিয়া ও কঠোর ভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবনীশক্তি বৃথা ক্ষয় করিয়া ফেলি। আমাদের লক্ষ্য দেশ এবং সমাজে আত্ম-বিকাশ বা কর্ম্ম-বিকাশের অনুকূল না হইয়া মোহের দিকে হইবার দরুণ আমরা নিজেরাই যে প্রতারিত হইতে চলিয়াছি ইহা আমরা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি। আমাদের এই লক্ষ্য-ভ্রান্তির দরুণ আমাদের সমাজ এবং দেশ দিন দিন অধঃপতনের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহাদের জন্য ভাবিয়া আমরা এইরূপ করিতেছি সেই সন্তান সন্ততিগণই দিন দিন নিরাশ্রয় এবং দরিদ্র হইয়া চলিয়াছে। একটু সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে যে কত সুখ তাহা বুঝি, কিন্তু সেই ২০০ বৎসর ব্যাপী সুখ-স্বপ্ন আমাদিগকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে দেয় না। এই মোহ-জালে আবদ্ধ সুখ-স্বপ্ন আমাদিগকে বর্ত্তমান সুখ হইতে বঞ্চিত করে, আত্মার পূর্ণতম বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়; আবার সেই স্বপ্ন-জালে আবদ্ধ হইয়া এই পৃথিবীতে যে সব কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করি তাহাও লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্ম বিকাশের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে।

অভিমানকে (তামসিক অহঙ্কার বা জেদ্‌কে) জীবিত রাখিবার জন্য আমরা এমন সব কার্য্য কলাপের পশ্চাৎ ধাবিত হই যাহার পাকে চক্রে পড়িয়া অন্তর্জগৎ (চিন্তা জগৎ) তো নিষ্পেষিত হয়ই, অধিকন্তু অন্যকেও নিষ্পেষিত হইতে বাধ্য করি। এরূপ মোহ এবং অভিমানের বস্তুতঃ কোন ভিত্তি নাই। ইহা আমাদের পূর্ণ বিকাশের পথকে খর্ব্বই করে। ইহা আমাদের ভাবজগতের (মনোজগতের) এক একটী ঢেউ। ইহাদিগকে বাঁচাইয়া না রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেই স্বাভাবিক শান্তি এবং স্বাভাবিক কর্ম্মের পথ সরল হয়। সমাজের উপরও যে আমাদের দায়িত্ব আছে তাহা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপালিত হয়। সে দায়িত্বকে পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের নূতন করিয়া কর্ম্মের প্রোগ্রাম করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

একদিকে একদল মানুষ মোহে এবং অভিমানে বদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুণ তাহাদের দৃষ্টিশক্তির সীমা সঙ্কুচিত বা খুব সামান্য স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়; অর্থাৎ তাহাদের চিন্তা জগতের বৃহত্তর পরিধি খর্ব্ব হয়। তাহারা বাস্তবকে আর দেখিতেই পায় না। এই

সুযোগে একদল আসুরিক প্রকৃতির লোক এই দুর্ব্বলতার সুবিধাটী হস্তগত করিয়া লয়। আসুরিক প্রকৃতির মানুষও অভিমান এবং মোহবদ্ধ, কিন্তু তাহারা বেশী বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মপ্রিয় হইয়া থাকে। তাহারা নিজেদের প্রয়োজনকে অতি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারে। তাহাদের দোষ তাহারা নিজেদের প্রয়োজনকে কেবলই ভোগে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে; মোক্ষের স্থান তাহাদের নীতির লক্ষ্য থাকে না। এদিকে যাহারা কেবলই মোহ এবং অভিমানবদ্ধ তাহারা নিজেদের চিন্তাটাকে কেবলই কাল্পনিক-জগতে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ভোগ যদিও তাহাদের লক্ষ্য, কিন্তু তাহারা নিজেরা মোহান্ধ হইবার দরুণ ভোগকে নিয়মে রাখিতে পারে না। যাহা হউক দেশ এবং সমাজের প্রত্যেক কর্ম্মীই ভোগের কল্পনা, মোহ এবং অভিমানকে নিয়মিত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা আত্মার পথে চলিয়াছি। আত্মাকে পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। সেই আত্মাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইব, সেই আত্মার শক্তিকেই অন্তরে জাগাইয়া তুলিব এবং এই বিশ্ব-সংসারে সেই আত্মারই বিকাশ প্রত্যেক মানুষে প্রত্যেক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিব। স্ত্রী-পুত্রই আত্মা নহে। আত্মার ব্যাপকত্ব আরও বেশী। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম এবং রাজশক্তি সবই আত্মবিকাশের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আজ যদি ঐ সবের ভিত্তি নষ্ট হইয়াও গিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। আমরা অন্তরস্থিত শক্তির সহায়তায় নিজেদের পথ করিয়া লইব। সত্য, প্রেম, শান্তি এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগের অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইতে পারি তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। মানুষ স্বভাবতঃই আত্ম-বিকাশের পথে চলিয়াছে, যদিও সকলে সে কথা জানে না, কিন্তু কথাটা সত্য। আমরা যেদিন এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইব, সেদিন যেন জানিতে পারি বা বুঝিতে পারি এবং এ জগৎও যেন বুঝিতে পারে আত্মাকে বিকাশ করিয়াছি, সঙ্কোচ করি নাই।

এখানে কর্ম্মীগণকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা হইতেই মোহ এবং আসুরিকতা আসিয়া থাকে সুতরাং মানুষের কোন্ চিন্তা-ধারা কোন্ স্তর হইতে আসিয়াছে তাহা বিচার করা প্রয়োজন। বড়লোক বা নামী লোকের কথা শুনিয়াই বিচলিত হইও না। বিচার করিতে চেষ্টা করিবে এই চিন্তা কোন স্তরের দান। তাহা হইলেই পথ সহজ হইবে। সব সময়েই শক্তি-কেন্দ্রপুষ্ট চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক ভাল বস্তু বিষ্ণু এবং সূর্য্যকেন্দ্রপুষ্ট নিয়মে আবরিত আছে। কারণ ভারতে বহুদিন হইতে এই দুইটী কেন্দ্র-পুষ্ট রীতিনীতির প্রাধান্য খুব বেশী। তাই খুব সাবধানে আবরণ ত্যাগ করিয়া মূল গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, নইলে নিজেই প্রতারিত হইবে। একই দেশ-সেবা, দেব-পূজা, লোক-সেবা, সমাজ-সেবা, সাধনা এবং শিক্ষা বিভিন্নকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ বা বিভিন্নলক্ষ্যপুষ্ট মানুষ বিভিন্ন প্রকারে দিতে চেষ্টা করিবে। তুমি তোমার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিবে, বা ত্যাগ করিয়া নিজের লক্ষ্যের পথ ধরিয়া নিজের কাজ করিয়া চলিবে। সর্ব্বোপরি দুটী কথা মনে রাখিও - কর্ম্মহীন হইও না, মৃত্যু ভয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইও না। আমরা শক্তির কোলে আশ্রয় লইতেছি। এখানে মৃত্যুভয় রূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় নাই, কর্ম্মহীনতারও আশ্রয় নাই।

জ্ঞানের অংশ বা কলার কথা পূর্ব্বে (শিব অংশে) আলোচনা করা হইয়াছে। জীব যখন যেমন কলায় অবস্থান করে তখন সেই কলাকেই অন্য কলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে

করে। ইহা সমস্ত জীবের সাধারণ এবং স্বাভাবিক মোহ; এই মোহই তাহাকে সেই কলাস্থিত মোহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীবের স্বভাবে আরও একটী বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা হইল এই যে - কেহই নিজ নিজ বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। (অবশ্যই এই অসন্তুষ্টির ভাব শিব স্তরের অনুভূতি আসিলে শেষ হইয়া থাকে)। এই অসন্তোষপূর্ণ মনোবৃত্তিই প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রমাণ আনিয়া দেয় যে তাহার আরও উন্নত বিকাশের প্রয়োজন আছে। উন্নত কলায় বা স্তরে না আসিলে সে কিছুতেই নিম্ন কলাস্থিত জ্ঞানে এবং শক্তিতে সত্যই কি অভাব বা দুর্ব্বলতাটুকু আছে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

শিব অংশে পঞ্চ কোষের কথা বলা হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ পর্য্যন্ত যথাক্রমে এক হইতে চার কলার বিকাশ। উক্ত পঞ্চ কোষের মধ্যে অন্নময় কোষ বৃক্ষে (উদ্ভিজ্জে) এবং প্রাণময় কোষ পশুতে (জরায়ুজে) বেশী পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রকৃতির কোলে চারকলাপুষ্ট জীবসকল পশুর আকারে জন্মগ্রহণ করে। চারিকলা হইতে কিঞ্চিদধিককলাপুষ্ট জীব মানবাকারে জন্ম গ্রহণ করে। মানুষ যখন পাঁচ কলায় দাঁড়ায় তখন তাহারও আকার (বিশেষ করিয়া মাথার আকার) যে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহাও আমরা বিচার সাহায্যে বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহার স্বভাবেই সেই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্বভাবের সংক্ষেপ ইঙ্গিত - নিরভিমানতা, সত্যের গ্রহণ, অন্যায়ের বিরোধিতা এবং বিষয়সঙ্গ জনিত বাসনার ত্যাগরূপে ধরা পড়ে। যে কোন মানুষের স্বভাবে ওরূপ বিকাশ আসিয়া গিয়াছে তাহাকেই পাঁচ কলার বিকাশস্থল বুঝিতে হইবে। যাহা হউক আট কলার বিকাশ পূর্ণ হইলে মানবের স্বভাবে জীবত্বের অভিমান (আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি শূদ্র, আমি চণ্ডাল, আমি ইংরেজ, আমি বাঙ্গালী, আমি ধনী, আমি দরিদ্র ইত্যাদি ভাব) নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যশাস্ত্রে ইহাকেই জীবন্মুক্তির অবস্থা বলা হইয়াছে। জীবত্বের শেষ এবং শিবত্বের আরম্ভ ৭॥০ কলা বিকাশের পরই আরম্ভ হইয়া থাকে। ১৫ কলা পূর্ণ হইলে শিবত্বের পূর্ণাবস্থা হয়। ইহাই পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা। অর্থাৎ চারি কলার বেশী সবগুলি কলার বিকাশই মানব শরীরে হইয়া থাকে।

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিতের মতে মানুষের পরেও অন্য কোন আকারের জীব মানুষ হইতে উন্নত কলার বিকাশ লইয়া পৃথিবীতে আসিবে। বাস্তবিক তাহা সমর্থন করা যায় না। অন্যান্য জীব হইতে মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিলে এ কথার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কোন মানুষ চেষ্টা করিলে জ্ঞানের সবগুলি কলার বৈশিষ্ট্যই নিজের চরিত্রে বিকশিত করিতে পারে। এ বিষয়ে মানুষ মাত্রই স্বাধীন, কিন্তু অন্যান্য জীবে এরূপ কোনই স্বাধীনতা নাই। অন্যান্য জীবে প্রকৃতিপ্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট কলা আপনিই বিকশিত হয়। বাধা দিয়াও সে বিকাশকে আটকান যায় না। মানবেতর জীবে প্রকৃতি প্রদত্ত বিকাশ-বৈচিত্র্য তাহার চরিত্রে প্রতিভাত হইবেই। একটী কাকের ডিমকে আনিয়া একটা কবুতরের বাসায় কবুতরের ডিমের সহিত রাখিয়া দিলে কাকের ডিমটী ফুটিয়া ছানাটি ক্রমে বড় হইলে কাকের ডাকই ডাকিবে। কোন অজ্ঞাত শক্তি প্রভাবে কাকের চেষ্টাই শিখিয়া লইবে। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। প্রকৃতি যেন পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছাধীন হইয়া ধরা দিয়া মানুষেরই চেষ্টার অধীন হইয়া পূর্ণ-বিকাশের

জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে সবটাই বিকাশ করিবে। আবার মানুষ যদি ইচ্ছা না করে বা ভুল করে তবে সে কিছুই বিকাশ করিতে পারিবে না। বিকাশের পথে মানবে প্রকৃতিদত্ত এমন কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য নাই যেরূপ বৈশিষ্ট্য মানবেতর অন্য জীবে রহিয়াছে। মানুষ যেন প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাই মানুষ সঙ্গ, শিক্ষা এবং সাধনা দ্বারা পূর্ণ-কর্ম্মী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে পারে, আবার মানব সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া, কুকুর, বিড়াল, ব্যাঘ্র, সিংহাদির সমাজে লালিতপালিত হইলে সেইরূপ পশুর চরিত্রই আয়ত্ত করিবে। এরূপ অবস্থায় নিজের ভাষা পর্য্যন্ত সেই পশুর ভাষায় রূপান্তরিত করিবে। মানুষ যদি নিজে ইচ্ছা করে তবে নিজের পূর্ণ জ্ঞানবিকাশের পথে যতই বাধা আসুক না কেন মানুষ তাহাকে অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করিবে। যে কোন মানুষে গণেশ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বেশী প্রস্ফুটিত তাহাদের উন্নত বিকাশের পথে কিছুতেই বাধা দিয়া আট্‌কান যায় না। বাধা তাহাদিগকে বেশী শক্তিশালী করিয়া দিবে। শিক্ষা, সমাজ, গুরু* এবং রাজশক্তি বিপুল শক্তি লইয়া তাহাদের বিকাশের পথে বাধা দিতে আসুক, দেখিবে সকলেই হার মানিয়াছে। মানুষ যদি নিজে ইচ্ছা করে আর মানুষ যদি নিজের দুর্ব্বলতাকে বুঝিতে পারে তবে মানুষের পূর্ণ বিকাশের পথে যতই বাধা আসুক না কেন মানুষ নিজের লক্ষ্যে কৃতকার্য্য হইবে; কারণ প্রকৃতিই মানুষকে ঐ ভাবে গড়িয়াছেন বা প্রসব করিয়াছেন। অন্যান্য জীব সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। অন্যান্য জীবের অন্তরের প্রাকৃতিক বিকাশ-বীজ প্রকৃতিই ফুটাইয়া তুলিবে। মানুষে মনোময়-কোষের বিকাশ হইবার দরুণ এই বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে। মানবেতর অন্যান্য জীবে মনোময় কোষ ভাল প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাই বিকাশের পথে সেই জীবের নিজের ইচ্ছা-শক্তির কোনই আধিপত্য নাই। বাহিরের সঙ্গ, সমাজ সেই জীবের প্রাকৃতিক বিকাশের পথেও বাধা দিতে পারে না। মানুষের বিকাশ মানুষের নিজের অধীন। অন্যান্য জীবের বিকাশ প্রকৃতির অধীন। মানুষের ইচ্ছা-শক্তিকে যদি পশুত্বের সীমার মধ্যে এমনি করিয়া আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় যাহাতে মানুষ পশুত্ব ভিন্ন অন্য কিছু ধারণা করিতে না পারে, অর্থাৎ মানুষ যদি নিজের অন্তরে (ইচ্ছার কেন্দ্রে) পশুত্বকেই বরণ করিয়া লয় তবে মানুষ পশুই হইয়া যাইবে। প্রকৃতির শক্তি নাই যে প্রকৃতি তাহাকে মানুষরূপে গড়িয়া লয়। মানুষের শাসন-যন্ত্র যদি শক্তি-স্তরের আদর্শে গঠিত থাকে, মানুষের সমাজকে যদি বিষ্ণু-কেন্দ্রের উন্নত

---

* অনেকের ধারণা হইতে পারে গুরু বিকাশে বাধা দিবেন এ কিরূপ কথা? গুরু যদি গুরু-স্তরের মানুষ হন তবে কখনও বাধা দেয় না, সাহায্যই করেন। কিন্তু গুরু যদি অনুভূতিতে সূর্য্য এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রের সীমা অতিক্রম না করেন তবে বাধা শিষ্যকে সহ্য করিতেই হইবে। গুরু যে কেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন শিষ্য তাহা হইতে উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় গুরুদ্বারা প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইবেন। গুরুতে ভক্তির আবরণে মোহ শিষ্যে স্বভাবতঃই আসিয়া যায়; ঐ মোহ যদি শিষ্য না কাটাইতে পারেন তবে শিষ্য উন্নত স্তরে আসিতে পারিবেন না। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে এবং গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতির জোর থাকিলে শিষ্য সব বাধাই অতিক্রম করিতে পারিবেন।

আদর্শে স্থাপিত করিয়া দেওয়া যায় এবং মানুষের শিক্ষা যদি মানুষের বিকাশের অনুকূল হয় এবং মানুষে যদি গণেশ-কেন্দ্র পুষ্টির কোন প্রকার পথ থাকে তবে মানবসমাজে অসীম সুখের যুগ আসিবে। শিক্ষার বিকাশও মানুষের অত্যন্ত আশ্চর্য্য বিকাশ। মানব-স্বভাবে এসব আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে - মানুষ প্রকৃতির কোলস্থিত অন্যান্য জীবের মত জীব নহে। মানুষের কর্ম্মশক্তি এবং জ্ঞান-শক্তি বিকাশে অসীম শক্তি মানুষের হাতেই রহিয়াছে। মানুষের সমাজে পশুর মত স্বভাব বিশিষ্ট মানুষও রহিয়াছে। আবার বুদ্ধ, শঙ্কর, রাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মত মহাপুরুষও রহিয়াছেন। মানুষের নিকট এই পৃথিবীতে যদি অন্য কোন আকারের জীব আরও উন্নত বিকাশ লইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় তবে একথা আপনারা জানিয়া রাখুন যে মানুষ সেই উন্নত বিকাশের সর্ব্ব সম্পদই আয়ত্ত করিয়া লইবে। আর মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই উন্নত সৃষ্টিকে মানুষ নিজ বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তির বলে ধ্বংস করিয়া দিয়া প্রকৃতির স্পর্দ্ধাকে খর্ব্ব করিয়া দিবে। অভয়, তেজ, ত্যাগ, অহিংসা আদি দৈবী সম্পদ এবং গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি আদি ঈশ্বরীয় সম্পদ (বা শক্তি সম্পদ) মানুষে বিকশিত হইয়াছে, এসব শক্তি আয়ত্ত করিয়া মানুষ অসীম শক্তিশালী হইয়াছে। সুতরাং মানুষের চক্ষের সামনে প্রকৃতি যত বড় বিকাশই মূর্ত্ত করুন না কেন তাহার আকারটি মানুষের মত করিয়াই গড়িতে হইবে। আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি প্রকৃতি মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়াছেন, তাই অন্য কোন আকারের উন্নত বিকাশ এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করিয়া হইবার পন্থা নাই।

মানুষ নিজের বিকাশের পথে নিজে কণ্টক প্রস্তুত করে। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিবস্তরের মোহ মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মানুষের অন্তর্জগতে দুইটী শক্তিশালী কেন্দ্র রহিয়াছে; তাহার একটী সেইস্থান যেস্থানে প্রাণময় কোষ মনের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে - অর্থাৎ মনের ভোগমুখী গতির মূলস্থানটী (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৯ চিহ্নিত এবং ১ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখ)। আসুরিক প্রকৃতির মানবগণ এইস্থানের তৃপ্তিকে আদর্শ করিয়া লয়। ইহাকে আমরা ভোগবাদ আদর্শ কেন্দ্র নাম দিব। দ্বিতীয় স্থানটী আনন্দময় কোষ যেস্থানে মনের কেন্দ্রে সংযুক্ত হইয়াছে সেই স্থান (মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১ চিহ্নিত কেন্দ্র এবং ১০ চিহ্নিত রেখা দেখ)। ইহা শক্তি-স্তরের আদর্শের কেন্দ্রস্থান। এই স্তরের কর্ম্ম-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব প্রকার নীতি গড়িয়া লইতে হয়। মানুষ ভুল করে সূর্য্যস্তরের কর্ম্ম-শক্তিকে ভিত্তি করিয়া সমাজ এবং রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া। মানুষ ভুল করে বিষ্ণু স্তরের কর্ম্ম শক্তিকে ভিত্তি করিয়া সমাজ এবং রাজ শক্তিকে নিয়মিত করিতে যাইয়া। বিষ্ণু স্তরের ভিত্তি পর্য্যন্ত মোহ এবং অভিমান থাকিবেই। কাজেই এসব ভিত্তি ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শক্তির কোলে আশ্রয় লইতে হইবে।

যদি জন্মান্তরবাদী বা অধ্যাত্ম-বাদী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে শক্তি-স্তরকে ভিত্তি করিতে হইবে। বাস্তবিক অধ্যাত্ম বাদ বলিতে শক্তি স্তরের অনুকূল আদর্শের ভিত্তিকেই জানিতে হইবে। সূর্য্য এবং বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট চিন্তা ভাববাদের অন্তর্গত। শিব কেন্দ্রপুষ্ট চিন্তা শান্তিবাদের অন্তর্গত। কর্ম্মক্ষেত্রে ভাববাদ এবং শান্তিবাদ সব সময়ই দুর্ব্বলতার আশ্রয়, ইহার চেয়ে ভোগবাদ ভাল। ভোগবাদ, ভাববাদ, শান্তিবাদ এবং অধ্যাত্ম-বাদ এই

চারিটী স্তরের আদর্শকে বুঝা প্রয়োজন। গণেশ কেন্দ্র আদর্শ সব সময়ই শক্তিস্তরের আদর্শের সহায়ক হয়। আবার গণেশ-কেন্দ্রের আদর্শকে ভিত্তি করিলে সমাজ ধীরে ধীরে শিব স্তরের পথে অগ্রসর হইবে। আদর্শ শক্তি-স্তরই হইবে। সহায়ক সব চেয়ে বেশী "গণেশ"। অবশ্যই শক্তি-স্তরের আদর্শকে ধরিতে পারিলে সব স্তর হইতেই উপযুক্ত সহায়তা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ধর্ম্ম স্তরকে গুরুগণ কর্ম্মের দিক দিয়াও শান্তিবাদের অন্তর্গত করিয়া ফেলিয়াছেন। ধর্ম্মের লক্ষ্য শান্তি, কিন্তু ধর্ম্ম-স্তরের বা গুরুগণের কর্ম্ম-লক্ষ্য তাহা নহে। ভারতে চিরদিনই গুরুগণ শক্তি স্তরের বিকাশকে মানব চরিত্রে মূর্ত্ত করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন বিকাশে সাহায্য করাই গুরুর কর্ম্ম, শান্তিতে আকর্ষণ করিলে মানুষের বিকাশ জড়ত্বে পরিণত হয়। এখন ধর্ম্ম বলিয়া মানুষে যাহা বুঝে তাহা সূর্য্য-স্তরের ভিত্তিতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উপাসনা পথের ভিত্তি ছিল "গায়ত্রী উপাসনা" (শক্তি-উপাসনা)। দীক্ষা-গুরু সেই শক্তিকেই প্রত্যক্ষ করিবার পথ শিষ্যকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। তাহাই ছিল - তান্ত্রিক-দীক্ষা। সেই সব সাধনার শক্তিশালী ভিত্তি ছিল বলিয়াই ভারতে সেরূপ শক্তিশালী বীরের আবির্ভাব হইত। অতীত যুগের ভারতীয় বীর রাজাগণের শরীর গঠন সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমান সময়ের রাজাগণের শরীরিক গঠন তাঁহাদের তুলনায় কত শক্তিহীনতার পরিচায়ক। শক্তিশালী সাধনাই ছিল তাঁহাদের শক্তি সংগঠনের প্রধান সহায়। এখন তাহা কোন অজ্ঞাত গুহায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিবে? ভাবের কথা না হইলে তাহা এখন আর ধর্ম্ম-কথাই হয় না। বড় বড় নামী যোগী ও ত্যাগীর নাম ছেলে বেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম হয়ত খুব বড় সাধকই হইবেন ভাবিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু কিছু দিন পর দেখা যায় শক্তিশালী সাধনার কথা দেশকে শুনাইবার কাজ ছাড়িয়া দিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া ভাবাবেশ দেখান বা সমাধি লাগান এবং একদল শিষ্য করিয়া কেবল টাকা যোগাড়ে মন দেন। আজ কাল অনেক স্থলে দুর্গা, কালী আদি শক্তি-পূজায় পর্য্যন্ত ভাবাবেশ ঢুকিয়া গিয়াছে। যাহা চিরদিন সাধকগণের শক্তি-স্তরের অত্যন্ত গোপনীয় সাধনাঙ্গ-পূজা ছিল তাহাও আজ ভাবের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। যাহা হউক শক্তি-স্তরই গায়ত্রীর স্বরূপ, এই গায়ত্রীই আর্য্য সন্তানের উপাসনার ভিত্তি। বাল্যকালেই ইহার সহিত পরিচয় দিবার বিধান আর্য্য সমাজে চলিয়া আসিতেছে। দীক্ষার সময় গুরু সেই শক্তি-স্তরের দিকে শিষ্যকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে আকর্ষণ করিতে থাকিতেন। এখনও ঐরূপ আদর্শ যাহাতে গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এতো অধ্যাত্মবাদের ভিত্তির কথা; কিন্তু যদি ভোগবাদ লক্ষ্য থাকে তবে এতদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। মনের ভোগমুখী কেন্দ্রটীকে জীবনের লক্ষ্যে স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষা এবং সমাজকে সেই ভোগের স্থবিধার জন্য নূতন ছাঁচে গঠন করিতে হইবে। নীরেট নিষ্ঠুর হইয়া জগতকে ভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে শিব-স্তরের শান্তি-সংস্কারকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপদে বিবেকের নির্দ্দেশকে পদাঘাত করিতে হইবে। মিথ্যা, ছলনা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে হইবে। একটী আত্মবিকাশের ভিত্তি (শক্তি বা অধ্যাত্মবাদ), অন্যটী ভোগবিকাশের ভিত্তি। কোনটী চাও স্থির কর। যদি অধ্যাত্মবাদই লক্ষ্য হইয়া থাকে

তবে সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব সকলকেই লইতে পারিবে, কিন্তু ঐ কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলিকে ছিন্ন করিতে হইবে (“রক্তাম্বুজাসনং” সূর্য্য-স্তর, “সরসিজাসনং” বিষ্ণু-স্তর, “পদ্মাসীনং” শিব-স্তর এবং “সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াম্” শক্তি-স্তর; ধ্যানাংশগুলি পাঠ করিয়া লও)। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব দুর্ব্বল স্তর। এখানে অবস্থান করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। হয় মনের ভোগমুখী গতির কেন্দ্রে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পৃথিবীকে ভোগ কর অথবা শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া ভোগ এবং মোক্ষ দুইই লও। এক কথায় হয় রাবণ হইয়া ভোগ কর অথবা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মী হও। কর্ম্মহীন হইয়া ভাবজগতে বেড়াইয়া আর দুই চারটা লীলার কথা শুনাইয়া দিন কাটাইলে চলিবে না। অধ্যাত্ম-বাদের ভিত্তিতে যদি ভাববাদের আবরণ লাগাও তবে তাহার ফলে তুমি দুর্ব্বল হইবে। আর একদল আসুরিক প্রকৃতির লোক শক্তিশালী হইয়া তোমার বাঁচাকে নরক ভোগের সমকক্ষ করিয়া দিবে। তুমি বাঁচিয়া নরক ভোগ করিবে মাত্র। তোমার জীবনের আদর্শ গ্রহণের পূর্ব্বে তোমাকে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য এই ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হইল। এবার চল আমরা শক্তি স্তরে প্রবেশ করিব।

আমাদের অন্তরস্থিত সর্ব্ব শক্তির সমষ্টিকে “দুর্গা বা শক্তি” বলিয়া জানিতে হইবে। ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, দৈবী, আসুরিক যত প্রকারের শক্তি প্রকৃতির মধ্যে বা যে কোন জীবের মধ্যে পাওয়া যায় সকলের শক্তি এই মূল শক্তিতে ধৃত আছে। আমরা জ্ঞানের ১৫ কলা পূর্ণ করিয়া ষোড়শ কলাতে এই শক্তিস্তরে আসিতে পারি। আমাদের আত্মা বলিতে এই স্তরকেই বুঝা যায়। ইহাই ঈশ্বরত্বের অবস্থা। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব আমাদের অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডশক্তির কেন্দ্র বা পীঠ মাত্র। উহারা এই মূল শক্তি সংযুক্ত খণ্ড ঈশ্বরীয় শক্তি। সব ঈশ্বরীয় শক্তিতে এই মূল শক্তির খণ্ডবিকাশ মাত্র রহিয়াছে।

যে সব সাধক এই শক্তির স্তরে আসিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে “হংস” অবস্থার সন্ন্যাসী বলা যায়। এই স্তরকে ঈশ্বরত্বের পূর্ণাবস্থার স্তরও বলা যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী এবং কর্ম্ম-যোগীকে একই স্তরের মানুষ বলিয়াছেন। এ স্তরের অনুভব সম্পন্ন মহাপুরুষে পূর্ব্ববর্ণিত সমস্তগুলি ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভূতির জ্ঞান আছে। আবার এ স্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মিগণে পূর্ব্ববর্ণিত সমস্তগুলি ঈশ্বরীয় শক্তির কর্ম্মবিকাশ যুগপৎ অবস্থিত আছে, কিন্তু তত্তৎ শক্তির দুর্ব্বলতাগুলি থাকে না। তাই তাঁহারা যে কোন স্তরের কর্ম্ম-বিকাশ সম্পন্ন কর্ম্মীগণকে পরিচালিত করিতে পারেন। বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রকৃত কর্ম্মযোগী স্তরের মানুষ এবং প্রকৃত জ্ঞানীস্তরের মহাপুরুষের কার্য্য কলাপের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। কেহ থাকিলেও বা হইলেও তাঁহাদের জীবন চরিত্র অনভিজ্ঞ লেখকগণ এমন সব বিকৃত উপাদানে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন যে তাহা পড়িয়া বুঝাও যায় না। কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন চরিত্র প্রকাশ না হইবার দরুণ কর্ম্মীগণকে এবং সাধকগণকে নানাপ্রকারে অকারণ শক্তি ক্ষয় করিতে হইতেছে। সচরাচর যে সব জ্ঞানী মহাপুরুষের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের অধিকাংশই সূর্য-স্তরের অনুভূতির উপর কোন খবর রাখেন না। লোকে আবার তাঁহাদিগকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। আসুরিকতার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতই

প্রকৃত কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম-লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য, তাহা খুব কমই দেখা যায়। প্রকৃত কর্ম্মযোগী এবং প্রকৃত জ্ঞানীর (শিব বা শক্তি-স্তরের জ্ঞানীর) লক্ষ্য একই প্রকারের হইয়া থাকে। জ্ঞানিগণ জ্ঞানে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের ইঙ্গিত দিবেন। প্রকৃত কর্ম্মীও সেরূপ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। পাঠকগণ জ্ঞানী এবং কর্ম্মীর এই সামঞ্জস্য যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন তবে গীতা এবং যোগবাশিষ্ঠ্য রামায়ণ আলোচনা করিবেন। গীতায় (১৫শ অধ্যায়) ক্ষর-পুরুষ, অক্ষর-পুরুষ এবং পুরুষোত্তমের কথা আছে। পুরুষোত্তমের যে সব লক্ষণ আছে তাহা এই শক্তিকেন্দ্রে আসিলে অনুভব করা যায়। স্থূল-জগৎ, দৈব-জগৎ এবং জ্ঞান-জগৎ যে শক্তির আশ্রয়ে যুগপৎ অবস্থিত সেই শক্তিই পুরুষোত্তম নামে গীতায় স্থান পাইয়াছে। গীতার বক্তা "শ্রীকৃষ্ণ" এই শক্তি-স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ ছিলেন। তাই অর্জ্জুনের সামাজিক চিন্তাপুষ্ট হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বেশ নিপুণতার সহিত ছিন্ন করিয়া দিয়া অর্জ্জুনের কর্ম্মকে দুর্ব্বলতাহীন করিয়া দিয়াছিলেন। চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন অর্জ্জুন দৈবী-সম্পদ সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সমাজ-কেন্দ্র পুষ্ট অতি সুন্দর বিচার যোগ্য ভিত্তি দাঁড় করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তর্কে-প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু কেন্দ্রে আদর্শ গ্রহণ করিয়া কিছুতেই অর্জ্জুনের সে বিচার ভিত্তিকে ছিন্ন করা যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রত্যেকটী সংশয় ছিন্ন করিয়াছিলেন। এরূপে একদিন রাম এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বিচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাম শিবকেন্দ্র পুষ্ট বিচারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বশিষ্ঠদেবকে যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নোত্তরেই যোগবাশিষ্ঠ্য নামক মহাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখানে রাম বৈরাগ্য এবং তপস্যার পথকেই শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। সংসারের অনিত্যতা এবং মনের চঞ্চলতার বেগ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। অর্জ্জুনও সমাজ এবং স্বজাতি ধ্বংস অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজনকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তিকেন্দ্র পুষ্ট চিন্তার নিকট কাহারও বিচারভিত্তি দাঁড়ায় নাই। গীতার কথা ভারতের ঘরে ঘরে আলোচিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ্যের কথা পণ্ডিত এবং সাধুসমাজে অত্যন্ত সমাদরে আলোচিত হইয়া থাকে। ইদানীং প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ গীতা এবং ঐ যোগবাশিষ্ঠ্য প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু রাম এবং অর্জ্জুনের মত কর্ম্মী এবং বশিষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের মত গুরু সমস্ত ভারতে একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহার কারণ প্রত্যেকেই (গুরু এবং কর্ম্মী) সূর্য্য বা বিষ্ণু-কেন্দ্রের চিন্তার মধ্য আবদ্ধ। গুরু যদি শক্তি-স্তরের খবর না রাখেন তবে শিষ্য কি করিয়া রাম বা অর্জ্জুন হইবেন? গীতায় এবং যোগবাশিষ্ঠ্যে কর্ত্তব্যের কথা আছে, দায়িত্বের কথা আছে, গুরু-ভক্তির কথা, বীরত্বের কথা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগেরও বহু কথা আছে, ভারতের ঘরে ঘরে সে সবের বিস্তারিত আলোচনাও হইয়া থাকে; কিন্তু আলোচনা হয় না কেবলই শক্তি-স্তরের কথা। তাই আজ সহস্র বৎসরের ইতিহাস দেশপ্রেমী ভারতবাসীকে কেবল হতাশা-সাগরে নিমগ্ন করে। বীর রাজগণের সমর-নৈপুণ্য, বীরত্ব সবই ভাব-প্রবণতায় ভাসিয়া গিয়াছিল। বিদেশী আক্রমণকারীদের ছলনার নিকট সেই সমর-বিক্রম ভারতকে বাঁচাইতে পারে নাই। গুরুদের চরিত্রে হয়ত ত্যাগ, সংযম, শিষ্য-স্নেহ, সাধন-শক্তি, তপঃ-শক্তি, স্বদেশ প্রেম, অতি-মানবতা সবই আছে; নাই কেবল শক্তি

স্তরের সন্ধান। তাই তাঁহাদের মুখ হইতে যাহা বাহির হয় তাহা গীতা নহে - তাহা ভাবাবেশ, ধ্যান-ভাব এবং শান্তি-ভাব মাত্র। তাই গীতা বুঝিবার পূর্ব্বে বা বলিবার পূর্ব্বে শক্তি-স্তর বুঝা প্রয়োজন। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-স্তরের কর্ম্মী এবং জ্ঞানী কখনও দুর্ব্বলতাহীন হইতে পারেন না। যাহা হউক ঈশ্বরত্বের পূর্ণাবস্থাই পুরুষোত্তম। ইহাই মানবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পূর্ণতার অবস্থা।

(অর্জ্জুন শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহ, মাতুল, গুরু এবং শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেও, অধিক কি যুদ্ধক্ষেত্রে সকলকে বধ করিলেও তাঁহাদের উপর সর্ব্বদা শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় বহু যুবক পাশ্চাত্য সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া বহুস্থানে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কোন কোন স্থানে তাঁহারা গুরুজনকে অপমানও করিয়া থাকেন। গুরুজন নীতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে বিনয়ের ভিত্তি নষ্ট না করিয়াও তাহার প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করা যায়। যুদ্ধ করিতে হইলেই যে নিতান্ত ছোট মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাহা যে কোন উন্নত আদর্শের জীবন-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি মহাবীরগণ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধ পক্ষে থাকিলেও অর্জ্জুনের বিজয়-ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। শিষ্য যে কোন মতবাদ গ্রহণ করিয়া নিজের, দেশের এবং দশের মঙ্গল করিতে পারিলে গুরু তাহাতে গর্ব্বই অনুভব করেন। শিষ্য সাম্যবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া গুরুকে অপমান না করিলেও তাহার কর্ম্ম-লক্ষ্য খর্ব্ব হইবে না। পাশ্চাত্য সাম্যবাদ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের নজরে ছোট বড় নাই। কিন্তু ভারতীয় সমাজস্তরের আদর্শে ছোট বড় ভাব রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় - সমাজ-স্তরের আদর্শে এরূপ ছোট বড় ভাব সমাজের শোভাই বর্দ্ধন করে। যাহা হউক সাম্যবাদ বা অধ্যাত্মবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সমাজ-স্তরের আদর্শের ভিত্তিতে পদাঘাত করা চলে না। আবার যাঁহারা আত্মোন্নতি করিতে চান তাঁহারাও গুরুর সঙ্গে সাম্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করিতে গেলে ভুল করিবেন। অনুভব-সম্পন্ন গুরুর সেবা করিয়াই জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সেখানেও অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে প্রথমে গুরুর সঙ্গে বন্ধুর মত ভাব অবলম্বন করিলে জ্ঞান লাভে বিঘ্ন আসিবে। সময় হইলে গুরু নিজেই, শিষ্যের সহিত সাম্য ভাবের ব্যবহার করিয়া থাকেন।)

সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ এবং শিব আদি অনুভূতির কেন্দ্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া কেহ যেন সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করেন না। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের লক্ষ্য নহে, আমাদের লক্ষ্য বিকাশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে উপরি উক্ত সমস্তগুলি শক্তির বিকাশ-বীজ আছে। বিকাশের স্তরগুলিকে প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শ অনুযায়ী আমরা ঐ ভাবে সাজাইয়াছি মাত্র। ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রশ্রয় নাই। মানুষ মাত্রই ইহা অবলম্বন করিয়া আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। শক্তি-স্তর সমস্ত মানুষের কর্ম্ম-লক্ষ্য হউক আমরা এইরূপই ইচ্ছা করি। ঐ স্তরকেই - আপন আপন আরাধ্য দেবতা গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি (বা আল্লা, গড্, জিন, বুদ্ধ, আত্মা, ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম) বলিয়া জানিতে হইবে। এমন অনেক স্তোত্র প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যাহা পড়িলে শক্তি-স্তরের আভাষই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধক নিজে যে স্তরে

প্রতিষ্ঠিত নহেন তিনি সেই স্তরের অনুভূতির ভাব লইয়া কখনও স্তোত্র রচনা করিতে পারেন না। ইহাতে বুঝা যায় সাধনায় নিষ্ঠা থাকিলে সাধক মাত্রই অনুভূতির গভীরতায় ধাপে ধাপে শেষকালে শক্তি-স্তরে আসিয়াই ক্ষান্ত হইবেন। পূজা পদ্ধতি বা পূজা-ক্রম বিচার করিলেও এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যে কোন দেবতার পূজাই করা হউক না কেন প্রথম গণেশ, তাহার পর ক্রমে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির পূজা করিয়া তবে নিজের অভীষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। অর্থাৎ সাধকগণ অন্তঃকরণস্থিত বিভিন্ন শক্তি-পীঠগুলিকে অনুভব করিতে করিতে যখন একেবারে শক্তি-স্তরে আসেন - তখনই তিনি সেই পূর্ণ শক্তির স্তরেই নিজের অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। এই শক্তি-স্তরকে যাঁহার যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারেন। যে কোন নামের ঈশ্বর বলিতে আমরা এই শক্তির স্তরকেই জানিব। কেহ অনীশ্বর বা অনাত্মার নাম দিয়া যদি এই শক্তি-স্তরকে বুঝিতে চাহেন তাহাতেও আমাদের কোন ক্ষতির কারণ নাই। কারণ আমরা চাই পূর্ণ-বিকাশ স্তরের কর্ম্মী। দোকান চালান যাহাদের লক্ষ্য তাহারা ব্যবসার ফন্দি আঁটিবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু কর্ম্মী তাহা করিতে পারেন না। যাঁহার কর্ম্মে এবং স্বভাবে যে স্তরের কর্ম্ম-লক্ষণ বুঝা যাইবে আমরা তাঁহাকে সেই স্তরের কর্ম্মী বলিয়া মানিয়া লইব। আমাদের লক্ষ্য কর্ম, সুতরাং আমরা কোন স্তরেরই নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। সাধকগণ জানিয়া রাখুন শক্তি-সাধনার মধ্যেই শক্তি-স্তরের সন্ধান বেশী পাওয়া যাইবে।

দুর্গা-ধ্যান* অবলম্বন করিয়া এই স্তরের অনুভূতি এবং কর্ম্মবিজ্ঞান প্রকাশ করা হইবে। পরে এ স্তরের অন্যান্য কথারও আলোচনা করা হইবে। এ স্তরের জ্ঞানী এবং কর্ম্মী একই স্বভাববিশিষ্ট। যাঁহারা ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহারা এই শক্তি-স্তরের তুরীয় অংশের অনুভূতি লাভ করিয়াই শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে কাহাকেও আত্ম পরিচয় দেন না। খুব অল্প লোক তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া থাকেন। শক্তি-স্তর বাস্তবিক কর্মীরই স্তর। কর্মী মাত্রেরই এই শক্তি-অধ্যায়টী বিশেষ মনোযোগসহ পাঠ করা কর্তব্য। ইহাই ভারতের কর্ম-নীতির কুঞ্জি (চাবি)। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা পঞ্চ দেবতার স্তরগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। গণেশ, সূর্য্য, দৈবী-সম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু এবং শিব-স্তরের প্রাকৃতিক জীবনের বিশেষত্বগুলি নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। জীবনের ভিত্তি অতি সুন্দরভাবে গড়িয়া লইবেন। নিজের সঙ্গিগণকেও সেই উপাদানে গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। ইহা ভিন্ন কল্পনার স্কিম (কর্ম্ম-পদ্ধতি) লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলে নিজের সঙ্গিগণ দ্বারাই প্রতারিত হইতে হইবে।

কালাভ্রাভাং - কাল রঙের মেঘের মত আভা (জ্যোতি) যাঁহার (এমন স্ত্রী)। (ইহা কালী দেবীর গায়ের রঙ্)।

---

* দুর্গা-ধ্যান :-

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ ররিকুল ভয়দাং মৌলী-বদ্ধেন্দুরেখাং।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ রুদ্ধহস্তিং ত্রিনেত্রাং॥
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন মখিলং তেজসাপূরয়ন্তিং।
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণাবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

(অন্তর্নিহিত অর্থ) এরূপ অনুভূতি এই স্তরের অনুভূতির বিশেষত্ব। ইনি তুরীয়া শক্তি। যাঁহার সহজ অর্থ প্রকাশহীন শক্তি। শিবের স্তরে যে জ্ঞানের পূর্ণাবস্থার (মহত্তত্ত্বের) অনুভূতির কথা আছে, উহাই এ স্তরের আবরণ স্বরূপ। সাধক জ্ঞানের পূর্ণ কলায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই অমাকলার (অন্ধকার কলার) জ্যোতিতে সমস্ত জ্ঞানের বিলয় অনুভব করেন। এখানে কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির কথা বলা হইল। জ্যোতি বলিতে আমরা সব সময়ে প্রকাশ শক্তিকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই কৃষ্ণ-জ্যোতি প্রকাশ-শক্তি সমন্বিত নহে। ইহা ঘোর অন্ধকারের মত সর্ব্বগ্রাসী জ্যোতি। এই জ্যোতির এমনই প্রভা যে ইহা সমস্ত দৃশ্যকে আকর্ষণ করে এবং গ্রাস করে। যে কোন স্থানে জ্যোতি তেজ আছে সেই কেন্দ্রেই অন্ধকার অবস্থান করে। আলো এবং অন্ধকার একই কেন্দ্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্যোতি বলিতে আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্রণে একই তেজ সত্ত্বাকে জানিতে হইবে। অন্ধকার অংশটি বেশী সূক্ষ্ম এবং দ্রুতগতি বিশিষ্ট। তাই যে কোন স্থানে জ্যোতি আসিয়া পড়ে সেই স্থানেই অন্ধকার (ছায়া) দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির অংশটি কোন বস্তুর সংঘর্ষে বাধা প্রাপ্ত হয়। সেই বাধা প্রাপ্ত স্থানটাই আলোকিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার অংশটি সেই বস্তুর ঘনত্বকে ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যায়; তাহাই ছায়া বলিয়া খ্যাত। আলোর অংশ স্থূল বলিয়া বস্তুর ঘনত্বকে ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু অন্ধকার অংশটি সূক্ষ্ম হইবার দরুণ যে কোন বস্তুর ঘনত্বকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। অব্যক্তের (অন্ধকার-তত্ত্বের) আশ্রয়ে মহত্তত্ত্ব (প্রকাশ অংশ) অবস্থিত। এই মহত্তত্ত্বের আশ্রয়ে সমস্ত সৃষ্টি রহিয়াছে - একথা শিবঅংশে বলা হইয়াছে। যাহা হউক আমরা আমাদের অন্তঃকরণের (এখানে অন্তঃকরণ নামই প্রদান করিলাম; ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞান-ময় কোষের শেষ স্তরের অনুভূতির কথা) যে কেন্দ্রে মহত্তত্ত্ব বা জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ অবস্থাকে অনুভব করি, সেই কেন্দ্রেই অব্যক্ত-তত্ত্ব বা শক্তির এই তুরীয় অংশ অনুভূত হয়। শান্তির কলা বৃদ্ধি করিতে করিতে, অথবা অন্তরস্থিত শান্তিকে ভোগ করিতে করিতে আমরা মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হই। আবার শান্তির কলা কম হইয়া যখন রজোগুণের আধিক্য হয় তখন আবার জীবাত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই। মহত্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই কৃষ্ণ কলার অনুভূতিতে আসিতে হয়। চেষ্টা করিয়া ইহা লাভ হয় না। অন্তরস্থিত প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিকে দর্শন করিবার শক্তি, ভোগ করিবার শক্তি এবং প্রবেশ করিবার (আত্মসমর্পণ করিবার) শক্তি অর্জ্জন করিয়া এই সব তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়। মহত্তত্ত্বই আমাদের অনুভূতির শেষ কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে স্থিত হইতে পারিলে অব্যক্তের অনুভূতিও পাওয়া যাইবে। একই কেন্দ্রস্থিত হইয়া মহত্তত্ত্ব এবং অব্যক্ত-তত্ত্ব অনুভব করিতে হয়। সেই পূর্ণ শান্তির বোধটাই অব্যক্তের কৃষ্ণবর্ণ বোধে বিলয় হইতে থাকে। শান্তির ভোগও ভোগ এবং এক প্রকার বন্ধন বিশেষ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে (শক্তিস্তরে) অবস্থিতি লাভ হইলে ইহা বুঝা যাইবে এই শান্তির বোধও এক প্রকার ক্রিয়া-স্বরূপ। এই ক্রিয়াকে ভোগ করিয়া সাধক পূর্ণ হইয়া যান বা মহৎ হন। পরে অনুভূতির আরও গভীরতায় আরও সূক্ষ্ম স্পন্দনের মধ্যে চলিয়া যান। এই স্পন্দনগুলির আর কোনই বোধ* নাই। এখানে আসিলে সাধক একেবারে নির্বিষয় হইয়া যান। যাঁহারা

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ‘‘বোঝা’’ স্থানে ‘‘বোধ’’ শব্দটি গৃহীত হল।

অন্তরস্থিত একটা কেন্দ্রের অনুভূতিতে আত্মদান করিয়া কিরূপে অন্যান্য আন্তর ও বাহির্জগৎস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে হয় ইহার বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এসব অনুভূতির কথা বুঝিতে পারিবেন না।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে এক এক প্রকারের অনুভূতির উপাদান পাওয়া যায়। যে সাধক যে কেন্দ্রপুষ্ট তাঁহার স্বভাবে সেই কেন্দ্রের বিকাশ খুব স্থিরভাবে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে - "সত্য" গণেশ কেন্দ্রস্থিত অনুভূতির প্রধান অংশ। এই অংশে যাঁহার দৃঢ়তা জমিয়া যায় এমন সাধক অন্তরে বাহিরে যত প্রকার সংঘর্ষই আসুক না কেন সব স্থানে একই সত্য বজায় রাখেন। তিনি তখন অন্তরকে গোপন করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করেন না। ব্রহ্মচারীর শরীর, কামের পীড়নে হয়ত ব্রত ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু সে কথা প্রয়োজন মত গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে ভয় বা সঙ্কোচ আসিবে না। তিনি নিজের আত্মাকে গণেশ কেন্দ্রস্থিত ঐ সত্যাংশের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, তাই বাহিরে ভিতরে কোনস্থানেই তিনি আর মিথ্যা অবলম্বন করেন না। এরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রেরই বৈশিষ্ট্য আছে। সাধক সেরূপ কেন্দ্রস্থিত হইলে তাঁহার স্বভাবটী এবং আন্তর দৃষ্টিটী সেইরূপ উপাদানে মিশিয়া যায়। এরূপ যাঁহারা এই অব্যক্তের অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই গীতা বর্ণিত ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন। আমাদের এই শক্তির ধ্যানে সে কথা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; ক্রমে জানিতে পারিবেন।

এখানে পাঠকগণের সুবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্রখানা প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ ইহার পরিচয়-অংশ পাঠ করিয়া লইবেন।

চিত্র পরিচয় -

১। মনের কেন্দ্র। মানবাত্মা এই কেন্দ্রটীতেই বেশী সময় অবস্থিত থাকে। ইহা কর্ম্ম-কেন্দ্র। ইহা অত্যন্ত চঞ্চলতার কেন্দ্র। পুরাণাদিতে ইহাকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে।

২। সূর্য্য কেন্দ্র। ইহা ভালবাসার কেন্দ্র। প্রেম বোধের কেন্দ্র। শিক্ষার কেন্দ্র, অনুসন্ধিৎসার কেন্দ্র। ভাবের কেন্দ্র। মাতৃত্বের কেন্দ্র (যতক্ষণ কামের বেগ থাকে ততক্ষণ মাতৃত্বের পূর্ণাবস্থা আসে না। শিবের স্তরের অনুভূতি আসিলে কামের বেগ থাকে না)।

৩। বিষ্ণু-কেন্দ্র। ইহা সুখ বোধের কেন্দ্র। স্মৃতির সূক্ষ্মভাগ এখানে অবস্থান করে (স্মৃতির লীলার ভাগ সূর্য্য-কেন্দ্রে অবস্থান করে)। ইহা সমাজ-ভাবের কেন্দ্র। ছলনা করিবার শক্তি এই কেন্দ্র হইতেই আসিয়া থাকে। ইহাই আসুরিকতার কেন্দ্র। এ কেন্দ্র যাহাদের পুষ্ট তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াও অনুতপ্ত হয় না। এ কেন্দ্রে অনুভূতি আসিলে স্পষ্ট বুঝা যায় সত্য এবং মিথ্যা একই ঈশ্বরের আশ্রয়ে আশ্রিত। ইহা মোহের কেন্দ্র। জীব মাত্রেরই সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকিবার বেগ এই কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। জীব মাত্রেরই এই কেন্দ্র শক্তির অনেক অংশ (সবটা নহে) বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

৪। শিব-কেন্দ্র। ইহা শান্তি-বোধের কেন্দ্র। গভীর নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) জীব মাত্রই এই কেন্দ্রে স্থিতিলাভ করে। যাঁহারা এই কেন্দ্র পুষ্ট হন তাঁহারা খুব শান্ত স্বভাব হন। এই কেন্দ্র হইতেই ১, ২ ও ৩ চিহ্নিত কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে।

সন্ধ্যা, পূজা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই কেন্দ্র পুষ্ট হয়। এই কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত যোগিগণের স্ত্রী এবং বিষয় ভোগের বাসনা থাকে না।

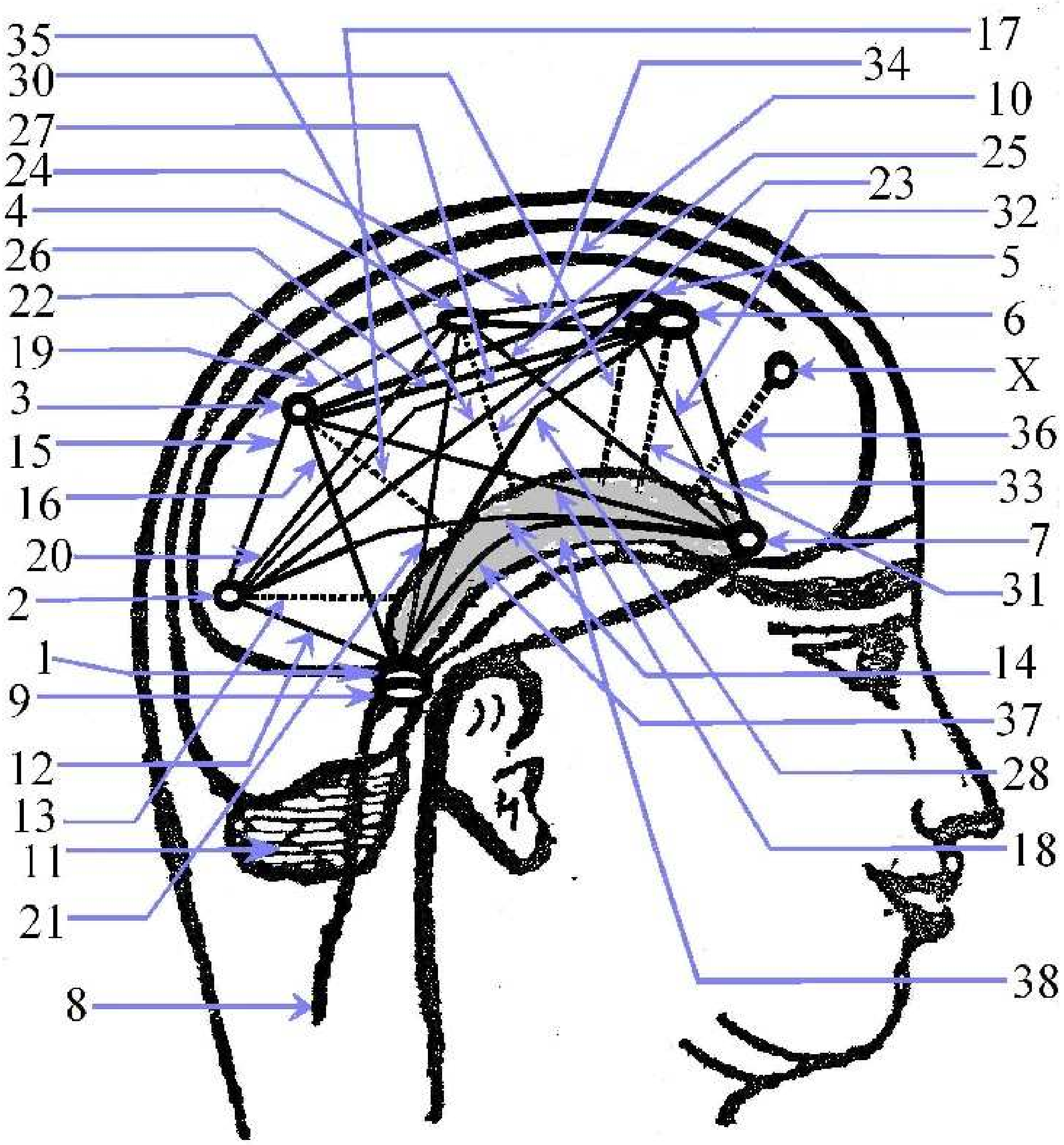

মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র

৫। মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র। এখানে মানুষের জ্ঞান পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা নাদ, ধ্বনি বা মন্ত্র-জগতের কেন্দ্র। ইহাকে আর্য্যশাস্ত্রে সরস্বতী দেবী বলিয়া উপাসনা করিবার বিধি আছে। ইহা পূর্ণবোধ কেন্দ্র।

৬। অব্যক্ত অনুভূতির কেন্দ্র। শক্তি ধ্যানে এই কেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইহা ঘোর অন্ধকার বোধের স্বরূপ।

৭। গণেশ-কেন্দ্র। সত্য, ত্যাগ, অন্যায়-বিরোধিতা এই কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। এই কেন্দ্র-পুষ্ট মানবই গণ-শক্তির নেতা হইতে পারেন। এই কেন্দ্র যাঁহাদের পুষ্ট তাঁহারাই জ্ঞানী এবং প্রকৃত জনহিতৈষী হইতে পারেন। ইহা শূন্য বোধের কেন্দ্র।

৮। ইহা মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্না-পথ। এই পথে জীবমাত্রেরই জীবনী-শক্তি বিচরণ করে। মস্তিষ্ক এবং এই পথই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবাস স্থান।

৯। প্রাণ-কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতেই জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। এই কেন্দ্রের নিজের কোন স্বাধীন কর্ম্ম-শক্তি নাই, কিন্তু এই কেন্দ্রস্থিত শক্তি জীবমাত্রকেই বহন করিয়া বেড়ায়। জীবের শরীরের শক্তি বলিতে এই কেন্দ্র-শক্তিই বুঝিতে হইবে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি জীবের স্থূল শরীরটা আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রাখে। এই প্রাণ-শক্তিই স্থূল শরীরকে নিজ শক্তি বলে উঠাইয়া-চালাইয়া লইয়া যায়।

স্ত্রী-পুরুষ মিলনে যে সুখ তাহা এই প্রাণ-কেন্দ্রেরই তৃপ্তি জানিতে হইবে। ইহাই সাধারণতঃ কাম নামে খ্যাত। অনেকে মাতা ও সন্তানমিলন সুখকেও কাম আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন। আমাদের পাঠকগণ জানিয়া রাখিবেন উহা ঠিক কথা নহে। ২ চিহ্নিত কেন্দ্রটী মাতৃভাব ও সন্তান ভাবের স্থান। কামের মিলন পশু-স্তরের সুখ, কিন্তু স্নেহ দৈব-স্তরের সুখ। যে সব স্ত্রী উন্নত বিকাশসম্পন্ন নহে তাহারা স্নেহে এবং কামে সব সময় যথাযথ ভাবের সমন্বয় রাখিতে পারে না। পিতা ও কন্যার স্নেহমিলনকেও অনেকে কাম বলিতে চাহেন। তাহাও ঠীক নহে। উন্নত-অনুভূতির স্তরে প্রতিষ্ঠিত না হইবার দরুণ ভাব-জগতে কিছু কিছু মিশ্রিত ভাবের গোলমাল আসিয়া থাকে ইহা সত্য। সেই কারণেই স্নেহের সহিত কাম ভাবের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহা হইলেও কাম এবং স্নেহ এক বস্তু নহে। কাম মানুষকে পশুত্বের পথে লইয়া যায়। স্নেহের বিকাশ থাকিলে মানুষ উন্নত স্তরে প্রবেশের পথ পায়। স্নেহের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষমাত্রই কামের পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। (সূর্য্য-অংশ পাঠ করুন)। এ সম্বন্ধে আমরা বেশী কথা বলিতে চাহি না, কারণ তাহাতে সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় আসিয়া যাইতে পারে।

পুরুষ মাত্রই সন্তান-ভাব, পতি-ভাব এবং পিতৃ-ভাবের ক্ষেত্র। স্ত্রী-মাত্রই সন্তানভাব, পত্নী-ভাব এবং মাতৃ-ভাবের ক্ষেত্র। সূর্য্য কেন্দ্রের প্রাবল্যে সন্তান ভাব, বিষ্ণু কেন্দ্রের প্রাবল্যে পতি বা পত্নী ভাব এবং শিব-কেন্দ্রের প্রাবল্যে পিতৃ বা মাতৃ ভাব জানিতে হইবে। বয়সের সঙ্গে এই ভাব গুলির ক্রমে বিকাশ হইতে দেখা যায়। বাল্য কালে সন্তানভাব প্রবল হয়। যৌবনে মনুষ্য মাত্রই স্ত্রী-পুরুষ মিলন ভালবাসে, কিন্তু সেই সময় সন্তানের কথা মনে আসে না। আবার একটু বয়স বৃদ্ধি হইলেই সন্তানের জন্য ব্যস্ত হয়, সন্তান না থাকিলে যেন তাহাদের মন তৃপ্ত হয় না। পতি যদি সন্তানের স্থানই অধিকার করিতে পারে তবে সন্তানের প্রয়োজন কি? আবার সন্তানের সঙ্গে যদি কামসূত্রই বিদ্যমান্ তবে পতি থাকিতে সন্তানের কামনা কেন?

অন্তঃকরণকে এরূপ ক্রম-বিকাশ ধারা বিচার করিলেও একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে কাম ও স্নেহ এক বস্তু নহে। এতো বহির্জগতের কথা। আমরা ক্রম-বিকাশের পথে পূর্ণ বিকাশের স্তরে যাইতে চাই। সেই পথে মানুষ গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতি প্রথম পান।

তখন প্রথমটায় সত্যে পরে সংযমে দৃঢ় নিষ্ঠা হয়। ইহার পর সূর্য্য কেন্দ্রের অনুভূতি আসিলে সাধক মাত্রই বালকের মত সরল স্বভাববিশিষ্ট হন। ভগবান যে কত স্নেহের সাগর তাহা এ স্তরে বুঝা যায়। এই স্নেহস্পর্শে স্বভাবতঃই সরলভাব আসিয়া যায়। বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতি আসিলে প্রভুত্বশক্তি বৃদ্ধি হয়, অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি এই স্তরের দান। ইহার পর শিবের স্তরের অনুভূতি লাভ হয়। এই স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক সমস্ত জীবের পিতৃস্থানে স্থিত হন। ইহাই গুরুর স্তর। জীবে আন্তর প্রকৃতির বহির্বিকাশে জীব মাত্রই এক সময়ে সন্তান, পরে পতি বা পত্নী এবং তাহার পর পিতা বা মাতা হন। আবার অনুভূতির পথেও ক্রমোন্নতিতে সূর্য্য-স্তরে বালকের মত স্বভাববিশিষ্ট হন। বিষ্ণু-স্তরে পূর্ণ বিকাশ হইলে অন্তঃকরণের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি অর্জ্জন হয়। আবার শিব-স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক মানুষমাত্রেরই গুরুস্থানে স্থিত হন।

কেহ কেহ মানুষের মনের উপাদানকে কেবল কামেরই বিকাশ-স্থল বলেন। মানুষের মন যদি কেবল কামেরই বিকাশ-স্থল তবে মানুষ সংযমশক্তি কোথা হইতে পায়? হইতে পারে মানুষ মাত্রই স্ত্রী-সংস্পর্শে (স্ত্রী হইলে পুরুষ-সংস্পর্শে) কামের স্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভব করে। এ কথাও উন্নত অনুভূতি আসিলে খাটে না। কিন্তু একথাও সত্য যে মানুষ কামের উত্তেজনায় মনুষ্যত্বকে বলিদান দিয়া পশুর মত চেষ্টায় আত্মহারা হয় না। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় মানুষের মনে ঐরূপ সংযমশক্তিও রহিয়াছে। এই সংযমশক্তি গণেশ কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। সংযম বিবেকেরই অংশ।

এই সংযমশক্তি মানুষের এতটা প্রবল নহে যাহাতে মানুষ কামকে সব সময় নিয়মিত রাখিতে পারে। মানুষ যতক্ষণ গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু কেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করে নাই, ততক্ষণ মানুষের বিবেক যতই শক্তিশালী হউক না কেন কাম দমনে তাহার পূর্ণ শক্তি নাই। সাময়িক সংযম মাত্র সে করিতে পারে। কামের প্রভাব বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে। অনুভূতিতে গণেশ-কেন্দ্র-স্থিত হইলে সাধকে এই শক্তিটুকু হয় যে বাহিরে প্রত্যক্ষে কোন কামের বস্তু দেখিলে তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না। আবার কোন স্ত্রী বা পুরুষ বিশেষে যেখানে মাতৃ, পিতৃ বা সন্তান ভাব আসিয়া গিয়াছে সেখানেও কামের উত্তেজনা তাহার আসিবে না। তাহা হইলেও কাম সম্বন্ধে সাধক নিরাপদ নহে। তখনও মানসক্ষেত্রে সময় সময় কামের রূপক ছবি খেলিবে ও সেই রূপক-ছবির নেশা সাধককে আকর্ষণও করিবে। সূর্য্য-স্তরের অনুভূতিতে স্থিত হইলে সাধকের কামের উত্তেজনা একেবারেই দেখা যাইবে না (কিন্তু কাম এখানেও থাকে)। এখানে রাগাত্মিকা ভক্তির স্তর। এখানে তিনি বালক বা বালিকাভাবে (সখ্য, দাস্য, বাৎসল্যাদিভাবে) এমনই তন্ময় থাকেন যে কামের উত্তেজনার গন্ধও থাকিবে না। কামের উত্তেজনা না থাকিলেও কামের বীজ সাধকে থাকে। ভাবের বেগ তখন এতই প্রবল হয় যে কামের উত্তেজনার সময়ই হয় না। তখন লোক বিশেষে সন্তান, দাস্য, সখ্যাদির আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবলভাবে থাকিবে। অর্থাৎ কাম না থাকিলেও মোহ থাকিবে। ইহার পর বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক সুখবোধের কেন্দ্রে স্থিত হন। বিষ্ণু-কেন্দ্র ভোগ জগতের কেন্দ্র। সুতরাং সাধক এখানে সব সময়ে নিরাপদ নহেন। সময় সময় কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে কামের এবং মোহের

উত্তেজনা আসিয়া সাধককে অভিভূত করিয়া দিবে তাহা বলা যায় না। যাঁহারা সাধক তাঁহারা সময় মত সবই জানিতে পারিবেন বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

শিবের স্তরে আসিলে সাধকের কামের উপর পূর্ণ দখল হয়। যখন বালকভাবের অনুভূতি (সূর্য্য-কেন্দ্র) ততক্ষণ কাম নাই। আবার যখন গুরুর ভাব বা পিতৃভাব (শিব-কেন্দ্রের অনুভূতি) তখনও কাম নাই। মানবকেন্দ্রে এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রে কামের বেগ আছে। যাহারা বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ লিখিত মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া কাম দমনে হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। মানুষের মন সব সময়েই কামে মাখা নহে। স্ত্রী সংস্পর্শে পুরুষ এবং পুরুষ সংস্পর্শে স্ত্রীর মনোজগৎ সব স্তরেই নর্দ্দমার কাদাগোলা জলের মত অস্পৃশ্যরূপ ধারণ করে না। ইহার উপরে মানুষ সহজেই দাঁড়াইতে পারে। পশুত্বের পরপারেও মানুষের গতি ও স্থিতি আছে। গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতি আয়ত্ত হইলে কাম দমন করা খুব কঠিন নহে। গণেশ কেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করা খুব সাধনসাপেক্ষ কাজ নহে। ইচ্ছা চাই চেষ্টা চাই, আবার দৃঢ়তারও প্রয়োজন।

১০। ইহা একটি রেখার মত করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাকে আমরা শক্তিরেখা নাম দিতেছি। এই শক্তি-স্তরে আত্মবুদ্ধি আসিলেই সাধক ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। এস্থানে দাঁড়াইয়া সাধক ইহাই বুঝিতে পারেন যে কর্ম্ম অনাদি ও অনন্ত। কর্ম্মই জীবের ও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ। কর্ম্মের বাহিরে কেহই যাইতে পারে না। আদি, মধ্য ও অন্ত সবই কর্ম্মময়। ইহা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ইহাই আত্মার সর্ব্বোত্তম বিকাশের ক্ষেত্র। এখানে দাঁড়াইয়া কর্ম্মীগণ একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। এই শক্তি-স্তর হইতেই শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণেশাদি কেন্দ্রগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। এই শক্তিই পরস্পরের সংযোগ সাধন করিতেছেন। এই শক্তি-স্তর অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-স্তর বুঝিতে হইবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তুরীয় সকল অবস্থাই পুরুষপ্রকৃতির অধিনায়কত্বে যেন আপনি আপনি হইয়া চলিতেছে। সাধক এই স্তরে না আসিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন না। এই ঈশ্বরের দৃষ্টির সামনে সব (সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও প্রলয়) হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে কর্ম্মহেতু কোন দোষগুণ ইঁহাতে স্পর্শ করে না। সাধকগণ এ স্তরে আসিলে বুঝিতে পারিবেন গণেশাদি কেন্দ্রশক্তির সর্ব্ববিধ উপাদান এখানে আছে, কিন্তু কোন কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতা এ স্তরে নাই।

কটাক্ষৈ ররিকুলভয়দাং - চক্ষের চাহনিতে অরি সকল ভয় পায়।

অরিকুল অর্থে অসুর সকল। আত্মবিকাশে বাধাদানকারী ভোগী মানব। আইন দ্বারা, শাস্ত্রের বচন দ্বারা, শস্ত্র দ্বারা, কূট নীতি দ্বারা, চালাকি দ্বারা, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া বা শোষণ দ্বারা যে কোন প্রকারে নিজের এবং আপন বংশের বা দেশের ভোগের সুবিধা করা এবং অন্যের ও অন্যের বংশের বা দেশের আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করা বা কণ্টকাকীর্ণ করিবার চেষ্টাই আসুরিকতা। এরূপ কর্ম্মে যাহারা লিপ্ত আছে এমন দুষ্ট প্রকৃতির মানুষই অরিকুল বলিয়া খ্যাত।

মানুষ সহজে শরীর রক্ষার উপাদান (অন্ন) এবং মস্তিষ্ক পুষ্টির উপাদান (দুগ্ধাদি) আহার করিতে পারিবে। বাস করিবার জন্য শুষ্ক স্থানে আলো বাতাস ও জলের অনুকূল স্থানে গৃহ পাইবে। মানুষ মাত্রেই শিক্ষার সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে। মানুষ মাত্রই সমাজের চক্ষে সমান হইবে। এরূপভাবে মানুষের শাসন, সমাজ এবং শিক্ষাযন্ত্র স্থাপিত

হওয়া চাই। ইহার অন্যথায় বহু লোকের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। ভোগের স্থবিধার জন্য একদল মানুষ এই প্রাকৃতিক নীতির অপলাপ করে। ইহারাই অরিকুল বলিয়া খ্যাত।

সত্য, ত্যাগ, প্রেম, শান্তি, তেজ প্রভৃতি দৈবীসম্পদই মানুষকে আত্ম-বিকাশে সাহায্য করে। যাহারা এই সব দৈবীসম্পদ অবলম্বন না করিয়া দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ এবং পারুষ্য নামক আস্থরিক সম্পদগুলি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারাই অরিকুল বলিয়া খ্যাত।

দম্ভ - যে কোন নিরীহ, নির্দ্দোষ মানুষের উপর শক্তিশালী মানুষের অন্যায় অত্যাচারকে দম্ভ-প্রসূত বলা যায়। যাহারা দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা নীতির নিকট মাথা নত করে না।

দর্প - নিরীহ, নির্দ্দোষ ও শান্ত মানুষের উপর বার বার অন্যায় অত্যাচার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাকে দর্প বলা যায়।

অভিমান - প্রেমের স্পর্শহীন মানুষই অভিমানী। নিজেকে, নিজের বুদ্ধিকে বড় মনে করিয়া বা পাশব বলে নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিককে হেয় করিবার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষই ‘অভিমানী’। এই অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই অন্যান্য আস্থরিক সম্পদগুলি বাঁচিয়া থাকে।

ক্রোধ - নিজের ভোগের তৃপ্তির জন্য নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে কিছু পাইবার চেষ্টাকে কাম বলে। এই কামের চেষ্টায় বাধা পাইলে ক্রোধের উদ্দীপন হয়। শক্তিশালী লোকের ক্রোধের সম্মুখে নিরীহ লোকের যে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় তাহা কেবল ভুক্তভোগী জানেন। অনেক দুষ্ট লোক তেজস্বীর তোজোদ্দীপনাকে ক্রোধ বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া তেজস্বীর নিন্দা করিয়া থাকে। নীতি বিরুদ্ধ অন্যায় এবং আস্থরিক আচরণের প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের উদ্দীপনাকে তেজ বলিয়া জানিতে হইবে। তেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈবীসম্পদ কিন্তু ক্রোধ মানুষের চণ্ডাল-বৃত্তি।

পারুষ্য - নির্দ্দোষ এবং নিরীহ লোকের উপর শক্তিশালীর নিষ্ঠুর আচরণকে পারুষ্য বলে। ‘‘আমার অত্যাচার করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে, তাই অত্যাচার করিতেছি।’’ যাহাদের কর্ম্মে এরূপ মনোবৃত্তি বুঝা যায় তাহারাই পারুষ্য নামক আস্থরিক-সম্পদসম্পন্ন মানুষ।

এখানে বলা প্রয়োজন উপরোক্ত আস্থরিক ভাবগুলি বিষ্ণু-কেন্দ্র হইতেই আসিয়া থাকে। বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষ খুবই শক্তিশালী হইয়া থাকে। স্থতরাং বিশেষ শক্তিশালী না হইয়া ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ান ঠিক হইবে না।

যিনি যত শক্তিশালী তাঁহার চাহনি তেমনই শক্তিশালী হইয়া থাকে। নিম্ন স্তরের ভোগী মানুষ হইতে নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণের চাহনি তেজঃপূর্ণ। এই সব কর্ম্মিগণের আবার অন্তরস্থিত শক্তির ইতর বিশেষে চাহনির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট আস্থরিক শক্তি-সম্পন্নদের চাহনি খুব শক্তিশালী হইয়া থাকে। ইহার কারণ ইহারাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সত্য, দান, সাধনা, তপস্যা ও নিঃস্বার্থ কর্ম্ম প্রভাবেই বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যিনি নিজের অন্তরে যতটা শক্তিমান্ তাঁহার চাহনি ততটাই শক্তিশালী হইয়া থাকে। অন্তরস্থিত কেন্দ্রশক্তির দৃঢ়তা চক্ষে ফুটিয়া উঠে। অসৎ ভাবদুষ্ট কর্ম্মিগণ

সেই সব চক্ষের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র নিজে নিজের অন্তরে লজ্জিত হইয়া পড়ে। কেহ বা উন্নত স্তরের চাহনি সংস্পর্শে কাম্য বস্তুর বাধা আসিবে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

গণেশ-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি ত্যাগ-ভাব উদ্দীপক। সূর্য্য-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি প্রেমপূর্ণ। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চাহনি মধুরতা পূর্ণ ও সুখদ। আসুরিক-শক্তি সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চাহনি নিষ্ঠুর ভাব উদ্দীপক। ছল-ধর্ম্মপরায়ণ বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি কুটীল। ইহারা সত্যবাদী লোকের সাম্‌নে যখন মিথ্যা কথা বলিতে থাকে (ইহারা প্রায় সব কথাই স্বার্থের সুবিধার জন্য মিথ্যার আবরণেই বলিয়া থাকে) তখন চোরের মত বার বার চক্ষু এদিক ওদিক ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকে। চাটুকারধর্ম্মী বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চাহনি অত্যন্ত হাল্‌কা ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। ইহারা বাস্তবিক সূর্য্য-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষ। সূর্য্য কেন্দ্রের পুষ্টি না থাকিলে চাটুকারিতা অর্জ্জন করা যায় না, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে ইহারা আপন কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয় এবং বিষ্ণুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট রাজা, জমিদার ও শাসনকর্ত্তাদের পদলেহন করিয়া দিন কাটায়। অনেক রাজা, জমিদার ও শাসনকর্ত্তাও ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, কিন্তু পদে তৈল মর্দ্দনকার্য্যে ইহাদের বিশেষ আবশ্যক বোধে মুখে কিছু বলেন না। ইহারা সকলেই শিক্ষিত বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া থাকে। শিব-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি সরল হইয়া থাকে। যাঁহারা অষ্টম কলাপুষ্ট শিব-কেন্দ্রপুষ্ট মহাপুরুষ তাঁহাদের চাহনি সরল, শান্ত, স্নিগ্ধ এবং একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। এ স্তরের মানুষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহারা সরল জীবন-প্রিয় হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূর্য্য-স্তরের কর্ম্মীর ভিত্তি প্রেমময় অরুণাভ জ্যোতি। বিষ্ণু-স্তরের কর্ম্মীর ভিত্তি সুখময় হিরণ্ময় জ্যোতি, শিব স্তরের কর্ম্মীর ভিত্তি শান্তিময় স্নিগ্ধ জ্যোতি। অসুর সকল ইঁহাদের নজরকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া চলে। অসুর ভয় পায় শক্তিস্তরের জ্যোতিকে এবং গণেশ-স্তরের জ্যোতিকে। সকলেই জানেন যে গণেশ শক্তিরই পুত্র। গণেশের মধ্যে শক্তির বিকাশ থাকার দরুণ অসুর গণেশের দৃষ্টিকেও ভয় পায়। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-কেন্দ্র-শক্তির সহিত যখন গণেশ-কেন্দ্র-শক্তি সংযুক্ত হয় তখনই এই সব স্তরের কর্ম্মিগণ আসুরিকতার বিরোধী হইয়া থাকেন। অসুরগণ তখন সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব-স্তরের কর্ম্মিগণের কটাক্ষে ভীত হইয়া থাকে। এই ভীতির লক্ষণ পলায়ন নহে, শক্তিশালী আক্রমণ।

যাঁহারা শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মী তাঁহাদের অনুভূতির দার্শনিক ভিত্তি কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বগ্রাসী জ্যোতি। কৃষ্ণবর্ণের প্রথম অনুভূতি এরূপ জ্যোতিতে অনুভূত হয়। শক্তির অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, আকার, প্রকার, অবস্থিতি এবং বিস্তৃতি সবই কৃষ্ণ-জ্যোতির আকারে অবস্থিত। জ্ঞান ক্ষেত্রে (মহত্তত্ত্বের অনুভূতির কেন্দ্রে) জ্ঞান শক্তির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন নাদ (ধ্বনি, অ, আ, ই, ঈ* ইত্যাদিকে ধ্বনি বলে) স্বরূপ (এই নাদের অনুভূতির

---

*এই ধ্বনিগুলির কোন্‌টী কোন্ অঙ্গ স্বরূপ তাহার আভাষ তন্ত্রে আছে। সাংখ্যের ২৪টি তত্ত্বের মত এই ধ্বনিগুলিকে তত্ত্বরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। এই ধ্বনিগুলিই সৃষ্টির একেবারে সূক্ষ্মতম উপাদান। এই ধ্বনিগুলিই শক্তি। ইহারা ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে এই স্থূল বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে এই ধ্বনিগুলিই অবস্থিত। এই

বোধকে স্ফটিকের সহিত তুলনা করা যায়); অব্যক্ত-ক্ষেত্রে সেইরূপ দেবীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতি স্বরূপ। এই শক্তিকে বুঝিবার জন্য সাধক যে শক্তিটুকু নিয়োজিত করিবেন অনুভূতির কেন্দ্রে তাহাই কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিতে নিমগ্ন হইবে। সাধকের তখন আর প্রেমের নেশা (সূর্য্য) নাই, সুখের স্মৃতিও কাটিয়া গিয়াছে (বিষ্ণু), শান্তির মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (শিব), সমাধির শেষ স্তরও (মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র) আজ অব্যক্ত আধারে নিমজ্জিত। আজ শক্তিসাধকের সাধনার পূর্ণাহুতি হইল।

সাধক! এস তোমায় আজ প্রাণ ভরিয়া আদর করি। আজ তুমি শক্তিমান্ হইলে। একদিন তুমি ভোগ-সম্পদ (পার্থিব) আহুতি দান করিয়াছিলে মা তোমার নিকট প্রেম-সম্পদরূপে আসিয়াছিলেন। যে দিন তুমি প্রেম-সম্পদ আহুতি দান করিয়াছিলে সেদিন মা তোমার নিকট সুখ-সম্পদরূপে আসিয়াছিলেন। আবার একদিন তুমি সুখ-সম্পদকে আহুতি দান করিয়াছিলে বলিয়া মা তোমার নিকট শান্তি-সম্পদরূপে আসিয়াছিলেন। যে দিন তুমি সেই শান্তি-সম্পদে নিজের ক্ষুদ্র অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলে (শিবের প্রণাম - "নিবেদয়ামি চাত্মানং" স্মরণ কর) সেই দিন তুমি জ্ঞানের পূর্ণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলে। আজ চাহিয়া দেখ সমাধির যে শেষ মোহ তাহাও কাটিয়া গিয়াছে। সেই "জ্ঞান-সম্পদ" আজ মায়ের অব্যক্ত করাল-বদনে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই অসুর তোমার কটাক্ষে ভীত। অসুরের আয়ত্তে বাস করিয়া যতক্ষণ তুমি ভাবিবে - এটুকু আমার ধন, এটুকু আমার সম্পত্তি - অর্থাৎ যতক্ষণ সম্পত্তি রক্ষার মোহ তোমার থাকিবে ততক্ষণ অসুর নিশ্চিন্ত। আজ তুমি তোমার সমস্ত সম্পদ আহুতি দিয়াছ, তাই অসুর শঙ্কিত। আজ তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তুমি প্রকৃতই শক্তিমান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছ শীঘ্রই মা তোমার নিকট কর্ম্মজগতের পূর্ণ বিকাশটী হইয়া দেখা দিবেন; তুমি পুরুষোত্তম হইবে। যখন তোমার প্রেমে, সুখে, শান্তিতে এবং জ্ঞানে মোহ ছিল, ততদিন তুমি প্রভূত সম্পত্তিশালী ছিলে। কর্ম্ম করিতে তোমার ভয় হইতেছিল, সে সম্পত্তি কমিয়া যাইবে ভাবিয়া। আজ সে নেশা কাটিয়াছে, তুমি কর্ম্ম করিতে সর্ব্ব শক্তিমান্ হইয়াছ। তুমি সত্যই শক্তি-সাধক, তাহার শেষ পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইলে। এবার তুমি পুরুষোত্তমে (মানব-শ্রেষ্ঠ) প্রতিষ্ঠিত হইলে।

মানুষ যদি দুর্ব্বলতাহীন হয় তবেই অসুরকুল ভীত হয়। অসুর তখন বুঝিতে পারে এবার আমায় চিনিয়াছে। শক্তি-স্তরের কর্ম্মী কখনও অসুরকে ক্ষমা করেন না। তিনি জানেন ক্ষমার নামে অসুর নূতন সুবিধা অর্জ্জন করিতে চায়।

মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং - মুকুটে রেখামাত্র চন্দ্র অবস্থিত।

মস্তকে চন্দ্র থাকার কথা শিব-স্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। চন্দ্রটীই বুঝাইয়া দিবে সেই স্তরের অনুভূতিটী কত কলার জ্ঞান প্রকাশ করে। মহত্তত্ত্বের অনুভূতিকে ১৫ কলাপুষ্ট পূর্ণিমার চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। চন্দ্রের প্রকাশ-অংশে ১৫ কলা এবং অপ্রকাশ অংশে ১৫ কলা অবস্থিত। এই রেখামাত্র চন্দ্র-কলা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ঐ তিথিতে শেষ রাত্রে অতি সামান্য সময়ের জন্য

পুস্তকে এই ধ্বনিবিজ্ঞান আলোচনা করিবার সুযোগ আসিবে কিনা তাহা আমরা এখনও বলিতে পারি না।

এই চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবের স্তরের অনুভূতি অষ্টকলা জ্ঞানের আধার। মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে ১৫ কলা জ্ঞানের অনুভূতি হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ণিমার চন্দ্র বলিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। পূর্ণিমার বাদ কৃষ্ণপক্ষে এই চন্দ্রমাই কলায় কলায় বিলীন হইয়া চতুর্দ্দশীতে এক কলায় দাঁড়ায়। দেবীর ধ্যানে এই চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকে "ইন্দুরেখা"-রূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই রেখামাত্র চন্দ্র (বা জ্ঞানের অনুভূতি) অবস্থিত থাকিয়া সাধকের জ্ঞান-রাশি বিলীন হইয়া যায়। ইহাই তুরীয় শক্তির-অনুভূতি। ইহাই অব্যক্তের অনুভূতি বলিয়া সাধকগণ জানিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অব্যক্তের নিজস্ব কোন অনুভূতি নাই। অনুভূতি জ্ঞান-ক্ষেত্রেই (মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে) হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই বিলীন হইয়া যখন অতি সামান্য অবশিষ্ট থাকে তখনই সাধককে অব্যক্ততত্ত্বের অনুভূতিতে স্থিত বলা যায়। ঐ রেখামাত্র জ্ঞানটুকু না থাকিলে অনুভূতিই থাকে না। অনুভূতি এবং জ্ঞান একই কথা জানিতে হইবে।

সাধক! মায়ের ধ্যানে নিজের জীবন-লক্ষ্যের কথা আজ বুঝিয়া লও। তুমি কোথায় কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া আছ তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। তুমি কোথায় যাইতে চাও এবং কি করিতে চাও ভাবিয়া দেখ। অসুর! তুমিও ভাব একি করিতেছ? তুমি তোমার নিজের শরীরের তৃপ্তির জন্য এ কি করিতেছ ভাব। তুমিই বা কেন এমনভাবে বদ্ধ হইয়া ছোট হইয়া থাকিবে। তুমিও এস, বিকাশের পথ ধর। তুমি কর্ম্মীর আদর্শ গ্রহণ কর। তুমি লক্ষ মানুষের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে শুধু অন্নের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে বাধ্য করিতেছ কেন? মানুষকে বিকাশের পথ করিয়া দাও। মানুষের জীবন-সংগ্রাম সহজ হইয়া উঠুক। মানুষ বিকাশের কথা ভাবুক।

মানুষ! তুমি হয়ত বৃক্ষরূপে একদিন পৃথিবীকে ভোগ করিতে আসিয়াছিলে। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে তোমার হয়ত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছিল তাই তুমি কৃমি কীটের রূপ ধারণ করিয়াছিলে। কৃমি-কীট হইয়াও সুখে ভোগ করিতে পার নাই বলিয়া আবার পক্ষীরূপে আসিয়াছিলে। পাখী* হইয়াও তৃপ্তি পাও নাই। পশু

---

*কোন কোন পণ্ডিতের মতে পশুর পর পাখীর উদ্ভব হইয়াছিল। পশুর পর যদি পাখীর উদ্ভব হইয়া থাকে হউক, ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু পাখীকে যেন কেহ পশুকলা হইতে উন্নত কলাপুষ্ট জীব মনে না করে। কোন্ শ্রেণীর জীবে কত কলার বিকাশ আমরা মাত্র তাহারই আলোচনা করিতে যাইতেছি। বাস্তবিক কোন্ জীবের পর কোন্ জীব আসিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। স্ত্রী এবং খাদ্যই ক্রম-বিকাশের ভিত্তি নহে। ওরূপ ভাবে ক্রম-বিকাশ সাজাইলে নিশ্চয় ভুল হইবে। অন্তর্বিকাশের উপর ক্রম-বিকাশ বেশী নির্ভর করে। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে আমরা করিতে চেষ্টা করিব)। যাহা হউক প্রাণময় কোষ-পুষ্ট জীবে চার কলার বিকাশ আছে। বৃক্ষে প্রাণময় কোষের এক কলার বিকাশ ধরা হইয়াছে। স্বেদজসৃষ্টিতে প্রাণময় কোষের দুই কলার বিকাশ মানা হইয়াছে। অণ্ডজে তিনকলা এবং জরায়ুজে চার কলার বিকাশ মানা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণের তমোগুণের প্রাধান্যে উদ্ভিজ, প্রাণের তমঃ+রজে স্বেদজ, প্রাণের রজঃ+সত্ত্বে অণ্ডজ এবং প্রাণের সাত্ত্বিক অংশ পুষ্ট জীবই জরায়ুজ (পশু)। তমোগুণ-প্রধান জীব একটু জড় হয়। রজো-গুণ প্রধান জীব একটু চঞ্চল হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ

হইয়াছিলে, তাহাতেও তৃপ্তি পাইলে না। ঘাত-প্রতিঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া মানুষ হইলে। মানুষ হইয়া ভোগ করিয়া সুখী হইবে ভাবিলে, দেখিলে ভোগেও সুখ নাই। মনের চঞ্চলতা তোমাকে বিচলিত করিল। ধীরে ধীরে ত্যাগের অভ্যাস শিখিয়া কতকটা ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সূর্য্য ও বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত আসিলে। দেখিলে সে সুখ সে শান্তি স্থায়ী হইল না। তখন নিজের অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া শিব হইলে, শান্তির স্বরূপ হইলে। সে শান্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের বিকাশের কেন্দ্রে আসিলে। আজ দেখিতেছ সেই জ্ঞানও অব্যক্ত-শক্তির আধারে বিলীন হয়। তাই আর কেন - বৃথা কেন অত্যাচার অবিচারের জাল পাতিতেছ? অন্তরের দিকে নজর ফিরাইয়া দাও। এমন এক সাধারণ নিয়ম তোমার চরিত্রে ফুটাইয়া তোল যাহার সংস্পর্শে শাসন-যন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র ও শিক্ষা-ধারা প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ক্রম-বিকাশে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। কাহাকেও যেন কেহ বদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারে। দেখিতে পাও না কি - আজ মানুষ সত্য কথা পর্য্যন্ত বলিতে পথ পাইতেছে না? আজ বিচার ক্ষেত্র, রাজদরবার পর্য্যন্ত সত্যের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া মানুষকে মিথ্যা বলিতে বাধ্য করিতেছে। পিতা, মাতা, শিক্ষক, সঙ্গী কেহই আজ মানুষকে সত্য কথা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারিতেছে না। হায়! মানুষের সমাজের একি ঘোর অধঃপতন হইল!! সত্যকেই (সত্যই গণেশ-কেন্দ্রের প্রধান অংশ) আজ যখন অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, পাঁচ কলার ক্ষেত্রেই যখন মানুষ দাঁড়াইতে পারিতেছে না তখন শক্তির স্তরে মানুষ কি করিয়া দাঁড়াইবে?

আসুরিক শক্তি যখন শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করে তখন তাহারা এমন ভাবে আইন বা নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া লয় যাহাতে মানুষে গণেশ-কেন্দ্র পুষ্টি হইতে না পারে। ইহারা সূর্য্য (শিক্ষা), বিষ্ণু (সমাজ), শিব (ধর্ম্ম) প্রভৃতির সমর্থক হয়, কিন্তু ইহাদিগকে গণেশ-হীন করিয়া প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে। আসুরিক বিষ্ণু-চরিত্রে এবং কার্য্যে বিশেষত্ব এই যে গণেশকেন্দ্র পুষ্ট হইতে দিবে না। আসুরিক কর্ম্ম-বিজ্ঞানের এই কৌশল বুঝিয়া তুমি নিজের পথ সহজ কর।

শিব অংশে ‘‘বিন্দুনাদ কলাতীতং’’ (গুরু-প্রণাম) এর কথা বলা হইয়াছে। এই ‘‘বিন্দু’’ অর্থে শিবের ষষ্ঠ মুখ। ইহা আমাদের বিশুদ্ধ অভিমান। এই অভিমানই মনোময়-কোষরূপে পরিণত হইয়াছে। ‘‘নাদ’’ - শিবের ঈশান মুখ। ইহাই মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র, এখানে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। ‘‘কলা’’-এই শক্তি ধ্যানে ‘‘ইন্দুরেখা’’ রূপে স্থান পাইয়াছে, এই কলাই অব্যক্তের অনুভূতি। ইহাই ২৯ কলাপুষ্ট অনুভূতি। এই অনুভূতিটুকু শেষ হইলে যাহা বাকী থাকে তিনি গুরু, আত্মা বা ব্রহ্ম।

প্রধান জীব একটু শান্ত হইয়া থাকে। রজো স্তরের জীব কেবল চঞ্চলই নহে, উহারা বেশী বুদ্ধিমান্, কর্ম্মী এবং সঙ্ঘ-ধর্ম্ম প্রিয় হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে পশু হইতে পাখীর মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ বেশী। পশুগণ মানুষের খুব নিকটস্থ জীব। পশুর সঙ্গে মানুষের যতটা ভাব-বিনিময় সহজ পাখীর সঙ্গে ততটা সহজ নহে। মানবসমাজেও তামস্ এবং সাত্ত্বিক স্তরের (শিব-স্তরের) মানুষ হইতে রাজস-স্তরের মানুষ (গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু) বেশী বুদ্ধিমান্, কর্ম্মপ্রিয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে। ঋষি স্তরের মানুষ কর্ম্মী-স্তরের মানুষ হইতে বেশী বিকশিতই হইয়া থাকেন।

এখানে আমরা দেখিতেছি ‘‘কালাভ্রাভাং’’ ‘‘কটাক্ষৈ ররিকুলভয়দাং’’ এবং ‘‘মৌলিবদ্ধেন্দু রেখাং’’ একই অনুভূতির কথা প্রকাশ করিতেছে। ইহারা সবই জ্ঞানীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও কর্ম্মীর লক্ষণে ‘‘কটাক্ষৈ ররিকুল ভয়দাং’’ এর কথা আসিবে। অর্থাৎ এই স্তরের কর্ম্মীকে সব সময়েই আসুরিক শক্তির আক্রমণ সহ্য করিতে হইবে, ইহা প্রাকৃতিক বিধান।

শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈ রুদ্ধহস্তীং - শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ এবং ত্রিশূল এই চারিটী অস্ত্র (দেবী) হস্তে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

এই স্তরের কর্ম্ম-লক্ষণ যেরূপ হইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ ইঙ্গিত ধ্যানের এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। শক্তি-স্তরের বিকাশ লইয়া যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা একাধারে কর্ম্মী এবং জ্ঞানী হইয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ কর্ম্মী দুর্লভ। বিশেষ করিয়া অনুভূতির পথে শক্তিস্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া খুবই অসম্ভব। কর্ম্মীগণ তাহা বলিয়া হতাশ হইবেন না। বিতর্ক সাহায্যে এই স্তর বুঝিয়া লইয়া এই স্তরের আদর্শ-গ্রহণ করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় এই শক্তি-স্তরের সাধনা ও কর্ম্মাদর্শ বর্ত্তমান সময় সমস্ত ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধমত, শাঙ্কর এবং পরে বৈষ্ণব মত ভারতের বুকের উপর বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ মত এবং শাঙ্কর মত বিশেষভাবে শিব-স্তরের শান্তি এবং ত্যাগ প্রধান ধর্ম্ম মতের সমর্থক। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম প্রধান (সূর্য্য) মতকে সমর্থন করে। এ দিকে সমাজ সম্পূর্ণরূপে স্মার্ত্তকারদের হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি ‘‘বিষ্ণু-স্তর’’। বিষ্ণু-স্তরের কাজ হইল ,সমাজকে ভাগ করা এবং একদল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। একমাত্র কর্ম্মপ্রধান বা শক্তি-ভাবোদ্দীপক সাধনা তন্ত্রেই আছে। তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অংশ ‘‘শক্তি-সাধনা’’। তাহার প্রচার একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্মৃতির চর্চ্চা করেন তাঁহাদের মধ্যে শক্তি দীক্ষার সামান্য অবলম্বন এখনও আছে। স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের এবং জ্যোতিষিগণের বংশ পরম্পরায় কোথাও সামান্য তান্ত্রিক সাধনার বীজ আছে। প্রাচীন বৈদ্যচিকিৎসকগণও তন্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা রাখিতেন। এখন অনেক স্থানের শাস্ত্রীয় চিকিৎসকগণ ইহার খবরই রাখেন না। শক্তিশালী তান্ত্রিক সাধনা রাজকুলে এবং ঋষিকুলে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আসেবিত হইত। আজ ভারতের রাজশক্তির অধঃপতনে তাঁহাদের বংশ পরম্পরায় ইহার আদর আর নাই। শক্তিশালী তান্ত্রিক সাধনার কথা এখন আর কেহ জানিতেই পারে না। যাঁহারা বংশ পরম্পরায় গুরুগিরি করেন তাঁহারা ত সাধনার ধারও ধারেন না। সাধনশক্তি শিব-স্তরের শক্তি। এই শক্তি শিষ্য পরম্পরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যদি শিষ্য প্রকৃত সাধননিষ্ঠ এবং গুরু-সেবক হয় তবেই এ শক্তি লাভ করিবে। ইহা বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইবার শক্তি নহে। এদিকে পঞ্চ-মকারের পাল্লায় পড়িয়া তান্ত্রিকগণ হাবুডুবু খাইতেছেন। সে সব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শক্তি-সঞ্চয় সহজ ব্যাপার নহে। দিব্যাচারী তান্ত্রিক সাধক নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা মানুষ, যাঁহারা যুবক, যাঁহারা দেশের এবং সমাজের প্রাণ তাঁহারা জানেন ধর্ম্ম বলিতে ‘‘জগৎ এবং কর্ম্ম মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য’’ই বুঝায়। তাঁহারা জানেন ধর্ম্ম বলিতে স্মৃতি শাস্ত্রের বচন - ‘‘তোর কোন কর্ম্মে অধিকার

নাই; আমায় ধন রত্ন দে, আমায় ভূমি ঘোড়া বস্ত্র দে, আমি বংশ পরম্পরায় তোর সমস্ত বিষয়ের ও ধর্ম্মের অধিকারী, আমি তোকে স্বর্গে, পাতালে নরকে পাঠাইতে পারি; তুই আমায় দে - ইহাই তোর ধর্ম্ম; ইহার অন্যথা করিলে তোর চৌদ্দ পুরুষ নরকে যাইবে''। অথবা ধর্ম্ম বলিতে তাঁহারা খোল-করতাল-যুদ্ধ বুঝিয়া থাকেন। যাহা হউক ধর্ম্ম বলিতে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে তাহাতে কর্ম্ম-ভাব এবং বীর-ভাব খর্ব্বই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় বীর-ভাব এবং কর্ম্ম-ভাব-প্রধান ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

'শঙ্খ' - সত্যের প্রচার। অসত্য এবং অন্যায়ের দৃঢ় প্রতিবাদকে 'শঙ্খ' বলা হইয়াছে। যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিয়া আসুরিক শক্তি বা অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাই 'শঙ্খ'। অসুরত্ব এক বিন্দুও সহ্য করিব না - ইহাই 'শঙ্খ'। মানুষের সমাজে শিক্ষা-বিভাগ এই অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। শিক্ষা-বিভাগ আত্ম-বিকাশের পথে ইহা অপেক্ষা বড় অস্ত্র আর গ্রহণ করিতে পারে না। সূর্য্য-স্তরের বিশেষ বিকাশ যে সব মহাপুরুষে দেখা যায় তাঁহারা জীবনব্যাপী শক্তির এই অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য-স্তরের বিকাশ যাঁহাদের চরিত্রে অল্প তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন না। এখানে বলা প্রয়োজন এই অস্ত্রটীকে কেহ সামান্য অস্ত্র বলিয়া মনে করিবেন না। যে সব আসুরিক শক্তি সমাজে ভদ্রলোকের মুখোশ পরিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করে এই বিতর্ক-অস্ত্রে তাহাদের মুখের মুখোশ খুলিয়া যায়। সূর্য্য-স্তরে দাঁড়াইয়া এই অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া প্রয়োগ করিলে তাহা বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। 'শঙ্খ' শক্তির একটী মাত্র অস্ত্র। সবগুলি অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া তবে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়।

'চক্র' - সংগঠন বা সমাজ। প্রতিবাদে অসুরের শক্তি দুর্ব্বল হয়। এই দুর্ব্বলতার লক্ষণ অন্যায় আক্রমণ। যাঁহারা আক্রমণ সহ্য করিবার জন্য পূর্ব্বেই ব্যূহ (চক্র) রচনা করেন নাই তাঁহারা উহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ঐ আক্রমণের সম্মুখে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেন। তাই শঙ্খের পূর্ব্বেই চক্র রচনা করিতে হয়। মৃত্যু ভয় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চক্রের মধ্যে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। সৈনিকের জীবনের আদর্শ যাহারা বুঝে না তাহারা এরূপ চক্রের মধ্যে আসিবে না যে চক্রের লক্ষ্য আসুরিক শক্তির বিরোধিতা করা। নেতার আদেশে যে কর্ম্মের দায়িত্ব পাওয়া গিয়াছে তাহা পালন করিতে যখন একজন লোক এতটা দৃঢ় হইতে পারেন যাহাতে তিনি অনায়াসে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে পারেন তাঁহারই চক্রে প্রবেশ-অধিকার আছে। বহুদিন যথাযথ আজ্ঞা পালনের অভ্যাস দ্বারা এরূপ স্বভাব আয়ত্ত হইয়া থাকে। আজ্ঞা পালনের তৎপরতা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা চক্র-শক্তির মর্ম্মও বুঝিতে পারিবেন না। আত্ম-বিকাশের পথকে আসুরিক ভাব-দুষ্ট দুর্জ্জন হইতে মুক্ত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া একজন নিজের গুরু বা নেতার আদেশে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে প্রস্তুত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধীনে ঐরূপ একদল মানুষকে গড়িয়া লইতে হইবে। এই ভাবেই চক্র প্রস্তুত করিতে হয়। চক্র অবশ্যই আসুরিকতার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। বিষ্ণু-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া যখন চক্র প্রস্তুত হয় তখন ঐ চক্র আসুরিকতার বিরুদ্ধে বিনিময়ের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। আসুরিক ভাবদুষ্ট মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সব মানুষ মানুষের আত্ম-বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিবার

জন্য জাল পাতিয়া বসিয়াছে এরূপ মানুষকে তাহারা একমুষ্টি দানার দ্বারাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয় না। বাস্তবিক আসুরিক ভাবদুষ্ট মানুষকে বাঁচাইবার জন্য আজ যে শক্তিটুকু ব্যয় করা হইবে তাহারই অপব্যবহার কাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। সংগঠিত সমাজ স্বার্থপর, পর-পীড়ক এবং আসুরিক ভাবাশ্রিতকে সর্ব্বভাবে ত্যাগ করিবে। ইহাই বিষ্ণু-কেন্দ্রের চক্র-প্রয়োগ। শক্তি-স্তরের চক্র সেরূপ নহে। ইহা যুদ্ধ ক্ষেত্রের ব্যূহ। ইহার প্রথম অবলম্বন মৃত্যু। ইহার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আসুরিক প্রকৃতির মানুষ স্বার্থের জন্য যে কিরূপ নীতিহীন আচরণ অবলম্বন করিতে পারে তাহার পরিচয় শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া লওয়া প্রয়োজন। যাহারা নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং অত্যন্ত জঘন্য ভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহে তাহারা নিশ্চয়ই আসুরিক শক্তিকে লইয়া খোঁচাখুঁচি করিবে না। শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর না হইলে পথ একেবারেই সহজ হয় না। শক্তি-স্তরের চক্র এই ভাবেই গড়িতে হয়।

“ত্রিশূল” - ত্রিশূল শান্তি এবং ধর্ম্ম রক্ষার অস্ত্র। ধর্ম্ম শান্তিরই স্বরূপ। মনের ভোগমুখী গতি, মোহ এবং অভিমানকে নিয়মিত রাখিতে না পারিলে অশান্তি আসিবেই। প্রত্যেক জীবে প্রকৃতি দেওয়া একটা ধর্ম্ম আছে। বানরের বাঁদরামি করা যেমন স্বভাব বা ধর্ম্ম মানুষেরও সেইরূপ শান্তিই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। শিব-স্তরের মানুষ স্বভাবতঃই শান্ত এবং নিরীহ হইয়া থাকেন। শিব-স্তরের বিকাশই মানুষের আদি বিকাশ। সাধারণতঃ দেখা যায় শিব স্তরের মানুষ খাইয়াই সুখী। আহার পাইলে তাঁদের আর ভাবনা নাই। পরিশ্রম করিয়া খাওয়া এবং নিশ্চিন্ত হইয়া আহার করিতে পারিলে মানুষের যে সুখ তাহা শিব-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষের সঙ্গ করিলে বুঝা যায়। মানব-সমাজে যতদিন সেই ঋষির মত শান্ত এবং মজুরের মত সরল কর্ম্মময় জীবন ছিল ততদিন শান্তিই ছিল। পরে নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধির বিকাশে বহু প্রকার অশান্তির সূত্রপাত হইয়া অন্যান্য যুগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুর্বুদ্ধিগুলির প্রধান আশ্রয় ভোগের ইচ্ছা, মোহ এবং অভিমান। শিবের হস্তের ত্রিশূল ঐ তিনটী গ্রন্থিকে শিথিল করিবার চেষ্টা মাত্র। শিব ধর্ম্ম-গুরুকেই জানিতে হইবে। ধর্ম্মের সংগঠন নাই। সংগঠন সব সময়ই বিষ্ণু-কেন্দ্র-শক্তি। বর্ত্তমান সময় পৃথিবীর ধর্ম্মগুলি সংগঠনে আবদ্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ ধর্ম্মের আসল উদ্দেশ্য ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে সংগঠন সেখানে মোহ আসিবেই। সঙ্ঘকর্ত্তার যতই প্রশংসা কর না কেন তিনি বিষ্ণু-কেন্দ্রের ধন, জন ও ভোগে আবদ্ধ হইবেনই। শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া সংগঠনে মোহ আসে না; অর্থাৎ আসুরিকতার বিরুদ্ধে সংগঠনে মোহ নাই। যতক্ষণ অভিমান জীবিত আছে (যতক্ষণ রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয় নাই) ততক্ষণ যে কোন সময় মোহ আসিতে পারে। শক্তি-স্তরের বিচারযোগ্য ভিত্তি না থাকিলে সংগঠনে মোহ আসিবে। যুদ্ধই শক্তি-স্তরের প্রধান ভিত্তি। সেই যুদ্ধের দুইটা দিক - তাহার একদিকে আসুরিকতা ধ্বংস, অন্যদিকে নিজের অজ্ঞানতা নাশ করা।

যাহা হউক মানুষ মাত্রই কোন না কোন ধর্ম্ম মানিয়া চলে। ধর্ম্ম মানা মানুষের যেন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক স্বভাব-বৈচিত্র্য। কিন্তু গুরুদের দোষে সেই ধর্ম্মও বর্ত্তমান সময় মোহে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গুরুতে যে শক্তি নাই শিষ্যে সে শক্তি আসা খুবই কঠিন (অবশ্য অসম্ভব নহে)। শক্তি-কেন্দ্র-লক্ষ্য পুষ্ট শিষ্যকে কোথাও আটকাইয়া রাখা যায় না;

সে শিষ্য অগ্রসর হইবেনই। মানুষ মাত্রই যদি শক্তি-কেন্দ্রের আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করে তবে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ঋষিগণ বিভিন্ন স্তরের যে কর্ম্ম এবং অনুভূতির ভিত্তি সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় লইয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল। ইহাতে সমাজের উন্নত বিকাশের পথ সহজ হইবে। শিক্ষক, নেতা, সমাজকর্ত্তা এবং গুরুকে শক্তিস্তরের আদর্শে আজই পাওয়া যাইবে না। তবে ছাত্র, সঙ্ঘসভ্য, সমাজবাসী এবং শিষ্য যদি উন্নত আদর্শ বুঝিতে পারেন তবে একদিন সবই সহজ হইবে। সুতরাং ধর্ম্ম মানার সঙ্গে আরও এমন কিছু মানার প্রয়োজন যাহাতে বিকাশের পথ সহজ হয়। একজন ধর্ম্মগুরুর শক্তি একজন সমাজকর্ত্তা হইতে অনেক বেশী এবং ব্যাপক। ধর্ম্মগুরু যদি নিজের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন তাঁহার দায়িত্ব এই মানব-সমাজে একজন সমাজ-কর্ত্তা হইতে কত বেশী। ভোগী, মোহী এবং অভিমানীকে ধর্ম্মগুরু এমন কৌশলে সংযত রাখেন যাহাতে সমাজের অনিষ্ট হইতে না পারে। ধর্ম্মগুরু সমাজ কর্ত্তাদিগকে অতি কৌশলে উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধনা সাহায্যে বিজ্ঞানময়কোষের সন্ধান পান নাই এমন মানুষ ধর্ম্মগুরু হইলেই অসুবিধা হয়, কারণ বিজ্ঞানের স্তরে না আসিলে ইচ্ছা, মোহ এবং অভিমান মুক্ত হওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছেন এমন শক্তিশালী সাধক না পাইলে যাকে তাকে গুরু করা কর্ম্মীর এবং জ্ঞানেচ্ছুর প্রায়ই মঙ্গলের কারণ হয় না। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রত্যেক জীবের প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ বিকৃত হইলে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। কতকগুলি সমাজ ধর্ম্মের নামে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে বিশেষ বাধার কারণ হইয়া রহিয়াছে। সেই সব ধর্ম্ম ধর্ম্মের স্থানে মোহকে প্রচার করিয়া থাকে। সেগুলিকে ধর্ম্ম না বলিয়া সমাজ বলিলেই ভাল হয়। এখন ধর্ম্ম বলিতে লোকে যাহা বুঝিতেছে তাহা ধর্ম্ম মোটেই নহে। সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক নিজেরা সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া গড়িতে সুবিধা পাইতেছে। গুরুকে সমাজের মোহ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আত্মার কোলে এবং আত্মার আদর্শে আত্মদান করিতে হইবে। আত্মার সন্ধান মানব-সমাজকে দান করিয়া তিনি মানবকে দুর্ব্বলতাহীন কর্ম্মী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। অসুরকে কি করিয়া দমন করিতে হয় তাহারও ইঙ্গিত তিনি দিতে থাকিবেন। গুরু সর্ব্বজীবের মধ্যে একই আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। সুতরাং তিনি সকল মানুষের আত্মবিকাশের পথ সহজ করিয়া দিবেন। গুরু শিষ্যকে আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিবেন এবং কেমন দৃঢ় হইয়া অসুরকে ধ্বংস করিতে হয় তাহাও শিখাইবেন। গুরু সংগঠনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মের নামে ভোগের সুবিধার জন্য সংগঠন করিবেন না। ইহাই দেবীহস্তের "ত্রিশূল"।

বর্ত্তমান সময় গুরুগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তরে শিষ্যগণকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া শিষ্যের আত্মবিকাশে বাধা প্রদান করিতেছেন। যিনি ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়াছেন (অনুভূতিতে সূর্য্য-স্তরে আসিয়াছেন) তিনি শিষ্যকে নাচাইতে কাঁদাইতে পারিলেই সুখী হন। আবার যিনি সর্ব্বত্যাগী (অনুভূতিতে গণেশ স্তরে প্রতিষ্ঠিত) তিনি শিষ্যকে কৌপীন পরাইয়া ভিক্ষুকের দলে টানিতে চেষ্টা করেন। যিনি ধ্যান-যোগী (বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত) তিনি শিষ্যকে বৃত্তি নিরোধের হিসাব দেখাইতে চেষ্টা করেন। যিনি শান্ত

অবস্থা লাভ করিয়াছেন (অনুভূতিতে শিব-স্তরে আসিয়াছেন) তিনি শিষ্যকে বুদ্ধিশক্তি, শিক্ষাশক্তি, সংগঠন-শক্তি এবং কর্ম্ম-শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া শান্তির নামে জড় বা অকর্ম্মণ্য করিতে নিযুক্ত হন। গুরু শিষ্যকে শিষ্যের অন্তরস্থিত সমস্ত শক্তির সহিত সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন - অর্থাৎ অন্তর্বিকাশে বিশেষ সাহায্য করিবেন। অন্তর্বিকাশ ধীরে ধীরে হয়। একেবারে এবং এক জন্মে বিকাশ নাও হইতে পারে। গণেশ-স্তর হইতে তাহা আরম্ভ এবং শেষ পর্য্যন্ত গণেশই প্রধান সহায়। গুরুশক্তির বিশৃঙ্খলায় ভারতের কর্ম্মশক্তি এমন হীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে ভয় হয়। যাহা হউক ফলে গুরুদের অভাবে চেলাগণ কোন পথেরই পথিক হন না। শেষকালে গুরুর নামে দোকান চালাইবার চেষ্টা করিয়া বড় বড় মঠ মন্দির গড়িয়া মহান্ত হন এবং অতি ছোট বৈষয়িক সম্বন্ধে জড়িত হইয়া ঝগড়ার প্রবৃত্তি লইয়া দল গড়িতে প্রবৃত্ত হন; কেহ বা বংশ পরম্পরায় গুরুগিরি করিবার ফন্দি-আঁটিয়া নানাপ্রকার ঘৃণিত স্বার্থ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। সমাজেও এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে যে কোন প্রকার উন্নত লক্ষণ বুঝিতে পারে এমন লোক অত্যন্তই কম। একদল বিদ্বেষী অন্য দল বোকা ভক্ত।

(মোহের বাহিরে দাঁড়াইয়াছেন এমন গুরু আমাদের চক্ষে খুবই কম পড়িয়াছে। ছেলের জন্য, ভায়ের জন্য আমার সম্পত্তিগুলি স্থায়ী হইয়া থাকিবে এরূপ মনোবৃত্তি প্রায় সাধকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা আবার অন্যের অজ্ঞানতা ভাঙ্গিবার জন্য ধর্ম্মকথা বলিতে সাহস পান, ইহাই আশ্চর্য্য! গুরু গৃহী হউন বা সন্ন্যাসী হউন জ্ঞানের পূর্ণক্ষেত্র হওয়া চাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গুরুগিরি এখন বাক্‌চাতুর্য্যের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ চাতুর্য্যের আড়ালে ভোগও আছে মোহও আছে। সমাজের কি ভীষণ বিপদ!)

বহুদিন অবধি ধর্ম্মশক্তির উপর কলঙ্ক আসিয়া গিয়াছে। গুরুগণের নামে নানাপ্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কোন সময়েই এরূপ ছিল না। যাহা হউক এই সব সঙ্ঘের যে লক্ষ্য কি তাহা বুঝাই যায় না। ধর্ম্মশক্তির প্রধান কর্ম্ম মানুষকে শক্তি-স্তরের সন্ধান দেওয়া অর্থাৎ মানুষ বা মানুষের রীতিনীতি যাহাতে সহজে পূর্ণ বিকাশের স্তরে আসিতে পারে তাহা চেষ্টা করা। কিন্তু কোন সঙ্ঘের মধ্যেই এরূপ কোন আভাষ নাই। কেমন একটা সং দেখাইবার চেষ্টা মাত্রই দেখা যায়।

মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে সাহায্য করিবার জন্য সমাজে কর্ম্মের একটা বিভাগ আছে। মাতা-পিতা পালন করেন, শিক্ষক সর্ব্ববিধ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সহিত পরিচয় করাইয়া শিষ্যের জ্ঞান উন্মেষের সাহায্য করেন। শিক্ষার পর মানুষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সমাজে প্রবেশ করে, সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পালনের ভার গ্রহণ করে। সামাজিক বিকাশ সেই সময় তাহার হইতে থাকে। গুরুর কাজ ইহার একটিও নহে। গুরু তাহাকে তাহার বিকাশের মধ্যে যে সব ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে সেইগুলিই সংশোধন করিবেন। তাহাকে তাহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, সমাজ, দেশ প্রভৃতির বিকাশ-অনুকূল করিয়া তো গড়িবেনই অধিকন্তু আত্মার পূর্ণ বিকাশের পথে যে সব অনুভূতি শিষ্যের জন্য প্রয়োজন সে দিকেও পরিচালিত করিবেন। সংগঠন সমাজধর্ম্ম, গুরুর এত সময় কোথায় যে সংগঠনের কথা ভাবিয়া দিন কাটাইবেন? সংগঠন-বিজ্ঞান

এবং আত্ম-জ্ঞানের পথে সাহায্য করিবার কৌশল এক নহে। গুরু যে কোন সংগঠনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে সমাজের প্রকৃত উপকার হিবে। মানুষও যদি প্রকৃত ভোগ, মোহ এবং অভিমানহীন গুরু বাছিয়া লইতে পারেন তবে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

গুরুর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব এ জগতের উপর অত্যন্ত বড়। দল গড়িয়া যদি তিনি মানুষকে মোহের দিকে টানিতে থাকেন তবে তাঁহার দায়িত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। দল সব সময়ে কর্ম্মিগণই গড়িবেন। গুরু ধনীকে বলিবেন বিকাশের পথে অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে সাহায্য বা উপযুক্ত পাত্রে দান করিতে। আবার গরীবকে বলিবেন উপার্জ্জনের পথে নিষ্ঠা রাখিতে। দোকানদারকে বলিবেন ভেজাল না দিতে, আবার খরিদ্দারকে বলিবেন দেখিয়া শুনিয়া খরিদ করিতে। সকলের আত্ম-বিকাশের পথে সব দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি প্রত্যেকটি উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি খবরের কাগজ না পড়িয়াও দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন সেরূপ উপদেশ দিতে পারেন। সমাজের শান্তির সামঞ্জস্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি তাহা সবই বুঝিতে পারেন। এরূপ দায়িত্বের কথা না বুঝিয়া তিনি যদি একটা সঙ্ঘে বদ্ধ হইয়া যান এবং একটা প্রকাণ্ড সঙ্ঘ পালনের কথাই ভাবিতে থাকেন তবে আর্থিক চিন্তায় তাঁহাকে এতটা ব্যস্ত হইতে হইবে যাহাতে তিনি বহুস্থানে উপযুক্ত বিচার অবলম্বন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মের নামে সংগঠনগুলির মধ্যে কিছুদিন বেশ অন্তরঙ্গভাবে মিশিলে এরূপ বহু ঘটনার পরিচয় যে কেহ পাইতে পারেন। গুরুকে কায়মনোবাক্যে শিবের স্তরের জ্ঞানীর আদর্শ অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই দেবীর হস্তের "ত্রিশূল"।

গুরুর সঙ্গ লাভ করিবার পরেই মানুষের ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং অন্যায় ও আসুরিক বিরোধ ভাবগুলি ধীরে ধীরে হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইতে থাকে। তখন শিষ্য মুখে বড় বড় কথা না বলিয়া নীরবে সমাজের আত্মবিকাশের চেষ্টায় নিজের অকৃত্রিম চিন্তা-শক্তি একটু একটু করিয়া নিয়োজিত করিতে থাকেন এবং বিশ্বস্তভাবে কিছু করেনও। গুরু সর্ব্বপ্রথম শিষ্যকে আত্মার অমরতার এবং নির্মলতার কথা শুনাইবেন। পরে শিষ্য যখন যেমন স্তরে আসিবেন তখন তাহাকে সেই স্তরের দুর্ব্বলতাগুলির নিকট সাবধান করিয়া দিয়া আরও উন্নত স্তরের সন্ধান দিতে থাকিবেন। ভোগেচ্ছায় মত্ত হওয়া, মোহে আবদ্ধ হওয়া এবং অভিমানে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া আত্মবিকাশের পথে বিপজ্জনক এ কথা অতি সুন্দর ভাবে ধরাইয়া দিবেন। ইহাই দেবীর হস্তের "ত্রিশূল"।

ধর্ম্মের স্তরে প্রত্যেক মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে আত্মবিকাশে সাহায্য করিতে হয়। কেহ যেন দল বাঁধার মতলবের মত একটা সাধারণ মতলব (Scheme) আঁটিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর না হন। আত্মোন্নতির পথে নিজের বিবেক এবং নিজের সাধনাই প্রধান সহায়। গুরু তাহার পর যাহা হয় করিতে পারেন। গুরুকে আত্মবিকাশের পথে অবিচলিত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। সেই সঙ্গেই অন্যকে সাহায্য করিয়া চলিতে হইবে। নইলে অন্যকে সাহায্য করিতে যাইয়া নিজে শক্তিহীন হইয়া যাইবেন। ধর্ম্মের নামে দল বাঁধা ভাল নহে। যত প্রকারের ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে সব সমাজ। প্রকৃত ধর্ম্মস্তরে প্রতিষ্ঠিতগণ আকাশের মত সীমাহীন উদার এবং বাতাসের মত স্বাধীন। দল বাঁধিলে তাহা সমাজই

হইয়া দাঁড়ায়। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মহাপুরুষগণ যতই দল গড়েন ততই মঙ্গল। গুরুগণ যখন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন তখন জানিতে হইবে গুরুর মধ্যে বিষ্ণু-স্তরের বীজ আছে। অনেক স্থানে মোহই তাঁহার সংগঠনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, তিনি যতই সংযত হইয়া অবস্থান করুন না কেন একদিন হয়ত অবতার হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিবেন বা বংশ-পরম্পরায় গুরুগিরির পথ খুঁজিবেন। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি না থাকিলে এরূপ গোলমাল হইয়া থাকে। যাহা হউক গুরু সব সময়েই শিবস্তরের জ্ঞানের অধিকারী হইলেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইহাই দেবীর হস্তের "ত্রিশূল"।

"কৃপাণ" - কৃপাণ তরবারীকে বলে। এই অস্ত্রই শক্তি-স্তরের বিশেষ অস্ত্র। শক্তি-পূজায় কৃপাণকে ধর্ম্মপাল (ধর্ম্মের রক্ষক) নাম দেওয়া হইয়াছে। জীবের পূর্ণতার পথে স্বাভাবিক গতির নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে আসুরিক শক্তি বাধা দেয় বা রুদ্ধ করে। "কৃপাণ" সেই অসুরকে ধ্বংস করিবার অস্ত্র। "কৃপাণ" মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সত্য, প্রেম এবং শান্তিকে রক্ষা করে। "কৃপাণ" জ্ঞানীর নির্ম্মল জ্ঞান (অজ্ঞান-ছেদনকারী) এবং কর্ম্মীর হস্তের দৃঢ় অস্ত্র (অসুর-ধ্বংসকারী)। শক্তি স্তরে আসিলেই জ্ঞানী পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন এবং কর্ম্মী প্রকৃত দুর্ব্বলতাহীন কর্ম্মী হন। ইহার পূর্ব্বস্তর পর্য্যন্ত কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই দুর্ব্বল। এ সব দুর্ব্বলতার স্তরে প্রকৃত ধর্ম্ম পালন হয় না।

সাধক! অন্যায় দেখিলে প্রতিবাদ করিতে ভয় হয় কি? অন্যায় দেখিলে তোমার শরীরে অগ্নির উদ্দীপন হয় কি? যদি ভয় হও তবে ফিরিয়া যাও। এখনও তোমার শক্তি সাধনার সময় হয় নাই। যদি সত্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে তোমার ভয় না-ই হয় তবে তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিব - তুমি নিজে যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে কর (যাহা তোমার অধিকারে আছে) তাহা তুমি সকল মানবের আত্ম-বিকাশের পথকে সহজ করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে সঙ্কুচিত হও কি? অর্থাৎ তুমি নিজে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবে তুমি কোথাও মোহে বদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাস কি না? যদি এরূপ মনোভাবও তোমার না হইয়া থাকে তবে তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিব - দেখ, অন্যকে ছোট করিয়া রাখিয়া নিজেকে বড় করিতে ইচ্ছা হয় কি? (কাহারও সহিত এমন ব্যবহার ভাল নহে যাহাতে সে নিজেকে ছোট বা হীন মনে করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যাহারা দৈবী সম্পদের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না এমন লোকের সঙ্গে অস্বাভাবিক উদার ব্যবহার করিলে সে লোক বিশেষ অনিষ্ট করিবারই পথ পাইবে।) এইরূপ মনোভাব যদি না হইয়া থাকে আর যদি তুমি উৎসাহী অধ্যবসায়ী এবং উদ্যোগী হও তবে তুমি শক্তি সাধনায় প্রবেশ করিতে পারিবে। তুমি পূর্ণ কর্ম্মী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে পারিবে। মানুষের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতে পারিবে এবং মানুষের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহা তুমি রক্ষাও করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষের বহু স্থানে এখনও মহাষ্টমী আদি বিশেষ শক্তিশালী পর্ব্বদিনে* কৃপাণের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার আসল মর্ম্ম বর্ত্তমান সময় প্রায় কেহ অবগত নহেন।

---

* শক্তিশালী পর্ব্বদিন। শক্তিশালী পর্ব্বদিন সম্বন্ধে কর্ম্মী এবং সাধকগণের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ ঐ সব দিনগুলি শক্তি লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বর্ত্তমান

পশ্চিম দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ বংশে ও রাজসম্মানে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার পূজা এখনও বেশ আড়ম্বরের সহিত হইতে দেখা যায়। বঙ্গ-দেশেও ইঁহার পূজার ব্যবস্থা আছে। শিখগণের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এই কৃপাণকে নিত্য পূজার সামগ্রী করিয়া নিজের শিষ্যগণের হাতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। নেপালী ক্ষত্রিয়গণও কৃপাণ ছাড়া এক পা চলেন না। দুঃখের বিষয় তাহা এক্ষণে বহুস্থানে ধর্ম্মের সংএ পরিণত হইয়া গিয়াছে। কেহ বা নিতান্ত পশুর মত ইঁহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সব প্রাচীন বংশে বংশ পরম্পরায় ইঁহার পূজা হইয়া থাকে তাঁহারাও ইঁহার পূজা করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব কাহিনী স্মরণ করিয়া মনে মনে আত্মশ্লাঘা মাত্র অনুভব করিয়া থাকেন। নিজেরা শৃগাল থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সিংহ বিক্রমের মূল্যই বা কি? ইঁহার যে কি কর্ম্ম আছে তাহা বুঝা প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল একদল মানুষকে শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করাইয়া দেওয়া। যাহার সংক্ষেপ উদ্দেশ্য সত্যে, প্রেমে এবং নিরভিমানে নিজেকে গড়িয়া লওয়া এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা। অসত্য, অপ্রেম, এবং অশান্তিকে জগৎ হইতে দূর করিবার জন্য জীবনকে ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহারই নাম "কৃপাণ"। কৃপাণ চালনার অভ্যাস থাকিলে মনে তেজের সঞ্চার হয়। শুধুই বেলপাতা ও ফুল চন্দনে পূজা করিলে তাহা পাওয়া যায় না। শক্তিশালী দিনে ইঁহার পূজা করিয়া চালনা করিবার প্রথা ভারতের বহুস্থানে দেখা যায়। শারদীয়া বিজয়ার দিবস রাজপুতদের মধ্যে এই উৎসব বিশেষ সমারোহে হইয়া থাকে।

আসুরিক শক্তিকে বা অসুরকে ক্ষমা করা নীতিবিরুদ্ধ। সূর্য্য-শক্তি জগৎকে সুস্থ রাখিতে পারে না। বিষ্ণুশক্তিও জগতের শান্তির জন্য যথেষ্ট নহে। ধর্ম্মশক্তিও দুর্ব্বল। প্রত্যেক স্তরের দুর্ব্বলতার আড়ালে আসুরিক শক্তি পুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শক্তি-স্তরের

সময় দেশের এই ঘোর অধঃপতনের যুগে শক্তিশালী দিনগুলি নিতান্তই হেলায় নষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের অতীত গৌরবের যুগে শক্তিশালী দিনগুলি কত যে আদরের সহিত অতিবাহিত করা হইত তাহার কথা রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণগুলি আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যাইবে। যে সব দিনে উৎসবাদি কর্ম্মি এবং সাধকগণকে করিতে দেখা যায় তাহা কেবলই কোন মহাত্মার জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মহাত্মাদের স্মৃতিপূজার দ্বারা বালকগণকে উৎসাহ দেওয়ার বিধি প্রাচীনকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু সেই স্মৃতিপূজায় সাধক বা কর্ম্মীদের শক্তি সঞ্চয়ের কাজ বিশেষ হয় না। বর্ত্তমান সময় শক্তি পূজার দিনের যত আদর শক্তি সঞ্চয়ের দিনের তেমন আদর নাই। বহুদিন বৈষ্ণববাদ বা লীলা প্রধান ধর্ম্মের প্রাবল্যে আজ মানুষ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছে। লীলাবাদ প্রধান ধর্ম্ম যে কেবল প্রচার করিবার কৌশল মাত্র ইহা জানা প্রয়োজন। যাঁহারা শক্তিশালী হইতে চাহেন তাঁহারা শক্তিশালী দিনে নিজের যন্ত্র এবং অস্ত্র আদির পূজা করিবেন। যাঁহারা সাধক বিশেষ ভাবে জপ এবং হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহারা উৎসবাদি করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা ঐ সব দিনেই পূজা এবং হোমাদির বাদ উৎসব করিবেন। ইহাতে জাতিকে বেশী শক্তিশালী করিবে। শক্তিশালী দিন - শারদীয় এবং বাসন্তী নবরাত্র, মাঘী পঞ্চমী, জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি, কালী পূজার তিথি, শিব রাত্রি, জন্মাষ্টমী, চৈত্র ও পৌষ সংক্রান্তি ইত্যাদি।

আদর্শে সে কথা খাটে না। কারণ এ স্তরের মানুষ নিজে দুর্ব্বলতা হীন। যাহারা ভোগে বদ্ধ এবং যাহারা বিশ্ব মানবতা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে (অর্থাৎ যাহাদের অভিমান মলিন) তাহারা শক্তি স্তরে আসিতে পারিবে না। ত্রিশূল ভেদ করিয়া শক্তি-স্তরে আসিতে হয়। আবার ভাবাবেশের মোহ, ধ্যানাবস্থার সুখের মোহ এবং সমাধির শান্তির মোহ কাটাইয়া 'কৃপাণ' অবলম্বন করা চলে।

অস্ত্রগুলিকে দেবী ঊর্দ্ধমুখী করিয়া ধারণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ দেবী অস্ত্রগুলিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। চলতি কথায় ইহাকে 'সঙ্গিনী' অবস্থা বলে। দেবী যেন যে কোন মুহূর্ত্তে রণক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ একেবারে অনলস স্বভাবে এ স্তরের মানুষ নিজের চরিত্র গঠন করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা সৈন্য বিভাগে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ভাবনার সময় সেখানে নাই, সর্ব্বদাই প্রস্তুত। শরীর দৃঢ়, কর্ম্মঠ ও সহিষ্ণু। আবার মন উদ্বেগ শূন্য, নিশ্চিন্ত, ভীতিশূন্য এবং তেজমণ্ডিত।

শক্তি-স্তর বলিতে রাজশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। এ রাজশক্তি অর্থে কোন রাজা বিশেষের শক্তি নহে। রাজশক্তি অর্থে মানব মাত্রেরই শাসন-বিভাগ। মানব মাত্রেরই শিক্ষা-বিভাগ বলিতে সূর্য্য-স্তর, সমাজবিভাগ বলিতে বিষ্ণু-স্তর, ধর্ম্ম বিভাগ বলিতে শিব-স্তর এবং শাসনবিভাগ বলিতে শক্তি-স্তর বুঝিতে হইবে। মানুষের অন্তরে এই সব কেন্দ্রের বিকাশ আছে বলিয়াই মানুষ বহির্জগতে ঐরূপ বিভিন্ন প্রকার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যাহা হউক প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ঋষিগণ রাজাকে এমনভাবে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন যাহাতে শক্তি-স্তরের আদর্শ রাজার শাসন নীতিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে! শাসন শক্তির পরিচালকগণ যদি শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া আসুরিক স্তরের আদর্শ গ্রহণ করে তবে মানুষের ভীষণ বিপদ বলিতে হইবে। বর্ত্তমান সময় শাসন যন্ত্রের সংশোধনের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ "রাজশক্তির আসুরিক আদর্শ গ্রহণ"। সর্ব্বত্র শক্তিশালী রাজশক্তিগুলি মানুষকে শোষণ করিয়া একদল বা দেশ বিশেষের মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য বহু প্রকার মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদকে সমাজের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের কথা শাসনযন্ত্র রাজাই চালান বা প্রজাই চালান অথবা অন্য যে কোন উপায়ে ইহা পরিচালিত হউক না কেন তাহাতে আসে যায় না। যতক্ষণ শাসন যন্ত্র শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করিবে না ততক্ষণ শক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে ভোগে বদ্ধ, যে মোহবদ্ধ ও যে অভিমানে বদ্ধ সে রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে। আবার ভোগ, মোহ এবং অভিমানবদ্ধ কোন সঙ্ঘও যে একটা আসুরিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে এরূপ ভরসা করাও বৃথা। যাহা হউক আমাদের কথা সমাজকে এবং মানুষকে শক্তি স্তরের আদর্শে গঠন করিবার জন্য কর্ম্মিগণ (গুরু, সমাজকর্ত্তা, শিক্ষক এবং যুবকগণ) যদি অগ্রসর হন তবেই ইহার প্রতিকার আছে, নইলে নহে। যে রাজার আসনে বসিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া আসুরিক আদর্শকে ধরিয়া রাখিবে তাহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দেওয়ার শক্তি কেবল শক্তি-স্তরের আদর্শগ্রাহী জন সাধারণেরই থাকিতে পারে।

শক্তি স্তরের শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল এবং কৃপাণের সার মর্ম্ম এই যে শিক্ষা-বিধি এবং শিক্ষক শক্তিস্তরের আদর্শে প্রস্তুত হইবে। ইহা কোন সম্প্রদায় বা দেশ বিশেষের স্বার্থের সুবিধার জন্য এবং সম্প্রদায় বিশেষকে বিকাশে বাধা দিবার জন্য হইবে না। সংগঠন বা সমাজ গঠন (চক্র) ভোগের জন্য ও সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার জন্য না করিয়া সকলের আত্মবিকাশের অনুকূল করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মানব সমাজকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে অন্যায় হইতেই প্রতিবাদ-'শঙ্খ' চারিদিক হইতে বাজিয়া উঠে। জ্ঞানিগণ বা গুরুগণ বাছিয়া বাছিয়া কর্ম্মী এবং মুমুক্ষুগণকে সাধনা এবং কর্ম্মের পথ ধরাইয়া আত্মার ছাঁচে গড়িয়া দিবেন। সেই সব কর্ম্মী শিক্ষা এবং সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিবেন ও আসুরিকতাকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। সেই ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠ, নিষ্কলঙ্ক, ত্যাগী সাধকগণই ভবিষ্যৎ গুরুর আসন গ্রহণ করিবেন (ত্রিশূল)। চেষ্টা করিয়া কাহাকেও গুরু বা নেতা করিয়া প্রস্তুত করা যায় না। সে সব উপাদান লইয়া যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সামান্য ইঙ্গিতে অন্তরকে বিকাশ করিয়া লইতে পারেন। রাজা এবং রাজবিধি শক্তিস্তরের আদর্শে প্রস্তুত করিতে হইবে। শাসন কর্ত্তাদেরও শক্তিস্তরের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। যাঁহারা শক্তি স্তরের আদর্শকে বুঝেন এমন লোকই মন্ত্রী বা রাজ-সভাসদ হওয়া প্রয়োজন। রাজশক্তির যদি কুমতলব থাকে তবে তাঁহারা তাহা হইতে দিবেন না। তখন প্রজা প্রথম শঙ্খ বাজাইবেন, পরে কৃপাণ ধারণ করিবেন। যে বুঝিয়া জানিয়া সংশোধন করে না কৃপাণ তাহাকে ক্ষমা করেন না। আসুরিক ভাবদুষ্ট রাজশক্তি যতটা শক্তিশালী শক্তিস্তরের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত প্রজাশক্তি তাহা হইতে বহুগুণ বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজাশক্তির ভীতির কারণ নাই।

অনেকে মনে করে যোগবল দ্বারা আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করিয়া একটা অঘটন ঘটান যায়। এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। প্রত্যেক কর্ম্মেরই বিজ্ঞান আছে। কর্ম্মের বিজ্ঞান জানিয়া সেই ভাবে আত্ম-গঠন করিয়া শক্তিশালী হইতে হয়। যাঁহারা আসুরিক ভাবদুষ্ট তাঁহারা কর্ম্মবিজ্ঞান জানিয়াই শক্তি অর্জ্জন করেন এবং প্রভুত্ব করেন। আবার যাঁহারা কর্ম্মযোগী তাঁহারাও শক্তিবিজ্ঞান বুঝিয়াই শক্তি সঞ্চয় করেন এবং আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করেন। যাঁহারা প্রকৃতই যোগী স্তরের মহাপুরুষ তাঁহারা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষকে নূতন ভাবে জাগাইয়া দিতে পারেন। যাহা হউক নিজেকে প্রাণপণে শক্তির ছাঁচে ঢালিয়া যাইতে হইবে এবং যখন যেটুকু ক্ষেত্র পাওয়া যায় সেইরূপ কাজ করিয়া যাইতে হইবে। একটা পশুর নিকটও তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যমান। বড় বড় মতলব আঁটিয়া নিজের কর্ম্মশক্তি নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আসুরিক অত্যাচারে মানুষ যদি অন্তরে ব্যথিত হইয়াই থাকে তবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবেই। শক্তিশালী কর্ম্মিগণ সে সময় জন্ম লইবেনই। ইহা প্রাকৃতিক বিধান। তুমিও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না। নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। নিজের চিন্তার দৃঢ়তা থাকিলে অতি সামান্য কর্ম্মের মধ্যেই মানুষ এমন আলো পাইবে যাহাতে সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইবার জন্য পথ পাইবে, ভাবিলে তাহা হইবে না।

আইন করিয়া নিয়ম করিয়া বা বড় বড় মতলব আঁটিয়া মানুষকে গড়িতে পারিবে না। রাজশক্তি যখন আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করে তখন কেন্দ্রীয় নিয়মেই গোলযোগ করিয়া রাখে। সেই সব নিয়মকে সংশোধন করিতে না পারিলে দুই চারটা আইন বদ্‌লান না

বদ্‌লান সমান। মানুষ যখন মনুষ্যত্বের উপাদান ত্যাগ করিয়া হীন মনোভাব দ্বারা নিজেকে গঠন করিয়া লয় তখন জানিতে হইবে কেন্দ্রীয় শাসনে ভুল আছে। নইলে ঐরূপ হইতেই পারে না। মানুষকে ফাঁকি দিবার জন্য যদি কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে, তখন আইন বাঁচাইয়া যে মানুষ মাত্রই সত্যকে নষ্ট করিয়া অন্য মানুষকে বঞ্চিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং পথ আইনের মধ্য দিয়া সহজ হইবে না। নিজে নিজের অন্তরে প্রবেশ কর। নিজের অন্তরকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেখ। মনুষ্যত্বের উপাদান সেখানে কি আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। নিজেকে সেই প্রাকৃতিক উপাদানে প্রস্তুত কর এবং কর্ম্মক্ষেত্রে যখন যাহাকে পাইবে তাহাকেও সেই উপাদানে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর। কথার মধ্য দিয়া মানুষ গড়া যায় না। কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ গড়িতে হয়। নিজের দৈনন্দিন কর্ম্ম অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিত্যই সম্পন্ন করিও। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিও। নিত্য শরীর চালনার অভ্যাস রাখিও। সময় মত স্নান আহারের অভ্যাস রাখিও। অতি সামান্য সময়ও নিজের অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইও। খুব শীঘ্রই তুমি বুঝিতে পারিবে। নিজেকে গড়িবার এই কয়টী প্রধান উপাদান ত্যাগ করিয়া অন্যকে গড়িতে সুবিধা হইবে না।

দেবীর হস্তের 'শঙ্খ এবং চক্র' অর্থে শক্তিস্তরে দাঁড়াইয়া বিষ্ণু-শক্তির (সমাজ) অবলম্বনকে জানিতে হইবে। সূর্য্যশক্তি বিষ্ণুশক্তিরই অংশ। সুতরাং দেবীর সহিত যে সূর্য্যশক্তি সংযুক্ত রহিয়াছে ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। ত্রিশূল অস্ত্র দেবীর হস্তে থাকিবার কারণ শিবের শক্তিও যে শক্তির সহিত সংবদ্ধ তাহা বুঝা যায়। গণেশ এবং সূর্য্যের জন্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন গণেশ শিব এবং শক্তি অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সূর্য্য বিষ্ণু (কশ্যপ) এবং শক্তির (অদিতির) অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সূর্য্যে কতকটা বিষ্ণুশক্তি বিদ্যমান। তাই সূর্য্যের প্রাণটা দুর্ব্বল। সূর্য্যকেন্দ্রপুষ্ট কর্ম্মিগণ কঠোরভাবে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পারে না, সহজেই চিন্তিত হন - মরিতে এবং মারিতে। সূর্য্যের অন্য অংশটা শক্তি হইতে আসিয়াছে, তাই সূর্য্য স্তরের কর্ম্মী অসুরের বিরুদ্ধে খুব স্পষ্টভাবে যুদ্ধের ঘোষণা করিতে পারেন। গণেশ শিবের পুত্র; তাই এ স্তরের কর্ম্মিগণ ভবিষ্যৎ ভাবিতে পারেন না, সহজেই কর্ম্মে নামিয়া পড়েন। গণেশে শক্তির অংশ থাকিবার দরুণ তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। পুরাণের মতে দৈত্য এবং দেবতাদের পিতা একই কশ্যপ, কিন্তু মাতা দুইজন। সূর্য্য যে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন না ইহা তাঁহার পিতৃ মোহ। গণেশ শিবস্তরের মানুষকে (মজুর আদিকে) বেশী ভালবাসেন। শিক্ষা এবং সঙ্গ প্রভাবে শিব স্তরের মানুষ সহজেই অন্যায় ভাবে বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট হইয়া যায় এবং বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট স্বার্থবাদিদের মত স্বার্থেরই পিছে ধাবিত হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। গণেশ এ কথা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের পিছনে সহজেই ঝুকিয়া পড়েন। ইহাও গণেশের পিতৃ মোহেরই ফল জানিতে হইবে। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট কর্ম্মিগণকেও গণেশ আসুরিক বিষ্ণু বলিয়া ধারণা করেন। ইহা গণেশের বিশেষ দুর্ব্বলতা বলিতে হইবে। শক্তি স্তরের কর্ম্ম-বিকাশে কোনই

দুর্ব্বলতা নাই। শক্তি সকলের সমর্থক, কেবল আস্থরিকতা সহ্য করেন না। ইহাই হইল 'কৃপাণের' মর্ম্ম কথা।

গণেশের দুর্ব্বলতা যতই থাকুক না কেন গণেশই প্রকৃত কর্ম্মী এবং ত্যাগী। গণেশের নিজের বিচারে দৃঢ়তা থাকিবার দরুণ যেমন সহজে গণেশ কর্ম্মে অগ্রসর হন তেমন খুব সহজে বেশী বুঝিতে পারেন। মস্তিষ্কের কেন্দ্র পরিচয় সম্বন্ধে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে গণেশ-কেন্দ্রটী একদিকে, আর শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য ও মনের কেন্দ্র অন্য দিকে। গণেশ-কেন্দ্রই জীবকে বিকাশ করিবার প্রধান সহায়, ৪ কলার পর হইতে ৮ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ গণেশ-শক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত গণেশ-কেন্দ্র পুষ্ট হইবেন না তাঁহারা গেরুয়া পরিহিত সাধু, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু মণ্ডিত মহাপুরুষই বা বিশ্ব-বিশ্রুত নামী পণ্ডিতই হন ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারে দাঁড়াইতেই পারিবেন না। জীবন্মুক্তির আনন্দ কেবল গণেশই দিতে পারেন অন্যে নহেন। পূর্ব্বে শিব অংশে বলা হইয়াছে - শিবের মস্তকে যে চন্দ্র দেওয়া আছে তাহা অষ্টমীর চন্দ্র। (শিবের মস্তকে অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশীর চন্দ্র থাকিতে পারে, তবে অষ্টমীর চন্দ্রই শিবের মস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।) গণেশের কপালে চতুর্থীর চন্দ্র আছে। আমরা গণেশকে পঞ্চম কলা পুষ্ট অনুভূতির কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছি। যে কোন জীবের অন্তঃকরণে জ্ঞানের চারি কলা বিকশিত হইয়াছে তাহাদেরই বিচার করিবার শক্তির উন্মেষ হইয়াছে জানিতে হইবে। কিন্তু চারি কলা পুষ্ট বিচার শক্তি খুবই দুর্ব্বল, সে বিচার জীবকে কুবুদ্ধির পথেই বেশী পরিচালিত করে, সেই বুদ্ধি মনের অধীন বুদ্ধি মাত্র। বুদ্ধি যখন পঞ্চম কলায় দাঁড়ায় তখন সেই বুদ্ধি মনের বিষয় ভোগের বেগকে দমন করিয়া দিবার জন্য শক্তিমান হয়। (গণেশের মস্তকে চতুর্থী, পঞ্চমী ও পূর্ণিমার চন্দ্র থাকিতে পারে)। তাই আমরা গণেশকে পঞ্চম কলা পুষ্ট অনুভূতির কেন্দ্রে স্থাপনা করিয়াছি। যাহা হউক চতুর্থী তিথি গণেশ পূজার প্রশস্ত দিন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সূর্য্য কেন্দ্র মাতৃত্বের কেন্দ্র। সূর্য্য কেন্দ্র পুষ্ট মানব খুব স্নেহশীল হইয়া থাকেন। সূর্য্য কেন্দ্র ষষ্ঠ কলাপুষ্ট কেন্দ্র। এ জন্য যাঁহারা সন্তানের মা হইতে ভালবাসেন তাঁহারা ষষ্ঠী দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। ষষ্ঠী দেবীর উপাসনা অর্থে জীব মাত্রকেই স্নেহ করা বুঝায়। ষষ্ঠী মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এই ষষ্ঠ কলাই জাগরণ কলা, তাই এই ষষ্ঠী তিথিতেই মহাশক্তি দুর্গার বোধন হইয়া থাকে। একটা জাতিকে প্রচার করিয়াই জাগাইয়া দিতে হয়। সূর্য্য-কেন্দ্রের ইহাই কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য। যাহা হউক গণেশের দোষ গণেশ জাগতিক ভোগ সমর্থন করেন না। শক্তি-স্তরে আসিলে আমরা দেখিতে পাইব ভোগে মোটেই দোষ নাই, কিন্তু আস্থরিকতাই দোষের। মানবেতর সমস্ত জীবেই ভোগের স্বাভাবিক বেগ আছে। কিন্তু মানবেতর কোন জীবেই আস্থরিকতা নাই। এক মাত্র মানুষই মানবকে বিকাশে বাধা দিবার জন্য জাল পাতিয়া থাকে। অন্য জীবে এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন শক্তি-স্তরের আদর্শে ভোগের বিরোধিতা না থাকিলেও ত্যাগকে অবলম্বন করিয়াই উন্নত বিকাশ হইয়া থাকে। ভোগকে ধরিয়া রাখিয়া বিকাশ (৭ কলার উপরে) আসিবে না। শক্তি-স্তরে আসিলে অবশ্য ভোগের বিরোধিতা নাই, কিন্তু ত্যাগ না থাকিলে বিকাশই আসিবে না।

ত্রিনেত্রাং - শক্তির তিনটী চক্ষু।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি সূর্য্য এবং শিবেরও তিন চক্ষু রহিয়াছে। সূর্য্য-স্তরে স্নেহের দৃষ্টি, সুতরাং সজ্জন ও অসজ্জনকে সূর্য্য একই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। সূর্য্য ভক্তি-স্তর, সুতরাং সূর্য্য (সূর্য্য-স্তরের মানুষ) ঈশ্বরকেও ভাল রাখেন। সূর্য্য-স্তরের তিনটী চক্ষুতে সজ্জন, দুর্জ্জন এবং ঈশ্বর তিন দিকের নজর বুঝায়। শিব-স্তরে সাধক স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ জগতের দ্রষ্টা হন। শিব-দৃষ্টির স্থূল জগতই সূর্য্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া দর্শন করেন। সূর্য্য-কেন্দ্রের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সাধক যে তত্ত্বটীকে ভগবান বলিয়া মনে করেন তাহা শিব-স্তরের দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম-জগৎ, দৈব-জগৎ বা ভাব-জগতের দর্শন মাত্র। উহা সাধকের অন্তঃকরণেরই একটা অংশ মাত্র। তাহা স্নেহময় অরুণাভ জ্যোতির একটা ব্যাপক স্পর্শরূপে ধরা পড়ে। এই দৈব-জগতই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। সূর্য্য-স্তরে ইহার চেয়ে বেশী অনুভূতি নাই। ইহাই ভাবাবেশের অনুভূতি। ভাব, মহাভাব, রাগ, অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি, সবই ঐ একই স্তরের কথাকে বৈষ্ণব দর্শনে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাজান হইয়াছে মাত্র। ভক্তির স্তর ক্রম-বিকাশের পথে একটী স্তর। সুতরাং ভক্তির স্তরকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিলে ভুল করা হইবে। বিকাশের পথে ইহার প্রয়োজন আছে। তবে ইহাতে মোহ থাকা বিকাশের কণ্টক। শিব-স্তরের অনুভূতিতে আসিলে স্থূল জগতের ন্যায় এবং অন্যায় আর দর্শনে ফোটে না। ন্যায়ও স্থূল, অন্যায়ও স্থূল। তাই সাধক এ স্তরে নির্ব্বিকার সমাধিস্থ থাকেন। ভাল মন্দ লইয়া মাথা চালাইবার শক্তি, এ স্তরে সাধকের থাকে না। সাধক এ স্তরে আসিলে বহুদিন পর্য্যন্ত কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারেন না। কাঁচা নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিলে মানুষের যেমন অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে সাধকেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়। একবার শিব-স্তরের শান্তি বোধে সমাধিস্থ হন পরক্ষণে বিষ্ণু-কেন্দ্রের সুখবোধে নামিয়া আসেন, আবার হয়ত চক্ষু খুলিয়া অত্যন্ত উদাস নয়নে এই স্থূল জগতটাও দেখিয়া লইতেছেন। বার বার শান্তির কেন্দ্রে যোগস্থ হইতে চেষ্টা করিতে থাকেন। বার বার অন্তরস্থিত শান্তিবোধরূপ অমৃতকেন্দ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া যেন কত কালের (কত জনমের) অশান্তির জ্বালা নিবাইবার জন্য তাহাতে লীন হইতে থাকেন। এইভাবে একবার কারণ (শান্তি-জগৎ), একবার সূক্ষ্ম (দৈব-জগৎ) একবার স্থূলে দৃষ্টিটা বদ্‌লাইয়া যাইতে থাকে। কখনও বা শান্তির কোলে সমাধিস্থও হইয়া যান। সূর্য্য ভাল ও মন্দ কারিকে একদৃষ্টিতে দেখেন না। কিন্তু স্নেহ উভয়ের উপরেই সমান। তাই মন্দ কারিকে ভাল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ইহাতে সংসারের বিশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে আসুরিক শক্তির সহিত পাল্লা পড়ে সেখানে বার বারই বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন। তাহা হইলেও সূর্য্যের সেই স্বভাব বদলায় না। ইহাই সূর্য্য-স্তরের মোহ। যাহা হউক সূর্য্য ভাল এবং মন্দ ভাবপূর্ণ স্থূল জগতের দ্রষ্টা। শিব-স্তরে আসিলে সাধক ভাল এবং মন্দ ভাবপূর্ণ স্থূল জগৎকে একই উদাস নয়নে দেখেন। ইহাই শিবের এক চক্ষু। দ্বিতীয় চক্ষু দৈব-জগৎ, বিষ্ণু-জগৎ বা সূক্ষ্ম-জগতের উপর থাকে। তৃতীয় চক্ষুটি কারণ-জগৎ, বীজ-জগৎ বা শান্তি-জগতকে দর্শন করিবার জন্য নিবদ্ধ। স্থূল জগতের ভাল মন্দ যদি শিবের চক্ষে পড়ে তবে তাঁহারও যোগাবস্থা থাকে না। তখন তিনি শিব-স্তরের দার্শনিক ভিত্তিকে ত্যাগ করিয়া এই স্তরের কর্ম্ম ভিত্তিকে (শক্তি-স্তরের আদর্শে মানুষ গড়া) অবলম্বন করিয়া

ফেলিবেন। (এখানে বলা প্রয়োজন প্রত্যেক স্তরেরই দার্শনিক হইতে কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ হন)। যে কোন মানুষ উন্নত স্তরে আসিলে তাঁহার মধ্যে দৈবী সম্পদের বিকাশ হয়। জগতের উপর আসুরিক বা অন্যায় অত্যাচার দেখিলে যে কোন দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন মানুষের অন্তরে প্রতিবাদ, প্রতিকার বা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত পশু-স্তরের মানুষ তাহাদের ওরূপ তেজোদ্দীপন হয় না। যাহারা পশু হইতেও ঘৃণিত নিম্ন-স্তরের মানুষ তাহারা ঐরূপ অমানুষিক অত্যাচার দর্শনে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যোগীগণ নিদ্রিত মানুষের মত অন্যায়গুলি দেখিতেই পান না। তাঁহাদের অন্তঃকরণের অবস্থাই এরূপ হয় যে তাঁহারা তাহা ভাবিতেই পারেন না। অন্যায় অত্যাচার দেখিলে যোগীদেরও অন্তরে প্রতিকার প্রতিক্রিয়া জাগিবেই। ইহা স্বাভাবিক। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ শান্ত-চিত্ত যোগী মহাপুরুষকে কেহ কেহ স্বার্থপর বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজের অজ্ঞানতার পরিচয় দেন। বাস্তবিক যোগীগণ স্বার্থপর নহেন। শান্তি-সম্পদ এরূপ যোগী মহাপুরুষগণ হইতেই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়। বিদ্বেষহীন হইয়া নিকটে অবস্থান করিতে পারিলে খুব সহজে যে কেহই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যে যাহাই বলুক না কেন যোগিগণের ইহা ভাবিবার অবসর নাই। তাঁহাদের যোগে প্রয়োজনীয় সর্ববিধ উপকরণ তাঁহারা একস্থানে বসিয়াই লাভ করেন। যাহা হউক সকলেই যে চিরদিন যোগস্থ থাকেন, তাহাও নহে। অনেকে সংসারের মঙ্গলের জন্য কিছুদিন বাদ কর্ম্মক্ষেত্রেও নামিয়া আসেন। কর্ম্মক্ষেত্রে না আসিলেও তাঁহাদের চিন্তাদ্বারা মানুষের বিশেষ কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। যাহা হউক শিব-স্তরের তিন চক্ষের কথা বলা হইল।

শক্তি-স্তরে আসিয়াও আমরা দেখিতেছি দেবীর তিনটি চক্ষু। এই শক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-জগতের দ্রষ্টা। এই শক্তিই পরমেশ্বরী (পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম) বা আমাদের অন্তরস্থিত সর্ব্বশক্তির সমষ্টি। আমরা আমাদের অন্তরস্থিত শক্তির অতি সামান্য অংশটুকু লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াই তৃপ্ত। এই পৃথিবীতে মানুষ যে কত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছে তাহার হিসাব করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা যখন মানুষের রীতি, নীতি, আইন, কানুনের কথা ভাবি তখন দেখিতে পাই মানুষ অতি সামান্য শক্তিটুকু লইয়াই নিজের জীবন লক্ষ্য নিয়মিত করিয়া চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের যে শক্তির সন্ধান ঋষিগণ বহু প্রাচীনকালে পাইয়াছিলেন তাহার খবর মানুষ যেন লইতেই প্রস্তুত নহে। মানুষ কেন যে অতি সামান্য লইয়াই তৃপ্ত ইহার কারণ কে বলিবে। বিভিন্ন স্তরে আমাদের দৃষ্টিশক্তির দার্শনিক ভিত্তি কেমন বদ্‌লাইয়া যাইতেছে তাহা যদি পাঠকগণ একটু অন্তরস্থ হইয়া বিচার করেন তবে বুঝিতে পারিবেন, মানুষ কিরূপ শক্তিশালী জীব। কিন্তু মানুষ আজ কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! মানুষ হয়তো লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, কিন্তু মানুষের সমাজ আজও এমন দশাগ্রস্ত যাহা হইতে স্বাধীন বন্য পশুকে বেশী সুখী বলিয়া মনে হইবে।

যাহা হউক শক্তি-স্তরে আসিয়া আমরা শক্তিকে ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তির * বিকাশের দর্শনে আত্ম-নিয়োজিত দেখিতে পাইতেছি। 'ইচ্ছা-শক্তি' ভোগিগণে বেশী

---

* শক্তিসাধনার ক্রম ধরিয়া যাঁহারা সাধন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন শক্তিকে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং জ্ঞান-শক্তি ক্রমে উপাসনা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। নিজের

বিকাশ পাইয়াছে। ‘ক্রিয়া-শক্তি’ কর্ম্মিগণে বেশী প্রস্ফুটিত। ‘জ্ঞান-শক্তি’ যোগিগণে সদা প্রকাশিত। প্রত্যেক মানবেই ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশ রহিয়াছে। এই ‘ইচ্ছা’ অর্থে ভোগেচ্ছা, ‘ক্রিয়া’ অর্থে (নিঃস্বার্থ) কর্ম্ম এবং ‘জ্ঞান’ অর্থে উপলব্ধি। যে ভোগী সে নিজের কর্ম্ম এবং জ্ঞান-শক্তিকে ভোগের জন্য প্রয়োগ করে। যিনি কর্ম্মী তিনিও নিজের ইচ্ছা-শক্তিকে কর্ম্মের সুবিধার জন্য সংযত রাখেন এবং জ্ঞান-শক্তিকে কর্ম্মের সুবিধার জন্য নিয়োজিত করেন। যিনি জ্ঞানী তিনি নিজের ইচ্ছা-শক্তিকে সংযম অগ্নিতে আহুতি দেন। কর্ম্ম-শক্তিকে জ্ঞান-বৃদ্ধির পথে (সাধন এবং তপস্যার পথে) নিয়োজিত করেন। ভোগী, কর্ম্মী, এবং জ্ঞানীর উপর দেবীর সমান দৃষ্টি। এই স্তরের নিয়মগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত যাহাতে মানবে ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত ভাবে সঞ্জীবিত থাকে। এই স্তরের নিয়ম এবং বিধি (আইনাদি) এমনই ভাবে প্রস্তুত হয় যাহাতে ভোগীর সুবিধাটুকুর জন্য কর্ম্মী এবং জ্ঞানীর অস্তিত্ব লুপ্ত না হইয়া যায়। আবার কর্ম্মীর সুবিধার জন্য ভোগীকে এবং জ্ঞানীকেও উৎসন্ন যাইতে হয় না। আবার জ্ঞানিগণের সুবিধার কথা ভাবিয়া ভোগী এবং কর্ম্মীকে মারিয়া ফেলিবার মত নিয়মও আবিষ্কৃত হয় না। আসুরিক শক্তির নিয়মে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম-শক্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলার চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভোগ-প্রধান কর্ম্ম-শক্তিকেই আসুরিক কর্ম্ম-শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। আবার জ্ঞান-প্রধান কর্ম্ম-শক্তিই নিষ্কাম কর্ম্ম। সাধক এই স্তরে আসিলে ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্যময় জীবন লাভ করেন (শ্রীকৃষ্ণ, জনক, রাম, বশিষ্ঠ প্রভৃতির জীবন চরিত বুঝিতে চেষ্টা করুন)। শিবের স্তরে অবস্থান করিলে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ জগতের উপর সমান দৃষ্টি লাভ হয়। শিবের স্তরে ভোগের সঙ্গে মোটেই সম্বন্ধ নাই। যোগ এবং ভোগ একত্র স্থান পায় না। শক্তির স্তরে ভোগের বিরোধিতা নাই। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মিদের উপর পূর্ণ স্নেহ এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের (চণ্ডীর চিত্তে কৃপা এবং সমর নিষ্ঠুরতা) বেগ রহিয়াছে। শিবের স্তরে যেমন ভোগের বেগ নাই

অন্তরস্থিত শক্তিকে বা অন্তরকে জানার নামই জ্ঞান। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ সাধনার ক্রম এক প্রকার লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা এবং সূর্য্য-কেন্দ্র পুষ্ট ভাবের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের ভারতের সমস্ত প্রকার সাধনা-ভাণ্ডার আচ্ছন্ন আছে। কর্ম্মী যদি শক্তি-স্তরে দাঁড়াইতে পারেন তবে তাহা আবার সঞ্জীবিত হইবে। নইলে তাহার খবর আর লইবার পথ নাই। গুরু, পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রকার কেহই বিষ্ণু স্তরের চিন্তার বাহিরে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সব আছে, কিন্তু সমাজে নাই শক্তি-স্তরের সন্ধান। শক্তি-সাধনার ধারা যাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও অনেকস্থলে অপূর্ণ অবস্থায়ই আছে। সাধক যদি শক্তি-স্তরের লক্ষ্য লইয়া সাধনায় প্রবেশ করেন তবেই তাঁহার সাধনার শক্তি শক্তি-স্তরের বিকাশে সাহায্য করিবে। নইলে বানরের হাতে কলা দিবার চেষ্টা করিয়া কোনই ফল নাই। লক্ষ্য যাহার ছোট সে বেশী পাইয়াই কি করিবে? যে গৃহীর মত মোহবদ্ধ সে যদি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তবে সে সন্ন্যাস বিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া মোহের কথাই ভাবিবে। যিনি শক্তি-সাধনা করিবেন তিনি সর্ব্ব প্রথম শক্তি-স্তর বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তবেই ইহার উপযুক্ত ফল লাভ হইতে পারে।

তেমনই আসুরিকতার কথাও শিব ভাবিতে নারাজ। ভোগে যেমন যোগ-ভঙ্গ হয় যুদ্ধের কথা ভাবিলেও যোগ থাকে না। এই "ত্রিনেত্রাং" অংশটুকু সকলে মনোযোগ সহকারে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। বিভিন্ন স্তরে আমাদের দর্শনশক্তি কেমন বদলাইয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ চিনিবার খুবই সুবিধা হইবে। শক্তি-স্তরে আসিলে মানুষ প্রকৃতই মানুষ হয়।

আমাদের স্বরূপের এক প্রান্তে স্থূল শরীর অন্য প্রান্তে আত্মা। শক্তি-স্তরে দাঁড়াইলে আমরা স্থূল শরীরকে পাই আত্মাকেও পাই। শক্তি-স্তরে আমরা একদিকে আত্মাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত, অন্যদিকে ভোগী, কর্ম্মী এবং যোগিদিগের উপর (মানুষের উপর) আমাদের সমান নজর হয়। অন্যান্য স্তরে আমাদের দৃষ্টি-শক্তি ভাব-জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। সকলের বিকাশের পথকে সহজ করিবার সর্ব্ববিধ উপাদান আমরা শক্তি-স্তরে বুঝিতে পারি। এদিকে আসুরিক বিকাশকেও আমরা বিশেষ ভাবে চিনিয়া লইতে পারি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্যের পথ সরল হইয়া যায়।

সিংহ স্কন্ধাধিরূঢ়াং - শক্তি সিংহ-স্কন্ধে অধিরূঢ়া আছেন।

'সিংহ' অন্যায় বা অসুর হিংসুক তেজস্বী মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইহাই এই স্তরের মানুষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিংস্র পশুর মত গা ঝাড়িয়া কেশর ফুলাইয়া অগ্রসর হন। লোকেও কথায় বলে 'পুরুষ-সিংহ' বা 'সিংহ রাশী পুরুষ'। শক্তি-স্তরের বিকাশ সেই মানুষেই আছে যিনি সিংহের মত বিক্রমশালী, তেজস্বী, গম্ভীর, যুদ্ধে অনলস, প্রফুল্ল, উৎসাহী এবং জিতেন্দ্রিয় হন। এরূপ পুরুষ দ্বারাই জগতে শক্তি-স্তরের আদর্শে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত খণ্ড শক্তিগুলির (গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব) পূর্ণ বিকাশস্থল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শক্তির একটী দুর্ব্বলতাও যাঁহাদের চরিত্রে নাই তাঁহারাই 'পুরুষ-সিংহ'। এইরূপ লক্ষণ সম্পন্ন মানুষই শক্তিকে জানিতে পারেন এবং আত্মার পূর্ণতম বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, অন্যে নহে।

এবার সূর্য্য-স্তরের "রক্তাম্বুজাসনম্", বিষ্ণু-স্তরের "সরসিজাসনং" এবং শিব-স্তরের "পদ্মাসীনং" এর সহিত এই "সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং" তুলনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন মানুষ কোন্ স্তরে কিরূপ স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যাত্মবাদী হইয়া কোন্ স্তরটী অবলম্বন করিলে মঙ্গল হইবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাত্মবাদের প্রকৃত ভিত্তি "শক্তি-স্তর"। ইহা ভিন্ন আর সবগুলির ভিত্তি 'ভাব বাদের' অন্তর্গত। শক্তি-স্তরের ভিত্তি যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে অধ্যাত্মবাদের কোন ভিত্তিই আর থাকে না। শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়াই মানুষ পূর্ণজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ যদি চাহেন তবে তাঁহাকে বলিব "উপনিষদগুলি পাঠ করুন"। উন্নত স্তরের উপনিষদ্গুলির আদি বক্তাগণের বেশীর ভাগই যে ক্ষত্রিয় রাজাগণ একথা জানিতে পারিবেন। অধিক কি আর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য গায়ত্রীর ঋষি পর্য্যন্ত মহাতেজবীর্য্যের আধার 'বিশ্বামিত্র ঋষি'। 'ভাবাবেশ', 'ধ্যানানন্দ' এবং 'শান্তিবোধ' হইতে এই শক্তি-স্তরের 'সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং' এর প্রতিষ্ঠা যে অনেক ঊর্দ্ধে একথা তখন সকলেই জানিতে পারিবেন। 'সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং' শ্রেষ্ঠ হইলেও 'ভাবাবেশ, ধ্যানানন্দ এবং শান্তিবোধকে' কেহ যেন উপেক্ষা করেন না। কারণ ক্রম-

বিকাশের পথে ইহাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। তবে কর্ম্মীর লক্ষ্য ‘শক্তি-স্তর’, ইহা মনে রাখিতে হইবে। আর্য্যের উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ‘গায়ত্রী’ শক্তি-স্তরকেই জানিতে হইবে। আজ স্মৃতি-শাস্ত্রের (বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা) ও পুরাণের (সূর্য্য-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা) যেরূপ একাধিপত্য সমস্ত ভারতের সমাজ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে হইয়া বসিয়াছে তাহাতে এই শক্তি-স্তরকে কি ভাবে সমাজে স্থায়ী করা যাইতে পারে তাহা ভাবিবারই কথা হইয়াছে। ভেদবাদ (স্মৃতি) এবং ভাববাদ (অবতার বাদ বা পৌরাণিক বাদ) ভারতের আকাশ বাতাস ছাইয়া গিয়াছে। গায়ত্রী উপাসনা এখন উপবীত ধারণের সঙ্গেই লীন হইতেছে। শক্তি সাধনার নাম শুনিলে মানুষ শিহরিয়া উঠে।

ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তিং - সমস্ত ত্রিভুবনকে তেজ দ্বারা পূর্ণ করেন। ত্রিভুবন অর্থে ত্রিলোক। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোক। ভূঃলোক অর্থে ভোগের স্থান ‘মর্ত্তলোক’, ভুবঃ লোক অর্থে ‘দৈবলোক’ কর্ম্মীর লোক এবং স্বঃ লোক অর্থে ‘জ্ঞানলোক’ বা অনুভূতির জগৎ।

আমরা যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দাদির ভোগে লিপ্ত থাকি তখন আমরা ভূঃ লোকে অবস্থান করি। আমরা যখন জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্মের কথা ভাবি বা করি তখন আমরা ভুবঃ লোকে বিচরণ করি। আমরা যখন আমাদের অন্তরস্থিত অনুভূতির কেন্দ্রে সমাধিস্থ বা ধ্যানস্থ হই তখন আমরা স্বঃ লোকে অবস্থান করি।

এখানে ত্রিভুবন অর্থে - ভোগীর লোক, কর্ম্মীর লোক এবং জ্ঞানীর লোক। ভোগী, কর্ম্মী এবং জ্ঞানী একই পৃথিবীতে অবস্থান করেন; কিন্তু তিনজনের ভাবধারা তিন প্রকারের। ভোগী ভোগের কথাই ভাবে। পৃথিবীকে কি ভাবে ভোগ করিবে সেই চিন্তায় ভোগীর মন বিভোর। কর্ম্মী নিজে পার্থিব সুখ চাহে না কিন্তু এই পৃথিবীটাকে সকলের জন্য স্বর্গের বা সুখের নিকেতন করিয়া গড়িতে চাহেন। কর্ম্মী মানুষের মনকে পশুর মত হীন স্তরে না দেখিয়া দেবতার মত উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল দেখিতে চাহেন। কর্ম্মী মানুষকে পশুর মত ভোগবদ্ধ, মোহ-বদ্ধ এবং অভিমান বদ্ধ দেখিতে ভালবাসেন না। কর্ম্মী আসুরিকতা সহ্য করিতে পারেন না। কর্ম্মী মানুষ মাত্রেরই আত্ম বিকাশের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহেন। কর্ম্মী নিজের সর্ব্বশক্তি সর্ব্বসম্পদকে মানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেন। নিজের প্রিয় শরীরটী পর্য্যন্ত জীবশিবের সেবায় ঢালিয়া দেন। কর্ম্মীর মন দৈবজগতে বিচরণ করে, ভোগ-জগতে নহে। ভোগীও কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যেই অবস্থান করে, কিন্তু ভাবে ভোগের কথা। কর্ম্মীর সুখ ইহারা জানে না। জ্ঞানী এই পৃথিবীতেই আছেন, কিন্তু অত্যন্ত উদাসভাবে অবস্থান করেন। জ্ঞানীর মন শান্তি ও অনুভূতির জগতে অবস্থিত। শত থাকিলেও অভাব বোধের তাড়নায় ভোগীর মন আচ্ছন্ন। কর্ম্মীর যাহা কিছু আছে সবটাই মানব সেবায় নিয়োজিত করেন। মানুষের মুখে নিশ্চিন্তের হাসি দেখিবেন ভাবিয়া দিন কাটান, নিজের কথা ভাবেন না। জ্ঞানীর লৌকিক সম্পদ নাই আবার অভাবের যাতনাও তাঁহার নাই; পূর্ণ তৃপ্তির কোলে তিনি সমাধিস্থ। ভোগী পৃথিবীকে ভোগের জন্য সুন্দর করিয়া সাজায়। কর্ম্মী মানুষকে দৈবী-সম্পদের ভিত্তিতে গড়িয়া দিয়া মানব চরিত্রকে সুন্দর এবং সুখদ করেন। জ্ঞানী শান্ত এবং পূর্ণ। কর্ম্ম-শ্রান্তির পর কর্ম্মী শান্তির প্রবাহ পাইবেন বলিয়া জ্ঞানী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন।

এইরূপ ভোগী, কর্ম্মী এবং জ্ঞানীকে দেবী আপন তেজ দ্বারা পূর্ণ করেন। শক্তি-স্তরের নীতির এই বিশেষত্ব যে এই নীতির অধীনে সকলেই শক্তিশালী হয়, শক্তিস্তরের আদর্শের বৈশিষ্ট্যে আস্তরিকতার সমর্থন নাই। ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান শক্তি-স্তরের আদর্শে তেজমণ্ডিত হয়।

ধ্যায়েৎ - ধ্যান করিতে হয়।

'ধ্যান' সম্বন্ধে বিষ্ণু অংশে আলোচনা করা হইয়াছে। শিব অংশেও এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি ইহারা যথাক্রমে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-কেন্দ্রস্থিত শক্তি। যে কোন সময় মনকে বৈষয়িক সংযোগ হইতে মুক্ত করিয়া লইবার শক্তিকে প্রত্যাহার বলিয়া জানিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে গণেশ-কেন্দ্র শক্তি। 'ধারণা' সূর্য্য-কেন্দ্র শক্তি। প্রিয় এবং সৌন্দর্য্য বোধের সহিত ইহার সম্বন্ধ খুব বেশী। সৌন্দর্য্য জ্ঞান যখন অন্তরে প্রস্ফুটিত হয় তখন যে কোন একটা বস্তুকে অন্তঃকরণ বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। চেষ্টা করিয়া ধারণার অভ্যাসকে ধারণার সিদ্ধাবস্থা বলা যায় না। যতক্ষণ ধারণা শক্তিটা সূর্য্য-কেন্দ্র হইতে আসিবে না ততক্ষণ কোন বস্তুই মনে জাগাইয়া রাখা যায় না। ভালবাসা দান করিয়া গুরুগণ শিষ্যের অন্তরে এই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রেও ছাত্রকে ভালবাসা দান করিয়া শিক্ষা দিবার বিধানের কথা শিব অংশে বলা হইয়াছে। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার জ্ঞান-সম্পদ সেই পাত্রে প্রতিফলিত হয়। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার মূর্ত্তি তাহার অন্তরে আপনিই আঁকিয়া যায়। ইহাই ধারণার কথা। সুখবোধের অফুরন্ত প্রবাহই 'ধ্যান'। ইহা বিষ্ণু-কেন্দ্র শক্তি। মানুষ সামাজিক জীবনে এই সুখবোধের অতি সামান্য স্পর্শ মাত্র অনুভব করিয়া থাকে। এই সুখবোধের বিনিময়ে স্ত্রী পুরুষে এবং পুরুষ স্ত্রীতে আত্ম-বিক্রয় করিয়া দিয়া থাকে। বলা প্রয়োজন ইহা ধ্যানানন্দ সুখের অতি সামান্য স্পর্শ। শিব অংশে বিষ্ণু বা চিত্তকেন্দ্র সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণের জানিতে পারিবেন যে প্রাণময় শরীরে তৃপ্তিজনিত বহু সুখ-স্মৃতি চিত্তকেন্দ্রে জমিয়া থাকে। সাধক ধ্যানানন্দ প্রবাহে আসিলে এই সুখস্মৃতিগুলি প্রত্যক্ষে ভোগ করিতে থাকেন। ইহাকে সুখানন্দ বা স্পর্শানন্দ বলা যাইতে পারে। এ আনন্দের প্রবাহে সাধক যখন আপন অন্তরে আত্মহারা হন তখন সাধক ধ্যানানন্দে বিভোর। এই ধ্যানানন্দকে যিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি সম্ভোগ-সুখকে জয় করিতে পারিবেন। যাঁহারা রিপুজয়ের কথা ভাবেন তাঁহারা ধ্যানানন্দ পাইতে চেষ্টা করিবেন। শুধু সংযমের বাঁধনে রিপু দমনের ক্ষমতা আসে না, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। 'সমাধি' শিব-কেন্দ্র শক্তি। ইহা 'কেবল শান্তির' স্বরূপ। শিব অংশে উহা বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির কেন্দ্র ভেদ করিয়া আমরা শক্তি-স্তরে চলিয়া আসিয়াছি। ইহা চির কর্ম্মময় স্তর। এখানে ধ্যানের কথা আসিতে পারে না। তবুও দেখিতেছি 'ধ্যায়েৎ' শব্দের ব্যবহার। পাঠকগণের জানা প্রয়োজন আমরা উপাসনা কাণ্ডের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। উপাসনার ভিত্তি 'দ্বৈতবাদ'। বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতি শেষ হইলে দ্বৈতবাদ শেষ হয়। অর্থাৎ উপাস্য উপাসক ভাব বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ইহার পরে যোগ এবং জ্ঞানের কথা শিব-

স্তরে আরম্ভ হইয়াছে। উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে ধ্যান হইতে উন্নত স্তরের শব্দ প্রয়োগ চলে না। উপাসনা কাণ্ড সাধককে বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়া ছাড়িয়া দেয়। সাধক মাত্রই বিষ্ণু-কেন্দ্র ভেদ না করা পর্য্যন্ত উপাসনার ভিত্তি সন্ধ্যা, জপ ও পূজাদির কাজগুলি ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলে পূর্ণতার পথে বিশেষ ভুল করা হইবে। মানুষ যখন মনের স্তরে থাকে তখন সে মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলুক আর সমাধির কথাই বলুক তাহা তাহার কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনের স্তরে মানুষের জ্ঞান কল্পনায় সীমাবদ্ধ। গণেশের স্তরে ঐ জ্ঞানের কথা ত্যাগে এবং শূন্যবোধের অন্তর্গত জানিতে হইবে। সূর্য্য-স্তরে বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলে জ্ঞানের কথা ভাব ও প্রেমের কথা মাত্র। ঠিক এইরূপ উপাসনা কাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বা যোগের কথা ধ্যানাবস্থায় সীমাবদ্ধ। বিষ্ণু-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া সাধক উন্নত স্তরের কথা ধ্যানের বিষয় করিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই জন্য উপাসনা কাণ্ডে ব্রহ্মেরও ধ্যান আছে। যাঁহারা সামান্য দর্শন-শাস্ত্র চর্চ্চা করেন তাঁহারা একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্মের ধ্যান করা যায় না। ব্রহ্ম ধ্যানের বিষয় নহেন।

ধ্যান সম্বন্ধে অন্যান্য প্রযোজনীয় কথা আলোচনা করা যাইতেছে। যোগ-দর্শনে বলা হইয়াছে 'ঈশ্বর-চিন্তনের নাম ধ্যান'। সাংখ্য-দর্শন এবং যোগ-দর্শনে প্রায় একই তত্ত্ব মানা হইয়াছে। সাংখ্যকার ঈশ্বর মানেন নাই। যোগ-দর্শনকার ঈশ্বর মানিয়াছেন। সাংখ্য এবং পাতঞ্জলে এইটুকু মাত্র ভেদ বিদ্যমান। সাংখ্যের আদি বক্তা মহর্ষি কপিল ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মকোটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ শক্তি-স্তরের 'ঈশ্বরীয়-অংশ' ঈশ্বর-স্বরূপ বা পুরুষোত্তমের অনুভূতি পান না। তাঁহারা মহৎ তত্ত্বের অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করিয়া অব্যক্তের (শক্তি-স্তরের তুরীয় অংশের) অনুভূতিতে নিজের বহুজন্ম-লব্ধ জ্ঞানরাশি আহুতি দান করিয়া অব্যক্তের পরপারে চলিয়া যান। পূর্ব্বে বহুস্থানে বলা হইয়াছে যাঁহারা গণেশকেন্দ্রের অনুভূতি বা ত্যাগের পথে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হন অর্থাৎ যাঁহারা সূর্য্য এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতির উপর বিশেষ নজর না দিয়া গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতিকে দৃঢ় হইয়া অবলম্বন করিয়া শিবের কেন্দ্রে চলিয়া যান তাঁহারা পুরুষোত্তম বা শক্তি-স্তরের ঈশ্বরাংশের অনুভূতি লাভ করেন না। এইরূপ মহাপুরুষগণই ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত। সাংখ্যের আদি গুরু পূজ্যপাদ কপিলদেব ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তাই সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর মানা হয় নাই। গণেশের পথে যাঁহারা অগ্রসর হন তাঁহারা স্বভাবতঃই ভক্তিবাদ বা ঈশ্বর বাদ প্রিয় হন না। সাধারণতঃ গণেশ কেন্দ্র-পুষ্ট কর্মীসকলও ঈশ্বর মানিতে চাহেন না। ঈশ্বর না মানা গণেশ কেন্দ্রের একটা বিশিষ্টতা। আবার সূর্য্য-স্তরের মানুষগুলি স্বভাবতঃই ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়া থাকেন। ইঁহারা স্বভাবতঃই একটু ভক্তিবাদ ভালবাসেন। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন যে ভক্তিবাদ পৃথিবী হইতে পুছিয়া যাইবে তাঁহারাও ভুল বুঝিবেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস একটা স্তরেরই বৈশিষ্ট্য। তাই ইহা পুছিয়া ফেলা যাইবে না। পুছিতে চেষ্টা করা অদূরদর্শিতার কথা। যোগ দর্শনের আদি গুরু মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সূর্য্য এবং বিষ্ণু কেন্দ্রের অনুভূতির পথে পূর্ণতার দিকে গিয়াছিলেন তাই যোগ-দর্শনে ঈশ্বর মানা হইয়াছে। যাঁহারা সূর্য্য এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতির পথে অগ্রসর হন তাঁহারা যদি কোথাও বদ্ধ না হইয়া পড়েন

তবে শক্তি বা পুরুষোত্তম স্তর পর্য্যন্ত অনায়াসেই চলিয়া আসিবেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটী পথকেই 'জ্ঞান যোগেন (গণেশ-পথ) সাংখ্যানাং' এবং 'কর্ম্ম যোগেন যোগিনাং' রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ কপিল অত্যন্ত ত্যাগ প্রধান মহাপুরুষ ছিলেন। যোগ-সূত্র এবং সাংখ্য-সূত্র আলোচনা করিলে পাঠকগণ সব পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। যোগ-দর্শনের প্রথম সূত্র 'চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ'। এখানে 'যোগ' অর্থে শিবের স্তর, এবং 'চিত্ত' অর্থে বিষ্ণু-স্তর। বিষ্ণু-স্তরের নিবৃত্তি হইলেই 'যোগ' হয়। একথা আমাদের পাঠকগণের বুঝিবার পথে কোনই অসুবিধা হইবে না। কেহ কেহ চিত্ত শব্দের অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া এই উক্তি বাতিল করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। 'চিত্ত' শব্দের যিনি যেমন অর্থই প্রদান করুন না কেন যাঁহারা অনুভূতির পথে অগ্রসর হন তাঁহারা জানেন বিষ্ণু-কেন্দ্রের 'হিরণ্ময় আবরণ' ভেদ করিতে না পারিলে যোগাবস্থা লাভ হয় না। 'কেবল শান্তিই' যোগের স্বরূপ। এই শান্তি বোধটা শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট। বিষয়ের স্পর্শে সুখ হয়। এই সুখটীর রং লোহিতবর্ণ। এই সুখস্মৃতিই আসক্তির কারণ। তাই আসক্তির অন্য নাম 'রাগ'। রাগ রং এবং লোহিত বর্ণ একই কথার নামান্তর মাত্র। অনুভূতির কেন্দ্রে শান্তিপ্রভ শুভ্রবর্ণ এবং রাগপ্রধান লোহিত বর্ণ মিলিয়া হিরণ্ময় অনুভূতি হয়। ইহাই বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতি। অনুভূতির ঐ রাগ অংশই বিক্ষেপের কারণ। ঐ রাগগুলিই নানাপ্রকার অক্লীষ্টা ও ক্লীষ্টা বৃত্তি উৎপাদন করিয়া সাধকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কাহাকে বা পতিতও করে। অনুভূতিতে বিষ্ণু-কেন্দ্রের ঐ লোহিত অংশ শেষ হইলে যোগাবস্থা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই শ্বেতবর্ণ শিব। এ দিকে সাংখ্যকার প্রথম সূত্রে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কথা উঠাইয়াছেন। গণেশের পথ ত্যাগের পথ। ত্যাগ ভাব এবং শান্তিভাব গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতির উপাদান। ত্যাগেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যের ভিত্তি গণেশ-কেন্দ্র। তাই সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই। যোগ সূত্রের ভিত্তি বিষ্ণু-কেন্দ্র। তাই যোগে ঈশ্বরের কথা আছে।

ঈশ্বর কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগসূত্র বলেন, ''ক্লেশ, কর্ম্ম এবং বিপাক যাঁহাকে স্পর্শ করে না এমন যে পুরুষ তিনি ঈশ্বর।'' ক্লেশ অর্থে 'দুঃখ' দুঃখ অর্থে 'চিত্তের বিক্ষোভ'। কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের মনের মত কাজ না হইলে বা কর্ম্মে বিফলতা আসিলে অনেক উন্নতমনা মহাপুরুষের এইরূপ বিক্ষোভ হইতে দেখা যায়। এই বিক্ষোভই ক্লেশ। যাঁহারা গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণুস্তরের আদর্শ লইয়া জনহিতকর কর্ম্ম করেন তাঁহারা খুব পাকা কর্ম্মী নহেন। তাঁহারা অনেক সময় ভাবপ্রবণতার বেগ লইয়া অগ্রসর হন এবং পদে পদে বিক্ষুব্ধ হন। এই বিক্ষোভই ''ক্লেশ''।

যাহাতে বার বার জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যু ভোগ করিতে হয় তাহার নাম এখানে ''কর্ম্ম''। সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম উভয়েরই ফল মানবাত্মাকে ভোগ করিতে হয়। নিম্নস্তরের কর্ম্মিগণ সকাম কর্ম্ম করেন। স্বর্গের লোভে জলাশয়, মন্দির এবং ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে। একটা তীর্থে যাইয়া ৫০ ঘাটে ৫০ রকমের সংকল্প লইয়া স্নান করেন। আবার দানের বেলায়ও মহাপাপীকে তাহার পাপের সহায়তার জন্য দশ বিশ রকমের স্বর্গের সংকল্প করিয়া দান করেন। এইসব কর্মফলে যেমন সুখ ও দুঃখ ভোগ

করা উচিত সবই করেন এবং লোক লোকান্তরে গমন করেন। দুর্জ্জনকে দান করিয়া দুর্বৃত্তের প্রশ্রয় দিলে তাহারও ফল পাইতে হয়।

আরও একপ্রকারের কর্ম্মী আছেন যাঁহারা দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ এবং মানব হিতের জন্য উন্নত দৈবী-সম্পদের আদর্শ লইয়া কর্ম করেন। এরূপ কর্মিগণ গণেশ, সূর্য্য এবং দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট কর্ম্মী। ইঁহারা ধীরে ধীরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইঁহাদের জন্মের বেগ ধীরে ধীরে কম হইতে থাকে। অনেক সময় ভাবপ্রবণ হইয়া কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়েন বলিয়া ইঁহারা পদে পদে বিক্ষুব্ধ হন। মোহ ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইবার দরুণ ইঁহারা জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইঁহাদের কর্ম ইঁহাদিগকে জন্মের বেগ কম করিতে সাহায্য করে। ইঁহারা তীর্থের নামেতে দুর্জ্জনকে দুষ্কর্মের সহায়তার জন্য দান করা অপেক্ষা প্রকৃত সমাজের মঙ্গলকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করা শ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করেন। ইঁহারা পিতার পিণ্ডদান অপেক্ষা পিতৃসেবার বেশী পক্ষপাতী হন। ইঁহারা কর্মজনিত মৃত্যু ভোগ করেন না, কিন্তু ইঁহারা ক্লেশ ভোগ করেন। এই ক্লেশ অর্থ চিত্তের ক্লীষ্টা বৃত্তির বেগ বা বিক্ষোভ । ইঁহারা নিঃস্বার্থ কর্মীর অন্তর্গত। কেহ কেহ ইঁহাদিগকে নিষ্কাম কর্মী বলেন।

ইহা ভিন্ন এক প্রকারের কর্মী আছেন, যাঁহারা জীবন্মুক্ত কর্মী। ইঁহারা শিব-স্তরের কর্মী। ইঁহারা যতটুকু পারেন মানুষকে বা জীবমাত্রকে বিকাশের পথে সাহায্য করেন বা শক্তিস্তরের সন্ধান দিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের শেষ বিশ্রামের পথে অপেক্ষা করেন। ইঁহারা খুব সাবধানী কর্মী। ঋষিগণ এই স্তরের কর্মী ছিলেন।

আরও এক প্রকারের কর্মী আছেন, যাঁহারা পূর্ণ ঈশ্বরের স্তরের কর্মী। কর্ম করা প্রকৃতির ধর্ম ও আত্মার ধর্ম, তাই তাঁহারা কর্ম করেন। ইঁহারা অহং (অভিমান) হীন ভাবের কর্মী। ইঁহারা সাধারণতঃ অসুর ধ্বংস করিতে আসেন এবং তাহা করিয়া বিদায় হন। ইঁহারা এবং শিবস্তরের কর্মীরা খুব পাকা কর্মী। ইঁহাদের ক্লেশ, কর্ম এবং বিপাক স্পর্শ করে না। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং রাম ও জনক এই স্তরের কর্মী ছিলেন।

অসৎ কর্মের ফলে মানুষের নরক ভোগ হয়। এরূপ নরক ভোগের নাম 'বিপাক'। যাহারা জীবকে এবং মানুষকে দুঃখ দেওয়াকেই উপাদেয় মনে করে, যাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও শোষক এবং যাহারা অন্যের বিকাশের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করে তাহাদের বিপাক ভোগ করিতে হয়। বিকাশের পথের পথিককে অকারণ পীড়ন করিলেও বিপাক ভোগ করিতে হয়।

ঈশ্বর আছেন কিনা এরূপ প্রশ্ন সর্ব্বত্র উদিত হইতেছে। ইহার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা বিকাশের পথে চলিয়াছি। যিনি যতটুকু পারুন বিকাশের পথে চলুন। সেখানে আস্তিক নাস্তিকের প্রশ্ন নাই। যাঁহার অন্তর যতটা বিকশিত তিনি ঈশ্বরের ততটুকু অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্মে ও স্বভাবে উহা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। আবার একদল আছে যাহারা অন্তরে ঘোর নাস্তিক, কিন্তু ঈশ্বরের নাম করিয়া অন্যকে বঞ্চনা করে। বিকাশের কোন কথাই ইহারা ভাবে না। আমাদের কথা দৈবী সম্পদের অবলম্বন হওয়া চাই। যাঁহার অন্তরে মোহের দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তিনি যদি ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক নাই মানেন, তবুও তিনি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরকে মানিয়াও ছলনা, ভণ্ডামী এবং গুণ্ডামী করিতে

দেখা যায়, আবার ঈশ্বরকে না মানিয়াও সত্য, ত্যাগ ও উন্নত চরিত্রবান লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আসল কথা আমরা ভণ্ডামী, গুণ্ডামী ও আস্তরিকতার বিরোধী।

ঈশ্বর না মানিলেও নাস্তিকবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করা যায় না। সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই বলিয়া সাংখ্য-দর্শন নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত কোন দর্শন নহে। সাংখ্য যতটা সত্য বলিতে পারিয়াছিলেন এমন নিখুঁত তৎপূর্ব্বে আর কেহ বলেন নাই। তাই সাংখ্যের আদি গুরু মহর্ষি কপিলই আদি জ্ঞানী। সাংখ্যের ভিত্তির উপর ভারতের সর্ব্ববিধ জ্ঞান-সম্পদ অবস্থিত। ঈশ্বর না মানিলেও সত্য, ত্যাগ, তেজ আদি দৈবী-সম্পদের অবলম্বন থাকিতে পারে। আবার দৈবী-সম্পদের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর মানা অর্থে অনেক স্থলেই ছলনা ও চৌর্য বৃত্তির জন্য বা 'পেট কো বাস্তে'ই হইয়া থাকে। শাস্ত্র-রক্ষা অর্থে দল বিশেষের বংশপরম্পরায় স্বার্থ রক্ষা এবং আইন রক্ষা অর্থে জাতি বিশেষের স্বার্থ-রক্ষা; আবার নেতা সাজিয়া ধর্ম্মরক্ষা অর্থে নিজের স্বার্থ-রক্ষা ইহা তো বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার মূলমন্ত্র। ইহার বিরুদ্ধে কেহ মনে মনে ভাবিলে পর্য্যন্ত শাস্ত্রদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, ঈশ্বরদ্রোহী, রাজদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী হইতে হয়। সত্য কথা বলা বর্ত্তমান যুগের প্রধান অপরাধ; কিন্তু সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর মানা হয় নাই বলিয়া সাংখ্যের যুগে বা আজ পর্য্যন্তও কেহ ইহাকে নাস্তিক দর্শন বলেন নাই বরং সমগ্র আর্য্য শাস্ত্রের বিচার ভিত্তি সাংখ্য। উন্নত চরিত্র যাঁহার আছে, তিনি আস্তিক কি নাস্তিক তাহার বিচার আমাদের প্রয়োজন নাই। উন্নত চরিত্রই প্রধান আস্তিকতা।

যোগ-দর্শনে ঈশ্বরের কথা আছে, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সেখানে প্রণবকেই (ওঁ) ঈশ্বর বলা হইয়াছে। প্রণব অর্থে মন্ত্রশক্তি। মন্ত্রশক্তি বুঝিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব বুঝা যায়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য ঈশ্বর প্রণিধানের কথা যোগ-দর্শনে আছে। মন্ত্রশক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য উন্নত স্তরের মহাপুরুষেরও (গুরুর) শরণাপন্ন হওয়া যায়। সেইরূপ ঈশ্বরত্বের স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষও বিক্ষিপ্ত চিত্ত সাধকের জন্য ঈশ্বর হইতে পারেন। ক্লেশ, কর্ম ও বিপাকের পরপারস্থিত পুরুষ ঈশ্বর। আমরা গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি কেন্দ্রস্থিত অনুভূতিকেই ঈশ্বর মানিয়াছি। সাধকগণ অনুভূতির ক্রম গভীরতার পথে শেষ স্তরে ঈশ্বরত্বের স্তরে চলিয়া আসেন। অনুভূতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য যোগ-দর্শনে, উপনিষদে, গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে প্রণবকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। শুধু ওঁকার প্রণব নহে অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলিও প্রণব জানিতে হইবে। আমরা এই গ্রন্থের শেষ ভাগে মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পাঠকগণ সেই অংশ আলোচনা করিয়া প্রণব, ঈশ্বর, ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবেন। এখন আমরা দুর্গা ধ্যানের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুর্গাং জয়াখ্যাং - জয় নামক দুর্গাকে।

অনেক প্রকারের দুর্গা বা শক্তি মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে আছে। দশভূজা, অষ্টভূজা, চতুর্ভূজা ইত্যাদি বহু প্রকারের দুর্গার ধ্যান আছে। বাস্তবিক দুর্গা বলিতে যে কোন শক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত যত প্রকারের শক্তি আছে সকলেই দুর্গা বলিয়া

পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। আমরা এ স্থানে যে দুর্গার আলোচনা করিতেছি তিনি সাধক সমাজে জয়দুর্গা বলিয়া পরিচিতা।

দুর্গ এবং আর্ত্তি যিনি নাশ করেন তিনিই দুর্গা। দুর্গ শব্দের সহজ অর্থ কেল্লা বা গড় (Fort)। কঠোর বন্ধন আত্মবিকাশের পথে শক্তিশালী অন্তরায়। এই অন্তরায় যাহাতে নষ্ট হয় এমন শক্তি দুর্গা। মানুষ যদি ভোগী, মোহি এবং অভিমানীর হাতে নিজের সামান্য শক্তিও ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার আত্মবিকাশের পথে তাহা একটা প্রকাণ্ড দুর্গ হইয়া দাঁড়াইবেই। যদি বল মানুষ ভোগী, মোহি এবং অভিমানী থাকিবেই তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে মানুষকে সর্ব্বশক্তি নিজেদের হাতেই তুলিয়া লইতে হইবে। ভোগী, মোহি এবং অভিমানীকে মানুষ রাজা, গুরু, শিক্ষক বা পুরোহিতের আসন নির্ব্বিচারে ছাড়িয়া দিয়া আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে এমন নীতি মানিয়া লইতে হইবে যাহাতে শক্তি-স্তরের বিকাশের পথ খুব সহজ হইয়া যায়। মানুষের শাসন-বিভাগ শক্তি-স্তরের বিকাশের আদর্শ লইয়া প্রথম দাঁড়াইবে। পরে সেই শক্তির কোলে শিব, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য আপনিই স্থান পাইবে। তখন আমরা দেখিতে পাইব শিব, বিষ্ণু এবং সূর্য্য-কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতার দ্বারা মানুষ আত্মবিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাইব যে ঐ সব কেন্দ্রস্থিত অনুকূল শক্তি জাগ্রত হইয়া জগতে মানুষের বিকাশে সাহায্য করিতেছে।

বিষ্ণু, শিব এবং সূর্য্য কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাও যে তত্তৎকেন্দ্রপুষ্ট মানুষে থাকিবে না একথাও বলা উচিত হইবে না। সেই সব দুর্ব্বলতা থাকিবেই। কিন্তু শক্তি-স্তরকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাহাতে এইসব কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতার দ্বারা কেহ মানুষকে আত্মবিকাশে বাধা দিতে না পারে। যেমন পুত্রাদিতে মোহ বিষ্ণু-কেন্দ্রের দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বলতা এই কেন্দ্রস্থিত মানুষে থাকিবেই। এই মোহবশে নিজের চরিত্রহীন পুত্রাদিকে স্বর্গের দূত বলিয়া একজন লোক অনায়াসে মনে করিতে পারে। এরূপ মনে করার উপর সমাজের বাধা দিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সেই পুত্রটীকে বড় করিতে যাইয়া অন্যের সচ্চরিত্র পুত্রটীকে ছোট করিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা যদি কাহারও জাগ্রত হয় তবে 'শক্তি' তাহা কিছুতেই সহ্য করিবে না। এরূপে বাধা প্রাপ্ত হইলে শীঘ্রই সেই কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলচিত্ত মানবগণ নিজেরাই নিজেদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিবেন। অথবা সেই পুত্রই একদিন বুঝিতে পারিয়া পিতার দুর্ব্বলতার প্রতিবাদ নিজেই করিতে আরম্ভ করিবে। একদল মানুষ খুব দৃঢ় হইয়া শক্তিস্তরে দাঁড়াইতে পারিলে সবটা পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হইতে পথ পাইবে। শক্তি স্তরের উপাদান সত্য, প্রেম, শান্তি এবং আসুরিকতার বিরোধিতা। সঙ্গে সঙ্গে ভোগেচ্ছাহীন, মোহহীন এবং অভিমানহীন হইতে হইবে। মানুষ ভোগে, মোহে এবং অভিমানে বদ্ধ হইয়া নিজেদের পার্থিব সুখ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যের আত্মবিকাশের পথে শাস্ত্র, সংগঠন এবং অস্ত্র শক্তিবলে শক্তিশালী অন্তরায় প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহাই এখানে দুর্গ বলিয়া জানিতে হইবে। 'দুর্গ' সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা এবং রাজশক্তি সব স্থান হইতেই আসিতে পারে। তাই সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা এবং শাসন সবই আত্মবিকাশের অনুকূল করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।

প্রত্যেক জীব আত্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে চাহে; অথবা জীব পূর্ণাবস্থা পাইতে চাহে - ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সমাজ এবং শিক্ষার দোষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। জ্ঞানের ৪ কলা পর্য্যন্ত পাশবিক ভোগের বিকাশ। ৪ কলার পর ৫ কলা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে বৈষয়িক এবং পাশবিক ভোগেচ্ছা কম হইয়া ত্যাগের বিকাশ হইয়া থাকে। ৬ কলায় শিক্ষার বিকাশ। ৭ কলায় প্রেমের পূর্ণ বিকাশ; এই কলা হইতেই মানুষ সংগঠনশক্তি লাভ করেন। ৭৷৷০ কলা জ্ঞানের অধিক বিকাশে শক্তিশালীগণ জীবত্বের অভিমান বা অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইবার শক্তি লাভ করেন; ইঁহারাই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত। কিন্তু ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্ত বিকাশে অর্থাৎ বিষ্ণু-কেন্দ্রের পূর্ণ শক্তি বিকাশে মানুষের জীবত্বের অভিমান নষ্ট হয় না। এই অভিমান নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সব মানুষেরই ভোগ, মোহ এবং অভিমানের বেগ আসিবার সম্ভাবনা থাকে। যতক্ষণ অভিমানের বেগ আছে ততক্ষণ মনের ভোগমুখী প্রবৃত্তিও জাগরিত হইতে পারে। ভোগ অবশ্য ঘৃণিত পদার্থ নহে। কিন্তু একজনের ভোগের সুবিধার জন্য বহু লোকের আত্ম-বিকাশের পথে কণ্টক প্রস্তুত করা ভীষণ অপ্রাকৃত চেষ্টা। একজন মানুষ বিষ্ণু-কেন্দ্রের শক্তি লাভ করিবার পর যদি কর্ম্মযোগের আদর্শ ত্যাগ করিয়া স্বার্থে জড়িত হইয়া আসুরিক ভাব অবলম্বন করে তবে সমাজের খুবই বিপদ জানিতে হইবে, কারণ সে এখন সংগঠন শক্তি লাভ করিয়াছে। একদল সরল লোক (শিব-কেন্দ্র-পুষ্ট) সে তাহার দলে পাইবেই এবং একদল চাটুকার স্বার্থপর (অস্বাভাবিক ভাবে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট) মানুষ লোভবশে তাহার অধীনে থাকিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহারা নিজেরা আত্মোন্নতি করিবে না, অন্যকেও বিকাশের পথে যাইতে দিবে না। মিথ্যা, প্রতারণা, ছলনা ইহারা সর্ব্বাবস্থায় অবলম্বন করিবে। পৃথিবীর ইতিহাস বিচার করিলে একথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে বড় বড় সংগঠন এবং রাজশক্তিগুলি অনেক সময় আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে কণ্টক প্রস্তুত করিয়াছে। আত্ম-বিকাশের পথে এইসব শক্তিশালী অন্তরায়ই 'দুর্গ' বলিয়া জানিতে হইবে।

এতো দুর্গের কথা হইল। এবার 'আর্ত্তি' কাহাকে বলে জানিতে হইবে। রোগ, শোক, কলহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আদিকে 'আর্ত্তি' বলে। আর্ত্তিগুলির জন্য কতকাংশ রাজশক্তি এবং কতকাংশ ধর্ম্মশক্তি দায়ী। রাজশক্তি মানুষের আত্মবিকাশে সাহায্যের জন্য মানুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিবকেন্দ্রস্থিত আত্মবিকাশ শক্তিকে নিজের সমাজের মধ্যে জাগ্রত রাখিবে; আবার তত্তৎ কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতার দ্বারা যাহাতে মানুষের আত্মবিকাশের পথে কণ্টক প্রস্তুত না হয় তাহারও উপর নজর রাখিবার জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া রাখিবে। মানুষের সমাজে ইহাই রাজশক্তি। রাজশক্তি পূর্ব্বোক্ত সবগুলি শক্তির সমষ্টি এবং সহায়ক। আবার পূর্ব্বোক্ত শক্তিস্থিত দুর্ব্বলতাগুলির বিরোধী। মানুষ অন্তরস্থিত কর্ম্মরাশিকে জগতে মূর্ত্তি দিতে চাহে ইহাই মানুষের 'কর্ম্ম'। মানুষ যতক্ষণ নিজের অন্তরস্থিত পূর্ণশক্তি বিকাশের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে না ততক্ষণ সে পূর্ণ কর্ম্মীও হইবে না। তাহার কর্ম্মে দুর্ব্বলতা থাকিবেই। তাই সে নিজের অন্তরস্থিত খণ্ড কর্মশক্তির ক্রিয়াকে জগতে মূর্ত্ত করিতে যাইয়া জগতের বহু লোকের আত্মবিকাশের পথে যে কণ্টক প্রস্তুত করিবে

ইহা স্বাভাবিক। রাজশক্তি সে সময় তাহার প্রতিবিধান করিবে। রাজশক্তি যদি শক্তি-স্তরের আদর্শে স্বপ্রতিষ্ঠিত না থাকে তবে সে রাজশক্তির দ্বারা সেরূপ সুফল আশা করা যায় না। রাজশক্তি যদি আসুরিক ভাবাপন্ন হয় তবে সে রাজশক্তি প্রজার আত্মবিকাশের বিরোধীই হয়। রাজশক্তি তখন নিজেই মিথ্যা কথা বলিতে থাকে এবং প্রজাকে সত্য কথাটি বলিতে পর্য্যন্ত দেয় না। সে তখন গুণ্ডা পোষণে ব্যস্ত হয় এবং মানুষের আত্মবিকাশের পথে শক্তিশালী অন্তরায় প্রস্তুত করে। প্রজার অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত সে আইনের বলে হস্তগত করে এবং প্রতিবাদপরায়ণ সমাজ-শক্তিকে শত খণ্ডে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সমাজে মনঃপীড়া, কলহ ও অশান্তি দেখা দেয়। এদিকে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, রোগ শোক, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া জোটে। রাজার কর্ত্তব্যে দায়িত্বহীনতায় সমাজে এ সব আর্ত্তি দেখা যায়। এদিকে তপঃ-শক্তিও বহুবিধ আর্ত্তির জন্য দায়ী। অতিবৃষ্টি আদি দৈব দুর্বিপাকের জন্য রাজশক্তির সহিত তপঃশক্তিকে দায়ী করা হয়। তপস্বীর তপঃশক্তিতে বায়ুমণ্ডল নির্মল হয়। মানুষের মনোজগৎ এবং দৈব-জগতের উপর তপস্বীর তপঃশক্তির অসীম প্রভাব বিদ্যমান। তপঃশক্তি ভারতের বক্ষে বেশী বিকাশ পাইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সমাজ যাহাই বলুন না কেন ভারতের চিন্তাশক্তি এবং আকাশ মণ্ডলীর উপর তপঃশক্তির বিশেষ প্রভাব এখনও আছে। ভারতের বৃষ্টি শস্য এবং আবহাওয়ার উপর সেই সব চিন্তাশক্তি বিশেষ কাজ দিত। বর্ত্তমান সময় প্রকৃত সাধক, যোগী এবং তপস্বীর সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়াছে, কাজেই ভারতের সেই তপঃশক্তি খুবই নিষ্প্রভ। সমাজ-শক্তি বা বিষ্ণু-কেন্দ্র উৎপন্ন চিন্তারাশি, ভাবরাশি এবং বিচাররাশির দ্বারা ভারতের মনোজগৎ বহুদিন শাসিত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় দুই হাজার বৎসর ভারতের চিন্তাকে বিষ্ণু-কেন্দ্রশক্তি শাসন করিয়াছে। বর্ত্তমান সময় বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চিন্তার সৎ ভাগ ভারতে নাই বলিলেই চলে। বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট অসৎ ভাগ বা দুর্ব্বলতা ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বনাশের মূলে ইহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। সেরূপ ভাবদুষ্ট নকল ধর্মশক্তি বা তপঃশক্তি জনকয়েক পূজারীর হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট সঙ্কোচ চিন্তায় প্রভাবান্বিত শাস্ত্রজ্ঞগণ সেই পূজারিগণের পৃষ্ঠপোষণ করিয়া ভারতের তপঃশক্তিকে একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। সত্য এবং ত্যাগই হইল তপঃশক্তির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহা বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রজ্ঞ এবং পূজারিগণ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সেই স্থানে আসিয়াছে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট অজ্ঞানতার দিকটা - মোহ, ছলনা, লোভ এবং ভোগ। ইহাদের মিথ্যা আচার দেখিলে ভয় হয়। শয়নে, উপবেশনে, স্নানে, আহারে ও গমনে সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে ইহারা শত শত মন্ত্র উচ্চারণ করে, কিন্তু সত্য কথা একটিও বলে না। শত শত কুসংস্কারকে ইহারা পবিত্রতার নিদর্শন বলিয়া মনে করে এবং মানুষের সঙ্গে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মূর্খ লোককে ছলনা করিয়া উপার্জ্জন করিবার জন্য পূজার খুব ঘটা দেখাইতে চেষ্টা করে; শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্ট, স্তোত্র, ধূপ, ধুনা খুব জ্বলে, কিন্তু চরিত্রে ভক্তি, ত্যাগ ও সংযম এক বিন্দুও নাই। এদিকে যাঁহারা ত্যাগের পথ ধরিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে খুব বড় বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের চরিত্রেও শিব-কেন্দ্রস্থিত শান্তি এবং সরলতার বিকাশ না হইয়া বিষ্ণু-কেন্দ্রস্থিত অজ্ঞানতার ছাপই ফুটিয়া উঠে। মঠ, মন্দির,

শিষ্য শিষ্যা লইয়া নূতন করিয়া সংসার করিবার পন্থা লইয়া দিন কাটান। কেহ বা শিষ্যধনে প্রস্তুত সম্পত্তি পুত্র ও স্বজাতি সেবার জন্য নিতান্ত নির্লজ্জের মত ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। কেহ বা সন্ন্যাস-আশ্রমোচিত নাম গ্রহণ করিয়া ছলনা করিবার জন্য ভাবাবেশের ঢং, সমাধির ঢং বা যাদুকরী বিদ্যা চালাইয়া থাকেন। কেহ বা চারটা ভোজবাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নামজাদা মহাপুরুষ হইয়া গেরুয়ার আবরণে সংসার লইয়া মোহেরই সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট সমাজ কি আশা করিতে পারে? সমাজের জন্য প্রয়োজন ভোগ-মোহ-অভিমান-হীন ত্যাগী, তপস্বী এবং সাধক পুরুষ। আবার ঐ দিকে শিষ্যগণও সেইরূপভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে - উঠিতে, বসিতে, রামনাম, কৃষ্ণনাম, দুর্গানাম জপ চলে, কিন্তু স্বার্থ ও ছলনা তাহাদের অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিয়া আছে। সৎকাজে একটি পয়সা দান করিতে প্রাণ চড়চড় করে। সত্য কথাটি বলিবার মত শক্তি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটী কথা বলিবার মত শক্তি তাহাদের হয় না। মানুষের আত্মবিকাশে সর্ব্বশক্তি এমন কি ধর্ম্মশক্তিও যদি মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ দেখাইতে না পারে, মানুষ যদি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কেবল মোহই বৃদ্ধি করিতে থাকে তবে কাহার চিন্তা-শক্তিতে দৈব-জগৎ (ভাবজগৎ) বা বায়ুমণ্ডল নির্ম্মল হইবে?

এদিকে রাজশক্তি যদি আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া শোষণে এবং পীড়নে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে তবে জগতে কর্ম্মের নির্ম্মলভাব মূর্ত্তি করিবে কে? সৈন্যবিভাগ, পুলিস, বিচার, শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, ডাক ও রেলওয়ে প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে দৈবীসম্পদের বিশেষ বিকাশ থাকার প্রয়োজন। ইহারাই মানব-সমাজের কর্ম্মবিভাগ। ইহারা যদি মনুষ্যত্বহীন হইয়া মানুষের পীড়নের পথ অবলম্বন করে, মিথ্যা, ছলনা, উৎকোচ গ্রহণ এবং চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে তবে মানুষ দাঁড়ায় কাহার আশ্রয়ে? মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশধারা কোন্ পথে আসিবে? এই মানুষের ভাব-জগৎ ধর্ম্মশক্তি এবং রাজশক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মল না হইয়া দিন দিন মলিন হইতে থাকে। সুতরাং দৈব-জগৎও (বায়ু মণ্ডল) মানুষের আর অনুকূল থাকে না - অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আদি আর্ত্তি দেখা দেয়। এই যে 'দুর্গ' এবং আর্ত্তি ইহা হইতে যে শক্তি মানুষকে উদ্ধার করেন তিনিই 'দুর্গা'।

মানুষ শক্তিস্তরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। আবার নিজের অন্তরস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবীটাকে নরকের সমকক্ষ করিতে পারে। শক্তিস্তরের আদর্শকে অবলম্বন করিয়া বহু লোক যদি গঠিত হইয়া উঠিতে পারেন তবে জগতের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ব্যবসায়ী, কৃষক, মজুর, শিক্ষক এবং ছাত্রগণ তো খুব সহজেই অগ্রসর হইতে পারেন; অথচ যাঁহারা মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত তাঁহারাও পারেন। যাঁহারা রাজসেবক তাঁহাদের তো হওয়াই প্রয়োজন। আসুরিক শক্তি মানুষ নিজে প্রতিষ্ঠা করে। দৈবী-শক্তিও মানুষ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিবে। মানুষ সর্ব্বাবস্থায় শক্তিস্তরকে নিজের কর্ম্মে, চরিত্রে, চিন্তায় ফুটাইয়া তুলিবে। এইরূপে কিছু মানুষ প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর তাহাদের চিন্তায়, চরিত্রে এবং

কর্ম্মে প্রায় সমস্ত মানুষই তাহাদের দিকে একদিন আকৃষ্ট হইবে। তখনই পৃথিবী ‘দুর্গ এবং আর্ত্তি’ শূন্য হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

(ভারতের বর্ত্তমান চিন্তাধারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং প্রভুত্বের সংঘর্ষে এমন এক অদ্ভুতভাবে গড়িয়া যাইতেছে যে অনেকেই এখন কর্ম্মের এবং জীবনের লক্ষ্য ঠিকমত ধরিতে পারিতেছেন না। আমরা এই গ্রন্থে মাত্র কর্ম্মের বিজ্ঞান অংশই আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট বলা হয় নাই। কর্ম্মিগণ আপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই নিজেকে গড়িবার মত উপাদান এই গ্রন্থ হইতে আহরণ করিবেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, সমাজ বা সংগঠনকে শক্তি-স্তরের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন। শক্তি-স্তরের আদর্শে এই পৃথিবীর সর্ব্ববিধ রীতি নীতি গড়িয়া না লইলে মানুষের আর শান্তি হইবার পথ নাই। আইন রক্ষাই সব নহে, শাস্ত্র রক্ষাই সব নহে। দেখিতে হইবে আইন ও শাস্ত্ররক্ষার আড়ালে শক্তি-স্তরের সন্ধান আছে কিনা। প্রত্যেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলিকে জয় করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন; কেহই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলেই আপন চরিত্র এবং কর্মশক্তির বৈশিষ্ট্য নিজ কর্মক্ষেত্রস্থিত মানবে প্রতিফলিত হইবে। ভারতের আদর্শের বৈশিষ্ট্য (অধ্যাত্মবাদ) আজ খর্ব্ব হইয়া গেলেও ভারত একদিন নিজের বৈশিষ্ট্যকে লইয়াই দাঁড়াইবে। ভারতের সমাজবাদ মধ্য যুগে মোহকে অবলম্বন করিবার দরুণ ভারতের আত্মবিনাশের কারণ হইয়া ভারতকে বহুদিন অপদস্থ করিয়া রাখিয়াছে। একথা সত্য। মোহমুগ্ধ সমাজবাদিগণ এমন শক্তিশালী ছিলেন যে তাঁহারা কৌশলে ভারতের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁহারা সব সময়েই মোহের দোকানদারীর পাল্লায় ওজন করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। বহু মহাপুরুষ মধ্য যুগে এই মোহের দোকান ভাঙ্গিয়া দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারিয়া উঠেন নাই। বহুদিন ভারতে যে সব শক্তিশালী তপস্বীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা কেহই শিব স্তরের অনুভূতির উপর দাঁড়াইতে পারেন নাই। তাই শক্তি-স্তরের শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্ম প্রচেষ্টা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। একদল মানুষ শক্তি-স্তরের কর্মপ্রবাহকে ধরিয়া রাখিবার মত যদি সমাজে থাকিত তবে মোহমুগ্ধ সমাজশক্তির একাধিপত্য এমন ভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা শ্রেণী বিভাগ সমাজের বিরোধী। আমরা স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগের বিরোধী নহি, কিন্তু আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর আত্মবিকাশের পথে যে সব কণ্টক প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই সব কণ্টকের বিরোধী। আমরা চাই মানুষ মাত্রেরই আত্মবিকাশের পথ সহজ হইয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ ও কর্মবিভাগ যত ইচ্ছা থাকুক কিন্তু শাস্ত্রের নামে স্বার্থ-রক্ষা, এবং আইন রক্ষার নামে স্বার্থরক্ষা যাহারা করিতে চায় তাহাদিগকে মানুষ আর বেশীদিন বিশ্বাস করিবে না। মধ্য যুগের অধিকাংশ মহাপুরুষই বিষ্ণু-কেন্দ্র বা সূর্য্য-কেন্দ্র শক্তির সৎ অংশের অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া ধর্মপ্রচার বা সমাজ সংস্কার করিয়া চলিয়াছিলেন। শক্তি-স্তরের কোন আভাষ প্রায় কাহারও চিন্তায় স্থান পায় নাই। শিখ সমাজের দশম গুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের চিন্তায় শক্তি-স্তরের কথা জাগিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রভাব শিখ সমাজেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল। শক্তি-স্তরের

সাধনা ভাণ্ডার ‘তন্ত্র’ তাহা পঞ্চমকারের আবরণে আবরিত হইল; পরে তাহা ব্যভিচার এবং বশীকরণ বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। বীরের অভাবে বীরের সাধন-ভাণ্ডার আজ পর্য্যন্ত ব্যভিচারের হাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজও বীরের সাধনা ছাড়িয়া দিয়া আজ ভাবের ঢংএ গড়াগড়ি দিতে লাগিয়াছে। বাস্তবকে বাদ দিয়া ভাবকে অবলম্বন করিয়া একটা জাতি কতদিন বাঁচিতে পারে? শক্তিকে বা আত্মাকে বাস্তব ভাবিয়া - অমর হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়, অথবা শরীরকে অমর ভাবিয়া কর্ম্ম করিয়া জগৎকে ভোগ করা প্রয়োজন। ভাবকে লইয়া বাস্তব ছাড়িয়া দিলে কি ফল হইবে?)

আমাদের আলোচনার বিষয় হইল “দুর্গাং জয়াখ্যাং’। এতক্ষণ ‘দুর্গাং’ শব্দের আলোচনা করা হইয়াছে, এবার ‘জয়াখ্যাং’ সম্বন্ধে বলা হইবে। এই শক্তি-স্তরের সন্ধান যাঁহারা পান বা যাঁহারা শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহাদের অন্তরস্থিত কোন দুর্ব্বলতাই কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন প্রকার দুর্বলতাকেই তাঁহারা প্রশ্রয় দেন না। তাই তাঁহারাই বিজয়ী বলিতে হইবে। কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই এস্তরে আসিয়া পূর্ণ হন। এস্তরের জ্ঞানীগণের ভাবাবেশের মোহ, ধ্যানাবস্থার লোভ এবং যোগাবস্থার শান্তির বন্ধন থাকে না; আবার কর্ম্মিগণের ত্যাগের উগ্রতা (গণেশ), আদর্শের মোহ (সূর্য্য), সম্প্রদায় বিশেষের উপর টান (বিষ্ণু) এবং অভিমান (জেদ্ প্রধান মনোবৃত্তি) বা নিজেকে বিশ্বমানবতা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া আসুরিক ভাব অবলম্বনে ভোগের তৃপ্তিতে কর্মবেগ থাকে না। এস্তরে আসিলে কর্ম্মী এবং জ্ঞানিগণ সর্ব্ববিধ লৌকিক এবং অলৌকিক দুর্ব্বলতাহীন হইয়া থাকেন। এস্তরে আসিয়া মানুষ সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া পূর্ণ শক্তিমন্ত হন। তাই এই দুর্গা-স্তরকে ‘জয়’ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

ত্রিদশগণাবৃতাং - (১) দেবতাগণ দ্বারা বেষ্টিতা।
(২) সমস্ত শক্তি পরিবৃতা।
(৩) সমস্ত সৃষ্টি-কেন্দ্রস্থিতা।

দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন মানুষকেই দেবতা বলা হইয়াছে। যাঁহারা দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন মানব তাঁহারা স্বভাবতঃই এই কেন্দ্র-শক্তির সহিত সহানুভূতি এবং সংযোগ রাখেন।

ত্রিদশ (৩×১০) = ত্রিশ, ত্রিদশ অর্থে ৩০। ত্রিদশের গণ = ত্রিদশগণ। ইঁহাদের দ্বারা বেষ্টিতা বা আবৃতা।

এখানে ত্রিশ অর্থে ৩০ কলা। পূর্ব্বে ‘মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং’ অংশে ৩০ কলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। সেখানে এই ৩০ কলাকে চন্দ্রের কলার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ কলা এবং পুনঃ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ কলা, উভয়ে মিলিয়া ৩০ কলা হয়। মহত্তত্ত্বে বা মহৎ ব্রহ্মেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একথা অনেক স্থানেই আলোচনা করা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের অংশের তারতম্যেই সৃষ্ট জীবের মধ্যে ছোট বড় বিচার করা হইয়া থাকে। একথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের এক কলা শক্তিতে উদ্ভিজ্জের বিভূতি। উদ্ভিজ্জের গণ, এক কলার গণ এবং এক কলার সৃষ্টিসম্ভার এক কথা। মহত্তত্ত্বের দুই কলা শক্তিতে স্বেদজ সৃষ্টির যত জীব আছে তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। মহত্তত্ত্বের তিন কলার শক্তিতে পক্ষী আদি এবং চারি কলায়

জরায়ুজ সৃষ্টি অর্থাৎ পশ্বাদি। বৃক্ষাদি (এক কলার বিভূতি), কীটাদি (দুই কলার বিভূতি), পক্ষী আদি (তিনকলার বিভূতি) এবং পশ্বাদি (চারি কলার বিভূতি) পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান-শক্তি বা মহত্তত্ত্বের চারিকলার বিকাশ। এই পর্য্যন্ত ইচ্ছা-শক্তির* বিকাশ জানিতে হইবে। ইহার পর ক্রিয়া-শক্তি বা কর্ম শক্তির বিকাশ মানা হইয়াছে। ৪ কলা হইতে উন্নত বিকাশ মানুষে হইয়া থাকে। মানুষের আকার লইয়া যাহারা পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহারা কেবলই পশু নহে, পরন্তু তাদের মধ্যে কর্ম্ম-শক্তিও কিছু বিকাশ হইয়াছে জানিতে হইবে। ৫ কলার বিভূতি গণেশ-লক্ষণসম্পন্ন মানুষকে জানিতে হইবে। ইঁহারা খুব নিঃস্বার্থ কর্ম্মী, ত্যাগী এবং দৃঢ়তার সহিত অন্যায় ও অসত্য বিরোধী হইয়া থাকেন। জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্মে এবং জ্ঞানের পথে যাঁহারা প্রয়োজন মত ত্যাগ এবং সত্য অবলম্বন করিতে পারেন তাঁহারা ৫ কলার বিকাশ। যাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম কলার শক্তির বিকাশ কম তাঁহারা যুবকগণের নেতৃত্ব করিতে পারেন না।

ষষ্ঠ কলা-শক্তি সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষে বিকশিত হইয়া থাকে। সূর্য্য-লক্ষণযুক্ত মানুষও সত্য, ত্যাগনিষ্ঠ এবং অন্যায় বিরোধী হইয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কঠোর ভাবে অন্যায় বিরোধী হন না। সূর্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব প্রেমী হন। তাঁহাদের প্রাণ একটু কোমল। ইঁহারা স্বভাবতঃ একটু হিসাবী প্রকৃতির এবং সাবধানী হইয়া থাকেন। যাঁহাদের মধ্যে সূর্য্য-কেন্দ্রের ভাল বিকাশ হয় নাই তাঁহাদিগকে কৃপণ হতে দেখা যায়। স্ত্রী পুত্রে ইঁহাদের খুব মোহ থাকে। যাহা হউক সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষের ত্যাগে যতটা নিষ্ঠা হয় না, ভালবাসায় তাহা হইতে বেশী নিষ্ঠা হইয়া থাকে। সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষ যদি সত্য এবং ত্যাগকে বজায় রাখিয়া প্রেমী হইতে পারেন তবে প্রায়ই জগৎ পূজ্য হইয়া থাকেন। গণেশের সত্য ও ত্যাগ এবং সূর্য্য কেন্দ্রের সর্ব্বজীবে সমান প্রেম যদি কোনও চরিত্রে বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায় তবে সেখানে ষষ্ঠ কলা বিকশিত হইয়াছে জানিতে হইবে। ইঁহারা প্রচার

---

* ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তি। শক্তির ক্রম-বিকাশকে এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। জ্ঞান-শক্তিই মহৎতত্ত্ব একথা অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে। জীব যখন যৌনসম্বন্ধযুক্ত ভোগে তৃপ্ত থাকে ততক্ষণ তাহারা ইচ্ছা-শক্তি বিকাশের অন্তর্গত জানিতে হইবে। আমাদের অন্তরে যে ভোগ সম্বন্ধযুক্ত মনোবেগ ইহাই আমাদের অন্তরস্থিত ইচ্ছা-শক্তির রূপ। আমরা পঞ্চম কলায় পুষ্ট হইলে আমাদের এই ভোগ বেগের তীব্রতা আর থাকে না। (যাহারা আসুরিক বিকাশ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারা ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্ত এই ভোগবেগকে উপাদেয় মনে করে।) ইহার পর আমরা ক্রিয়াশক্তির পুষ্টির ক্ষেত্র হইয়া থাকি। তখন ত্যাগকে অবলম্বন করিয়া আমরা সমাজ, দেশ এবং ধর্ম্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকি। ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্ত ক্রিয়ার শক্তি বিকাশ। (যাঁহারা অবতার বিকাশ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা এই ক্রিয়াশক্তিকে ১৪ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।) ৮ কলা হইতে ১৫ কলা পর্য্যন্ত জ্ঞান-শক্তির বিকাশ। ৮ কলার বিকাশ আসিলে আমাদের অভিমানটী থাকে না। একই আত্মা সকলের মধ্যে সমান ভাবে অবস্থিত, কিন্তু অভিমানটী আমাদের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিতেছে। এই অভিমানই আমাদের জ্ঞানের পথে প্রধান অন্তরায়। অভিমান নষ্ট হইলেই ঠিক ঠিক জ্ঞান শক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়।

প্রধান কর্ম্মী হইয়া থাকেন। শান্তি এবং প্রেম ইঁহাদের প্রধান দৈবী-সম্পদ। ইঁহাদের সংগঠন সত্যের প্রচার করে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ মাত্র করে।

সপ্তম কলার বিভূতি - বিষ্ণু শক্তির বিভূতি। এখানে দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষ এবং আসুরিক সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যাহারা শিক্ষা এবং সঙ্গ দোষে শিবকেন্দ্র হইতে বিষ্ণু-কেন্দ্রে পুষ্ট হয় তাহাদের মধ্যে ৪৷৹ কলার বেশী বিকাশ হয় না। ইহারা অত্যন্ত নির্লজ্জ প্রকৃতির লোক হইয়া থাকে। সূর্য্য-কেন্দ্রের বিকাশ হইতে যাহারা সঙ্গ প্রভাবে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট হয় তাহারা অত্যন্ত চাটুকার এবং মিথ্যাবাদী হইতে দেখা যায়। তাহারাও সপ্তম কলায় বিকশিত মানা হইবে না। যাঁহারা সপ্তম কলার বিকাশ স্থল হন তাঁহারা সূর্য্য এবং গণেশ কেন্দ্র শক্তির বিকাশের বিশেষত্বগুলি জানিতে পারেন। তাঁহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা সবলতাও বুঝিতে পারেন; কর্মক্ষেত্রে ঐসব স্বভাবের নকল করিয়া তাঁহাদের সর্বনাশও করিতে পারেন। উন্নতকলা শক্তি-সম্পন্নগণ নিম্নকলা-শক্তির ওজন করিতে সমর্থ। ইঁহারা প্রায়ই রাজশক্তি সম্পন্ন বা বিশেষ সংগঠিত সমাজ শক্তির পরিচালক হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রচুর ধনবান তাঁহারাও বিষ্ণুকেন্দ্র শক্তির বিকাশস্থল। বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মানব ভোগী হন। ভোগ, ছলনা এবং সংগঠন ইঁহাদের স্বভাবে থাকিবেই। দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব খুব দয়ালু এবং দাতা হন। ইঁহাদের ত্যাগে ও দানে দেশ উন্নত হইয়া থাকে। আসুরিক সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব ছলনার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং শোষক হইয়া থাকে। জগতে সর্ব্বপ্রকার অন্যায় বিষ্ণুকেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। গণেশ কেন্দ্র-পুষ্ট মানব গণেশ-কেন্দ্রস্থিত বৈশিষ্ট্য (জগৎ-মঙ্গল লক্ষ্য) বজায় রাখিয়া যদি বিষ্ণু-কেন্দ্র-শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারেন তবে জগতের বিশেষ মঙ্গল হয়। বিষ্ণু কেন্দ্র-পুষ্ট মানব যদি গণেশ-কেন্দ্রস্থিত বৈশিষ্ট্যকে নিজের জীবন লক্ষ্যের সম্মুখে রাখিতে পারেন এবং শিব কেন্দ্রস্থিত স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করিতে পারেন তবে তাঁহারা খুব সহজে শক্তি-স্তরে চলিয়া আসিবেন।

অষ্টম কলা জীবন্মুক্তের বিভূতি। ইঁহারাই ঋষিস্তরের মানব। ইঁহাদের অভিমান (জীবত্বের অভিমান) থাকে না। ইঁহারা পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম কলা পুষ্ট মানুষের চরিত্র এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-শক্তি-দ্বারা জগতের কতটা উপকার বা অপকার হইবে তাহা বুঝিতে পারেন। যদি বুঝিতে না পারেন তবে জানিতে হইবে অষ্টম-কলায় আসেন নাই। এই অষ্টম কলাই ঋষি বা জীবন্মুক্তের বিভূতি। মানুষ আট কলায় আসিলে সমস্ত মানুষের পিতৃ স্থানে স্থিত হন। এই আট কলার বিকাশ লইয়াই মানব জাতির আদি পুরুষগণ আসিয়াছিলেন। এই অষ্টম কলাই বৈজ্ঞানিক বিকাশ। মানুষ মাত্রই এই বৈজ্ঞানিক বিকাশসম্পন্ন মানুষের বংশধর। সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের ভাষার বিনিময় যতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হইতে পারে তাহারা সকলেই বৈজ্ঞানিক বিকাশ (৮ কলা) সম্পন্ন যে কোন মানুষের (৮ কলার বিকাশ হইলে সকলেই ঋষিত্ব লাভ করেন) বংশধর। কেবল তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে মানুষের ভাষার বিনিময় চলিবে। বানর এবং বনমানুষও সৃষ্টির কোলে মানুষের আকার বিশিষ্ট জীব, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মানুষের ভাষার বিনিময় হয় না। ভাষার বিনিময় চলে এমন যে কোন মানববংশই ঋষি-সন্তান বলিয়া জানিতে হইবে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মানুষ এবং বানর একই পিতা

মাতার সন্তান কিন্তু আমরা ইহার সমর্থন করি না। মানুষের স্বরযন্ত্র এবং বানরের স্বরযন্ত্র এক রকমের নহে। একই পিতা মাতার সন্তান হইয়া মানুষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পথে এতটা উন্নতি করিল, কিন্তু বানর কিছুই করিতে পারিল না ইহাতেই প্রমাণ হয় যে উভয়ে এক বংশের সন্তান নহে। যাহাহউক এই ৮ কলা বিকাশ সম্পন্ন মানুষই গুরু হইবার উপযুক্ত। এই ৮ কলা বৈজ্ঞানিক বিকাশ হইবার দরুণ এই ৮ কলা পুষ্ট মানব তপস্যার দ্বারা শক্তি-স্তরকেও বুঝিতে পারেন। এই ৮ কলা পুষ্ট গুরু মানুষকে শক্তি স্তরের সন্ধান দিতে পারেন। সূর্য্য-স্তরের আদর্শ লইয়া যাঁহারা গুরু হন তাঁহারা মানুষকে আকর্ষণ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু মানুষকে পূর্ণ করিয়া গড়িয়া দিতে পারেন না।

অষ্টম হইতে পনের কলা পর্য্যন্ত জ্ঞানেরই বিকাশ। এই সব কলা পুষ্ট মহাপুরুষগণ জগতের মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষ কোন কর্ম্মই অবলম্বন করেন না। নির্জন বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে লোকনয়নের অগোচরে বা মৌনাবলম্বনে ইঁহারা তপস্যার দ্বারা নিজের অন্তস্থিত জ্ঞানকলায় পুষ্ট হন এবং পৃথিবীতে কাহাকেও আত্মপরিচয় না দিয়া অন্তিম সমাধি লাভ করেন। ইঁহারা ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহাদিগকে আমরা মহতের বিভূতি নাম দিতে চাই।

নবম হইতে চতুর্দ্দশ কলা পর্য্যন্ত অবতার-কলাও মানা হইয়াছে। মহতের কলা-পুষ্টগণ কর্ম্মাবলম্বন করেন না, কিন্তু অবতার কলাপুষ্ট মানবগণ কর্ম্মাবলম্বন করেন। এই কর্ম্ম অর্থে ‘আসুরিকতার বিরোধিতা’। অবতার সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ একদল মানুষ আছে যাহারা অবতারকে সম্মুখে রাখিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে। গণেশ, সূর্য্য এবং দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব যখন বিশেষ কর্মশক্তি সম্পন্ন হন তখন তাঁহারা অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। মহতের স্তর হইতেও বহু মহাপুরুষ কর্ম্মস্তরে নামিয়া আসেন। তাঁহাদিগকেও অবতার কলাপুষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে।

অবতার পূজা লইয়া বর্ত্তমান সমাজে নানারূপ অপ্রিয় অনুষ্ঠান চলিয়াছে। অবতার পূজার লক্ষ্য নাচানাচি বা পূজার ঘটা দেখাইয়া দোকানদারী করা হইতেছে। আমাদের কথা - যে কোনরূপ উপায়ে গণেশাদি কেন্দ্র-শক্তিগুলি নিজের চরিত্রে মূর্ত্ত করিয়া সেরূপ কর্ম্মদ্বারা আত্মবিকাশ করিবার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ভাবের পথ সব সময়েই দুর্ব্বলতার লক্ষণ; সেইপথে চলা কোন প্রকারেই আত্মবিকাশের অনুকূল নহে। উহা কতকটা ভাব প্রবণতার অন্তর্গত। কর্ম্মিগণ সেই সকল হইতে দূরেই অবস্থান করিবেন। অনেকে অবতারগণের হাঁচি কাশিটীরও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিয়া বেড়ান। এরূপ প্রচার দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশের পথে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহাতে মানুষের ক্ষতিই হইয়া থাকে। নিজের চরিত্রের উপাদানের সহিত মিল না থাকিলে কাহাকেও বড় করিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করা দোকানদারীর লক্ষণ। মানুষ সর্বাবস্থায় নিজ নিজ চরিত্র উন্নত কলাস্থিত বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করিবেন, সেই জন্যই গুরু, নেতা ও অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বহু দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিতে পারিলে বহু ভক্ত জুটান যায়, ভাবুকের সমাজে অবতারও হওয়া যায়। কিন্তু একটুও দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে কর্ম্মী হওয়া যায় না - একথা প্রত্যেক কর্ম্মীই মনে রাখিবেন।

(গুরু-বাদ এবং অবতার-বাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান সময় বাংলায় একটা ভীষণ কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের আত্মবিকাশের পথে 'শান্তি' একটা প্রয়োজনীয় আন্তর খাদ্য। এই অশান্তির যুগে বহু মানুষ দিশেহারা হইয়া দীক্ষা, সাধনা এবং উপাসনার জন্য ধাবিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছলধর্ম্মী গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীবেশধারী দোকানদারীর পথ খুলিয়া বসিতেছে। ইহার যে কি প্রতিকার আছে তাহা ভাবা প্রয়োজন। পূজার ঘটা, কীর্ত্তনের ঘটা এবং আরতির ঘটার মধ্যে সাময়িক সাত্ত্বিক বিলাসিতার স্বাদ যে একটুও আছে তাহা মানিতেই হইবে। সেই সাময়িক সাত্ত্বিক নেশায় মত্ত হইয়া পতঙ্গ পালের মত শত সহস্র লোকে সেই ছল দোকানদারগণের স্বার্থের অগ্নিশিখায় আত্মহুতি দিতেছে। নেশাভঙ্গে সেই ছল অবতারগণের সমস্ত কার্য্য কলাপ জানিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ভক্তের ধর্ম্মের নেশা চিরদিন তরে তিরোভাব হয় এবং হোমিওপ্যাথিক মতে সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ বিষ দুষ্ট রোগীর মত এ জীবনের জন্য ধর্মদ্বেষী রোগী হইয়া অত্যন্ত অশান্তিময় জীবন যাপন করে। মঠ, মন্দির ও আশ্রমগুলি যে ভাবে দোকান দারের আড্ডায় পরিণত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের ধর্ম্মপিপাসা যে কিরূপ ভীষণভাবে আহত হইয়া যাইবে তাহা সত্যই ভাবিবার কথা। কোথাও সত্যের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সকলেই অন্যের নিন্দা করে এবং নিজেরাই সেই দোষে কলঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে। যাঁহারা নিজেরা দৈবী সম্পদের অভ্যাস করেন তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন। আর যাঁহারা শান্তির পথের খোঁজ চাহেন তাঁহারা দৈবী সম্পদগুলি বুঝিতে চেষ্টা করুন। নিজের দৈবীসম্পদে দৃঢ়তা না থাকিলে গুরু করিয়া লাভ নাই। নিজের জ্ঞানের পিপাসা থাকিলে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। অন্যের দোষ দেখিয়া নিজের বেগ নষ্ট করা ঠিক হইবে না।)

আসুরিক সম্পদ সম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্টগণ কখনও অবতার কলায় আসিতে পারে না। ভোগ এবং মোহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া কিছুতেই ৭৷৷০ কলার উপরে বিকাশ হয় না। আসুরিক সম্পদ সম্পন্নগণ ভোগ এবং মোহ ত্যাগ করিতে পারে না। যে কোন বিষ্ণু এবং সূর্য্যকেন্দ্র বিকাশ সম্পন্ন লোক যতক্ষণ শিবকেন্দ্রস্থিত অষ্টমকলা লক্ষণ সম্পন্ন না হইবেন ততক্ষণ লৌকিক স্বার্থে এবং মোহে বদ্ধ হইতে পারেন; আসুরিক সম্পদও অবলম্বন করিতে পারেন। অষ্টম কলা সব সময়ই শান্তির কলা এবং বৈজ্ঞানিক কলা। (জড় বিজ্ঞান - ৫ম কলার বিকাশ)। এই অষ্টম কলায় আসিয়া যাহারা শান্তির আবরণে আত্মরক্ষা করিয়া অন্তরে পূর্ণতার দিকে চলিতে থাকেন তাঁহারা নিজেকে পূর্ণতার পথে ১৫ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ করেন। তাঁহাদিগকে আমরা 'মহৎ' নাম দিয়াছি। কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা অষ্টম কলা পূর্ণ করিয়া নবম কলায় আসেন তাঁহারাই 'অবতার' বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অবতারগণও অন্তরে জ্ঞানের ও শান্তির পূর্ণতা অনুভব করেন। অষ্টম কলা সকলের পক্ষেই শান্তির কলা। এই কলার বিকাশ স্থুল হইয়া কর্ম্মিগণও সাময়িক ভাবে শান্তি, নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক জীবনপ্রিয় হন। তবে কর্ম্মীর এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তাঁহারা শীঘ্রই নবম কলায় আসেন এবং বিপুল বিক্রমে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া পড়েন। এই সব কর্ম্মীই অবতার নামের যোগ্য। ঋষিগণ অষ্টম কলার বিকাশস্থল ছিলেন; তাঁহারা শান্তিকে বজায় রাখিয়া কর্ম করিতেন। সে কর্মের লক্ষ্য ছিল

শক্তি-স্তরের আদর্শে মানব-চরিত্র গড়া এবং সমাজকে শক্তিস্তরের আদর্শ বুঝাইয়া দেওয়া। ঋষিগণ যেমন অষ্টপাশমুক্ত মানব সেইরূপ অবতারগণও অষ্টপাশমুক্ত মহামানব। অর্থাৎ ৭৷৷০ কলার বিকাশ হইতে উন্নত বিকাশ হইলে অভিমানটী থাকে না। ঐ অভিমান মানুষকে স্বার্থী এবং অসুর প্রস্তুত করিতে পারে। তাই যাঁহারা খুব ভালভাবে গণেশ-কেন্দ্রপুষ্ট মানব নহেন তাঁহাদিগকে কোন প্রকারেই ভাল লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাঁহারা গণেশ-স্তরের আদর্শকে (অন্যায় বিরোধিতাকে) বজায় রাখিয়া কর্ম্মশক্তি আট কলার উপরে বৃদ্ধি করেন তাঁহারা নিজেদের কর্মশক্তি দশ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে পারেন। অর্থাৎ (৫×২ = ১০) ৫ কলারই দ্বিগুণ কলা বুঝিতে হইবে। যাঁহারা (দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন হইয়া) বিষ্ণু-স্তরের আদর্শকে (সমাজ রক্ষা) বজায় রাখিয়া কর্মশক্তি ৮ কলার উপরে বিকাশ করিতে পারেন তাঁহারা (৭×২ = ১৪) ১৪ কলা পর্য্যন্ত বিকাশস্থল হইতে পারেন। সূর্য্যকেন্দ্রপুষ্ট অবতার অহিংসা প্রধান প্রচার অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হন; তাঁহারা জগৎগুরুর স্তরেই চলিয়া যান। তাঁহাদিগকে অবতারের মধ্যে না ধরিলেই বোধ হয় ভাল হয়। গণেশ-কেন্দ্র-আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়া নবম এবং দশম কলাপুষ্ট অবতারগণ গণেশ-শক্তি সমন্বিত অবতার হইয়া থাকেন। এইরূপে বিষ্ণু-কেন্দ্রশক্তির বিশেষত্বকে অবলম্বন করিয়া নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ কলার বৃদ্ধি করা যায়। এই রূপ শক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষগণই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। যাঁহারা প্রথম অবধি বা যে কোন সময় শক্তিস্তরের কর্মাদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারা পূর্ণ মানবের স্তরে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন। ঋষিগণ শক্তিস্তরকে বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা শক্তিস্তরের কর্ম্মাদর্শে মানুষ মাত্রকেই গঠন করিয়া দিতে পারেন বা সেইরূপ চেষ্টা করেন।

পূর্ণ মানবের বিভূতি ষোড়শ হইতে ত্রিংশ বা অনন্ত কলার বিকাশ বলিয়া জানিতে হইবে, ইঁহারা অবতারগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। গণেশ-কেন্দ্রের আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়া দশ কলার অধিক বিকাশ হয় না, আবার বিষ্ণুকেন্দ্র আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়াও ১৪ কলার বেশী বিকাশ হয় না; কিন্তু পূর্ণ শক্তির আদর্শ গ্রহণ করিয়া ভোগ-কলা, কর্ম-কলা এবং জ্ঞান-কলা তিনই যুগপৎ বিকাশ হইতে পারে। মানুষ পূর্ণকলায় আসিলে আত্মস্বরূপতা লাভ করেন; তখন তিনি পূর্ণকর্ম্মী ও পূর্ণজ্ঞানী হইয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে এ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। শক্তির ধ্যানের প্রত্যেকটি কর্মলক্ষণ এবং অনুভূতি সেই সব পুরুষে বিদ্যমান থাকিবে। ইহাই আত্মস্বরূপের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং এমন যে মানব তিনি সকল জীবের আত্মস্বরূপ হইয়াই অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ মহামানব বলিয়া আর্য্যঋষিগণ মানিয়া লইয়াছিলেন। গীতার যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই স্তরের কর্মলক্ষণের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়াই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এখনকার দিনের দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ বুঝিতেই পারিবে না ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি প্রত্যক্ষ গুরুগণের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের মত চরিত্রবান পুরুষ কেমন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে বধও করিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে সেই যুদ্ধের ফল কিরূপ কারুণিক হইয়াছিল সে কথা মহাভারতের নারীপর্ব্বে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। অর্জ্জুন সেই কারুণিক দৃশ্যের পূর্ব্ব সূচনা যুদ্ধের প্রারম্ভেই দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য সমর্থন

করেন নাই। যাঁহারা ভক্তিপথের একটু আধটু ভাবের নেশাকে অবলম্বন করিয়া এখনও নিষ্কাম কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে চাহেন তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন তাঁহাদের ভুল কত গভীর। ভক্তি মানুষকে ষষ্ঠ কলা বিকাশের কেন্দ্র মাত্র আনিতে পারে। তাহা কোন যুগেই আসুরিক কলার গোলামীকে অস্বীকার করিবার শক্তি আনিতে পারিবে না। এই সব দুর্ব্বল সাধনার পথে প্রবেশ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ গুরুর দুর্ব্বলতার সমর্থক হইয়া আত্মবিকাশের পথে বামন হইয়া শেষকালে ভাবের দুর্ব্বলতার নকল করিয়া মানব সমাজকে কর্ম্মলক্ষ্যে পঙ্গু করিতে থাকে। শিষ্য যে কোন প্রশ্ন করে তাহার জবাবে ঐ স্তরের গুরুগণ চক্ষুদুটি একটু ঢুলুঢুলু করিয়া শিক্ষা দেন ‘‘ঠাকুর এই কথা বলিতেন -’’। যাহা হউক পূর্ণ মানবের স্তরে যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা একথা জানিয়া রাখুন কোন প্রকার দুর্ব্বলতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া পূর্ণ হওয়া যায় না। নিজের কর্মপথে সমস্ত জীবের আত্মকেন্দ্রে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই ‘ত্রিদশ গণাবৃতাং’ জানিতে হইবে।

(এখানে পূর্ণতার পথের পথিকগণকে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ণ মানব বলিয়া যে কেহ আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন এবং পূর্ণ মানব বলিয়া অনেকে যে কোন মানুষকে পরিচয় করাইয়াও দিতে পারেন তাঁহাদের পিছনে পঙ্গপালের মত ঝুঁকিয়া পড়িবার কোনই প্রয়োজন নাই। যিনি নিজের সমাজের* জন্য এবং জগতের মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষে কিছু করিয়া যান নাই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে অবতার সাজাইয়া নিজেকে খুব বড় দোকানদার সাজান যাইতে পারে, কিন্তু জগতের মঙ্গল তাহাতে খুব কমই হইয়া থাকে। নানা প্রকার শিক্ষা এবং সংস্কার দ্বারা আমরা মানুষের মনোবৃত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেই। পরবর্ত্তী যুগে স্বার্থপরগণ মানুষের সেই দুর্ব্বলতাটুকুর নকল অবলম্বন করিয়া নিজের চরিত্র গড়ে অথবা কোন সাধু বা গুরুকে সেই দুর্ব্বলতার আড়ালে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার জীবন চরিত প্রকাশ করে। সরল মানুষ নিজের বিচারশক্তির অভাবে সেই সব অলৌকিক কল্পিত কাহিনী জানিয়া আত্ম-লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া ভ্রান্ত সংস্কারের পশ্চাদগামী হয় এবং নিজের ও সমাজের সর্বনাশ করে। দু'চারটা অলৌকিক কল্পনার উপাদানে বর্ত্তমান সময় বহু জীবন নাটক অঙ্কিত হইয়া ধর্ম্মের নামে দোকানদারী চলিয়াছে। যাঁহারা পূর্ণতার পথে যাইবেন তাঁহারা সে সব মিথ্যা কল্পনার নেশায় মত্ত না থাকিয়া বিবেকের নির্দ্দেশ লইয়া পথ করিবেন। যাঁহারা গুরুকে খুব বড় যোগসিদ্ধ বলিয়া জাহির করিবার জন্য আকাশ-গমন, পাতাল-ভ্রমণ, সমুদ্র-ভক্ষণ, ট্রেণ-স্তম্ভন ও পরলোক দর্শনের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া বিজ্ঞাপন করিয়া বেড়ায় সে সব এজেণ্টগণকে তত্তৎ শক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। গুরুর অলৌকিক শক্তি তাহাদের মধ্যে কতটা আসিয়াছে তাহা জানিয়া তাহারই নিকট সে শক্তি শিক্ষা করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তবেই এই এজেণ্ট গণের চালাকি ধরা পড়িবে। গুরু আকাশ-ভ্রমণ করেন তাহাতে তোমার কি হইল? তুমি আকাশ-ভ্রমণ করিতে পার ত দেখাও! যাহার প্রয়োজন হইবে সে তোমারই নিকট শিক্ষা করিবে। আমাদের কথা কর্মশক্তির বিকাশ কতটা হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। বুজরুকি দ্বারা আত্ম-বিকাশের পথ সঙ্কোচ হয় ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেকেই নিজের জীবনেই অনেক বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ দেখিতে

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘সমাজের’’ শব্দটি আমাদের সংযোজন।

পারেন, কিন্তু সে সব পূর্ণতার লক্ষণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থিত শক্তি-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া সকলেই পূর্ণ হইতে চেষ্টা করিবেন। শিবকেন্দ্রস্থিত প্রাকৃতিক জীবনের উপর নবম কলা হইতে পূর্ণ কলার বিকাশ হইয়া থাকে। সে শক্তি ও আদর্শ আজ বহুদিন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধির কৌশল, কর্ম্মের কৌশল, ধৈর্য্য, বীরত্ব, দৃঢ়তা, অন্যায় বিরোধিতা, আসুরিক বিরোধিতা, মোহহীনতা, কামহীনতা, ত্যাগ, দান, সরলতা, সংগঠনী শক্তি, মানুষ চিনিবার শক্তি, নির্ভীকতা, গাম্ভীর্য্য, নিরভিমানতা প্রভৃতির বিকাশ দ্বারা মানুষ চিনিবে এবং এই সব উপাদানে নিজের চরিত্র গঠন করিবে। এই সব উপাদান চরিত্রে না থাকিলে অলৌকিক কোন শক্তিই মানুষকে সুখী এবং উন্নত করিতে পারে না। চরিত্রবল প্রথম, পরে অন্য কথা।)

সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ - সিদ্ধিকামিগণ এই শক্তির সেবা করেন।

আত্মবিকাশের পূর্ণতম কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা বা সাধনার সিদ্ধিই সিদ্ধি বলিয়া জানিতে হইবে। কেহই অল্পে তুষ্ট থাকিও না, তবেই সিদ্ধিকামী হইতে পারিবে। অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক জীবই আত্মবিকাশের পথে চলিয়াছে। মানুষ যতক্ষণ আত্মবিকাশের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না ততক্ষণ শূদ্র (ক্ষুদ্র) পদবাচ্য। আত্মবিকাশের পথেই মানুষ চলিয়াছে। যতক্ষণ মানুষ তাহা না বুঝে ততক্ষণ মানুষের বিকাশের পথ সহজ হয় না। তাই মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য আত্মবিকাশের দায়িত্ব বুঝিয়া দেখিয়া দেখিয়া সে পথে পা ফেলা। মানবেতর অন্যান্য জীব আত্মবিকাশের পথে প্রকৃতির অধীন হইয়া চলিয়াছে। মানুষ মোহবশে আসুরিকতাকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে; তাহা না হইলে মানুষের ক্রমবিকাশের পথও রুদ্ধ হয় না। আসুরিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি প্রয়োগের আদর্শ যতক্ষণ মানুষ গ্রহণ না করে ততক্ষণ মানুষ শক্তি-স্তরে আসিতে পারে না।

গণেশ-কেন্দ্র-শক্তি মানুষকে ক্রমবিকাশে সাহায্য করে। এইজন্য গণেশ-ধ্যানে 'সিদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাস্তবিক গণেশ-শক্তিই একটু একটু করিয়া উন্নত বিকাশে পৌঁছাইয়া দেয়। তাই গণেশ-ধ্যানে গণেশকে 'সিদ্ধিপ্রদং' বলিয়া উল্লেখ আছে। জ্ঞানী বা কর্ম্মী উভয়েই গণেশ-কেন্দ্রকে সর্ব্বদা জীবন্ত রাখিবেন। বিবেকই গণেশ; একথা বহুস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মনোময় কোষস্থিত যে কোন অনুভূতিকে গণেশ-কেন্দ্রস্থিত অনুভূতির আলোতে ঢাকিয়া দেওয়া যায়; গণেশ-কেন্দ্রস্থিত অনুভূতি এমনই শক্তিশালী অনুভূতি। এদিকে কর্ম্মপথেও গণেশ-কেন্দ্র এমনি শক্তিশালী যে বিবেক যে কোন অন্যায় কর্মবেগকে নিয়মিত করিয়া দিতে পারে। যাঁহারা আর্য্যগণের পুরাণাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় জানিয়াছেন যে গণেশই শক্তি বা দুর্গার প্রিয় পুত্র; সুতরাং যাঁহারা শক্তিস্তরের কর্ম্ম-বিজ্ঞানকে স্থাপন করিবার পক্ষপাতি তাঁহারা গণেশকে নিশ্চয়ই প্রিয় করিয়া লইবেন।

এখন কথা হইতে পারে বিবেকের কেন্দ্রকে কি করিয়া শক্তিশালী করা যায়? বিবেকের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা খুবই সহজ। যে কোন বিচারে আমরা নিযুক্ত হই আমাদের অন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রগুলি সেই সময় আপন আপন উপাদানগুলি আমাদের চিন্তার সম্মুখে প্রেরণ করে। আমরা যে কেন্দ্র-শক্তির প্রভাবে কাজ করি আমাদের

অন্তঃকরণস্থিত সেই কেন্দ্র-শক্তিই প্রবল হইয়া যায়। অন্তঃকরণের সূর্য্য-শক্তি আমাদিগকে প্রেম, ভালবাসা বা ভাবপ্রবণতার দিকে আকর্ষণ করে। বিষ্ণু-কেন্দ্র স্বার্থ এবং মোহের কথা ভাবায়। গণেশ ত্যাগ এবং পক্ষপাতিত্বহীন বিচার-বেগ প্রদান করে। আমরা যাঁহার প্রভাবে কাজ করি অন্তঃকরণে সেই প্রভাবই শক্তিশালী হয়। বিবেকের কথা দুই চারিবার মানিবার পর বিবেক বিশেষ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়। বিবেককে এইভাবেই শক্তিশালী করিতে হয়। যাঁহারা বিবেকের নির্দ্দেশ মত পথ ধরিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শারীরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হইবেন। শরীর রক্ষা (অন্ন বা আর্থিক) ব্যাপারেও স্বাধীন হইতে না পারিলে বিবেক শক্তিশালী হইবে না। শরীরের যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে বিবেকের বেগকে ধারণ করিবার শক্তির অভাবে শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। বিবেকের নির্দ্দেশ মানিতে গিয়া কেহ ভাবপ্রবণ এবং উচ্ছৃঙ্খল হইবে না। নিজের প্রয়োজনকে পূর্ণ করিবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই অসতের অধীন হইতে হয়। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আদর্শের সামান্য ইতরবিশেষে কিছু আসে যায় না। লক্ষ্য পূর্ণবিকাশ ইহা যেন মনে থাকে। বিষ্ণু-কেন্দ্রশক্তি বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিষ্ণু-কেন্দ্রস্থিত স্বার্থকে ত্যাগ করিয়া সমস্তগুলি বিষ্ণু-চরিত্র আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কৌশলে যত কাজ হয় যুদ্ধে তত কাজ হয় না। স্নুতরাং চতুরতার প্রয়োজন আছে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ইহাদিগকে ‘চতুর্বর্গ সিদ্ধি’ বলা হইয়াছে। শক্তি-স্তরের বিকাশে এই চতুর্বর্গ সিদ্ধি আসিয়া যায়। এখানে ধর্ম্ম অর্থে শিব-স্তরের অনুভূতি এবং সরল প্রাকৃতিক জীবন বুঝিতে হইবে। ‘অর্থ’ বলিতে বিষ্ণু-কেন্দ্রস্থিত ধন, সংগঠন, ভূমি, পশু, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। ‘কাম’ অর্থে স্ত্রী (স্ত্রী হইলে পুরুষ)। ইহা মনের কেন্দ্রস্থিত ভোগের উপকরণ। ‘মোক্ষ’ বলিতে অব্যক্ত তত্ত্বের অনুভূতি, যাহা শক্তির ধ্যানে ‘ইন্দুরেখা’ অংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সিদ্ধি চতুষ্টয় মানুষ মাত্রেরই অন্তরের স্বাভাবিক কাম্য বস্তু। একটু অন্তর লক্ষ্যের সহিত নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকেই ইহাদের প্রত্যেকটীর প্রয়োজন বুঝিতে পারিবেন।

ভাবের সাময়িক বন্যা এবং ত্যাগের সাময়িক উত্তেজনায় অধৈর্য্য হইয়া সাধকগণ রাতারাতি অবতার হইয়া চেলা করিবার ফন্দি আঁটিবার জন্য যা তা প্রচার করা আরম্ভ করিও না, কিছু দিন অপেক্ষা কর, নিজের অন্তরকে দেখ; দেখিতে পাইবে তোমার ভোগের প্রয়োজন আছে। তোমার অন্তরে তাহার চাওয়ার বেগ আছে; সে বেগ তোমাকে সময় সময় অধৈর্য্য করিয়াও দিতেছে। যতক্ষণ তন্মাত্র-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না ততক্ষণ ভোগের বীজ ধ্বংস হয় না। শক্তি-স্তরে আসিয়া ইচ্ছা করিলে ভোগও গ্রহণ করা চলে কিন্তু মোহ এস্তরে একেবারেই থাকে না, অষ্টপাশের বন্ধনও (অভিমান) থাকে না। এরূপ মানুষ নাই বলিলেই চলে। যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ অর্থেরও প্রয়োজন। অর্থ, বস্ত্র, গৃহ এবং বান্ধবহীন হইয়া তুমি শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না (যাঁহারা ব্রহ্মকোটীর লক্ষণসম্পন্ন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহাদের এসব ভাবনা নাই। সে সব মহাপুরুষ কোন কর্ম্মের অবলম্বন করেন না)। স্নুতরাং “ত্যাগ ত্যাগ” করিয়া চিৎকার করিলে চলিবে না। তোমার আত্ম-বিকাশের পথে প্রয়োজনীয় শরীর যাত্রার অবলম্বন চাই। “ঈশ্বর দিবেন”, “ঈশ্বর পৌঁছান” ইত্যাদি বড় বড় কথা বলিবার পূর্ব্বে নির্ভরতার

সাধনা কতটা হইয়াছে তাহা মনে মনে বিচার করিয়া লইবে। ‘‘ধর্ম্ম’’ অন্তঃকরণের শান্তির পুষ্টিকে বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিতে আমরা স্বভাবতঃই এই কেন্দ্রে আসিয়া থাকি। উপাসনার দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইহার সম্মুখীন হইতে পারি। উপাসনার সঙ্গে মন্ত্র এবং জলের সম্বন্ধ যত বেশী হয় শান্তি তত শীঘ্র জমিয়া যায়। মন্দির*, নদীতট বা কোন শান্তচিত্ত প্রেমী সাধুর নিকট বসিয়া সন্ধ্যা বা উপাসনা করিলে বেশী ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা একটু উন্নতস্তরে আসিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে উপাসনা করিবেন। ধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া বা নাস্তিক হইয়া কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না। যাঁহারা যোগের বিশেষ অঙ্গাদির অনুশীলন করেন তাঁহারাও মহাপুরুষ প্রদর্শিত উপাসনা বিধি অবলম্বনে সন্ধ্যাদি উপাসনা সম্পন্ন করিবেন। অনেকে মনগড়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বলা প্রয়োজন উহাতে শান্তি মোটেই পাওয়া যায় না। উপাসনার বিধি লইয়া সমালোচনা করা মোটেই কর্ত্তব্য নহে। উহাতে বহুলোকের শান্তি প্রাপ্তিতে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। যেমন অন্যে খাইলে নিজের পেট ভরে না সেইরূপ উপাসনা অন্যের দ্বারা করাইলে শান্তিলাভ হয় না। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা এবং তান্ত্রিক পূজা শান্তিলাভ করিবার অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক পন্থা। যাঁহারা ভক্তিপথের অনুশীলন করেন তাঁহারাও সন্ধ্যা-কর্তব্য শেষ করিয়া ‘নামকীর্ত্তনাদি’ করিবেন। যাঁহারা জপাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও ‘সন্ধ্যা-কর্তব্য’ শেষ করিয়া তাহা করিবেন। দেখিবেন সকলেই আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। যাঁহারা দু’চারটা ভাবের কথা শিখিয়া গুরুগিরি এবং মোড়লীগিরি করেন তাঁহারাও সন্ধ্যা-কর্ত্তব্য যথানিয়মে করিবেন। যাঁহারা দেশের এবং দশের নেতা তাঁহারা ইহা করিলে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের বিচার শক্তি দিন দিন কেমন তীক্ষ্ণ এবং নির্মল হইতেছে। উপাসনা পথে নিজের কল্পনা মত সাধনা সাধককে পতিত করে। সুতরাং কেহই শাস্ত্রোক্ত উপাসনা বিধির উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। উপাসনা মার্গে মানুষকে সবদিনই গুরু এবং শাস্ত্রের শরণ লইয়া চলিতে হয়। অনেকে উপাসনার মধ্যেও জন্মগত ভাগ বাঁটোয়ারা বসাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এমন মনোবৃত্তি সম্পন্ন গুরুর অধীন হইয়া আত্মোন্নতি মোটেই সহজ নহে। সাধনার সুরুতেই শিষ্য শ্রবণ করিবে ‘‘আমিই আত্মা’’। আত্মা আবরণহীন। সাধনার দ্বারা শিষ্য একদিন সেই অবস্থাই লাভ করিবে। শ্রবণের দিন যদি তাহাকে ক্ষুদ্র আবরণের মধ্যে আবদ্ধ করা হয় তবে সে সাধনার দ্বারা কি লাভ করিবে? উপাসনার পথে যাঁহারা বেশী গভীরভাবে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই গুরুর শরণ লইবেন। গুরুসেবায় অবহেলা করিয়া গুরুর জ্ঞানরাশি আকর্ষণ করা যায় না। গুরুর অজ্ঞানরাশিও অনুগত শিষ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং শিষ্য খুব সাবধানে সেইসব অজ্ঞানরাশি অতিক্রম করিবেন। সাধনায়, সত্যে ও ত্যাগে নিষ্ঠা থাকিলে সে সব অতিক্রম করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে।

নিজ নিজ ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট উপাসনা বিধি শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত যথা নিয়মে সম্পন্ন করিবেন। মন্ত্র এবং জলের প্রয়োগ যথাযথভাবে হওয়া আবশ্যক। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে জলের সুবিধা না হইলে মনে মনে সেইসব কাজগুলি শুধু মন্ত্রাবলম্বনে করিবেন; অথবা ধ্যানাবলম্বনে বীজমন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। জপকালে সেই জপজনিত সুখটুকু

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘(মসজিদ্ গীর্জ্জা ইত্যাদি)’’ শব্দকয়টি প্রক্ষিপ্ত বিধায় পরিত্যক্ত হল।

(অন্য সব কথা ভুলিয়া যাইয়া) ভোগ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে নিশ্চয়ই শান্তি পাইবেন। অনেক নবীন গুরু উপাসনাকে এখন টানিয়া হিঁচড়াইয়া ভাবের লহরের মধ্যে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা শান্তির খোঁজে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহারা ঐসব 'আহা উহু এবং নাচা কাঁদা' হইতে দূরে থাকিবেন। গুরুর কাজ মানুষকে পূর্ণতার পথে আকর্ষণ করা, ভাবের পথে নহে। ভাবের কেন্দ্রকে পুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং উপন্যাসই যথেষ্ট; দেশের সাহিত্যিকগণের (সূর্য্যস্তরের গুরুগণের) কৃপায় তাহারা আর অভাব নাই। শান্তির পথে ভাবের কেন্দ্র আপনিই পুষ্টিলাভ করিবে, সেইজন্য আর বেশী চেষ্টার প্রয়োজন নাই। খুব শান্ত এবং নিবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিয়া নামকীর্ত্তন বা স্তোত্র পাঠের সময় দেখিবেন স্বভাবতঃই ভাবের আবেশ আসিয়া গিয়াছে। নকল ভাব হইতে তাহার মাধুর্য্য লক্ষগুণ অধিক শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে, সেই কীর্ত্তনে আকাশ, বাতাস এবং বৃক্ষাদিও অমৃতের স্পর্শ পায়, শান্তি লাভ করে। আর বৃথা ভাবের ঢংএ সময় বৃথা নষ্ট হয়। তাহাতে সমাজের বহুলোকের শান্তির বিঘ্ন হইয়া থাকে।

(আমরা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবককে জলসহ অন্ততঃ একটি সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণের শান্তির কেন্দ্র অতি সুন্দরভাবে পুষ্ট হয়। এই শান্তির সংযোগে মানুষ প্রতি সন্ধ্যায়ই নবীন জীবন লাভ করে। নিদ্রার পর যেমন আমরা নূতন কর্ম্ম-শক্তি লাভ করি সেইরূপ উপাসনার দ্বারা আমরা আমাদের অন্তরস্থিত নূতন শক্তির সম্মুখীন হই। আমাদের অন্তঃকরণের ময়লারাশি শান্তির সংযোগে ধুইয়া পুঁছিয়া যায়। ইহাতে রোগ, শোক, আলস্য, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা নষ্ট হয়। একটু ধীরভাবে ইহা করিবার অভ্যাস করিলে প্রত্যক্ষে ইহার সুফল পাওয়া যায়। বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যার অভ্যাস করিতে হয়। উপনয়ন বা দীক্ষা গ্রহণ করিলে ইহাতে প্রবেশের অধিকার হয় একথা সত্য, তবুও আমরা একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি উপনয়ন বা দীক্ষাগ্রহণের সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্তও ইহার অভ্যাসে কোন পাপ স্পর্শ করে না। সাধক-সমাজে পাঁচটি সন্ধ্যার প্রচলন আছে। সময়ের প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পাঁচ প্রকারের সন্ধ্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রারম্ভ পাঁচটী সন্ধ্যার নির্দ্দিষ্ট কাল। বিস্তারিত এই পুস্তকে আলোচনা হইবে না।)

এখন 'মোক্ষ' সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা বলিতেছি। উপাসনার দ্বারা অন্তঃকরণের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়। ইহা একপ্রকার টনিকের মত। অন্তঃকরণ বেশ পুষ্ট না হইলে উপলব্ধির শক্তি হয় না। উপলব্ধিই যে 'মোক্ষ' একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এজন্য যাঁহারা মোক্ষপথে অগ্রসর হইবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সন্ধ্যোপসনা ও জপ অত্যন্ত আদরের সহিত সম্পন্ন করিবেন। উপলব্ধি বা অনুভূতিই 'মোক্ষ'। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি-স্তরের অনুভূতির কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন যেমন উন্নত-স্তরের অনুভূতি আসিতে থাকে তেমন তেমন নিম্নস্তরের দুর্ব্বলতা ও চিন্তার বেগ হইতে সাধক মুক্তিলাভ করিতে থাকেন। এই ভাবেই সাধক ধীরে ধীরে অব্যক্তস্তর পর্য্যন্ত অনুভব করিবেন। অব্যক্ত-স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক মাত্রই গীতানির্দ্দিষ্ট ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন, একথা গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। অব্যক্ত-স্তরের অনুভূতি মোক্ষের

শেষ স্তর। যে কোন বাহ্য বা আন্তরবিষয়ের সংযোগে আমাদের অন্তরস্থিত সবগুলি কেন্দ্রই স্পন্দিত হয়। আমাদের আত্ম-বুদ্ধি যখন যে কেন্দ্রে বিশেষভাবে অবস্থান করে তখন সেই স্পন্দন সেই কেন্দ্রে বিশেষ ক্রিয়া উৎপন্ন করে। অন্যান্য কেন্দ্রে উৎপন্ন ক্রিয়া (স্পন্দন) আমরা ততটা অনুভব করি না, যতটা আত্ম-বুদ্ধি-সংযুক্ত-কেন্দ্রে অনুভূত হইয়া থাকে। সেই সুখদ স্পন্দনই 'অনুভূতি' নামে খ্যাত। সেই স্পন্দনের রূপ আছে বা রং আছে। আন্তরদৃষ্টিতে তাহা দেখা যায় এবং আন্তরপ্রাণে তাহা ভোগ করাও যায়। সেই সুখদ অনুভূতিকে বেশীক্ষণ স্থায়ী করিবার অভ্যাস করিতে হয়। গীতায় অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ আছে। সেই স্পন্দন-সুখ-স্মৃতি বৃদ্ধির অভ্যাসই 'অভ্যাস' এবং তদ্ভিন্ন বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণ-ত্যাগই 'বৈরাগ্য' নামে খ্যাত। যাঁহারা সমাধির অভ্যাস করেন তাঁহারা এই স্পন্দন বা অনুভূতিকে বেশীক্ষণ স্থায়ী করিয়াই সে সুখে আত্মহারা হন, ইহাই 'সমাধি' বলিয়া খ্যাত। যাহা হউক অধিকক্ষণ স্থায়ী করিবার পর সেই অনুভূতিটী সাধকের খুব সহজ হইয়া যায়। তখন সেই কেন্দ্রই সাধকের স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়; অথবা সেই কেন্দ্র সাধকের এতটা আয়ত্ত হইয়া যায় যে ইচ্ছামাত্রেই সেই কেন্দ্রের প্রবাহে আত্মহারা হইতে পারেন। প্রত্যেকটী কেন্দ্রেই অনুভূতির সঙ্গে কতকগুলি দুর্ব্বলতা থাকে। সাধকের চরিত্রে ক্রমে সেই কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলি বিকশিত হইতে থাকে। ক্রমে অনুভূতির মধ্যেও সেই কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলি সাধক স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার নিকট সেই কেন্দ্র আর শান্তিপ্রদ বা তৃপ্তিপ্রদ থাকে না। তাই সাধক আরও গভীর শান্তির খোঁজে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হন। এই ভাবেই উপলব্ধির গভীরতা সাধকে আসিতে থাকে। ক্রমে সাধক উপলব্ধির শেষস্তরে অব্যক্ত কেন্দ্রে আসিয়া যান। উপলব্ধির উন্নত অবস্থা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের আচার, বিচার এবং স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অব্যক্ত-স্তরের অনুভূতির পর কোন কোন সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কর্ম্ম পথে তাঁহারা আর ফিরেন না। ইঁহারাই ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত 'মহাপুরুষ' বলিয়া খ্যাত। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তপঃশক্তির বলে গণেশ কেন্দ্রের অনুভূতির পর সোজাসুজি শিবের কেন্দ্রে শান্তির অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাঁহারাই এরূপ অবস্থা লাভ করেন। (কেহ যেন ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের নকল করিয়া এরূপ ভাব অবলম্বন না করেন। এ সব নকল করিয়া আয়ত্ত করা যায় না, তাহাতে নিজের আত্মোন্নতির বিশেষ বিঘ্ন আসিয়া যাইবে)। যাঁহারা বিষ্ণুকেন্দ্রের অনুভূতির পথে শিবস্তরে আসিয়া পরে অব্যক্তের অনুভূতিতে আসেন তাঁহারা পুরুষোত্তম বা ঈশ্বরত্বের স্তরে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মাবলম্বন করেন। এরূপ মহাপুরুষগণের অব্যক্তের পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ব্বেই সমাধি ভঙ্গ হয় এবং শক্তিস্তরের কর্ম্মীর আদর্শে স্বভাবতঃই জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্মাবলম্বন করেন। ইহা চির কর্ম্মময় স্তর; এখানে কর্ম্মের শ্রান্তি নাই; কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ নাই। ইহা এমন একটি স্তর যেখানে বিশ্বের স্থূল উপাদান এবং আমাদের অন্তরস্থিত ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একই শক্তিরূপে অবস্থিত আছে। পাঠকগণ মন্ত্রশক্তি আলোচনায় যোগদান করিয়া এসম্বন্ধে আরও স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভোগে ইচ্ছাশক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুকেন্দ্রে ক্রিয়াশক্তি এবং শিবস্তরে জ্ঞানশক্তির বিকাশ। বিকাশ সম্বন্ধেই সেখানে বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সেখানে কিছু বলা হয় নাই। যাহা হউক অনুভূতিতে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি এবং বিশ্বের স্থূল উপাদানকে আমরা এই স্তরে একই শক্তিরূপে পাইতেছি। বিজ্ঞানময় কোষের আলোচনায় আমরা ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থাগুলিকে আমরা বিভিন্ন প্রকারে বোধরূপেই পাইয়াছি। সেগুলি যে বিভিন্ন প্রকার শব্দের (নাদের) রূপ তাহাও বলা হইয়াছে। শক্তির স্বরূপে স্থিত হইয়া আমরা সমস্ত বাহ্যিক এবং আন্তর উপাদানকে একই শক্তিরূপে পাইতেছি। মন্ত্রশক্তি অংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইহা মোক্ষের উপরের স্তরের কথা। মোক্ষ এই স্তরেরই আশ্রয়ে অবস্থিত অব্যক্তস্তরের অনুভূতি।

শক্তি স্তরে দাঁড়াইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য ক্ষেত্র পাওয়া যায়। এই জন্য প্রত্যেকটি শক্তি-মন্ত্রের প্রয়োগে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিনিয়োগ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। মানব সমাজে ইহাদের সামঞ্জস্য না থাকিলে মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শুধু কামই মানুষের কাম্য নহে, শুধু অর্থ মানুষের লক্ষ্য হইতে পারে না, শুধু ধর্ম লইয়া অবস্থান করিলেও চলিবে না; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চারই চাই। শক্তি ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্রের প্রয়োগে এই উদারতাটুকু নাই। এই চারিটিকেই পুরুষার্থ চতুষ্টয় বলা হইয়াছে। পুরুষ বা পুরুষোত্তম শক্তিস্তরকেই জানিতে হইবে। ইহাই দুর্ব্বলতাহীন পূর্ণ কর্ম্মীর স্তর। কর্ম্ম করাই পুরুষের লক্ষণ। যে কর্মকুশলতা জানে সেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করিতে পারে। অলস বা ভাগ্যবাদী ইহা পায় না।

বর্ত্তমান সময় অর্থশক্তির যুগ; সুতরাং বহু কর্ম্মী অর্থের দিকে বিশেষ নজর ফিরাইয়া দিবেন। অর্থদ্বারা জগতের আত্মবিকাশে সাহায্য করিবার লোক যদি না থাকে তবে আত্মবিকাশের পথ বিশেষভাবে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নিজেকে সমৃদ্ধশালী করিবার লক্ষ্য যেমন থাকিবে তেমনই সেই অর্থ মানুষের আত্মবিকাশে সাহায্যার্থ ব্যয় করিবার মনোবৃত্তি না থাকিলে নিজেরও আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কৃপণের আত্মবিকাশ কোথায়? শরীরযাত্রাকে পরিচালনা করিবার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। আমরা এমন বহু কর্ম্মী দেখিতে চাই যাঁহারা নিজের শরীর রক্ষার মত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাকী সময়টা জগৎমঙ্গলকর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রাখিতে না পারিলে নিজের চিন্তাশক্তি কর্মের নামে জড়ত্বের বিকাশক্ষেত্র হইয়া যায়; উহা শূদ্রত্বেরই লক্ষণ। যাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহারাও শরীর রক্ষার মত উপার্জ্জনক্ষম হইতে চেষ্টা করিবেন। চাঁদাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রায়ই এমন মনোবৃত্তি হইতে দেখা যায় যাহাতে আত্মোন্নতি খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অনাথ হইয়া জগন্নাথ (পুরুষোত্তম) হওয়ার সাধ নিতান্তই অস্বাভাবিক। সাধকই একদিন জগৎগুরুর আসন লাভ করেন। যাঁহাদের প্রকৃতই জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়াছে তাঁহারাই ভিক্ষা বৃত্তি করিয়া নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিবেন। অন্যের জন্য এই বৃত্তি হানিকর।

কাম, কামনা ও ইচ্ছা একই কথা। যৌন সম্বন্ধে কামনাই 'কাম' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে বহুস্থানে ইহাকেই ইচ্ছাশক্তির স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তির উপরেই সমস্ত সৃষ্টি অবস্থিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানুষের ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইলে এই যৌন-সম্বন্ধ যুক্ত কামনা ক্ষীণ হইতে থাকে। শিবের স্তরে আসিলে এই কামনা একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। তাই কামনাকে আমরা এত ছোট করিয়া রাখিতে চাই না। আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কামনার উন্নত অবস্থা আসিতে থাকে। তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবে কামনাকে আমরা প্রত্যেক স্তরেই দেখিতে পাইব। একথা সত্য যে নিম্নস্তরে কামনা যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। পরে এক স্তরে সেই কামনা বিদ্যা ও যশাদি অর্জ্জনে আত্মদান করে। অন্যস্তরে দশের মঙ্গল এবং সমাজের সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার জন্য সেই কামনা মানুষকে উদ্বেলিত করে। এক স্তরে যে কোন প্রকারে অন্তঃকরণের শান্তির পুষ্টিই সেই কামনার লক্ষ্য হয়। শক্তিস্তরে আসিলে জগতের মঙ্গলই মানুষের কাম্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বহুস্থানে বলা হইয়াছে অনুভূতির রূপগুলিকেই ঈশ্বর মানিতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের শক্তিসম্পন্ন অনুভূতিগুলি গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শক্তিস্তরে আসিলে বুঝা যায় ঈশ্বর কি বস্তু। তখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় উহা আমাদের আত্মারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের অবস্থা, যাহা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক এবং অলৌকিক দুর্ব্বলতাশূন্য অবস্থা। আমাদের এই অবস্থাকে বহুপ্রকারের কল্পিত লৌকিক বন্ধনে বাঁধিয়া আমরা নিজেকে এতদিন ছোট করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা এ স্তরে আসিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই শক্তিস্তরের লক্ষণই আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থার লক্ষণ। পাঠকগণ যদি এই শক্তি অংশে আলোচিত শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল ও কৃপাণের আবার আলোচনা করেন তবে ভাল হয়। এই চারিটা অস্ত্র যেন জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক স্বভাবের বহির্বিকাশ। জীব মাত্রেরই স্বভাবে এই চারিটী অস্ত্র যেন মিলিয়া জুলিয়া অবস্থিত। এই চারিটি অস্ত্র যেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব হইতে সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ মানুষের স্বভাবের স্বাভাবিক বিকাশ। যেখানে জীব-স্বভাবে এই প্রাকৃতিক আন্তর শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ দৃষ্ট হয় না সেখানে জানিতে হইবে সেই জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের বিশেষ অত্যাচারের ফলে সে এমন অস্বাভাবিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। (ক্রমোন্নত বিকাশে সাধকের সাময়িকভাবে কোন কোন কেন্দ্রীয় অনুভূতিতে আত্মদান করিবার কারণেও ইহার সাময়িক ব্যতিক্রম দেখা যাইবে, কিন্তু ঐ ব্যতিক্রম স্বাভাবিক নহে)। যে কোন জীবকে তাহার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সে চিৎকার করিয়া নিজের অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে বা তাহার উপর অন্যায় অত্যাচারের তীব্র আন্তরিক প্রতিবাদ জানাইতে থাকে (শঙ্খ)। প্রত্যেকটী জীব সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে (চক্র), প্রত্যেকটী জীব কর্ম্মান্তে বিশ্রাম করে বা শান্তির সহিত থাকিতে ভালবাসে। এই অন্তরের শান্তি চাওয়াই এক সমাজভুক্ত জীবের নিকট অন্য সমাজভুক্ত জীবের প্রাকৃতিক আচার ব্যবহারকে অত্যন্ত বিরুদ্ধ করিলেও অসহ্য হইতে দেয় নাই (ত্রিশূল)। যে কোন স্বাধীন জীবের উপর অত্যাচার করিলে সে তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য সেই মুহূর্তেই তাহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে (কৃপাণ)। মানুষে এই প্রাকৃতিক বিকাশ অন্যান্য জীব হইতে স্বভাবতঃই বেশী প্রস্ফুটিত। মানুষে যদি ইহার

ব্যতিক্রম হয় তবে খোঁজ ইহার মূলে কি কারণ বিদ্যমান্ আছে, তাহার প্রতিকারই বা কি আছে? শিক্ষা, সমাজ, গুরু এবং রাজশক্তিই ইহার জন্য দায়ী।

দুর্গাধ্যান অবলম্বনে এপর্য্যন্ত যে সব কথার আলোচনা করা হইল তাহাতে কর্ম্মী মাত্রই নিজের প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত করিতে পারিবেন। পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যে সব উপাদানকে উন্নত করা প্রয়োজন তাহা উন্নত করিয়া লইবেন। যে সব উপাদান নিজের চরিত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে সেগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া লইবেন। মনে রাখিবেন ইহা প্রচার করিবার জন্য নহে, ইহা নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করিবার জন্য। বহুদিন বার বার পাঠ করিয়া ইহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিবেন। অন্যকে এই উপাদানের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য প্রথম ইহা পাঠ করিতে দিবেন, পরে তিনি নিজেই নিজের প্রয়োজন মত উপাদান ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহারা ছলধর্ম্মপরায়ণ তাহারা স্বভাবতঃই বেশী বুদ্ধিমান হইয়া থাকে (বিষ্ণু অংশে দেখ)। তাহারা ইহা পাঠ করিয়া সাধারণতঃ এই মন্তব্যই প্রকাশ করিবে "ইহার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছলনা করিবার পথ আরও সহজ করিয়া লইতে পারিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একজন মানুষও যদি সত্যের অবলম্বনে নিজের আত্ম-বিকাশের জন্য ইহার অবলম্বন করেন, তবেই সুখের হইবে; আমাদের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। শক্তি-অংশের অন্যান্য কথা আলোচনা করিবার জন্য এবার আমরা ধ্যান অংশ এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্রশক্তি

দুর্গা-ধ্যানে "ধ্যায়েৎ" ব্যাখ্যা অংশে প্রণবের কথা আলোচনা করা হইয়াছিল। ওঁ, ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ, ক্রীঁ, হ্স্ৗঁ প্রভৃতি বীজমন্ত্রকে প্রণব বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাদের প্রকৃত রহস্য সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলে জানা যায়। যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী গুরু-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কুণ্ডলিনী জাগরণ, ভূতশুদ্ধি ও মন্ত্রচৈতন্য করিয়া কিছু দিন জপ করিলেই সাধকগণের অন্তরে এক একটী বীজমন্ত্র এক এক প্রকারের শক্তিদান করিতে থাকিবে। সেইসব শক্তিকেই বিভিন্ন প্রকার খণ্ডশক্তি সমন্বিত ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। সাধকগণ এইভাবে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এইসব মন্ত্রশক্তিই ঈশ্বর।

ধ্বনি-বিজ্ঞানের দিকে হইতে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে 'ওঁ'ই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শক্তি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করিলে কোন বীজমন্ত্রকেই কম শক্তিশালী বলা চলে না। তবে সাধনার সব স্তরে সব প্রকার বীজমন্ত্রের অবলম্বন চলে না। যে কোন ধ্বনিরই উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থা আছে। ধ্বনির এই স্বাভাবিক উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থাই প্রণব (ওঁ)। ধ্বনির আদ্য বা উত্থানে 'অ', স্থিতিতে 'উ' এবং লয়ে 'ঁ' (নাদ)। ধ্বনির এই স্বাভাবিক উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থার সহিত মনঃসংযোগ করিয়া প্রণব (ওঁ) জপ করিতে হয়। ইহাতে অতি শীঘ্র মন স্থির হইয়া আসে। সাধনার পথে সাধকগণের সময় সময় বায়ুর প্রকোপ হইতে দেখা যায়। সে সময় ধ্বনি-বিজ্ঞানে প্রণব জপ আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। ধ্বনি-জগৎ যেখানে যাইয়া শেষ হইয়াছে সেখান হইতেই শক্তি-জগৎ আরম্ভ হইয়াছে; অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বের পরপারে শক্তি-জগৎ অবস্থিত। এজন্য যে কোন বীজমন্ত্র জপকালে সেই বীজমন্ত্রের পূর্ব্বে 'ওঁ' যোগ করিয়া জপ করিতে হয়। ধ্বনি-বিজ্ঞানে প্রণব জপ দ্বারা অন্তঃকরণ প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার পর যে কোন বীজ মন্ত্রই মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া লইয়া প্রণব সহ মানস জপ করিতে হয়। যাঁহারা ভূতশুদ্ধি আদি ক্রিয়া করিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে এইভাবে জপই প্রশস্ত। মন্ত্র-চৈতন্য হইয়া যাইবার পর মন্ত্রের স্পন্দন-প্রবাহ বুঝা যায়। তখন মন্ত্রের স্পন্দন-প্রবাহের সহিত মিল রাখিয়া জপ করিয়া চলিতে হয়। "ওঁ"কে শক্তি-বিজ্ঞানেও জপ করা চলে আবার ধ্বনি-বিজ্ঞানেও জপ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করা চলিলেও তাহাতে বিশেষ সুবিধা হয় না। ঐ বীজমন্ত্রগুলি মন্ত্রচৈতন্য করিয়া বা মেরুদণ্ডমধ্যগত সুষুম্নাপথে মনসংযোগ করিয়া জপ করিলে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। ধ্বনি-বিজ্ঞানে 'ওঁকার' জপ

করিতে হইলেও ঐ সুষুম্নাপথকে অবলম্বন করিয়াই জপ করা প্রয়োজন। ধ্বনির উত্থান, স্থিতি ও লয়ের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহা বুঝিতে না পারিলে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ সুবিধা হয় না। ধ্বনি-জগতের শেষ হইয়াই শক্তি-জগৎ আরম্ভ হয়। প্রণব-ধ্বনিকে ধরিয়াই ধ্বনি-জগতের শেষ প্রান্তে যাওয়া যায়। এই জন্যই 'প্রণবকে' মন্ত্রের সেতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সিঁড়ির সাহায্যেই শক্তি-স্তরে যাইতে হয়। তাই মন্ত্রশাস্ত্রে 'প্রণবের' এত আদর।

মনের জড়তা নাশ করিবার জন্য মন্ত্রজপ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। মনের উপাদানের মধ্যেই মানুষের অশান্তি ও দুঃখের কারণ গুলির বেশীর ভাগ বিদ্যমান্ থাকে। যাহারা বেশীদূর ভাবিতে পারে না তাহাদের মনের উপাদানে জড় অংশ খুব বেশী। যাহারা অন্যের জন্য ও সমাজের জন্য ভাবিতে পারে না তাহাদের মনের শক্তি খুবই কম জানিতে হইবে। বেশী জাড্যভাবাপন্ন মনই মোহে জড়িত থাকে। যাঁহারা বেশী দূর ভাবিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয়ই 'বীজমন্ত্র' জপ করিবেন। মনের জড়তা নাশ করিতে মন্ত্র-শক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য অবলম্বন। বীজমন্ত্র জপ না করিলে সহজে মনের দুর্বলতা নাশ এবং মানস-শক্তির বৃদ্ধি করা যায় না।

প্রায়ই দেখা যায় যাহারা মালার ঝুলি লইয়া দিন কাটায় তাহারাই বেশী স্বার্থপর, কুটীল এবং ছল হইয়া থাকে (অবশ্যই সকলে নহে); ইহার কারণ তাহারা বাস্তবিক জপ করে না; তাহারা ছলনার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মালা ঘুরাইয়া চলে এবং দিন পর দিন ছলনাই আয়ত্ত করে। ইহাদিগকে যেন কেহ মন্ত্রযোগী মনে না করেন। এখানে একটী কথা সকলেই লক্ষ্য করিবেন যে যাহারা মালা লইয়া দিন কাটায় তাহারা হীন স্বার্থবুদ্ধির ক্ষেত্র হইলেও কখনও বোকা হয় না।

ধ্বনির তিনটা স্তর। প্রথম ধ্বনির আরম্ভ, ওঁকারে উহাই 'অ' দ্বিতীয়ে ধ্বনির স্থিতি, ওঁকারে উহাই 'উ' তাহার পর ধ্বনির লয়ই ওঁকারের 'ঁ' (ম্)। একটা ঘণ্টাতে আঘাত দাও, পরে ধ্বনিটা ঘণ্টায় আসিয়া কিভাবে লীন হইতেছে উহা বুঝিবার জন্য ঘণ্টাটীকে কানের খুব নিকটে ধরিয়া রাখ, বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনি তাহাতে লীন হইতেছে বুঝিতে পারিবে। ধ্বনি-বিজ্ঞানে প্রণব জপের জন্য অ, উ এবং ম্-কারের উচ্চারণের দিকে নজর দিবার প্রয়োজন হয় না; দিলে সুবিধাও হইবে না। নাদের উত্থান, স্থিতি ও লয় তিনটা অবস্থাকে পরপর লক্ষ্য করিয়া যাইতে হয়। অভিজ্ঞ সাধকের নিকট জানিয়া লইলে ভাল হয়। একটা ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়া ক্রমধারাতে যেরূপ ভাবে স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, প্রণব জপকালে সেই ধ্বনিটি কণ্ঠে বাজিয়া উঠিবে এবং অন্তরলক্ষ্যটি ধীরে ধীরে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুম্না পথ ধরিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে। এখানে 'অ' কারের তিন মাত্রা (অ-অ-অ) - মূলাধারে একমাত্রা, স্বাধিষ্ঠানে একমাত্রা এবং মণিপুরে একমাত্রা। ইহার পর অনাহতে 'উ'কারের তিন মাত্রা (উ-উ-উ) স্থিতি দিয়া বিশুদ্ধাখ্যের উপর সহস্রার পর্য্যন্ত 'ম্' বাজিয়া উঠিবে। 'ম্' কারের মাত্রা ৯ বা যত বেশী হয় ততই ভাল। 'উ' পর্য্যন্ত বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং 'ম্' ধ্বনিটি যেন আপনী আপনী বাজিয়া চলিয়াছে এমনভাবে এই অনুনাসিক ধ্বনিটী করিয়া যাইতে হইবে। এখানে একার, উকার বা ম্কারের প্রশ্ন নাই। ধ্বনির উত্থান, স্থিতি ও

লয়ের অবস্থার সঙ্গে মনকে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে কোন ধ্বনিরই উত্থান অবস্থা 'অ', স্থিতি অবস্থা 'উ' এবং লয় অবস্থা 'ম্‌কার' জানিতে হইবে। ধ্বনি উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই লয়মুখী হইতে থাকে। কাজেই ইহাকে ধ্বনির বাল্য, যুবা ও বৃদ্ধাবস্থা বলিলেই ঠিক হইবে। উত্থানে বাল্যাবস্থা 'অ', যুবাবস্থাই 'উ' এবং লীন অবস্থাই 'ম্‌'। উঠিয়াই ধ্বনিটা একটু পুষ্ট হয়, পরে উহা লীন হইতে আরম্ভ করে। এই পুষ্ট অবস্থাই 'উ'কার। ইহার পর সবটাই লীন অবস্থার অন্তর্গত। 'অ'কার অরুণ বর্ণ, 'উ'কার শুভ্রবর্ণ এবং 'ম্‌'কার স্ফটিকবর্ণ হইবে। 'অ'কারে মনোময় কোষ, 'উ'কারে বিজ্ঞানময় কোষ এবং 'ম্‌'কারে সাধক জ্ঞানের কেন্দ্রে (মহৎতত্ত্বে) যাইয়া উপস্থিত হইবেন। অরুণ বর্ণ, শুভ্রবর্ণ এবং স্ফটিকবর্ণ তিনটা স্তর একই 'ওঁকার' দ্বারা ব্যাপ্ত।

স্পন্দনের উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থা আছে। স্পন্দন মাত্রই ধ্বনি স্বরূপ। ক্রিয়া, স্পন্দন ও ধ্বনি প্রায় একই কথার নামান্তর মাত্র। বহু স্পন্দনের মধ্যে যে সাধারণ উচ্চ নীচ ভাব তাহাই ছন্দঃ। তাল ছন্দকেই অনুগমন করে - একথা শিব-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে; অনুভূতির বিভিন্ন স্তরে স্পন্দনের বিভিন্নতা আছে। একটা দীর্ঘ 'প্রণব' উচ্চারণে যে কত কোটী স্পন্দনের সমাবেশ হয় তাহা সাধারণ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন না। একটা সূর্য্য-রশ্মিতে যে কতকোটী তেজঃকণা খেলিয়া বেড়ায় উহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। স্পন্দনকণাই ধ্বনিস্থিত শক্তি। 'অ'কার স্থিত কণাগুলি অরুণবর্ণ, 'উ'কার স্থিত কণাগুলি শুভ্রবর্ণ এবং 'ম্‌'কার স্থিত কণাগুলি স্ফটিকবর্ণ হইয়া থাকে। 'উ'কার হইতেও 'ম্‌'কারস্থিত শক্তিকণাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। স্পন্দনের উত্থান, স্থিতি ও লয় একই প্রণবে বাজিয়া উঠে। ধ্বনির দিক দিয়া বিচার করিলে 'ওঁ'কারই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। কিন্তু পাঠকগণ একথাও জানিয়া রাখুন যে শুধু প্রণবজপে ধ্বনি-জগতের সূক্ষ্ম-বিভাগ সম্বন্ধে কোন রহস্যই উদ্ঘাটিত হয় না। ইহার কারণ আমাদের অন্তঃকরণ সাধারণতঃ এত জড়ভাবাপন্ন থাকে যে আমরা ইহার সাহায্যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুর উপরই বিচার করিতে পারি না। একটা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনিতে যে কতকোটী স্পন্দন খেলিয়া বেড়ায় তাহা বুঝাইতে হইলে মনের জড়তাকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইবে। সেজন্য মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া বীজমন্ত্র জপ করা প্রয়োজন।

যে কোন যন্ত্রেই আঘাত করিলে ধ্বনির উত্থানে, স্থিতি ও লয়ে 'প্রণব' বাজিয়া উঠে একথা সত্য। কিন্তু ঘণ্টা ধ্বনিতেই ইহার সঠিক বিজ্ঞান ধরা পড়িবে অন্যান্য যন্ত্রে ওরূপ পরীক্ষা করিতে গেলে কিছু গোলমাল আসিবে, তাহাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জানিয়া রাখা প্রয়োজন। সেতার, এস্‌রাজ আদি বহুতার সংযুক্ত যন্ত্রে আঘাত করিলে ক্রীঁ, হ্রীঁ ইত্যাদি ঈকার মধ্যধ্বনির আভাস পাওয়া যাইবে। কারণ সেখানে একটা ধ্বনির কম্পনের আঘাতে এক সঙ্গে বহুতার বাজিয়া উঠে। তান্ত্রিক সাধনার মন্ত্র-শক্তি ঐ বিজ্ঞানেই বেশী শক্তিশালী হয়। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত বহু নাড়ী সংযুক্ত সুষুম্না পথই মন্ত্রযোগের আসল স্থান। ঐ পথে মানুষের কর্ম্মধারা, জ্ঞানধারা, বোধধারা ও ভাবধারা নিয়ত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সাধক ঐ নাড়ীতেই নিজের মন্ত্রকে ধ্বনিত করিবেন; অর্থাৎ ঐ নাড়ীপথ অবলম্বন করিয়া জপ করিবেন। ঐ নাড়ীপথে প্রবেশ করিবার জন্যই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধি করিয়া লইয়া মন্ত্রজপ আরম্ভ করিতে হয়। স্থূল ভূতশুদ্ধির সংক্ষেপ কথা মনের

শূন্য বোধ আয়ত্ত করিয়া লওয়া। সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধির লক্ষ্য হইল বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করা। সাধনার পথে সাধককে ইহারও ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ইহা কোন ক্রিয়াসাপেক্ষ স্তর নহে। অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করা যায় না। মনোময় কোষ ক্ষীণ হইলে বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ হইয়া থাকে। সাধক প্রথমটায় গুরুনির্দ্দিষ্ট ভাবেই জপ আরম্ভ করিবেন, পরে সময় মত সবই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা নিষ্কপট এবং উচ্চ কর্ম্ম ও জ্ঞান লক্ষ্য সমন্বিত সাধক তাঁহারা যদি শক্তিশালী গুরু লাভ করিতে পারেন তবেই বুঝিতে পারিবেন বীজমন্ত্রগুলি কিরূপ শক্তিশালী বস্তু। মানুষের জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও সুখের সন্ধান ঐ বীজমন্ত্রগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। বীজমন্ত্রের জপ অত্যন্ত সুখদ সাধনা। যাহা হউক আমরা ধ্বনি সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। ঢাক, ঢোল আদি বাদ্য যন্ত্রে জোরের সহিত আঘাত করিলে ‘বম্ বম্’ ধ্বনির মত ধ্বনি পাওয়া যাইবে, আবার খুব ধীরে আঘাত করিলে ‘ওঁ’ই বাজিয়া উঠিবে। যন্ত্রটিকে অস্বাভাবিক ভাবে পীড়ন করিবার দরুণ ধ্বনির ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে।

যে কোন যন্ত্রকে যথাযথ বিজ্ঞানে যত বেশী বাজান যায় সেই যন্ত্রের আওয়াজ তত বেশী মধুর হইতে থাকে - অভিজ্ঞ-মাত্রই একথা জানেন। ধ্বনির স্পন্দন আঘাতে সেই যন্ত্রস্থিত জড়-অংশ ক্রমে ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে। মন্ত্র-জপও ঐরূপ ধ্বনির সাধনা। মন্ত্র-জপ দ্বারা সাধকের অন্তঃকরণস্থিত জড়-অংশ ধ্বংস হয় এবং জ্ঞান-অংশ জাগ্রত হইয়া সাধককে শক্তিশালী করে। যিনি যত সুনিপুণ ধ্বনি-সাধক তিনি জ্ঞানের পথে তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে সমর্থ। যিনি যত উন্নত স্তরের মন্ত্রযোগী সাধক তাঁহার কণ্ঠস্বর তত মিষ্ট, স্পষ্ট ও তেজমাখা হইয়া থাকে।

মানুষের মনোজগৎ যে বহুপ্রকার অজ্ঞান এবং নিম্নস্তরের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে একথা মানুষ মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। সমাজস্থিত বহুলোকের চিন্তার প্রভাবে এবং উন্নত লক্ষ্য উন্নত আশা ও উন্নত বিচারের অভাবে আমাদের মন নিম্নস্তরের চিন্তাকণাদ্বারা আবৃত থাকে। মন্ত্র-শক্তি সাহায্যে সে সব জড়তার আশ্রয় চিন্তাকণাগুলি নষ্ট করিয়া দিতে হয়। আবার মন্ত্রশক্তি সঞ্চিত হইয়া নিম্নস্তরের চিন্তাকণার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার শক্তিও আয়ত্ত হয়। বহুলোক মন্ত্রযোগের ভিত্তি ত্যাগ করিয়া শুধু ‘হঠ, লয়’ আদি যোগাঙ্গের অভ্যাস করিতে যাইয়া বহু বৎসরেও জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ তাঁহাদের অন্তঃকরণস্থিত জড়-অংশ এতই প্রবল যে উহা তাঁহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। আবার শুধু মন্ত্রযোগ অবলম্বনেও উন্নত জ্ঞানের স্তরে প্রতিষ্ঠালাভ সহজ নহে। মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের মিশ্র সাধনার অভ্যাস করা প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্র যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত করিয়া তাল ও সুরের সাধনা দ্বারা দিন পর দিন মধুর ধ্বনির ক্ষেত্র হইতে থাকে ঠিক সেইরূপ মানুষের অন্তঃকরণও মন্ত্রজপ দ্বারা দিন পর দিন নির্ম্মল হইতে থাকে। শক্তিশালী গুরুর (হঠ, লয় ও রাজমিশ্র মন্ত্রযোগীর) সঙ্গ পাইলে সাধক মাত্রই ৪/৫ দিনের মধ্যেই মন্ত্র ও গুরুশক্তির প্রভাবে নূতন জীবনের সন্ধান পাইবেন, শক্তিশালী গুরুর স্পষ্ট অর্থ - ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারস্থিত সাধক মহাপুরুষ। গুরু যাঁহাদের ঐরূপ নহেন তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া ২/৩

বৎসর মন্ত্রযোগের অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন। মন্ত্রযোগের অভ্যাসের সঙ্গে বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়ামের (ও মুদ্রার) অবলম্বন থাকিলে ভাল হয়।

যাঁহারা ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা মন্ত্র প্রভাবে জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া বিষয় ও ভোগের উপকরণ সহজে লাভ করিবার জন্য অসীম বুদ্ধি-শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিবেন। মন্ত্রযোগ দ্বারা মনের জড়-অংশ নষ্ট হয়, কাজেই ইহাতে সাধকের বুদ্ধি-শক্তি খুবই তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া মোহ এবং ভোগবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহেন তাঁহারা মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে অসীম কুটীল বুদ্ধি আয়ত্ত করিয়া অন্যকে দিয়া নিজেদের মতলব সিদ্ধির বহুপথ উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন। বুদ্ধিমান লোক বুঝিবেন সব, কিন্তু বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি খুব কম লোকেরই হইবে। যাঁহারা সমাজের উপর ধর্ম্মের নামে বংশ পরম্পরায় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মন্ত্রযোগী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। মন্ত্রযোগের অবলম্বন করিয়া যাঁহারা মনোময় কোষের পর পারে স্থিত হইতে চাহেন না তাঁহারা অত্যন্ত কুটীল বুদ্ধির ক্ষেত্র হইয়া থাকেন। ইঁহারা মন্ত্র-শক্তিটাকে নিজেদের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য এবং অন্যের মানসিক দুর্ব্বলতাকে আয়ত্ত করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। বংশপরম্পরায় ইঁহাদের কুৎসিত মনোবৃত্তি প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। সিদ্ধবংশ, গুরুবংশ এবং সাধকবংশ বলিয়া ইঁহারা আপনাদিগকে প্রচার করিয়া চলেন এবং সমাজকে সংস্কারগণ্ডী-বদ্ধ করিয়া রাখিয়া ধর্ম্মের নামে ছলনা ও উপার্জ্জন বজায় রাখেন। ইঁহাদের কাজের দুইটা দিক আছে। একেত নিজেদের উপার্জ্জন ও বংশমর্য্যাদাকে নিতান্ত নির্লজ্জের মত কায়েম রাখা, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে অন্ধ-সংস্কারবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ধর্ম্মের নামে অর্থ দিতে বাধ্য করা। ইহা বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মনোবৃত্তিরই লক্ষণ। সুতরাং ইঁহাদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইলেও ইহাদের লোপ হওয়া খুবই অসম্ভব!

ধর্ম্মের নামে সঙ্ঘ স্থাপনা করিয়া যাঁহারা গুরুগিরি করেন তাঁহারাও খুব বিষ্ণুচক্র চালাইতে জানেন। ইঁহারা সাধনার ধারও ধারেন না। ইঁহারা কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত্র খুব জাঁকাল করিয়া দাঁড় করান এবং মানুষকে সেই মহাপুরুষের জীবনকথার মধ্যে ফেলিয়া নিজেদের কথার হেরফের ধর্ম্মকে মানাইতে বাধ্য করান। যাঁহারা উন্নত বিকাশ চাহেন তাঁহারা যে কোন ধর্ম্মের আদি পুরুষ যে মানুষ, তাঁহারা যে স্বয়ং নিষ্কলঙ্ক নির্ভুল ভগবান নহেন একথা প্রথমে বুঝিয়া রাখিবেন।

সাধক দশায় সাধকমাত্রই সেতু-প্রণব (ওঁ) অবলম্বনসহ গুরুনির্দ্দিষ্ট বীজমন্ত্র (ক্রীঁ, হ্রীঁ ইত্যাদি) জপ করিবেন। ক্রমে সাধক শক্তিশালী হইতে হইতে জ্ঞানের চরমে (মহৎ-তত্ত্বে) পৌঁছলে তখন তাঁহার বীজমন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন কমিয়া যায়। এসময় 'ওঁ'কার জপ করিলেই যথেষ্ট। প্রথমাবধি সেতুপ্রণব অবলম্বন দ্বারা সাধক শান্তি পাইতে পারেন একথা সত্য, কিন্তু অজ্ঞানতার গ্রন্থিগুলি শিথিল করিবার জন্য যেরূপ শক্তির প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। সেতু-প্রণব খুবই স্নিগ্ধ শক্তিসমন্বিত মন্ত্র। অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি সেইরূপ নহে। সেতু-প্রণবে তেজ (ঋ) এবং ত্যাগের (ঈ) অংশ না থাকিবার দরুণ ইহাদ্বারা বিকাশের পথ সহজ হয় না। বিকাশের পথে ত্যাগ এবং তেজস্বিতার খুব প্রয়োজন।

অ, ই, উ প্রভৃতি ধ্বনিগুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ কেন্দ্র সম্বন্ধ রাখে, কোন্ ধ্বনিতে কোন্ কেন্দ্র শক্তিশালী হয় এবং কোন্ ধ্বনিতে কিরূপ শক্তির আবেশ হয় তাহা পাঠকবর্গের জানা প্রয়োজন। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র-চিত্রে পাঠক ধ্বনি-শক্তির কেন্দ্র মিলাইয়া লউন।

১ চিহ্নিত কেন্দ্র - ঋ

২ চিহ্নিত কেন্দ্র - অ

৩ চিহ্নিত কেন্দ্র - ও

৪ চিহ্নিত কেন্দ্র - উ

৫ চিহ্নিত কেন্দ্র - ং

৬ চিহ্নিত কেন্দ্র - ঃ

৭ চিহ্নিত কেন্দ্র - ই

৮ চিহ্নিত রেখা - মেরুদণ্ডের মধ্যপথ ধরিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,
ইহা কোন কেন্দ্রস্থান নহে।

৯ চিহ্নিত কেন্দ্র — ৯

১0 চিহ্নিত অংশ রেখামাত্র। ইহা কোন কেন্দ্রস্থান নহে। ইহা শক্তি-স্তর; এই স্তরটীই সমস্ত শক্তির মূলস্থান। এই স্তরের প্রত্যেকটী শক্তিকণাতে অ, ই, উ, ঋ, ৯, ং এবং ঃ শক্তির বিকাশ আছে। এই রেখাস্তরই শক্তি-স্তর। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমাদের আত্মবুদ্ধি এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। এই স্তরে যাঁহাদের আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারাই গীতাবর্ণিত ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন। এই স্তরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা মন্ত্র-শক্তি অংশে সংক্ষেপে বলা হইবে।

সাধক এবং কর্ম্মীগণ পূর্ণ-শক্তির স্তরে আত্মবুদ্ধি স্থাপনার কথা শুনিয়া ভীত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদের মত উন্নত চরিত্র এবং কর্ম্ম শক্তি আয়ত্ত করিতে হইবে, একথা ভাবিতে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রচলিত বৈষ্ণববাদ বা ভাববাদের অনুকূলে খুব বড় পাকা ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এবং বিকাশক্ষেত্রে তাঁহারা কোনযুগেই সূর্য্যস্তরের উপরে দাঁড়াইতে পারিবেন না। যাঁহারা এরূপ ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তি পোষণ করেন তাঁহারা কর্মক্ষেত্র হইতে বিশেষ দূরে অবস্থান করিবেন, কারণ কর্মক্ষেত্র ও ভাবক্ষেত্র এক নহে। ভাবক্ষেত্র সূর্য্যস্তর এবং কর্মক্ষেত্র শক্তিস্তর; দুইএ অনেক ভেদ। ক্রম-বিকাশের প্রগতির পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন তাঁহারা একাধারে কর্ম্মী এবং সাধক হইয়া চলিবেন। নিম্নস্তরের আবরণে মোহ না থাকিলে মানুষমাত্রই নিজ কর্মলক্ষ্যকে শক্তি-স্তরে দাঁড় করাইতে পারিবেন। আমাদের কথা - একজন মানুষের চরিত্রে যে সব লক্ষণ ফুটিতে পারে উহা মানুষমাত্রেরই স্বভাবে ফুটা অসম্ভব নহে। কারণ পূর্ণ-স্তরে মানুষমাত্রেরই চরিত্রের মূল উপাদান একই প্রকারের। পূর্ণ-স্তর প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সব সময়ই বিদ্যমান।

ক্রম-বিকাশের পথকে সকল মানুষের নিকট সহজ করিয়া দিবার জন্য আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইবে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগকে শক্তিস্তরের আদর্শে স্থাপন করিবার চেষ্টা করা। ইহা যদি কোন দিন সম্ভব হয় তবে এই পৃথিবী হইতে দুঃখ, দৈন্য ও

অশান্তির বেশীর ভাগ কারণগুলি উঠিয়া যাইবে। যাঁহারা শক্তি-স্তরে দাঁড়াইতে চাহেন তাঁহাদের জীবনের কর্মলক্ষ্য হইবে কেন্দ্রীয় বিভাগকে শক্তি-স্তরের আদর্শে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম-শক্তি নিয়োজিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনার ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া। এই পৃথিবীর কোন কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে শক্তি-স্তরের প্রতিষ্ঠা হউক চাই না-ই হউক, যিনি ওরূপ লক্ষ্য লইয়া সাধনা এবং কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন তাঁহার বিকাশ পূর্ণস্তরের দিকে খুব শীঘ্রই অগ্রসর হইতে থাকিবে। তিনি দিন পর দিন ভোগ, মোহ এবং অভিমানজনিত অজ্ঞানতা ও যাবতীয় দুঃখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। অনেকেই জানেন প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে তাঁহার বংশধরগণ পরস্পরে বিবাদ করিয়া একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই মোহসম্বন্ধযুক্ত ক্ষতির কথা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটুও শোকাকুল হন নাই। প্রকৃতির লীলারহস্য তিনি এমনই ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনের সমস্তগুলি কার্যক্ষেত্রেই যথোচিত বুদ্ধি ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন চরিত্রে মোহ এবং অভিমান জনিত কোনরূপ অজ্ঞানতার ছাপ কখনও পড়ে নাই। জীব-জগতে প্রকৃতি যেমন খেলিয়া চলিয়াছেন সেই খেলা তিনি প্রকৃতিকে অবাধে খেলিতে দিয়াছিলেন। প্রকৃতির এই লীলাবৈচিত্র্য তিনি এমনই অকাট্য-বিজ্ঞানে বুঝাইয়াছিলেন যে পূর্ণ বিকাশের আদর্শে কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ব্যতীত কোনই অজ্ঞানাচরণ তাঁহার জীবনে স্থান পায় নাই। যিনি জীবন-লক্ষ্য ওরূপ নিখুঁত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি শক্তি-স্তরের আদর্শে ঢালিয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম ও সাধনা অবলম্বন করিবেন।

বর্ত্তমান সময় কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের অত্যন্ত ভ্রান্তধারণা আছে। যাহারা আসুরিক প্রকৃতির মানুষ এবং যাহারা খুব হীন-স্তরের স্বার্থপর তাহারা মানুষের সামনে এমন নীতিকে ‘কর্ত্তব্যজ্ঞান’ নামে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে যাহাতে তাহাদের নিজেদের আসুরিকতা এবং স্বার্থটী বরাবর কায়েম থাকে। যেখানে কর্ম্মলক্ষ্য মানুষের বিকাশকে পূর্ণতার পথে বাধা দিবার জন্য এবং কোন মুষ্টিমেয় অসুরের সুবিধার জন্য রচিত হয় সেই কর্মের দায়িত্বকে পালন করিবার চেষ্টাকে কেহ যেন ‘কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা’ বলিয়া মনে না করেন। এরূপ কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে প্রকৃত কর্ম্ম-নিষ্ঠা বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল বুঝা হইবে। কারণ আসুরিক শক্তি যেখানে কেন্দ্রীয় শাসনকে আয়ত্ত করে সেখানে তাহারা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাতে স্বার্থপরদের ভোগলক্ষ্য মাত্র পরিপুষ্ট থাকে এবং সেই কারণ মানুষ-মাত্রেরই বিকাশ-পথ রুদ্ধ হয়। প্রচুর অর্থবিনিময়ে উহারা মানুষের প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ক্রয় করিয়া লয় এবং উহাদের দ্বারা পৃথিবীর অমঙ্গলের পথ স্থির রাখিয়া চলে। যে কোন প্রকারে নিজের ও সমাজের আত্ম-বিকাশ প্রতিকূল আচরণই অকর্ত্তব্য এবং যে কোন উপায়ে নিজের ও সমাজের বিকাশ অনুকূল কর্মই কর্তব্য এবং দায়িত্ববুদ্ধির পরিচায়ক। যিনি যত পূর্ণ-বিকাশের পথে অগ্রসর হইবেন তাঁহার কর্মনিষ্ঠা এই বিজ্ঞানেই ক্রমে উন্নত স্তরের ভিত্তিতে স্থাপিত হইতে থাকিবে। যিনি যে কোন ক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন সকলেরই কর্ত্তব্য হইবে সমাজের বিকাশানুকূল সুবিধাকে যথাযথ সময়ে কাজে লাগাইয়া যাওয়া। যখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-শক্তি বিকাশ-বিরুদ্ধ মতবাদীদের অধীনে থাকে তখন ঐ আদর্শ মানিয়া লইয়াই কর্ম-কেন্দ্র আয়ত্ত করিতে হয় এবং সুবিধামত উহার দ্বারাই বিকাশে সাহায্য

করিতে হয়। যাহারা আসুরিক ভাবাশ্রিত মানুষ তাহারা যে কোন সুবিধাই আসুরিকতাকে স্থায়ী করিবার জন্য নিয়োজিত করে। আবার যাঁহারা বিকাশ-বাদী তাঁহারাও যে কোন সুবিধাকেই বিকাশের সুবিধার জন্য নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত থাকেন।

শক্তি-স্তর এবং পূর্ণ ঈশ্বরত্বের স্তর একই স্তরকে জানিতে হইবে। মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ রেখা-স্তরকেই অবলম্বন করিয়া শক্তি-স্তর অবস্থিত। এই স্তরের কর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই স্তরের আদর্শে সমস্ত প্রকার রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করাই মানুষের কর্ম-লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই নিষ্কাম-কর্ম্ম। এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেই আমরা প্রকৃত পৃথিবীর মঙ্গল করিতে পারিব। অন্য কোনও লক্ষ্যে কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলে অকারণ শক্তিক্ষয় হইবে বা দুর্জ্জনকে পালন করা হইবে।

এদিকে বহুশত বৎসর কর্মক্ষেত্রে এই চালাকি চলিয়াছে। ভারতের বক্ষে এই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রাচীন মহর্ষি এবং রাজর্ষি কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণগণ এই নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ জড়িত করিয়া দিয়া ইহার ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। রাজাগণও উহা পালন করিতে যাইয়া পরে নিজেদের পতন আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের পতনের মূলে এই নিষ্কাম কর্ম-লক্ষ্যে ভুলই প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণগণ 'গো-ব্রাহ্মণ-হিতায়'ই 'জগদ্ধিতায়' অর্থাৎ গো এবং ব্রাহ্মণের হিতই নিষ্কাম কর্ম বা জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্ম এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থে 'সমাজের জ্ঞান-শক্তি' এবং গো ঐ জ্ঞান-শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য দুগ্ধদাতা জীব। ক্রমে ইহার আসল অর্থ ভুলিয়া গিয়া একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন অদূরদর্শী মূর্খলোকের পোষণ অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইতে লাগিল; কাজেই প্রকৃত জ্ঞানীর অভাবে সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ভারতের ঋষি মানুষের জীবন ধারণের জন্য অন্ন এবং গো-দুগ্ধের প্রাচুর্য্যের কথাই ভাবিয়াছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি এবং জ্ঞান-শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা গো-দুগ্ধ এবং অন্নের ব্যবস্থাই চরম ব্যবস্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞান-শক্তিই মানুষের কর্ণধার, জ্ঞান-শক্তিই মানুষকে পরিচালনা করিবে। এই জ্ঞান-শক্তিতে শক্তিমান মানুষই ব্রাহ্মণ। এই জ্ঞান-শক্তি অর্থে উন্নত শিব-স্তরে প্রতিষ্ঠিত ভোগ, মোহ এবং অভিমানহীন মহাপুরুষ। ইঁহারা কখনও অর্থ এবং সম্মান লোভে কাহারও খোসামোদ করিয়া দিন কাটান না। যাহা হউক প্রত্যেক লোক যাহাতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পারে এবং প্রত্যেক লোক যাহাতে পেট ভরিয়া অন্ন পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশেই যে স্থির রাখিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থাই স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। ইহারই নাম 'গো-ব্রাহ্মণ-হিতায়'। একজন সাধারণ মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ এবং রাজচক্রবর্ত্তী সকলের কর্ম্ম ও জ্ঞান-শক্তি পুষ্টির সমস্ত উপাদান এই গো-দুগ্ধ এবং অন্নের মধ্যে বিদ্যমান্। আজ গোরক্ষার নামে কতকগুলি কঙ্কালসার বৃদ্ধ গরুর পোষণের নামই 'গো-রক্ষা' হইয়াছে এবং একদল স্বার্থপর, ভোগবদ্ধ, পরশ্রীকাতর হীনবীর্য্য মিথ্যাভাষী মানুষকে পুরোহিত এবং গুরুরূপে পালন করাই 'ব্রাহ্মণ-রক্ষা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোহান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্নগণ এখনও সমাজ ও দেশরক্ষা ব্যাপারে কোন উপযুক্ত পরামর্শ চাহিলে

সতীযুগের ছেঁড়া পুঁথীর পাতা খুলিয়া বিচার করিতে লাগিয়া যান! যাহা হউক ভারতের পতনের ইতিহাসমূলে অন্ধ সংস্কার যে কত কাজ দিয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠে সকলেই জানেন। কর্ত্তব্যের মাপযন্ত্র যে কি চালাকির মধ্যে কোথায় আনিয়া ফেলা হইয়াছিল ইহা বুঝিবার মত জ্ঞানীও একজন ছিলেন না। ভারত এইভাবেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

পরে 'জগদ্ধিতায়' অর্থে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা পাশ্চাত্য অঞ্চলে আসিয়াছিল। সেই স্থযোগে ধনীরা কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যবস্থাটা নিজেদের হাতে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। যুবকদিগকে সহজেই কোন মতবাদে নাচাইয়া দেওয়া যায়। তাহাদের সামনে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের নামে স্বদেশপ্রেমের আদর্শ দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহাদেরই রক্তে যে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিকবাদে পরিণত হইয়াছে। একটা রাক্ষসী শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়া সমস্ত ইউরোপ আজ যে কী ভীষণ অত্যাচারী জাতির লীলা-নিকেতন হইয়া রহিয়াছে ইহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। ইহারা সমস্ত পৃথিবীকে শোষণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে একেবারে শ্রীহীন ও স্বাস্থ্যহীন করিয়া দিয়া নিজেদের ভোগের ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া বসিয়া আছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে নবীন যুবকদের কর্ম্মকুশলতায় ইহার বীজ বপন করা হইয়াছিল। আর আজই ইহার বিষ-ক্রিয়ায় সমস্ত পৃথিবী জর্জ্জরিত। ইহার চেয়ে রাজশাসনের যুগ অনেক স্থখের ছিল; তাহাতে মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে ত পাইত! সমস্ত দিন কলকারখানায় যে মজুরী করিতে পারে সে তবুও একপেট খায়, আর বাকীগুলি বেকারের দলে নাম লেখাইয়া লইয়াছে। বর্তমান যুগের শিক্ষিতগণ ইহাকেই নাকি আবার সভ্যতা বলেন! ইহাও যদি সভ্যতা হয় তবে বর্ব্বরতা কাহাকে বলে?

এখন আবার কমিউনিজম্ (মজুর তন্ত্রবাদ) এর নামে নিষ্কাম কর্ম্মের হাওয়া উঠিয়াছে। ইহা যদিও ধন-তন্ত্র-বাদ হইতে উদার, কিন্তু ইহারও ফল অত্যন্ত বিষময় হইবে। ভারতের বক্ষে এই মতবাদ অত্যন্ত সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। ভারতের মুসলমান জনসাধারণ বেশীরভাগই নিম্নস্তরের শিব কেন্দ্র-পুষ্ট-মানব, শিব-কেন্দ্র-মানব স্বভাবতঃ ধর্মভীরু হইলেও স্বাধীনভাবে বিচার করিবার শক্তি ইহাদের মোটেই থাকে না, তাই সহজে ইহাদিগকে সামনে রাখিয়া স্বার্থবাদিগণ নিজেদের স্বার্থের স্থবিধা করিতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা দু'পাতা পড়িয়া কিছু শিক্ষালাভ করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বার্থের পেছনে পেছনে দৌড়াইতে থাকেন, অর্থাৎ বিষ্ণুকেন্দ্র আয়ত্ত করিয়া লন। গণেশকেন্দ্র-পুষ্ট মুসলমান আমাদের চক্ষে আজ পর্য্যন্ত একজনও পড়ে নাই। সূর্য্য কেন্দ্রপুষ্ট মুসলমান অবশ্যই দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারাও শেষকালে বিষ্ণুকেন্দ্র আয়ত্ত করেন। নিরক্ষর গরীব মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিজেদের সম্প্রদায়ের হাতে। মস্‌জিদের মধ্য দিয়াই উহা সকলে পাইয়া থাকেন। ধর্ম্ম-কথার মধ্য দিয়া গরীবদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের স্বার্থের স্থবিধা হয় মাত্র। তাঁহারা গরীবদের কোন স্থখস্থবিধার কথাই ভাবেন না। কাউন্সিলের পদগুলি আদায় করিলে বা চাকুরীকে ভাগ করিয়া লইলে সাধারণ গরীবদের কি লাভ হয়? সাধারণ গরীবদের জন্য সহজে অন্ন এবং বস্ত্রের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ঐ জন্য কেন্দ্রীয় শাসনে শক্তিস্তরের আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা হওয়া দরকার। কিন্তু সে দিকে কোন শিক্ষিতদেরই নজর নাই।

দেশের এবং সমাজের স্বার্থকে বলিদান করিয়া তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের প্রতিষ্ঠা কায়েম করেন এবং গরীব মুসলমানদের বুঝাইয়া দেন যে দেখ, কাউন্সিলের পদ ও চাকরী ভাগ করিয়া মুসলমানদের কত সুবিধা করিলাম। সুবিধাত নিজেদের। সেরূপ গণেশকেন্দ্র-পুষ্ট ত্যাগী মুসলমান কোথায় যে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য যেরূপ কর্ম্মশক্তি আয়ত্ত করা প্রয়োজন তাহা করিবেন? ত্যাগের অভাবে শিক্ষিত মুসলমানগণ অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকবাদী হইয়া চলিয়াছেন। এমন অবস্থায় বিদ্বেষভাবের ভিত্তিতে সংগঠন অত্যন্ত মারাত্মক হইবে। ধনী-বিদ্বেষের উপরেই কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ধনীরাই বা কি অন্যায় করিয়াছেন? দোষ থাকলে কেন্দ্রীয় শাসনে আছে। কাজেই ভারতে ইহা দ্বারা কাজের কাজ কিছুই হইবে না। যুবকরা এই সব অশিক্ষিতদিগকে বিদ্বেষ ভিত্তিতে উত্তেজিত করিয়া দিলে উহার ফল ভাল হইবে না। শিক্ষিত মুসলমানগণ শিখাইবেন ধনী অর্থে হিন্দু ইহারা তখন তাহাই বুঝিবে। গণেশ-কেন্দ্রের পুষ্টি যেখানে হয় না সেখানে স্বার্থ-লক্ষ্য-পুষ্ট বিষ্ণু-স্তরের একচাটিয়া অধিকার খর্ব্ব করা যায় না। গণেশ-স্তরের আদর্শ যাহারা ধরিতে পারে না তাহারা কমিউনিজম বুঝিতে পারিবে না। কিছুদিন বাদ হিন্দু ধনীদের তিষ্ঠিয়া থাকা দায় হইবে। আমরা স্বার্থভিত্তিতে ধনীবিদ্বেষ আন্দোলনের বিরোধী। মানুষের ক্রমবিকাশের স্তরগুলিকে বেশ মনোযোগের সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর। শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন বস্ত্র প্রয়োজন মত সকলের জন্য ব্যবস্থা করিবার উপায় উদ্ভাবন কর। শিক্ষা দ্বারা, দীক্ষাদ্বারা এবং শাসন দ্বারা আসুরিক ভাব-দুষ্ট বিষ্ণুকেন্দ্র-পুষ্ট মনোবৃত্তিকে মাত্র নিয়মিত রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই পৃথিবীর স্বাভাবিক বিকাশ পথ সহজ হইবে। কেন্দ্রীয় শাসনে শক্তিস্তর ফুটাইয়া তোল, আসুরিক ভাবদুষ্ট বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ যাহাতে কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্রে বসিতে না পারে সে চেষ্টা সর্ব্বদা স্থির রাখিতে হইবে। শাসনযন্ত্রের যে কোন স্থানে যিনি বসিবেন তাঁহাকে প্রথম শপথ করিতে হইবে যে তিনি শক্তিস্তরের আদর্শ গ্রহণ করিলেন। এই জগৎ-মঙ্গলকর কর্ম্মে তিনি মোহ এবং অভিমান শূন্য থাকিবেন। কোনস্থানে তিনি যদি ঐ নীতির অপলাপ করেন তবে তাঁহাকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। ভোটের জোরেই কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্রে নিযুক্ত হউন বা অন্য কোন প্রকারেই শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হউক উহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আদর্শের ও কর্ত্তব্যের অপলাপ করিলে তাহার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে। পৃথিবীর সমস্ত প্রকার অশান্তির জন্য প্রথম দায়ী কেন্দ্রীয় শাসন। নিষ্কাম কর্মের নামে ও কর্তব্যের নামে যদি কেহ ভুল বুঝেন তবে ইহার ফলে মানুষের সর্ব্বনাশ হইবে। কেন্দ্রীয় শাসনে শক্তিস্তর ফুটাইয়া তোলা এবং নিজের চরিত্রে শক্তিস্তর প্রতিষ্ঠিত করা, ইহা ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না। ইতিহাসের প্রগতিতে শেষকালে মানুষের সমাজে কমিউনিজম্ আসিয়া দাঁড়াইবে ইত্যাদি কথায় নাচানাচি করার পূর্ব্বে মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সব কথার আলোচনা হইয়া গিয়াছে সে সব কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখ। মানুষের সমাজে যুগ যুগান্তর ধরিয়া এরূপ বিকাশ ক্রম-বিদ্যমান আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং নিম্নস্তরের শিব সকল দেশেই সমান ভাবে রহিয়াছে। উন্নত স্তরের শিবের বিকাশ ভারত ভিন্ন অন্য কোথাও প্রায় হয় নাই, এই জন্যই কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে ভারতের বক্ষেই শক্তিস্তরের বিকাশ স্থান পাইয়াছিল। ঋষির স্থানে ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য হইয়া উহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন আবার যাহাতে ঐ

স্তরে দাঁড়াইতে পার সেই চেষ্টা করাই প্রয়োজন। বাহির দেখিয়া যতই আঁটাসাঁটা কর না কেন কিছুই ফল হইবে না। মানুষের মনের উপাদান বুঝিতে চেষ্টা কর। বাহিরের সাজ সজ্জাতে কোনই দোষ বা গুণ নাই। সব গোলমাল মানুষের মনের মধ্যে। কেন্দ্রীয় শাসন চিরযুগ থাকিবে। ধর্ম্মও মানুষে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। সমাজ, শিক্ষা, বিচার বিভাগ কোনটাই উঠিয়া যাইবে না। সকলকে নিজ নিজ স্তরে ঠিক আদর্শ লইয়া দাঁড়াইতে হইবে। যিনি ত্রুটি করিবেন তিনি দণ্ডভোগ করিবেন। কেন্দ্রীয় উপাদানে শক্তিস্তর না থাকিয়া যদি আন্তরিকতা বিদ্যমান থাকে তবে উহার ফল চিরদিনই সমাজ-বিকাশের বিরোধী হইবে। বর্ত্তমান সময় প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই কেন্দ্রীয়-শাসন অর্থনৈতিক শোষণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহাকে শক্তিস্তরের আদর্শে দাঁড় করাইবার জন্য শোষিত ও পীড়িতগণ অর্থ নীতিকে ভিত্তি করিয়া কর্ম্মের বিজ্ঞান (প্রোগ্রাম) প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াও, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। নিষ্কাম কর্ম করিতে যাইয়া, বিকাশের পথে নিষ্কাম কণ্ট ক যদি প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাও তবে শক্তিস্তর বুঝিতে পারিবে না। বিকাশের শেষ লক্ষ্যও ব্যর্থ হইবে।

আমরা ধ্বনি ও মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। এখন আবার আমাদের মূল বিষয়ে প্রবেশ করিব। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ং, ঃ এই সাতটী ধ্বনিই মূল ধ্বনি। এই সাতটীর এক একটীতে এক এক প্রকারের শক্তি নিহিত আছে। এই সাতটী শক্তি যখন একই শক্তিকণায় পরিণত হয় তখনই ইহারা একই মূলশক্তি, হইয়া থাকে। শক্তিস্তরের একটী কণাতেই এই ৭টী শক্তির সংস্থান আছে। মস্তিষ্কের এক একটী কেন্দ্র হইতে এক এক প্রকার শক্তিকণা বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদের শরীর অন্তঃকরণ, বিজ্ঞান ও জ্ঞানক্ষেত্রের কার্যকলাপ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে 'অ'কার সূর্য্যকেন্দ্র। জপকালে ইহার শক্তিকণাগুলি মস্তিষ্কের ২ চিহ্নিত কেন্দ্রে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার কণাগুলি অরুণ বর্ণ এবং স্নেহ-বর্দ্ধক, ইহার দ্বারা সাধকের স্মৃতি ও মেধা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এই কণাগুলি সাধককে খুব মধুর চরিত্রে বিভূষিত করে। এই শক্তিগুলি খুব কোমলতার আধার।

'ই'কার গণেশ কেন্দ্র। জপকালে ইহার শক্তিকণাগুলি ৭ চিহ্নিত কেন্দ্রে সঞ্চিত হয়। এই ধ্বনিস্থিত শক্তিকণাগুলি ধূম্রবর্ণ বিশিষ্ট। ইহা ত্যাগ-শক্তিদায়িনী শক্তিকণা। এই কণাগুলি সাধককে একটু রুক্ষ ও দৃঢ় করে। বিবেক-শক্তি এই কণা হইতেই আসিয়া থাকে। সাধকের অন্তঃকরণকে এই কণাশক্তিই উন্নত ও বিকশিত করে। ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নাশক শক্তিকণা। ইহা সাধককে একটু গম্ভীরও করে; এই কণাশক্তি সাধকের বিবেককে সঞ্জীবিত রাখে।

'উ'কার শিব-কেন্দ্র। জপকালে এই শক্তিকণাগুলি মস্তিষ্কে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রে জমা হইতে থাকে। ইহারা শান্তির আধার। ইহারা শুভ্রবর্ণ শক্তিকণা। চন্দ্র জ্যোতির মধ্য হইতে যেমন শীতল শান্তিকণা ক্ষরিত হয় ইহার কণাগুলি ঠিক সেইরূপ স্নিগ্ধ। এই শক্তিকণা সাধকে স্থৈর্য্য শক্তি দান করে। এই শক্তির প্রভাব পাইলেই সাধকের চিত্ত স্থির ও শান্ত হয়। এই কণা-শক্তি সাধককে অচঞ্চল করিয়া রাখে। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিবর্দ্ধক

শক্তিকণা। মনের কর্ম্মহেতু ক্ষয় এই কেন্দ্র হইতেই পূর্ণ হয়। এই শক্তিকণাগুলি সাধকের মনকে সুস্থ রাখে। ইহা সাধককে খুব সরল ও নিরুদ্বেগ করে।

'ঋ'কার কর্ম্ম-কেন্দ্র। জপকালে এই কণাশক্তিগুলি ১ চিহ্নিত কেন্দ্রে জমা হইতে থাকে। ইহা অগ্নিবর্ণ কণা। ইহা তেজঃকণা জানিতে হইবে। ইহা হইতে কর্ম-শক্তি আসিয়া থাকে। ইহা ধ্বংসকারিণী শক্তি। যজ্ঞাদিতে 'স্বাহা' মন্ত্রে এই শক্তিকেই আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে। এই শক্তি আমাদের শরীরকে শীঘ্র ক্ষয় করিয়া দেয়। অন্তঃকরণের শক্তিকে রক্ষা করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করিতে জানেন না তাঁহাদের শরীর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই তেজঃকণাকে রক্ষা করিয়া কাজ করিতে না পারিলে কর্ম্মের সফলতা অসম্ভব। ক্রোধকালে এবং তেজোদ্দীপন সময়ে এই কেন্দ্র হইতে তেজঃকণা বিপুলভাবে চলিয়া আসিয়া আমাদের মুখে, চক্ষে এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

'৯'কার প্রাণ-শক্তি। ইহার কণাগুলি ৯ চিহ্নিত কেন্দ্রে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা জীবনী-শক্তিবর্দ্ধক শক্তিকণা। এই শক্তিকণা শরীরকে সুস্থ রাখে। এই শক্তিকণাগুলি আমাদের শরীরকে বহন করিয়া বেড়ায়। ইহা পীতবর্ণ শক্তিকণা।

'ং'কার জ্ঞানশক্তি। জপকালে ইহার শক্তিকণাগুলি মস্তিষ্কের ৫ চিহ্নিত স্থানে জমা হইতে থাকে। ইহা শ্বেত বা স্ফটিক বর্ণ শক্তি কণা। সমস্তগুলি ধ্বনি এই শক্তিতেই বিদ্যমান। ইহা অত্যন্ত জমাট কণা।

'ঃ' অব্যক্ত শক্তি। এই শক্তিকণাগুলি কৃষ্ণবর্ণ। জপকালে এই কণাগুলি মস্তিষ্কের ৬ চিহ্নিত কেন্দ্রে জমা হইতে থাকে। ইহা অনন্ত শক্তি। পুরুষকার বলিতে এই শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। এই শক্তিকণাগুলি সাধককে কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি প্রদান করে। (কেহ যেন মনে করেন না কর্তৃত্ব করিবার শক্তি যখন ইহা প্রদান করে তখন ইহা সাধকের 'অহং' ভাব বর্দ্ধন করিবে। ইহা মোটেই ওরূপ বস্তু নহে। কর্ম্ম-শক্তিকে যিনি যত অনহং ভাবে স্থিত হইয়া কাজে লাগাইতে পারেন তিনি তত উন্নত-স্তরের কর্ম্মী হইয়া থাকেন।)

মন্ত্র জপকালে মন্ত্রস্থিত বিভিন্ন অংশ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে শক্তিশালী করে। জপের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রগুলিতে শক্তি জমিতে থাকে। সাধক সেই শক্তিগুলি বেশ অন্তরস্থ হইয়া ভোগ করিতেও থাকেন। সে সময় সাধকের খুব আরাম বোধ হইতে থাকে। মন্ত্রের যে শক্তি আছে এবং মন্ত্র-শক্তি যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে জমিয়া সাধককে শক্তিশালী করিতে থাকে ইহা কেবল কথারই কথা নহে। জপের পর বা কিছুক্ষণ জপ করিবার পরই প্রত্যেক সাধক ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। তাহার মস্তিষ্কে এবং শরীরে সে শক্তি-প্রবাহ ব্যাপ্ত হইতে থাকে। তাহাতে তাহার খুব আনন্দ এবং শান্তিবোধ হইতে থাকিবে। শক্তিপ্রবাহ যত ঘন আকারে আসিতে থাকিবে শরীর ও মন ততই হাল্কা বোধ হইতে থাকিবে। জপের পর সাধারণ লোকও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে ইনি বেশী গম্ভীর, নিশ্চিন্ত, শান্ত ও প্রেমী। সাধক যদি কর্ম্মী হন তবে তাঁহাকে বেশী তেজস্বী, শক্তিশালী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান মনে হইবে। জপকালে যাঁহাদের অন্তরে শক্তি জমে না তাঁহাদের জপ ঠিক বিজ্ঞানে হইতেছে না বুঝিতে হইবে। যাঁহারা জপকালে মন্ত্রশক্তির প্রভাব নিজেরা বুঝিতে পারেন না তাঁহাদেরও জপ ঠিক

বৈজ্ঞানিক ভাবে হইতেছে না বুঝিতে হইবে। তাঁহারা কিছুদিন জলাশয় বা নদীতটে জলের খুব নিকটে বসিয়া জপ করিবেন। স্নানান্তে জপ করিলেও ফল খুব ভাল পাওয়া যায়। শিবপূজা করিয়া জপ করিলেও তাঁহারা বেশী উপকৃত হইবেন। মন্ত্র-শক্তি জলের আশ্রয়ে বেশী স্পষ্টভাবে খেলিতে থাকে।

জপের লক্ষ্য আমাদের কর্ম্ম এবং জ্ঞান-শক্তি বৃদ্ধি করা। কিরূপে দিনের পর দিন জ্ঞান এবং কর্ম্ম-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে ইহা বুঝিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং ক্রমে উন্নত স্তরের চরিত্র আয়ত্ত করিতে হয়। জপদ্বারা উন্নত চরিত্র আযত্ত করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে ইহা দ্বারা কুটীলতা ও ছলনা করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাই সাধকগণ এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সাবধান হইবেন।

জপের পর মন্ত্রযোগী সাধকের গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া সাধারণ লোকও বুঝিতে পারিবে লোকটী শক্তিশালী। পুরশ্চরণের সময় এই গাম্ভীর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং স্পষ্ট হয়। যাহা হউক অন্যকে জপশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা যেন মন্ত্রযোগীর লক্ষ্য না হয়। সাধক উহা নিজে বুঝিলেই হইল। বিদ্যুৎ শক্তি যখন কোন আধারে জমা করিয়া রাখা হয় তখন অনভিজ্ঞ লোক উহা দেখিয়া বুঝিতে পারে না বলিয়া আধারে বিদ্যুৎশক্তি নাই এরূপ প্রমাণ হয় না, বরং উহাতে তাহার অনভিজ্ঞতাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ং, ঃ প্রভৃতি ধ্বনিশক্তির কেন্দ্র বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ ইহারা অ, ই, উ, ঋ, ঌ প্রভৃতির দীর্ঘ মাত্রা। স্থতরাং ধ্বনিশক্তি বিচারে হ্রস্ব, দীর্ঘে কোন ভেদ হইবে না। 'এ' এবং 'ও'তে যথাক্রমে অ+ই এবং অ+উ আছে। ঐ এবং ঔতে যথাক্রমে অ+এ এবং অ+ও আছে। ইহাদের শক্তি কোন্ কেন্দ্রে যাইবে তাহা পাঠকগণ বুঝিতেই পারিবেন। পূর্ব্বে জপকে দুইভাবে করিবার কথা বলা হইয়াছে। একত ধ্বনিবিজ্ঞানের জপ এবং অন্যটী শক্তি-বিজ্ঞানের জপ। ধ্বনি বিজ্ঞানের জপ একটু উচ্চারণ করিয়া করিতে হয়। ইহাতেও স্থষুম্নাপথে মন রাখিয়া জপ করিতে হয়। নচেৎ ফল কম হইবে। শক্তি-বিজ্ঞানের জপ সম্পূর্ণরূপে মানস-জপ। ইহাতে ওষ্ঠ তো নড়িবেই না, কণ্ঠ পর্য্যন্তও নড়িবে না। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত নাড়ী পথে একেবারে ডুবিয়া যাইয়া এইরূপ জপ করিতে হয়। শক্তি-বিজ্ঞানের জপে জপ-শক্তি শীঘ্র জমিতে থাকে।

পূর্ব্বে যে ভাবে মন্ত্র-শক্তির কেন্দ্র ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ যে কোন মন্ত্রকে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। পূর্ব্বে লিখিত বীজমন্ত্রগুলির সামান্য বিচার করা যাইতেছে। মন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিয়া কিছু বুঝা খুবই অসম্ভব। ইহা জপ করিয়াই বুঝিতে হয়।

'ওঁ'কার জপে অ, উ, ঁ (ম্) কেন্দ্র স্পন্দিত হয়। 'অ'কারে স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, প্রেম, অনুসন্ধিৎসা, মেধা (সূর্য্য-স্তর পাঠ করুন), বাক্‌শক্তি প্রভৃতি কোমল দৈবশক্তির প্রতিষ্ঠা সাধকের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে। 'উ'কার অত্যন্ত শান্তি এবং নিশ্চিন্ত অবস্থার কেন্দ্র। নির্জন প্রিয়তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, সংসারে অনাসক্তি (শিব-স্তর পাঠ করুন) এই কেন্দ্র হইতেই আসিয়া থাকে। 'ং' (ম্) কারে জ্ঞান-কেন্দ্র। পূর্ণতা ইহার প্রধান গুণ। এই শক্তি অভাব বোধ হইতে দেয় না। 'ওঁ'কার

জপে নিম্নস্তরের বা প্রাথমিক স্তরের সাধকগণের বিকাশের পথ সহজ হইবে না, কারণ ইহার ধ্বনি-সংস্থানের সবগুলি শক্তি কোমলতা, কারুণ্য, শান্তি এবং তৃপ্তিবর্দ্ধক শক্তিই বিদ্যমান। যাঁহার যে সামান্য বিকাশ আসিয়া গিয়াছে তাহাতেই যদি তাঁহার তৃপ্তি ও শান্তি আসিয়া যায় তবে উন্নত বিকাশ তাঁহার আসা অসম্ভব। এই জন্যই শুধু সেতু-প্রণবের জপ প্রাথমিক সাধকের অবলম্বন ঠিক হইবে না। ইহার সঙ্গে অন্য কোন তেজঃ এবং ত্যাগ শক্তি-সম্পন্ন বীজমন্ত্র জপ করা প্রয়োজন। যাঁহারা সিদ্ধদশায় আসিয়া স্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য এই সেতু প্রণবই অবলম্বন হইয়া থাকে। সাধারণ সাধকগণ জীবনের একটা দীর্ঘ সময় বিভিন্ন শক্তি-মন্ত্র বিশেষ একনিষ্ঠ হইয়া আলোচনা করিয়া লইবেন। ৩ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ নিয়মনিষ্ঠ হইয়া বহু বীজমন্ত্রের পুরশ্চরণ করা প্রয়োজন। সাধারণ সাধকদের মধ্যে যাঁহারা ওঁকার জপ করিবেন তাঁহারা খুব পবিত্রভাবে বৈদিক আচারে থাকিবেন। পবিত্রভাবে না থাকিলে প্রণব জপের ফল কম হইয়া থাকে। ছাত্র জীবনে স্নানান্তে প্রণব জপ মেধা ও স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি করে।

সিদ্ধ সাধকগণের নজর রাখিতে হয় যাহাতে ক্রম-বিকাশের স্তরগুলির বৈষম্য অবস্থা না আসিয়া যায়। প্রত্যেক স্তরের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তিগুলি যাহাতে স্বভাবতঃই যথাযথ নিয়মে চলিতে থাকে এরূপ অবস্থা স্থির রাখিবার জন্য প্রণবের অবলম্বন করিতে হয়। অস্বাভাবিক কর্ম্মবেগ, অস্বাভাবিক ত্যাগের বেগ এবং অস্বাভাবিক শান্তি, স্নেহশীলতা ও সমাজপ্রিয়তা যাহাতে সাধকে না আসিয়া যায় এরূপ নিয়মে সাধকগণকে অবস্থান করিতে হয়। সিদ্ধ সাধকগণ কর্ম্মহীন, শান্তিহীন, ত্যাগহীন, স্নেহহীন এবং সমাজবিদ্বেষী হইবেন না; আবার এই সবের কোনটাতেই মুগ্ধ থাকিবেন না। কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, শান্তিশক্তি, ত্যাগশক্তি, সুখশক্তি, স্নেহশক্তি এবং প্রাণশক্তি (শারীরিক বল) পূর্ণভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষে থাকিবে, কিন্তু দুর্ব্বলতা কোন স্তরেরই তাঁহাতে থাকিবে না। 'ওঁকার' মন্ত্রের এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই যে মস্তিষ্কের কেন্দ্র-শক্তিগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখে। শক্তি-প্রণবগুলি ওরূপ নহে; উহারা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। জ্ঞানলাভের জন্য বা বিভিন্ন স্তরের দুর্ব্বলতার গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করিবার জন্য শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। শক্তি-স্তরে প্রতিষ্ঠালাভ হইয়া যাওয়ার পর শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। প্রণব জপে উহা সাধিত হইয়া থাকে।

'ঐঁ' বীজে অ + এ (অ+ই) + ঁ এই চারিটী ধ্বনি আছে। ইহা সরস্বতীর বীজমন্ত্র। ইহাকে গুরুবীজও বলা যায়। এই বীজমন্ত্র সাধকের জড়তা নষ্ট করে। 'অ'কার আশ্রয়ে সূর্য্য-কেন্দ্র অবস্থিত সুতরাং ঐ কেন্দ্রস্থিত সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে। 'ই'কারের আশ্রয়ে গণেশ-কেন্দ্র অবস্থিত ইহাতে ত্যাগ, বিকাশমুখীগতি, সূক্ষ্ম ও নিষ্পক্ষ-বিচার এবং কোন কলকব্জার অন্তর্নিহিত কর্ম্ম-রহস্য জ্ঞান এই শক্তি হইতে আসিয়া থাকে। ঁ (নাদ) জ্ঞান-শক্তি। পূর্ণতাই এই শক্তির দান; ইহা সাধককে পূর্ণ-শক্তি দান করে।

গুরুচরিত্র যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা এই বীজমন্ত্রে তাহা বুঝিতে পারিবেন। গুরু একাধারে সূর্য্যের ন্যায় স্নেহশীল, গণেশের ন্যায় ত্যাগী, নিষ্পক্ষ-বিচারে অভ্যস্ত এবং জ্ঞানে শিবতুল্য পূর্ণ ও তৃপ্ত। গুরুতে এসব শক্তির বিকাশ না থাকিলে সমাজে নানারূপ গোলমাল আসিয়া যায়।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে ঐঁকার জপ করিতে হইলে আদ্যে 'অ' মধ্যে 'এ' (অ+ই) এবং অন্তে 'ঁ' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। ঐঁ বীজে অবস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে - প্রেমশক্তি + প্রেম-শক্তি + ত্যাগ-শক্তি + জ্ঞান-শক্তি।

'হ্রীঁ' বীজমন্ত্রে 'ঃ + ঋ + ঈ + ঁ' এই চারিটি ধ্বনি আছে। 'ঃ' অব্যক্ত শক্তি। ইহা কর্ত্তৃত্ব শক্তি দান করে; ইহা সাধককে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় লইয়া যাইতে সাহায্য করে। 'ঋ'কার কর্ম্ম-শক্তি তেজঃ-শক্তি। মানুষ যেখানে সুখসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় এই তেজঃ-শক্তি সেইখানেই নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া সেই জমাট সুখটুকুকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তিক্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। 'ঋ'কার অন্তঃকরণের জড়তার জমাট অবস্থাকে নিজের অগ্নি-শক্তিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। 'ঈ'কার জ্ঞান-মুখী এবং ভোগ-বিরোধী শক্তি ('ঐঁ' বীজে ঈকার সম্বন্ধে দেখুন)। 'ঁ' (নাদ) জ্ঞান-শক্তি। এই শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু স্থানে বলা হইয়াছে, মিলাইয়া বুঝিয়া লইবেন।

'হ্রীঁ' বীজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীজমন্ত্র বলা যায়। ইহাকে মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, বালা, ভৈরবী, ত্রিপুরা ইত্যাদি বহু নামে পরিচয় করান যায়। ইহা এমন একটী বীজমন্ত্র যাহা দ্বারা যে কোন দেবতার উপাসনা করা যায়। দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, তারা প্রভৃতি বহু দেবতার পূজা শুধু এই একটী বীজমন্ত্রে চলিতে পারে।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'হৃ' (ঃ + ঋ) মধ্যে 'ঈ' অন্তে 'ঁ' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। ইহা শক্তি-প্রণব। শক্তি-বিজ্ঞানে জপ করাই বেশী সুবিধাজনক। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে - কর্তৃত্ব শক্তি + তেজঃশক্তি + ত্যাগ-শক্তি + জ্ঞান-শক্তি।

'ক্লীঁ' বীজে 'ক্ + ঌ + ঈ + ঁ' এই চারিটী ধ্বনি আছে। 'ক্'তে বহু ধ্বনির কিছু কিছু মিশ্রণ আছে; উহারা ঃ + (অ + ঁ + অ)। বিস্তারিত ক কারাদি বর্গীয় বর্ণ উৎপত্তি অংশে দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। ইহাকে আমরা কর্তৃত্ব-শক্তি (ঃ) এবং প্রেম-শক্তি (অ) এই দুইটি শক্তির বিশেষ সংস্থান মানিয়া লইলাম। এখানে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে বহু ধ্বনি মিশ্রিত ধ্বনি খুব শক্তিশালী হইয়া থাকে। 'ঌ' প্রাণ-শক্তি। ইহা জীবনীশক্তি। ইহা যৌন সম্বন্ধে ভোগ-শক্তিও বুঝায়। 'ঈ' ত্যাগ-শক্তি। 'ঁ' জ্ঞান-শক্তি।

'ক্লীং' বীজকে কামবীজ বলে। ইহা মহাকালীর বীজমন্ত্র। ইহাকে 'কৃষ্ণবীজ'ও বলে। ইহা প্রাথমিক দীক্ষার মন্ত্র না হইলেই ভাল হয়, কারণ এই বীজমন্ত্রে 'ঋ'কার বা তেজের অংশ না থাকার দরুণ প্রাথমিক সাধকগণের সাধনার পথে ইহা বেশী শক্তিদায়ক হইবে না। 'ঋ'কারের শক্তি-সংস্থান আছে এমন বীজমন্ত্রগুলি শীঘ্র চৈতন্য হয়। 'ঌ'কার সংযুক্ত বীজমন্ত্রগুলি শীঘ্র চৈতন্য হয় না। 'ক্লীঁ' বীজমন্ত্রে তেজঃ অংশ না থাকিবার দরুণ এই মন্ত্রের সাধকগণ প্রায়ই অগ্রসর হইতে চাহেন না। প্রাথমিক দীক্ষার সময় এই বীজমন্ত্রের দীক্ষা না লইয়া অন্য কোন 'ঋ'কার শক্তি-সমন্বিত বীজের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবার পর এই বীজের সাধনা করা ভাল। তেজঃশক্তি সমন্বিত বীজমন্ত্রগুলিতে জ্যোতি এবং প্রকাশ-শক্তি থাকার দরুণ সেই মন্ত্রগুলি শীঘ্র চৈতন্য হইয়া সাধকগণকে অনুভূতির পথে শীঘ্র অগ্রসর করিয়া দিতে সাহায্য করে। ইহা শক্তি-প্রণব।

ইহাকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'কৢ' (ক্ + ৯), মধ্যে 'ঈ' এবং অন্তে 'ং' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে - স্নেহ শক্তিযুক্ত কর্তৃত্ব-শক্তি + ভোগ বা প্রাণ-শক্তি + ত্যাগ-শক্তি + জ্ঞান-শক্তি।

'ক্রীঁ' বীজে ক্ + ঋ + ঈ + ং এই চারিটি ধ্বনি আছে। এই বীজটি দক্ষিণাকালিকার বীজমন্ত্র। 'ক্লীঁ' বীজে এবং 'ক্রীঁ' বীজে '৯' ও 'ঋ' এর মাত্র ভেদ বিদ্যমান। পাঠকগণ পূর্ব্বের আলোচিত বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া এই বীজকে বুঝিয়া লইবেন। ইহা শক্তি-প্রণব। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'কৃ' (ক্ + ঋ), মধ্যে 'ঈ' এবং অন্তে 'ং' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে - স্নেহ-শক্তিযুক্ত কর্তৃত্ব-শক্তি + কর্ম্মশক্তি + ত্যাগ-শক্তি + জ্ঞান-শক্তি।

'শ্রীঁ' বীজে 'শ + ঋ + ঈ + ং' এই চারিটি ধ্বনি আছে। 'শ্' ' ঃ' বা কর্তৃত্ব শক্তির রাজস্ প্রকৃতি অর্থাৎ 'শ্' ধ্বনি ' ঃ' ধ্বনিরই রাজস প্রকৃতি। ধ্বনি জগতের সৃষ্টিতে ' ঃ'ই পুরুষ। এখানে পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে শক্তি-স্তরের বিচারে ' ঃ' কর্তৃত্ব-শক্তি কিন্তু ধ্বনি-জগতের বিচারে ' ঃ' ধ্বনি-জগতের পুরুষ। এই পুরুষের - সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ভেদে তিনটী প্রকৃতিভাব আছে। ইহাদের মধ্যে 'শ'টী রাজস্-প্রকৃতি। বিস্তারিত ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপত্তি অংশে বলা হইবে। ' ঃ' এর যেখানে পুরুষভাব সেখানে কর্তৃত্ব-শক্তির উন্নত বিকাশ-বেগ বুঝিতে হইবে। ' ঃ' এর যেখানে প্রকৃতি-ভাব সেখানে কর্তৃত্ব শক্তির ভোগবদ্ধভাব বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ ভোগে বদ্ধ হইয়া কর্তৃত্বভাব জানিতে হইবে। ' ঃ' এ এবং 'শ্' এ এইমাত্র ভেদ যে ' ঃ' উন্নত বিকাশমুখী গতিসম্পন্ন বেগ প্রদান করে; আর 'শ্' ধ্বনি সাধককে ভোগে বদ্ধ রাখিয়া কর্তৃত্ব করিবার শক্তিদান করে।

'শ্রীঁ' মহালক্ষ্মীর বীজমন্ত্র। ইহা ধনদাত্রী বীজমন্ত্র, ইহার জপকালে সাধকের মনে খুব আরাম বোধ হয় এবং শরীরে খুব লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। ইহা শক্তি-প্রণব। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে ইহার আদিতে 'শৃ' (শ্ + ঋ), মধ্যে 'ঈ' এবং অন্তে 'ং' বুঝিতে হইবে। ইহাতে শক্তি-সংস্থান সংক্ষেপে - ভোগবদ্ধ কর্তৃত্ব-শক্তি + কর্ম্ম-শক্তি + ত্যাগ-শক্তি + জ্ঞান-শক্তি।

'হ্লীঁ' বীজে ঃ + ৯ + ঈ + ং এই চারিটি ধ্বনি আছে। ইহার প্রত্যেকটী ধ্বনি সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ইহা আহ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী বীজমন্ত্র। 'ক্লীঁ' বীজের মত ইহাও ভোগের বেগ সম্পন্ন বীজমন্ত্র। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে - কর্তৃত্ব শক্তি + ভোগ-শক্তি + ত্যাগশক্তি + জ্ঞান-শক্তি।

'হ্লা*' বীজও আহ্লাদিনী বীজ। ইস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'মহম্মদ' বোধ হয় এই হ্লা† বীজেরই উপাসক ছিলেন। 'হ্লা' বীজই দেশ ভেদে উচ্চারণ ভেদ হইয়া 'অল্লহ্' হইয়া গিয়াছে। তাহা যাহাই হউক না কেন ধ্বনির সহিত শক্তি সংস্থান থাকিবেই। মূর্ত্তি এবং লীলাসংস্কার জড়িত না থাকিলে ধ্বনি-শক্তি নিজের পূর্ণশক্তির বিকাশ প্রকটিত করিয়া

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''হ্লী'' স্থানে 'হ্লা' গৃহীত হল।

† প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''হ্ল'' স্থানে ''হ্লা'' গৃহীত হল।

থাকে। ‘ইস্‌লাম’ মত কোন মূর্ত্তি বা লীলা প্রধান ধর্ম্মের সমর্থক নহে কাজেই এই ধ্বনি-শক্তি পূর্ণভাবে শক্তিদান করিতে সমর্থ। ‘অল্লহ্’তে অ + ঌ + ঌ + অ + ঃ এই পাঁচটী ধ্বনি বিদ্যমান। এই বীজস্থিত শক্তি গুলি সংক্ষেপে প্রেম-শক্তি + ভোগ-শক্তি (বা প্রাণ-শক্তি) + ভোগ শক্তি (বা প্রাণ-শক্তি) + প্রেম-শক্তি + কর্ত্তৃত্ব-শক্তি। ‘হ্লীঁ’ ‘হ্লা’ বা ‘অল্লহ্’ প্রভৃতি বীজমন্ত্র শক্তি-প্রণবের অন্তর্গত; সুতরাং ইহাদিগকে শক্তি-বিজ্ঞানে জপ করাই ভাল। “হ্লীঁ”কে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে ‘হ্ল’ (ঃ + ঌ), মধ্যে ‘ঈ’ ও অন্তে ‘ঁ’ রাখিতে হইবে। ‘অল্লহ্’কে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে ‘অঌ’ (অ + ল্), মধ্যে ‘ল’ (ঌ + অ) এবং অন্তে ‘ ঃ’ (হ্) রাখিয়া জপ করিতে হইবে। অল্লাহ্ বাদীরা স্বভাবতঃই বেশী ভোগবাদী ও দাম্ভিক।

“হূঁ” বীজে ‘ ঃ + ঊ + ঁ’ এই তিনটী ধ্বনি আছে। ‘ঃ’ কর্ত্তৃত্ব-শক্তি ‘উ’ শান্তি-শক্তি এবং ‘ঁ’ জ্ঞান-শক্তি। পাঠকগণ মস্তিষ্ক-কেন্দ্র চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এই বীজমন্ত্রে মনোময় কোষস্থিত কোন কেন্দ্রই স্পন্দিত হয় না। এই বীজমন্ত্রটি যেন কেবল জ্ঞান এবং শান্তির জন্যই সমস্ত পুরুষকার নিয়োজিত করিতে যত্নশীল। তান্ত্রিক সাধনায় ইহা ‘তারা’ বীজের অন্তর্গত বীজমন্ত্র। ইহা নীল সরস্বতীর বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্রটী বৌদ্ধ সাধকগণের মধ্যে বেশী প্রচলিত। ইহা কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, শান্তি ও জ্ঞানশক্তিবর্দ্ধক বীজমন্ত্র। ইহা শক্তি-বীজ। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে (ঃ + উ), মধ্যে উ ও অন্তে ঁ।

‘হৌঁ’ বীজে ঃ + অ + উ + ঁ এই চারিটী ধ্বনি আছে। এই বীজটিতে ওঁকারের পূর্ব্বে ‘ ঃ’টী মাত্র বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ‘ ঃ’ কর্ত্তৃত্ব-শক্তি প্রদানকারী শক্তি। ওঁকারের পূর্ব্বে এই ঃ কে স্থাপন করিয়া ওঁকারের শক্তিকে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা পুরুষ-বীজ বা শিব-বীজ। ইহা কর্ত্তৃত্ব, মেধা, শান্তি ও জ্ঞানবর্দ্ধক বীজমন্ত্র। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে হ (ঃ + অ), মধ্যে উ অন্তে ঁ রাখিয়া জপ করিতে হইবে। ইহাও শক্তি-প্রণব।

ইহা ভিন্ন বহুপ্রকার বীজমন্ত্র আছে। অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্য্যন্ত যতগুলি মৌলিক এবং মিশ্রিত ধ্বনি আছে, সবই বীজমন্ত্র। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র ভাগ করিয়া লইয়া পাঠকগণ মন্ত্রশক্তিকে মোটামুটি বুঝিয়া লইতে পারিবেন। বীজমন্ত্র জপ না করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায় না। উন্নত সাধকদের মধ্যে বহু বীজমন্ত্রের উপাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান সময় আর্য্য সমাজে এরূপ নীতি স্থির হইয়া গিয়াছে যে কেহই সমস্ত জীবনে একটি বীজমন্ত্রের উপর আর কোন বীজমন্ত্রের সাধনা করেন না। সাধনা সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সমাজ অত্যন্ত বদ্ধভাব ধারণ করিয়াছে। যখন সমাজ নিজের প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে তখন তাহাদের কোন কাজেই আর স্বাধীনতা ফুটিতে চাহে না। শিক্ষায়, দীক্ষায় চালচলনে বদ্ধভাবই ইহাদের বেশী প্রিয় হইয়া থাকে। তান্ত্রিক মন্ত্রাদি সম্বন্ধে মোটামুটি বলা হইল, তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি শক্তি-স্তরের মন্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবের দিনে প্রত্যেক রাজা এবং প্রত্যেক ঋষি তান্ত্রিক মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। যাঁহারা ভারতের গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহারা ভাবপ্রবণতা ও বাজে কল্পনা

ত্যাগ করিয়া বীজমন্ত্রের অনুশীলনসহ যদি কর্ম্ম করেন তবে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

তান্ত্রিক মন্ত্র ভিন্ন বৈদিক, পৌরাণিক এবং লৌকিক মন্ত্রের প্রচলন সমাজে আছে। ঐ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বৈদিক মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ শিব-স্তরের মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রে বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ এবং মনের স্তরের মন্ত্রও আছে। তাহা হইলেও বৈদিক মন্ত্রাবলম্বনে শান্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যই বেশী প্রস্ফুটিত। বেদগান করুন বা শ্রবণ করুন, আপনি উহার অর্থ বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন আপনার অন্তঃকরণে বৈদিক যুগের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইবেন। আবার তান্ত্রিক মন্ত্র বহুলতাপূর্ণ কালী বা দুর্গাপূজার মন্ত্রগুলি (কালী দুর্গাদি পূজার বৈদিক এবং পৌরাণিক মন্ত্রও অনেক আছে) শ্রবণ করুন, দেখিবেন যুদ্ধের এবং কর্ম্মের কেমন অস্ফুট প্রবাহ-বেগ আপনার মনে উৎপন্ন হইয়া চলিয়াছে।

সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার গায়ত্রী; এবং এই গায়ত্রীর সার ওঁকার। ওঁকার প্রথম আবিষ্কৃত সেতু মন্ত্র। এই সেতু ধরিয়াই অন্যান্য ধ্বনি ও বীজমন্ত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম যুগে যে সব ঋষি সৃষ্টিতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা নিজের অন্তরে সৃষ্টির মূল খুঁজিতে যাইয়া শরীর-যন্ত্রের মধ্যে সমস্ত শক্তির ক্রিয়াকলাপজনিত যে ধ্বনি উঠিতেছে উহা প্রথম শ্রবণ করিতে পান। এই ধ্বনিই ওঁকার। এই ধ্বনির আদ্য, মধ্য এবং অন্ত মিলাইয়া সাধারণ নাদ বা ধ্বনি ওঁকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কোনস্থানে বহুধ্বনির উত্থানে দূর হইতে এই প্রণব-ধ্বনিই শ্রুত হইয়া থাকে। ঋষিদের ধ্বনি-বিজ্ঞান, শক্তি-বিজ্ঞান এবং অন্তঃকরণের সর্ব্ববিধ রহস্য জানিবার জন্য একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল এই ধ্বনি বা প্রণব। এই ধ্বনি ধরিয়াই তাঁহারা জগৎ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব এবং আত্ম-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন।

অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৫০টি ধ্বনিই তান্ত্রিক মন্ত্র। এই ধ্বনিগুলির মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ৯, ং, ঃ এই ৭টি মৌলিক ও অনাদি, আর সবগুলিই যৌগিক। বেদে এই ধ্বনিগুলির মর্ম্মার্থ মাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু ফুটিয়াছে সবই অনাদি শক্তির সংযোগ বিয়োগ এবং মিশ্রণের ফল। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদি শক্তির বিবর্ত্তন মাত্র। এই সৃষ্টি থাকিলেও অনাদি-শক্তি সদাই বিদ্যমান থাকে; আবার এই সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার উপাদানভূত সমস্ত উপাদানই অনাদি শক্তিরূপে পরিণত হইবে। এই অনাদি-শক্তি সম্বন্ধে ঋষিগণের যে অস্ফুট জ্ঞান উহাই বেদ।

আমাদের চক্ষের সাম্‌নে শক্তি-জগতের কত কি শক্তির খেলা হইয়া চলিয়াছে। ইহারই মধ্যে যাঁহার চক্ষু ফুটিয়া গিয়াছে তিনিই কত কি জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি, নীতির জন্মদাতা হইয়া যাইতেছেন। প্রথমে বোধক্ষেত্রেই শক্তির সংযোগ বিয়োগজনিত কোন অস্ফুট বোধই তাঁহার অন্তরে জাগে। পরবর্ত্তীকালে তিনি বা অন্য কেহ যাহা আবিষ্কার করেন তাহার ঐ বোধই অবস্থিত। এই বোধই বেদ বলিয়া জানিতে হইবে। যুগে যুগে এরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার জীবজগতে হইয়া চলিয়াছে। শক্তিস্তরের সংযোগ বিয়োগজনিত অস্ফুট বোধকে ধরিয়াই ঋষিগণ গবেষণা করেন এবং তাহাতেই সমাজে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। তুমি এই বিশ্বজগতের গতি ধরিয়াই যদি কোন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া থাক তাহাও এই স্থূল জগতের ক্রিয়াজনিত উত্থিত শক্তির সূক্ষ্ম পরিণতির গতি ধরিয়াই

করিয়া থাকিবে। অর্থাৎ শক্তির গতিতেই বোধ জগতে বেদের (জ্ঞানের) প্রথম উৎপত্তি হয়, আবার ঐ বোধ ধরিয়াই নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। যাঁহারা শক্তি-সাধক তাঁহারা জানেন অনাদি শক্তিতেই এই সৃষ্টির উপাদান শক্তিরূপে অবস্থিত। মানুষের অনুভূতিতে যখন ঐ শক্তির ক্রিয়াজনিত অস্ফুট বোধ হয়, ঐ বোধ হইতেই কত কি সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যায়। ঐ বোধই বেদ, ঐ বোধের মূলে যে শক্তি নিহিত আছে ঐ শক্তির সন্ধান যাহাতে পাওয়া যায় উহাই তন্ত্র। অনাদি শক্তি সবযুগেই একরূপ; তাই তন্ত্রকে সবযুগে একরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বেদ এক এক যুগে এক এক ঋষির নিকট এক এক রূপে আসিতেছে। বোধের তারতম্যে, বিচারের তারতম্যে অনাদি শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া এক এক যুগে এক এক প্রকারের জ্ঞানের উপাদান রূপে আবির্ভূত হইতেছে। শক্তিস্তর এবং শক্তি-মন্ত্র, বেদের স্তর এবং বৈদিক মন্ত্রের উহাই ভেদ। বোধই বেদ, আর বোধের মূলে অনাদি শক্তির যে গতি বিদ্যমান ঐ গতিই 'তন্ত্র'। শক্তি সব যুগেই একরূপ। বেদ এক এক যুগে এক এক ঋষির নিকট এক এক রূপে আসিতেছে। বোধের তারতম্যে বিচারের তারতম্যে একই শক্তি হইতে এক এক যুগে এক এক প্রকার সৃষ্টি চলিয়াছে। শক্তি-স্তর এবং শক্তি-মন্ত্র এবং বেদের স্তর ও বৈদিক মন্ত্রের ইহাই ভেদ। তাই বলিতেছিলাম, বীজ-মন্ত্রের ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

শক্তি, গতি এবং সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদান একই বস্তু। এই জীব, এই জগৎ, এই জীবস্থিত বিচিত্র শক্তির লীলা এবং এই জগৎস্থিত বিভিন্ন শক্তির লীলা অর্থাৎ লৌকিক অলৌকিক যত প্রকারের শক্তি আছে সকলই সেই মূল উপাদান-ভূত অনাদি শক্তিরই খেলা। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি নীতি, শিল্প, কলা যাহা কিছু সবই ঐ শক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিণতি। আমাদের স্বরূপের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয় সমস্তগুলি স্তরই এইসব শক্তি কণার বিভিন্ন প্রকার পরিণতি। আমরা যখন আমাদের অন্তর্বিকাশের এইসব ক্রমোন্নত ধারাকে জানিতে জানিতে শেষ স্তরে দাঁড়াই তখন আমরাও ইহা বুঝিতে পারি যে, এই যে শক্তিকণা ইহারা এবং আমাদের আত্মার শেষ পরিণতি বিশুদ্ধ চৈতন্য বস্তুতঃ একই। সেই স্তরে স্থিত হইয়া ঋষি আনন্দে গাহিয়াছিলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বিশ্বের সমস্ত বস্তু একই বস্তুর পরিণতি। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। সে সব জানিতে পারিলে পাঠকগণ একথা বুঝিবে যে কোন দর্শনকারই ভুল বলেন নাই। বিকাশের স্তর অনুসারে সকলের দর্শনই ঠিক।

মূলে যে সব বস্তুর উপাদান নাই তাহা কখনও আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে আসিতে পারে না। আমাদের যে সব শক্তি আছে উহা যে সৃষ্টির মূলে বিদ্যমান ইহা মানিতেই হইবে। মূলে যে সবের উপাদান নাই সৃষ্টিতে উহা প্রস্ফুটিত হইতেই পারে না। ক্রমবিকাশের প্রগতিতে আমাদের জ্ঞান এবং কর্ম্ম-শক্তি মূলের জ্ঞান এবং কর্ম্মধারাকে জগতে ক্রমেই নিখুঁতভাবে মূর্ত্ত করিতে সাহায্য করিবে। বেদ ঋষি আবিষ্কার, সর্ব্ববিধ লৌকিক, অলৌকিক, রীতি, নীতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংগ্রহ গ্রন্থ মাত্র। ঐসব জ্ঞান বিজ্ঞানেরও সমস্ত উপাদান শক্তিরূপে সব যুগেই বিদ্যমান। বোধের মধ্যে যখন ঐসব শক্তির অস্পষ্ট ক্রিয়া ধরা পড়ে তখনই উহা বেদরূপে আসিয়া যায়। সব যুগেই শক্তি-জগতের বহু ক্রিয়ারাশি মানুষের বোধগম্য হইয়া জগতে প্রচলিত হইয়া চলিয়াছে। যিনি

এই বোধের বোদ্ধা তিনিই ঋষি। প্রথম যুগে এই ঋষিস্তরের মানুষের সংখ্যা অধিক ছিল, আর উহাই বৈদিক যুগ। মানুষের সভ্যতার সর্ব্ববিধ উপাদান বেদে স্থান পাইয়াছে। মানুষের সভ্যতার সর্ব্ববিধ উপাদান শক্তিরূপে সব যুগে শক্তিভাণ্ডারে বিদ্যমান আছে। যতক্ষণ শক্তিরূপে ততক্ষণ উহা তন্ত্র। যখন উহা মানুষের বোধের অধীন হয় তখন উহা বেদ। এই বেদকে সাম্‌নে রাখিয়াই স্মৃতি, পুরাণ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রীতি নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বৈদিক মন্ত্রগুলিকে অবলম্বন করিলে সাধকের বিকাশ শিবের স্তর পর্য্যন্ত আসিবে। যাঁহাদের লক্ষ্য শক্তিস্তর তাঁহারা তান্ত্রিক মন্ত্র অবলম্বন করিবেন। পৌরাণিক মন্ত্রের শক্তি খুবই কম। উহা ভক্তিস্তরের মন্ত্র মাত্র। 'নারায়ণায় নমঃ', 'গণেশায় নমঃ' ইত্যাদি রূপেই ইহাদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র মাত্রই অ, আ, ই ইত্যাদি উপাদানে গঠিত। কিন্তু ধ্বনির সঙ্গে ভাব জগতের ছাপ থাকিবার দরুণ পৌরাণিক মন্ত্রদ্বারা ধ্বনি বা শক্তি-স্তর বিকশিত হইতে সাহায্য না করিয়া আমাদের অন্তরে কেবল ভাবই খেলিতে থাকে। এই ভাবের মধ্য দিয়াও শক্তি-স্তরে যাওয়া যায়, কিন্তু সে পথ সহজ হয় না। পৌরাণিক মন্ত্রগুলি ভাবোদ্দীপক মন্ত্র; উহা দ্বারা ভক্তিভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শক্তির উদ্দীপন হয় না। একমাত্র বেদ এবং তন্ত্রোক্ত সাধনার ভিত্তি ভিন্ন যত প্রকারের সম্প্রদায় আছে সকলেরই মন্ত্রগুলি পৌরাণিক বা লৌকিক মন্ত্র মাত্র। তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি সবচেয়ে উন্নত স্তরের। ইহার পর বৈদিক মন্ত্রের স্থান। বৈদিক মন্ত্রের পর পৌরাণিক মন্ত্র। লৌকিক মন্ত্রের শক্তি খুবই কম। ইহা কতটা ''আয় ছাগ্‌লী পাতা খা, পাতা খেয়ে স্বর্গে যা''র মত। যাহাদের ধর্ম্ম কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে যাহাদের ধর্ম্ম কতকটা লৌকিক কল্পনার উপাদানে সজ্জিত তাহাদের মন্ত্রগুলি লৌকিক মন্ত্রেই পূর্ণ। ভূত প্রেত উপাসকদের মধ্যেও লৌকিক মন্ত্রের প্রচলন বেশী। এখনকার দিনে নবীন উদ্গত বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লৌকিক মন্ত্রে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহার প্রতিকার - 'বৈজ্ঞানিক আলোচনাটা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া'। বৈজ্ঞানিক আলোচনা বৃদ্ধি হইলে কাল্পনিক বাদ ও ভাববাদের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। যাঁহাদের লক্ষ্য শক্তি-স্তর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব করিবেন।

তন্ত্র, বেদ এবং পুরাণে সাধারণতঃ কেবল মাত্র স্তরের ভেদ দেখা যায়। যে বস্তু শক্তি-স্তরে 'তন্ত্র', সেই বস্তুকেই শিব-স্তরের আলোতে দেখিলে বেদ হয়। আবার তন্ত্রকে (শক্তিকে) লৌকিক গল্পাকারে সাজাইয়া প্রচার করিলে উহাই পুরাণরূপে পরিণত হয়। আমরা শক্তি-স্তরের লক্ষ্যটাকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে ফুটাইয়া তুলিতে চাই। বিভিন্ন স্তরের শক্তি-বিজ্ঞানকেই বিভিন্ন পুরাণে গল্পাকারে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 'ক্লীং' বীজই পৌরাণিক মন্ত্রে 'কালী'। 'হ্রীং' বীজই পৌরাণিক মন্ত্রে 'হরি'। তন্ত্রের দৃষ্টিতে যাহা 'শক্তি' পৌরাণিক দৃষ্টিতে উহাকেই 'নামরূপে' স্থান দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিকগণ বীজকেই 'নামে' পরিণত করিয়াছেন তাই তাঁহারা জপ করাকে 'নাম করা' বলেন। একটী বীজকে বিভিন্ন শক্তির সংস্থান রূপে শক্তিবাদী স্থির করিয়াছেন। আবার পৌরাণিকগণ তাহাকেই মূর্ত্তিরূপে আঁকিয়াছেন। শক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকভাবে জপ করিয়া সেই বীজমন্ত্রস্থিত শক্তি আয়ত্ত করেন। পৌরাণিকগণ (ভক্তিবাদীগণ) সেই নাম ও রূপের

কল্পনা করিয়া ভক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে যাহা শক্তি ভক্তিবাদীয় দৃষ্টিতে উহাই মূর্ত্তিরূপে স্থান পাইয়াছে। একজন শক্তি-স্তরকে লক্ষ্য করেন, অন্যজন সূর্য্য-স্তরের লক্ষ্যে পঙ্গু হইয়া অবস্থান করেন। কেহ বা সূর্য্য-লক্ষ্যের মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, আবার কেহ নামে শক্তিবাদী হইয়াও বাক্চাতুর্য্যের আড়ালে ভণ্ডামী করেন।

এতো পৌরাণিকবাদের কথা। এবার আমরা আরও নিম্ন-স্তরের সাধনার কথা বলিব। ইঁহারা মনের মত দুইচারটা কল্পনার কথা ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করার পক্ষপাতী। মানব-সমাজে এরূপ ধর্ম্মেরও স্থান আছে। ঈশ্বরও তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের কল্পনারই উপাদানে প্রস্তুত কোন নিরাকার বা সাকার ব্রহ্ম হইবেন। ইঁহাদের ধর্মেরও কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। ইঁহারা 'এই লও তোমার কাম, এই লও তোমার ক্রোধ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেদের বৃত্তিগুলি প্রদান করেন। তাঁহারা যাহা ঈশ্বরকে দেন তাহাই তাঁহারা বিপুলভাবে লাভ করিয়া ভোগ-জগতে মহানন্দে বিচরণ করেন। এসম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। কেবল উন্নত লক্ষ্যে কর্মিগণ যাহাতে ঐসব খেলনা খেলার ঝোঁকে না পড়িয়া যান এজন্য সামান্য আলোচনা করা হইল। যাঁহারা প্রকৃতই উন্নতি করিতে চাহেন তাঁহারা বিভিন্ন স্তরে মানুষের চরিত্র কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন এবং কোন শক্তিশালী বীজমন্ত্র বাছিয়া লইয়া উহা জপ করিতে থাকুন। শক্তিশালী গুরুর নিকট যদি দীক্ষা লইবার সংযোগ হয় তো ভালই; তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে একদিন একটা কোন খেয়ালের বশে নামজাদা সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা লইলেই সিদ্ধ হওয়া যায় না। যোগের সাধনার ক্রম আছে; ক্রমে ক্রমে ঐসব অতিক্রম করিলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়। এরূপ সাধনার পথে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন এরূপ গুরু না জুটিলে সুবিধা হইবে না। যাঁহারা শুধু দুইচার শত বই পড়িয়া জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক তাঁহাদের আর্য্যদর্শন সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা একজন সাধারণ লোকের জ্ঞানের চেয়ে উন্নত নহে, কারণ সাধনার অবলম্বন না করিলে আর্য্য-দর্শনের কোন জ্ঞানই আয়ত্ত হয় না।

শক্তি-স্তরের দৃষ্টিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয়, তুরীয়াতীত সমস্তই শক্তির বিভিন্ন স্তরের লীলামাত্র। তাই বীজমন্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত, প্রেত, মাটী, পাথর প্রভৃতি জড়বস্তুর পর্য্যন্ত উপাসনা হইতে পারে। শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে জড়বাদ, ভাববাদ, শান্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদের প্রশ্ন নাই। রুচি ও মতি অনুসারে যাঁহার যেমন ইচ্ছা করিয়া চলুন। আমরা দেখিব লক্ষ্য কাহার কিরূপ। লক্ষ্য পূর্ণ-বিকাশ হইলেই হইল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সমাজ, ধর্ম, শাসন সবই আমাদের বিকাশের জন্য আসিয়াছে। বিকাশের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন সবই লইব, কিন্তু বিকাশ-বিরুদ্ধ কোন কিছুই মানিয়া লইব না। নিত্য নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করিতে হইবে। উন্নত বিকাশের স্তরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করিতে হইবে এবং সাধনার সাহায্যে উন্নত-স্তরের শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া শক্তিমান হইতে হইবে।

বহুদিনের শক্তি-চর্চ্চার অভাবে আমাদের দেশের লোকগুলি অত্যন্ত মূর্ত্তিপ্রিয় হইয়া গিয়াছে। এখন শক্তি-প্রিয় হওয়া প্রয়োজন। মূর্ত্তির মধ্য দিয়াও যদি উহা আসে ক্ষতি নাই। একদল সাধনশক্তিহীন তথাকথিত ধার্মিক সমস্তটা দেশের মধ্যে ধর্মের নামে সংঘ

স্থাপনের চেষ্টা করিয়া বড় বড় মঠ মন্দির গড়িয়া লইয়া মানুষের মনের উপর বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়া মূর্ত্তি ও অবতার প্রিয়তার বীজকে দৃঢ়মূল করিয়া দিতেছেন। ইঁহারা নিজেরা ত কিছু করেনই না, অন্যকেও কিছু করিতে দেন না। যাঁহারা শক্তি-লক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা শক্তি-অর্জ্জনে চেষ্টা করিবেন।

জপ করিতে করিতে বীজমন্ত্রস্থিত শক্তিশালী ক্রিয়াময় রূপ সাধকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনের মধ্যস্থিত সর্ববিধ দুর্বলতা (নিম্নলক্ষ্যে মনোবৃত্তি) সেই শক্তিস্পর্শে পুঁছিয়া যায়। সাধক দিন পর দিন শক্তিশালী হইতে থাকেন। তাঁহার চরিত্রটী ত্যাগে, প্রেমে, শান্তিতে, তেজে, উদারতায় ও নির্ভীকতায় ভরিয়া যাইতে থাকে। মন্ত্র যতই জাগ্রত হইতে থাকিবে, সাধকের ততই কামাদি রিপুগুলি দমিয়া যাইতে থাকিবে।

যাঁহারা মন্ত্রযোগের পথ ছাড়িয়া দিয়া মনের মত কল্পনা ভগবানকে শুনাইবার উপদেশ প্রদান করেন তাঁহাদিগকে সাধনার পথে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জানিতে হইবে। মালার সাহায্যে জপ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। যাঁহারা কোন দিন সাধনা করেন নাই তাঁহারাই মন-মালা জপের নামে বাজে কথা বলিয়া মালাজপ হইতে উহার শ্রেষ্ঠত্ব গাহিয়া থাকেন। মানসজপ লয়-যোগান্তর্গত সাধনা। উহা এত উন্নত স্তরের সাধনা যে সে স্তরের সাধক সাধারণতঃ দেখিতেই পাওয়া যায় না। বহুদিন মালা সাহায্যে জপের ফলে উহা আয়ত্ত হইয়া থাকে।

অনেকের ধারণা দীক্ষা মাত্র একবারই হইয়া থাকে; এ ধারণার কোন মূল্য নাই। কর্ম ও জ্ঞানের পথে শক্তি অর্জ্জনের জন্য তন্ত্রে বহুবার দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রকার বীজমন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয়। 'শাক্তদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা, যোগদীক্ষা ও মহাপূর্ণদীক্ষা' তন্ত্রে এরূপ দীক্ষার ক্রম আছে। তন্ত্রপথে সাধকগণের মহা-পূর্ণদীক্ষা অন্তেই 'সন্ন্যাস' হইয়া থাকে। নিজেকে নানাপ্রকারে শক্তিশালী হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, রাম, ভীষ্ম, ভৃগু, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রাবণ প্রভৃতি পূর্ব্বযুগের শক্তিশালী মহাপুরুষগণের জীবনচরিত্র আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা জীবনের এক এক সময় এক এক প্রকার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শক্তি ঐভাবেই অর্জ্জন করিতে হয়। ইহাতে একনিষ্ঠার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। বহুদিন শক্তিচর্চ্চার অভাবে এদেশের মানুষগুলি নিতান্ত বদ্ধ পুকুরের পচা জলের আকার ধারণ করিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারে কেবলই বদ্ধভাব। চালচলন, আচার, বিচার, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্ত স্থানেই ইঁহারা বদ্ধ থাকিতে ভালবাসেন। গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, যজমান, শিক্ষক, ছাত্র, সকলেই বদ্ধ। এখন ধীরে ধীরে ঈশ্বর পর্য্যন্তও বদ্ধ হইতে চলিতেছেন।

সাধক ধ্বনি শক্তির অবলম্বনে মনের জড়াংশ নষ্ট করিয়া ক্রমে ধ্বনির মূলস্থান মহৎ-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই মন্ত্র-শক্তিই সাধককে শক্তিশালী করিয়া শক্তি-স্তরে লইয়া আসিবে। সাধনার সঙ্গে কর্মের অবলম্বন না থাকিলে সাধকে জ্ঞান-মোহ আসিবে। জ্ঞান-মোহ থাকিলে মহত্তত্ত্বের পরাপারে আসা যায় না। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব প্রত্যেক স্তরের অনুভূতির মধ্যেই মোহ আছে। মন্ত্র-শক্তির অবলম্বন থাকিলে কোন স্তরেই

আটকাইয়া যাইবেন না। মন্ত্র-শক্তির দুইটা দিক; উহা একদিকে সাধককে মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে লইয়া আসে, আবার অন্যদিকে সাধককে শক্তিশালী করিতে করিতে শক্তি-স্তরে লইয়া যায়। অর্থাৎ মন্ত্র-শক্তি সাধককে জ্ঞানী প্রস্তুত করে, অন্যদিকে সাধককে কর্মের পথে দৃঢ় করিতে সাহায্য করে। মন্ত্র-শক্তি পূর্ণতার পথের সিঁড়ি; আবার এই মন্ত্র-শক্তিই পূর্ণ-শক্তির পূর্ণ উপাদান। সৃষ্টির মূল উপাদান এই শক্তি সপ্তক। এই সৃষ্টি তত্ত্বকে বুঝিবার জন্য জ্ঞান-শক্তি অর্জ্জন করিবার মত সমস্ত উপাদান আমরা এই ধ্বনি-সপ্তক হইতেই লাভ করি।

শিব অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছিলাম আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে শক্তি-স্তরে আলোচনা করিব। শিব অধ্যায়ে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে। বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশই মহত্তত্ত্ব, একথাও সেখানে বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বই ধ্বনি-জগতের কেন্দ্র। মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে অব্যক্ত-তত্ত্বের অনুভূতি হয়। মহত্তত্ত্বের পরই শক্তি-স্তর আরম্ভ হইয়াছে। অব্যক্ততত্ত্বকে শক্তি-ধ্যানে (দুর্গা-ধ্যানে) শক্তি-স্তরের অধীন করা হইয়াছে।

সৃষ্টির মূলে শক্তি-স্তর অবস্থিত। শক্তি-স্তরই আনন্দময় কোষ। মনোময় কোষ হইতে আরম্ভ হইয়া আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের দার্শনিক সীমা আমরা প্রথম অঙ্কিত করিয়া দিব; তবেই এই আনন্দময় কোষকে পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

মনোময় কোষকে আমরা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিভাগের সীমা-ভাগ করিয়াছি। এবার আমরা মনোময় কোষের দর্শনের মোটামুটি আলোচনা করিব। আমরা আমাদের চক্ষু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে একটা জগৎকে দর্শন করি বা বুঝি, ইহার নাম 'বহির্জগৎ', আবার চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়-দ্বার বন্ধ করিয়া মনে মনে একটা জগতের অনুভব করি, উহার নাম 'অন্তর্জগৎ'। অন্তর্জগতের দর্শনে স্থূল চক্ষু কর্ণাদির প্রয়োজন হয় না। বহির্জগতের দর্শনে স্থূল চক্ষু কর্ণাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এই অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের মত বিভিন্ন রকমের। একজন বলেন, "অন্তর্জগৎই বাস্তবিক সত্য বস্তু, বহির্জগৎ বলিয়া কোন বাস্তবিক পদার্থ নাই; বাহিরে আমরা যাহা দর্শন করি উহা আমাদের অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। বাহিরে আমরা কিছুই দেখি না, সবটাই অন্তরে"। আবার একজন বলেন, "অন্তর্জগৎ বলিয়া কোন বাস্তবিক পদার্থ নাই; বাহিরের ছাপই অন্তরে প্রতিফলিত হয়। আর ইহাই তোমরা অন্তর্জগত বলিতেছ; অন্তর্জগৎ বলিয়া কোন বাস্তবিক পদার্থ নাই, যা কিছু সবই বাহিরে।"

অন্তর সত্য কি বহিঃ সত্য বা অন্তর বাহির দুইই সত্য ইহা লইয়া আমাদের ঝগড়ার প্রয়োজন নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা অন্তরে হউক বাইরে হউক, ইহা নিত্য পরিবর্তনশীল। ইহা সর্ব্বদাই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। যতক্ষণ আমরা মনোময় কোষের দার্শনিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত ততক্ষণ দৃশ্য অন্তরেই থাকুক বা বাহিরেই থাকুক দৃশ্য বস্তু কেবলই রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে। যে স্তরে আমাদের দর্শনে দৃশ্য কেবলই রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে সেই স্তরই 'মনোময় কোষের দর্শন বলিয়া জানিতে হইবে'।

এই পরিবর্তন কি অংশে এবং কিভাবে হইয়া চলিয়াছে এসম্বন্ধে বিচারের সূত্রপাত করিলে একটা প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। আমাদের অহঙ্কারের আশ্রয়ে আমাদের মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ বদ্‌লাইয়া চলিয়াছে। এরূপ বদ্‌লাইয়া যাইবার দরুণ আমরা নিত্য আকারে, প্রকারে, শক্তিতে এবং ভাবে নূতন মানুষ হইয়া যাইতেছি। আমাদের চক্ষের সাম্‌নে ঐ দৃশ্য বৃক্ষটী রহিয়াছে, ঐ বৃক্ষেরও অভিমান আছে। বৃক্ষের ঐ অভিমান-আশ্রয়ে বৃক্ষের অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় কোষ নিত্য বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। তাই আমরা নিত্য নূতন আমিত্বের মধ্যদিয়া ঐ বৃক্ষটীকে নিত্য নূতন রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিতেছি। সেও তাহার আমিত্বের আধারে নিত্য নূতন রূপটী লইয়া আমাদের নিকট নিত্য নূতন দৃশ্য হইয়া চলিয়াছে। আমাদের পারিপার্শ্বিক স্থিতি ও উহার পার্শ্বিক স্থিতি সময়ের গতিতে প্রতি মুহূর্তে বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাকে আমি যেরূপভাবে পাইতেছি পর মুহূর্তে আমি আর সেরূপটী থাকি না। তাহাকেও একরূপে দুইটীবার পাইবার উপায় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার উপর দিয়া নূতন সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, আবার প্রতি মুহূর্তে তাহার মধ্যস্থিত বহু অংশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই দৃশ্যটা আমার মনের ভিতরে কি বাহিরে ইহা লইয়া ঝগড়া করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আমার মন ঐ দৃশ্যের অস্তিত্ব দাতা নহে; উহার অস্তিত্বের মূলে উহার অভিমান অবস্থিত। তাই আমার মনোময় কোষ নিদ্রাবস্থায় জড়তায় পরিণত হইলে ঐ দৃশ্যের বা বৃক্ষের অস্তিত্ব সকলের নিকট জড়তায় পরিণত হয় না।

বিজ্ঞানের দৃশ্যটা মনোময় কোষের দৃশ্যের মত পরিবর্তনশীল নহে। বিজ্ঞানের দর্শনে দৃশ্য আছে, দ্রষ্টা আছে এবং দর্শন-শক্তিও আছে, কিন্তু অনুভূতিতে এই তিন বস্তুর কোনই ভেদ নাই। দর্শনের এই স্তরে এই তিনই একরূপ প্রাপ্ত হয়। অনুভূতিতে এই তিন বস্তুর একরূপতা প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ দর্শনে দৃশ্য-পরমাণুর রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। একটা বস্তুকে দেখিলে সেই দৃশ্য বস্তুস্থিত রূপকণাগুলি আমাদের বিজ্ঞানের কেন্দ্রে চলিয়া আসে। আসিবার সঙ্গেই আমাদের বিজ্ঞানময় কোষে যে বোধের তরঙ্গ উত্থিত হয় উহা লোহিতবর্ণে পরিণত হয়। স্থূল দৃশ্যের মধ্যে যত প্রকার রূপেরই (রং এর) বিচিত্রতা থাকুক না কেন বিজ্ঞানের কেন্দ্রে সবই লোহিতবর্ণ হইবে। পূর্ব্বে শিব-অধ্যায়ে বলিয়াছি বাহ্য বিষয়ের সংযোগ আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই প্রথম হয়। পরে সেই বোধধারাই মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্রে চলিয়া আসে। দৃশ্যস্থিত রূপ-পরমাণু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানময়কোষে থাকে ততক্ষণ উহা লোহিতবর্ণ-বোধই থাকিবে। পরে মনোময় কোষে সেই দৃশ্য কণাগুলি প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন রং-এ বিভক্ত হইয়া যাইবে। এখানে স্থূল দৃশ্যে যেরূপ লাল, নীল, পীত ইত্যাদি থাকে সেই রূপেই পরিণত হইবে। অনেকে কোন কোন বিশেষ রং দেখিতে পায় না। ইহার কারণ তাহাদের মনোময় কোষে সেইরূপ রংকে ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি কখনও সেই স্তব্ধতা কাটিয়া যায় তবেই তাহারা সেই রংটীকে ঠিক দেখিতে পাইবে। যাহা হউক এখানে আমরা বিজ্ঞানময় কোষ লইয়া আলোচনা করিতেছি। সেই বিজ্ঞানের দৃশ্যকণার সঙ্গে বিজ্ঞাতার রূপের কোনই ভেদ থাকে না। দৃশ্যের সঙ্গে ভেদ আসিলেই দৃশ্য পরমাণু মনোময় কোষে প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের শেষ-স্তরে জ্ঞানের বিকাশ।

আর বিজ্ঞানে ভেদ হইলেই মনোময় কোষে প্রবেশ হয়। বিজ্ঞান হইতে জ্ঞানের স্তর এবং মনের স্তর বুঝিবার জন্য পাঠকগণ ইহা মনে রাখিবেন।

বিজ্ঞান-স্তর মনোময় কোষের পরপারে। বিজ্ঞানের স্তরে আসিলে আমাদের নিকট (বিজ্ঞাতার নিকট) অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। এখানে রূপ-পরমাণু, রস-পরমাণু, স্পর্শ পরমাণু ও গন্ধ-পরমাণুর খেলা মাত্র। এখানে এক জাতীয় পরমাণু অন্য জাতীয় পরমাণুর সহিত মিশে না। বিজ্ঞাতাও একসঙ্গে দুই জাতীয় পরমাণুর জ্ঞাতা হন না। প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুই স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নিত্য। এখানে লীলা নাই, পরিবর্ত্তন নাই অন্তর বাহির নাই। মনোময় কোষে আমরা যে সৃষ্টির বিচিত্র লীলা দর্শন করি এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানে কেবলই পরমাণুর খেলা। যখন রস-পরমাণুর সঙ্গে বিজ্ঞাতা একাকারে স্থিত হন, তখন শুধু রসবোধ বিদ্যমান। অন্য কোন পরমাণু কোন কালে আছে কি নাই তাহার কিছুই জানা যায় না। মনোময় কোষস্থিত চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি (উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ) কোন কালে ছিল কি হবে এরূপ কোন স্মৃতি পর্য্যন্ত ফুটিবে না। এ যেন সুষুপ্তির একটা স্তর; বোদ্ধা, বোধিত বিষয় এবং বোধ-শক্তি একই বোধ-সাগরে নিমজ্জিত। ইহা সমাধির এক একটি স্তর। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিজ্ঞান-স্তরও সৃষ্টির একটা স্তর মাত্র। এখানে বোদ্ধার সহিত শরীর, প্রাণ ও মনোময় কোষের স্মৃতিসম্বন্ধ থাকে না।

বিজ্ঞানের স্তরে অন্তর বাহির দুই-ই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানে বিজ্ঞান; দৃশ্যের বিজ্ঞান, স্পর্শের বিজ্ঞান, গন্ধের বিজ্ঞান ও রসের বিজ্ঞান। এখানে বিচার ফুটিবে না (গণেশ বা বিচারাংশ দেখুন), আকার ফুটিবে না (সূর্য্য বা লীলা অংশ দেখুন), সুখ দুঃখ ফুটিবে না (বিষ্ণু বা চিত্ত অংশ দেখুন), ভেদও ফুটিবে না (শিব বা অভিমান অংশ দেখুন)। ভেদ ফুটিবে না সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটী বিজ্ঞান-বোধের সঙ্গে শান্তিবোধ অংশ বিদ্যমান থাকে। অভিমানের কেন্দ্র হইতে দুইটী শক্তি নির্গত হয়; উহার একটীতে দ্রষ্টার ভেদভাব আনয়ন করে, আর অন্যটীতে শান্তি-বোধ স্থাপন করে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরে বলা হইবে। দৃশ্যস্থিত রূপ-পরমাণু, দর্শন-শক্তি ও দ্রষ্টা একই লোহিতবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে আত্মহারা। স্পর্শস্থিত স্পর্শ-পরমাণু, স্পর্শন-শক্তি এবং স্পর্শ-বিজ্ঞাতা একই ধূম্রবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে আত্মহারা। গন্ধ-পরমাণু, ঘ্রাণ-শক্তি এবং ঘ্রাণ-বিজ্ঞাতা একই পীতবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে আত্মহারা।

অনেক সাধককে বলিতে শুনা যায় "এমন একটি স্তরে চলিয়া আসিলাম, যেখানে আমি আমার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিলাম এবং কি হইল কিছুই বলিতে পারিলাম না।" এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা মনোময় কোষে ভাব-জগতের উপর স্তরের কোন খবরই রাখেন না। উহা একটা ভাবের খেলা মাত্র। উহা কতকটা শূন্য ভাব*। শূন্য ভাব ও শূন্য বোধ এক বস্তু নহে, ইহা পাঠকগণ মনে রাখিবেন। শূন্য-ভাব হইতে শূন্য-বোধ অনেক উন্নত স্তরের অনুভূতি। কাম-ভাব, শান্তি-ভাব, শূন্য-ভাব ও শোক-ভাব সবই এক ভাব-জগতের খেলা মাত্র। বোধ-জগৎ ইহা হইতে উন্নত-স্তরে (অবস্থিত) মাত্র। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতির সময় শরীর হয়ত স্তব্ধ বা জড়-পিণ্ডের মত অবস্থিত হইতে পারে,

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এস্থলে "শূন্য ভাব" শব্দ দুটির সংযোজন দ্বারা বাক্যকে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু শরীরের এ অবস্থার কথা বিজ্ঞানের অনুভূতিতে স্থিত সাধক জানিতে পারিবেন না। শরীরের জড়তা আসিলেও একথা সত্য যে বিজ্ঞাতা সেখানে জড়তা প্রাপ্ত হন না। বিজ্ঞাতা সেখানে জাগ্রত, মনোময় কোষ স্তব্ধ থাকিলেও ও শরীর নিশ্চল হইয়া গেলেও বিজ্ঞাতা তাহার জ্ঞান-শক্তি হারায় না। কাজেই কেহ যদি বলেন যে 'একস্তরে আসিয়া আমি আমার জ্ঞান হারাইলাম' তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি চিত্তকেন্দ্রস্থিত কোন ভাবে আত্মহারা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, বিজ্ঞানময় কোষে আসেন নাই। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতিতে শরীর এবং মনের জড়তা আসিলেও সাধকের জ্ঞান-শক্তির জড়তা আসে না। পাঠকগণ আরও জানিয়া রাখুন যে আমাদের জ্ঞান-শক্তির জড়তা কোন অবস্থাতেই আসে না; জ্ঞান-শক্তির জড়তা আসিলে শরীর সেই মুহূর্তেই আত্মা হইতে খসিয়া পড়িবে। ক্রমে এসব কথা আরও স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতির ভেদ স্থির করিলে পাঠকগণের পক্ষে বুঝিতে সুবিধা হইবে। একটা পাকা আম ও একটী শশা হাতে লও। আম ও শশাটী হইতে গন্ধ-পরমাণু ব্যাপ্ত হইয়া চলিয়াছে; তুমি দুই রকম গন্ধই অনুভব করিতেছ। আম ও শশাটী হইতে এক এক প্রকার রূপ-পরমাণু নির্গত হইয়া চলিয়াছে। তুমি এই উভয় রূপটীই দেখিতেছ। আমটী ও শশাটী তোমার হাতেই আছে। আমটী হইতে শশাটীর স্পর্শ একটু ঠাণ্ডা। আমটী ও শশাটী হইতে স্পর্শপরমাণু (বায়বীয় পরমাণু) সর্বদা নির্গত হইয়া চলিয়াছে। তুমি তোমার হাতে উভয়-স্পর্শের ভেদসহ অনুভব করিতেছ। আম ও শশার আকার এক প্রকার নহে। ইহারা তোমার হাতে স্থিত হইলেও ইহারা তোমা হইতে অন্য বস্তু, ইহাও তুমি বুঝিতেছ। এরূপ ভেদ বিচার সহ যে জ্ঞান উহাই মনোময় কোষের জ্ঞান।

বিজ্ঞানময় কোষের বোধ ওরূপ হইবে না। বিজ্ঞানের স্তরে আসিলে তোমার অভিমান, চিত্ত (সূর্য্য ও বিষ্ণু), বুদ্ধি এবং মন-অংশের কাজ থাকিবে না। সেখানে তোমার আমিত্বও একটা বিন্দুরূপে পরিণত হইবে। বিজ্ঞানের স্তরে আমি, তুমি, রাম, শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় না। সুতরাং এখানে আমরা 'বোদ্ধা' বা 'বিজ্ঞাতা' এরূপ প্রতিশব্দে কর্ত্তার প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিব। বিজ্ঞান স্তরে না আসিলে বিজ্ঞান-বোধ ঠিক বুঝা যাইবে না। পাঠকগণ সুষুপ্তির স্তরে নিজেদের অবস্থিতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ বুঝিতে চেষ্টা করুন। আম ও শশা হইতে দুই প্রকারের গন্ধ-পরমাণু ব্যাপ্ত হইয়া চলিয়াছে। বোদ্ধার সঙ্গে উহার সংযোগ হওয়া মাত্র বোদ্ধার বোধের যে স্তরে অবস্থিতি হইবে উহা গন্ধ-বোধের ক্ষেত্র। উহা একটি পীতবর্ণের ব্যাপক শান্তিবোধ মাত্র। বোদ্ধা, বোধ-শক্তি এবং ঐ গন্ধ-পরমাণু একই বোধ-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। এখানে আম ও শশার গন্ধের কোন পার্থক্যবোধ ফুটিবে না (সুষুপ্তিতে গোলাপ ও বিষ্ঠার গন্ধের যে কোন পার্থক্য থাকে না ইহা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারেন)।

আম ও শশাটী হইতে দুই প্রকারের রসজ-পরমাণু নির্গত হইয়া চলিয়াছে। তুমি আম ও শশা হইতে এক এক টুক্‌রা কাটিয়া নিজের জিহ্বার উপর রাখিলেই বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক উহার সহিত বোদ্ধার সংযোগ হইলে বোদ্ধা শুভ্রবর্ণ বোধ-সাগরে ডুবিয়া যাইবে।

আম ও শশাটী হইতে সর্ব্বদা রূপজ-পরমাণু বাহির হইয়া চলিয়াছে অর্থাৎ রূপ-কণা নির্গত হইয়া চলিয়াছে। বোদ্ধার সঙ্গে ইহার সংযোগ হইবা মাত্র বোদ্ধা বিজ্ঞানের যে স্তরে স্থিত হইবেন উহা রূপ-বোধের স্তর হইবে। বোদ্ধা, রূপ-বোধ শক্তি এবং রূপ-পরমাণু একই লোহিতবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধের স্তরে ডুবিয়া যাইবে। এখানে বিজ্ঞানের স্তর, সুতরাং আম ও শশার রূপের ভেদ ফুটিবে না।

আম ও শশাটী হইতে এক এক প্রকার স্পর্শজ পরমাণু নির্গত হইয়া চলিয়াছে, যে কারণ তোমার হাতে আমটী হইতে শশাটী একটু ঠাণ্ডা মনে হইতেছে। ঐ স্পর্শ-পরমাণু বোদ্ধার সহিত মিলিত হইলে বোদ্ধা ধূম্রবর্ণ বোধে পরিণত হয়। বোদ্ধা, স্পর্শ-শক্তি ও স্পর্শ-পরমাণু একই ধূম্রবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে ডুবিয়া যাইবে।

এই আম ও শশাটী সম্বন্ধে বিচার করিয়া আমরা যে সব তত্ত্বের সন্ধান পাইলাম তাহাতে আমরা বলিতে পারি ঐ শশা ও আমে বাস্তবিক কতকগুলি পরমাণুর সংস্থান আছে। উহারা গন্ধ-পরমাণু, রস-পরমাণু, তেজঃ-পরমাণু ও বায়ু-পরমাণু। এইরূপ বিচার করিলে এই সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুর উপাদানেই কতকগুলি পরমাণুর সংস্থান পাওয়া যাইবে। এক স্তরে শশাটী, আমটী ও আমাতে আকারে, রূপে ও স্থিতিতে ভেদ আছে। ইহা শশা, আম ও আমার মনোময় কোষ এবং প্রাণময় কোষ। শশা ও আমটীর প্রাণময় ও মনোময় কোষকে ভাঙ্গিয়া দিলে উহারা কতকগুলি পরমাণুতে পরিণত হইবে। প্রাণময় কোষ সেই পরমাণুগুলিকে একত্র জড়পিণ্ড করিয়াছিল। উহাদের মধ্যস্থিত মন-অংশ উহাদের আকারটি ফুটাইয়াছিল। উহাদের মধ্যস্থিত অভিমান উহাদিগকে পরস্পর হইতে এবং আমা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিল। উহাদের মধ্যস্থিত চিত্ত অংশ উহাদের মধ্যে না থাকিলে উহাদের সুখদুঃখ বোধ থাকিত না। সুখদুঃখ বোধ না থাকিলে উহাদের মধ্যস্থিত প্রাণ উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিত না। উহার একটিতে একটা কাঁটা ফুটাইয়া দাও, দেখিবে উহা হইতে রস ক্ষরিত হইতেছে (ফল যখন গাছে থাকে তখন এরূপ পরীক্ষায় ঠিক ফল পাওয়া যাইবে। মৃত ফলে সব সময় এইরূপ পরীক্ষায় ঠিক ফল নাও আসিতে পারে)। কিছুক্ষণ মধ্যে দেখিতে পাইবে কোন শক্তি বলে সেই ছিদ্রটি বন্ধ হইয়া রস পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চিত্ত-অংশ যে উহাদের মধ্যে আছে, সুখ-দুঃখ বোধই তাহার প্রমাণ। বুদ্ধি-কেন্দ্র উহাদের মধ্যে কিরূপ কাজ করে উহা বুঝা একটু কঠিন। যাহা হউক উহাদের মনোময় এবং প্রাণময় অংশ ত্যাগ করিয়া আমরা যদি ইহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে আমরা ইহা বুঝিতে পারিব যে উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরমাণুর সংস্থান রহিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞানময় কোষের এক অংশ। বিজ্ঞানময় কোষের আরও উন্নত অংশ রহিয়াছে; ঐ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। উন্নত বিজ্ঞান-স্তরে ইহা বুঝা যাইবে যে ঐ যে পরমাণু উহারা কতকগুলি ধ্বনি বা শব্দের সমষ্টি মাত্র।

শিব-অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে কোন বাহ্য বস্তুর প্রথম সংযোগ আমাদের বিজ্ঞানের স্তরে প্রথম হয়। ক্রমে উহা মনোময় কোষের বিভিন্ন-কেন্দ্রে চলিয়া আসে। বিজ্ঞানের স্তরে বোদ্ধা, বোধ-শক্তি এবং বিষয়ের মধ্য হইতে বিনির্গত পরমাণু একই রূপতা প্রাপ্ত হয়। বোদ্ধা, বোধ-শক্তি এবং বোধিত বিষয়ের পরমাণু একই রূপে পরিণত হইলেও এই তিনটিতে গুণের বৈষম্য অবস্থান করে - অর্থাৎ বোদ্ধাতে বিজ্ঞানের সত্ত্বগুণের অবস্থান থাকে, বোধশক্তিতে বিজ্ঞানের রজোগুণ বিদ্যমান থাকে এবং বোধিত

বিষয়-পরমাণুতে বিজ্ঞানের তমোগুণের প্রধানতা থাকে। গুণের এই বৈষম্য না থাকিলে বিজ্ঞানময় কোষ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই বিজ্ঞান-স্তরকে এই ত্রিগুণ তিনভাগে ভাগ করিয়া জীবিত রাখিয়াছে।

বিজ্ঞান-স্তরের এইসব বিষয় লইয়া বেশী আলোচনা প্রয়োজন মনে করি না, কারণ ইহা বুঝিতে পারে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যাইবে। যাঁহারা বুঝিবার মত শক্তিশালী তাঁহারা এই সামান্য ইঙ্গিতেই সব বুঝিতে পারিবেন। স্থূল সৃষ্টির মূল রহস্য এই বিজ্ঞানের স্তরেই অবস্থিত। মানুষ মনোময় কোষে দাঁড়াইয়া এই স্থূল সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে সব জল্পনা কল্পনা করে তাহার কোনটাই সত্য নহে। ক্রম-বিকাশের পথে বিজ্ঞান-স্তরের আলোচনা করিলে একথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ক্রম-বিকাশবাদ এবং ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে এখন দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। ক্রম-বিকাশে যাঁহার বিকাশ যতটা উন্নত-স্তরে আসিবে তিনি সেখান হইতেই বিবর্ত্তন সাজাইবেন। যাঁহার বিকাশ মনোময় কোষ পর্য্যন্ত হইয়াছে তিনি সৃষ্টি তত্ত্বে মনোময় কোষই (ভাববাদ) ফুটাইয়া তুলিবেন। যাঁহার বিকাশ বিজ্ঞান-স্তর পর্য্যন্ত আসিয়াছে তিনি বিজ্ঞান হইতেই সৃষ্টির বিবর্ত্তন সাজাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। যাঁহারা মানুষের ক্রম-বিকাশকে পশুত্বের সীমায় আবদ্ধ করিতে চান তাঁহারা সৃষ্টির কতটুকু অংশ জানিতে পারেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীবের ক্রম-বিকাশটা ঠেলিয়া ঠুলিয়া পশু-স্তরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন মাত্র। ঋষিগণ এই ক্রম-বিকাশকে শক্তি স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্যই সৃষ্টিতত্ত্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনের স্তরের কথাই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিয়া চলিয়াছেন। ওদেশের কর্ম্মিগণও কর্ম্মবিজ্ঞানকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আসুরিকতার পরপারে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। ঋষিগণ এই কর্ম-বিজ্ঞানের পূর্ণস্তরে নিষ্কাম-কর্ম ও শেষকালে কর্মযোগে ঈশ্বরত্বকেও মূর্ত্তি করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অটোক্রেসি হইতে ডিমোক্রেসি, পরে সোসিয়ালিজ্‌ম, কমিউনিজ্‌ম যাহাই দাঁড় করান না কেন উহার পরিণতিতে কিছুদিন বাদ আসুরিকতা আসিয়াই যাইতেছে। খাদ্য এবং যৌনসুখই তাঁহাদের ক্রম-বিকাশের ভিত্তি। অন্তর্বিকাশ সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নিতান্ত বালক। পশু পর্য্যন্ত বিকাশ ক্রমটা কতকটা খাদ্য ও যৌনসুখের উপর দাঁড় করান যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্রম-বিকাশ খাদ্য ও স্ত্রীপুরুষ-মিলন-সুখে আবদ্ধ করা যায় না। প্রাণময় কোষ যেটুকুতে তৃপ্ত, মনোময় কোষের তৃপ্তি উহাতে নিয়মিত হয় না। যাহা হউক তাঁহাদের ভুল ঐখানে হইবার দরুণই তাঁহারা মানুষকে পশু-স্তরে নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া অন্নের পিছনে লাগাইয়াছেন। পশুর মত মানুষেরও অন্ন এবং সৃষ্টির লীলাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য যৌন-সুখের বেগ রহিয়াছে, কিন্তু পশুর মত মানুষের বিকাশ ঐখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। এই পর্য্যন্ত প্রকৃতির ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ। ইহার পর মানুষের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ হয়। ইঁহারাই গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু চরিত্রের মানুষ। এই ক্রিয়া-শক্তির বাদ মানুষে প্রকৃতির জ্ঞান-শক্তির বিকাশ হয়। এই জ্ঞান-শক্তির বিকাশে মানুষ বিজ্ঞান ও জ্ঞান-স্তরের সন্ধান দিতে পারে। আবার কর্ম-শক্তিকে শক্তি স্তরের আদর্শে গড়িয়া দিতে পারেন। এই জ্ঞান-শক্তির উপরের স্তরে যখন মানুষের বিকাশ হয় তখন মানুষ পুরুষোত্তম হয়। পুরুষোত্তমের স্তরে আসিয়া দাঁড়াও, তারপর সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা কর। ইহার পর সৃষ্টির

বিবর্ত্তন-লীলা সাজাইলে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ভুল হইবে। দুঃখের বিষয় ভারতের যাঁহারা বড় বড় খ্যাতনামা বিদ্বান্, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারাও পাশ্চাত্যের ঐ অত্যল্প বিকাশ-বিজ্ঞানে নিয়মিত সৃষ্টিতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া ভারতের কর্ম-শক্তিকে সেই ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অদূরদর্শিতা ক্ষমা করা যায় কি না তাহা আজ হইতে ১০০* বৎসর পর বিচার হইবে।

যাহা হউক ক্রম বিকাশের পথে পূর্ণ-বিকাশের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিবর্ত্তন-সিঁড়ি যে কিরূপ হইবে ইহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। ক্রম-বিকাশে মানুষ যেমন উন্নত-স্তরের খবর পাইতে থাকিবেন, তেমনই উন্নত-স্তরে প্রতিষ্ঠিত নীতিকে জগতে স্থাপন করিতে পারিবেন। যাঁহারা বিকাশ-ক্রমকে পশু পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণময় কোষটারই বিকাশ মাত্র বুঝিয়াচেন তাঁহারা ইহার চেয়ে বেশী কথা বলিতে পারেন না। তাঁহারাও শেষকালে মানুষকেও পশু-স্তরে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতে ইহা প্রচারের ফলে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

মানুষের ক্রম-বিকাশকে অন্ন ও যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া মনোবিজ্ঞানের ছাঁচে উন্নত বিকাশের পথে অগ্রসর করিবার চেষ্টা কর দেখিবে ঐ নিম্নস্তরের সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি মানুষের নিকট একটা বাজে কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। কর্মীদের নিকট আমাদের কথা - ‘‘লক্ষ্য অন্ন নহে, লক্ষ্য পূর্ণ-শক্তির বিকাশ’’। ইহা ধরিয়া লইয়া কর্মক্ষেত্রে আগুয়ান হও, দেখিবে ঐসব দর্শন তত্ত্ব দু’চার বছরের মধ্যেই ছেঁড়া কাগজ পত্রের ঝুরিতে চলিয়া গিয়াছে। নিজের বিকাশকে পশুত্বের স্তরে না রাখিয়া পূর্ণ-স্তরে লইয়া চল; দেখিতে পাইবে স্তরে স্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নিত্য নূতন জ্ঞানের আলো পাইয়া চলিয়াছ।

বিজ্ঞানময় কোষে আমরা তন্মাত্র-সৃষ্টির স্তরে আসিয়া যাই। এ স্তরে সর্ব্বভূতের শরীরের সমস্ত উপাদান মাত্রারূপে অবস্থিত থাকে, আর জীব এখানে বীজরূপে অবস্থিত। এসব বিষয়ে পূর্ব্বে শিব-অধ্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে; বিস্তারিত এখানে বলিবার ইচ্ছা নাই। আমরা কর্ম-বিজ্ঞান বুঝিয়া চলিয়াছি এবং ইহাই বুঝিয়া চলিব। ক্রম-বিকাশের পথে আমরা ক্রমেই উন্নত-স্তরে অগ্রসর হইতে থাকিব। আমাদের বিকাশ যখন মনোময় কোষে অবস্থান করে, তখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু বুঝি সেটুকুই সব নহে। পাঠকগণ ইহা মনে রাখিয়া চলুন। বিচার বিজ্ঞান উন্নত-স্তরে স্থাপন করুন দেখিবেন নিম্নস্তরের দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শন আপনার আর ভালই লাগিবে না। অনুভূতির পথে উন্নত-স্তরের বিকাশ আসুক চাই নাই আসুক সেজন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। উন্নত-স্তরের চরিত্র এবং কর্ম-শক্তির বিজ্ঞান বুঝিয়া চলুন, দেখিবেন উন্নত-স্তরের দর্শন অভাবে আপনার কিরূপ অসুবিধা বোধ হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

গন্ধ, রস, রূপ এবং স্পর্শ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছি। এবার আমরা শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিব, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষে শব্দের বোধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এখানে পাঠকগণ মনে রাখিবেন ‘‘শব্দ-তন্মাত্রা ও শব্দ-বিজ্ঞান এক কথা নহে’’। শব্দ-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম পরিণতি শব্দতন্মাত্রা। যাহা হউক গন্ধাদির বিজ্ঞানের সঙ্গে শব্দ-বোধের কি সম্বন্ধ আছে

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ‘‘শত’’ শব্দটি বাহুল্য বিধায় পরিত্যক্ত হল।

তাহাই বলিতেছি। মাত্রার স্পর্শগুলি শব্দময় হইয়াই বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে। রূপ-পরমাণু যখন বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করে তখন বিজ্ঞাতার সঙ্গে ঐ মাত্রার মিলনে যে ক্রিয়া হয় উহাতে 'রং' ধ্বনি উত্থিত হয়। যে কোন স্থানে দুই বস্তুর মিলনে একটা ধ্বনি উত্থিত হয়। এরূপে গন্ধ-পরমাণু ও বিজ্ঞাতা মিলনে 'লং' ধ্বনি উত্থিত হয়; রস-পরমাণু ও বিজ্ঞাতা মিলনে 'বং' ধ্বনি হয়। স্পর্শ-পরমাণু বা বায়বীয় পরমাণু ও বিজ্ঞাতা মিলনে 'যং' ধ্বনি হয়।

পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে যাহাতে জটীলতা না আসে সেইজন্য মস্তিষ্ক-কেন্দ্র চিত্রের সাহায্য লইয়া আমরা মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ বুঝাইব। পাঠকগণ এবার মস্তিষ্ক-কেন্দ্র চিত্র দেখুন। বিজ্ঞানময় কোষে তিনটী কেন্দ্র কাজ করিতে থাকে। একটি গণেশ কেন্দ্র (৭ চিহ্নিত কেন্দ্র), একটি শিব-কেন্দ্র (৪ চিহ্নিত কেন্দ্র) এবং অন্যটী মহৎ-কেন্দ্র (৫ চিহ্নিত কেন্দ্র)। গণেশ-কেন্দ্র মনোময় কোষেও কাজ করে বিজ্ঞানময় কোষেও কাজ করে। শিব-কেন্দ্রও মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষে কাজ দেয়। গণেশ-কেন্দ্র যখন মনোময় কোষে কাজ দেয় তখন ইহা বিচার শক্তিরূপে পরিণত হয়। যখন এই কেন্দ্র বিজ্ঞানময় কোষের কাজে নিযুক্ত হয় তখন ইহার কাজ হয় বোধিত জগতের ভেদ করা; এই জন্যই বিজ্ঞানময় কোষে বোধিত বিষয় সমূহের ভেদ থাকে; অর্থাৎ রসবোধের ও স্পর্শ-বোধের কেন্দ্রে একই বিজ্ঞাতা থাকিলেও বোধের মধ্যে রং এর তারতম্য থাকে। একই বুদ্ধি-কেন্দ্র (৭ চিহ্নিত কেন্দ্র) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে কিরূপ কাজ দেয় তাহা বলা হইল। এবার শিব-কেন্দ্রের (৪ চিহ্নিত কেন্দ্র) দুই প্রকারের কাজের কথা বলা যাইতেছে। পাঠকগণের মনে থাকিবে, ইহাই অভিমান-কেন্দ্র। অভিমান-কেন্দ্র যখন মনোময় কোষে সম্বন্ধ রাখে তখন ইহা দ্রষ্টা ও কর্তার ভেদ করে; অর্থাৎ আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, বৃক্ষ ইত্যাদির কর্ত্তৃত্বের ভেদ সৃষ্টি করে (যেমন একটা বস্তু আমিও দেখিতেছি, রামও দেখিতেছে)। আবার এই অভিমান যখন বিজ্ঞানময়-কোষে সংযোগ রাখে তখন এই অভিমানই বিজ্ঞাতাকে মহত্তত্ত্ব (পূর্ণ-বোধ-কেন্দ্র; ৫ চিহ্নিত কেন্দ্র) হইতে এক স্তর নিম্নে শান্তিবোধে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই অভিমানই বিজ্ঞানময় কোষে সাংখ্যের 'অহং তত্ত্ব'। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটী বোধের সঙ্গে শান্তিবোধ বিদ্যমান থাকে। এই শান্তিবোধ অভিমান কেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত হয়। এই শান্তিবোধ যতক্ষণ বিজ্ঞানের স্তরে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ মহৎ-তত্ত্ব এবং অহংতত্ত্বের ভেদ বিদ্যমান থাকে। এই শান্তিটুকু না থাকিলে অহং-তত্ত্বটী মহৎ-তত্ত্বের কেন্দ্রে মিলিয়া যায়। সুষুপ্তিতে আমরা এই শান্তিবোধেই নিবিষ্ট থাকি। সুষুপ্তির মধ্যে এই শান্তি-বোধটুকুই যদি মিটিয়া যাইত তবে অহং-তত্ত্ব মহৎ-তত্ত্বের কেন্দ্রে চলিয়া আসিত, বা অহং-তত্ত্ব মিলিয়া যাইত। সুষুপ্তিতে উহা হয় না, ইহা সমাধির দ্বারা আয়ত্ত হইয়া থাকে।

শব্দ-বিজ্ঞান অর্থে - বিজ্ঞানময় কোষে ধ্বনি-বোধ বুঝিতে হইবে। শিব-অংশে গন্ধ-তন্মাত্রা, রস-তন্মাত্রা, রূপ-তন্মাত্রা, স্পর্শ-তন্মাত্রা ও শব্দ-তন্মাত্রার কথা বলা হইয়াছে। শব্দ-তন্মাত্রা এবং শব্দের সূক্ষ্মতম বোধ একই কথা। বিজ্ঞানময় কোষে শব্দ-বোধে পাঁচটি ধ্বনি বিদ্যমান, কিন্তু শব্দের সূক্ষ্ম বিজ্ঞানে ঐ পাঁচটী ধ্বনি একটী ধ্বনিতে পরিণত হয়; ইহাই শব্দ-তন্মাত্রা।

‘শব্দ-তন্মাত্রা’ শব্দের বা ধ্বনির সূক্ষ্মতম পরিণতি। শব্দের সূক্ষ্মতম পরিণতিতে শব্দে মাত্র ‘অং’কার বিদ্যমান থাকে; এই ‘অং’কারই অহং-তত্ত্ব। এই ‘অং’কারের ধ্বনি যেখানে যাইয়া একেবারে স্থির হইয়া যায় উহাই ‘ ঃ’ (বিসর্গ)। এই ‘ঃ’ই অব্যক্ত-তত্ত্ব। এই ‘ ঃ’ এবং ‘অং’কার যোগ করিয়া দিলে (ঃ + অং = হং) ‘হং’ হয়॥ (অকারকে বাদ দিলে কোন ধ্বনিই হইতে পারে না, কাজেই ধ্বনি মানিলেই অকার মানিতে হইবে)। সুতরাং শব্দ-তন্মাত্রার সূক্ষ্মতম পরিণতিতে ‘অং’ বা ‘হং’কার বিদ্যমান থাকে।

‘লং, বং, রং, যং, হং’ ইহারা বিজ্ঞানময় কোষের পাঁচ প্রকার বোধের ধ্বনি বোধ। ‘লং, বং, রং, যং এবং হং’ ইহারা ৫টী বিজ্ঞান-ধ্বনি। ইহাদের মধ্যে ‘হং’কার এই ধ্বনি পাঁচটীরও সূক্ষ্মতম পরিণতি। তাই ‘হং’কারই শব্দের সূক্ষ্মতম মাত্রা। ইহার মধ্যে ‘অং’কার ক্রিয়াশীল মাত্রা এবং ‘ ঃ’ ক্রিয়াশীলতার শেষ আধার।

বিজ্ঞানময় কোষের বোধের দুইটা দিক আছে। উহারা স্পর্শ-বোধ এবং ধ্বনি-বোধ। গন্ধ-পরমাণু, রস-পরমাণু, রূপ-পরমাণু এবং স্পর্শ-পরমাণু। স্পর্শের সহিত ‘লং, বং, রং, যং’ ধ্বনিও বিদ্যমান থাকে। এবার আমরা বিজ্ঞানের বোধের মধ্যে স্পর্শ-অংশ ত্যাগ করিয়া ধ্বনি-অংশে স্থিত হইতে চাই। বিজ্ঞাতা যদি বোধের মধ্যে স্পর্শ-অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্বনি অংশে স্থিত হইতে পারেন তবেই বিজ্ঞাতা শব্দ-বিজ্ঞানে স্থিত হইলেন। শব্দ-বিজ্ঞানে ‘লং, বং, রং, যং’ এবং ইহাদের সূক্ষ্মতম মাত্রাতে ‘হং’ এই পাঁচটী শব্দ বিদ্যমান। তুমি সুষুপ্তির স্তরে নিদ্রিত আছ; তোমার নিকট দুইজন লোক বাক্‌যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ঝগড়া করিতেছে। তুমি হঠাৎ জাগিয়া দেখিলে দুইজন লোক ঝগড়া করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে তুমি বুঝিতে পারিলে যে ইহাদেরই ঝগড়ার জন্য তুমি জাগিয়া গিয়াছ। এবার তুমি বিচার কর “তুমি কেমন করিয়া জাগিলে”। তুমি যদি উহাদের ঝগড়ার শব্দ না শুনিতে পাইতে তবে তুমি জাগিতে পারিতে না। আর যদি তুমি উহাদের ঝগড়ার বিষয় কোন কথা শুনিয়া থাক তবে তুমি বল, তুমি কি শুনিয়াছ? এখানে তোমার শুনা যদি অসিদ্ধ হয় তবে তোমার জাগিয়া উঠাও সিদ্ধ হয় না। আবার তোমার শুনা যদি সিদ্ধ হয় তবে তুমি কেন বলিতে পারিবে না “তুমি কি শুনিয়াছ”? এবার নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর :-

বিজ্ঞানময় কোষে ধ্বনিগুলির মূল অংশ শ্রুত হয়; অর্থাৎ যত রকমের কথাই হউক না কেন, বিজ্ঞানময় কোষে ‘হং, যং, রং, বং এবং লং’ ভিন্ন কোন ধ্বনিই বিজ্ঞাত হইবে না। অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত ১৬টী স্বর এবং ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৩৪টি ব্যঞ্জনের সৃষ্টির মূলে ‘হং, যং, রং, বং এবং লং’ শব্দস্থিত ধ্বনিগুলিই বিদ্যমান।

‘হং, যং, রং, বং এবং লং’ এই শব্দগুলির মধ্যে যে কয়টা মূল ধ্বনি আছে উহা বাহির করিয়া লওয়া যাক্।

ঃ + অ + ং = হং

ই + অ + ং = যং

ঋ + অ + ং = রং

উ + অ + ং = বং

৯ + অ + ং = লং

এই কয়টীতে ঃ, অ, ং, ই, ঋ, উ এবং ৯ এই ৭টী ধ্বনি বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে মন্ত্র-অংশে বর্ণিত অ, ই, উ, ঋ, ৯, ং এবং ঃ এই ৭টী ধ্বনিই বিদ্যমান আছে।

ধ্বনিগুলি অনাদি শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিলেও মহতের মধ্য দিয়াই ইহারা ধ্বনি-আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমস্তটা সৃষ্টিই (জ্ঞান সৃষ্টি, বিজ্ঞান সৃষ্টি, মানস সৃষ্টি ও স্থূল সৃষ্টি) মহতের মধ্য দিয়া অনাদি শক্তি হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। অ, ই প্রভৃতি শক্তিরূপে অনাদি কিন্তু মহৎ-তত্ত্বের মধ্য দিয়া না আসিলে ইহারা ধ্বনি রূপে পরিণত হইতে পারে না। যতক্ষণ ইহারা ধ্বনিরূপে পরিণত হইবে না, ততক্ষণ জীবের কণ্ঠ হইতে ইহারা ধ্বনিরূপে* বিকশিত হইতেও পারে না। ইহারা যতক্ষণ অনাদি শক্তিরূপে অবস্থিত ততক্ষণ ইহারা শক্তি বা সৃষ্টির মূল উপাদান। ইহারা তখন আমাদের শ্রুতির বিষয় হয় না। শক্তিস্তরে শক্তিকণার গতি আছে, কিন্তু ধ্বনি নাই। পরে যথাসময়ে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল। সমস্তটা সৃষ্টিই মহতের কোলে অবস্থিত। মহৎ হইতে ধ্বনিগুলি কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে তাহা আমরা পরে বলিতেছি।

'কং, খং, গং, ঘং, ঙং' এই শব্দগুলি বিজ্ঞানের কেন্দ্রে কেবল 'হং হং হং হং হং (?)' এরূপ বিজ্ঞাত হইবে। এই বিজ্ঞানে শান্তি-মিশ্রিত স্ফটিক বর্ণ মাত্র ফুটিবে। এই ৫টী ধ্বনিতে কেবল 'সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ' এর ভেদ মাত্র হইবে; অর্থাৎ 'কং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) সত্ত্ব-গুণ-সম্পন্ন 'হং' (?), 'খং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) সত্ত্বঃ-রজঃ মিশ্রিত গুণ সম্পন্ন 'হং' (?), 'গং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) রজো গুণ সম্পন্ন 'হং' (?), 'ঘং' এর প্রতিনিধি রজস্তমঃ গুণ সম্পন্ন 'হং' (?) এবং 'ঙং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) তমোগুণসম্পন্ন 'হং' (?) হইবে। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমোভেদে সমস্ত 'ক' বর্গে একই 'হং' অবস্থিত। বিজ্ঞানের স্তরে ক বর্গের প্রতিনিধি 'হং' (ইহার উচ্চারণ ঠিক 'অং'কারের মত; এসম্বন্ধে পরে বলা হইবে)। যত উচ্চ স্তরেই চিৎকার কর, আর ধীরেই বল, বিজ্ঞানময় কোষে সব ধ্বনিই একই মাত্রাতে বিজ্ঞাত হইবে। তুমি তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তোমার শরীরের কোন এক স্থানে খুব ধীরে স্পর্শ কর, বিজ্ঞানের স্তরে ধ্বনি-কম্পন বিজ্ঞাতাকে উহা হইতে অতি ধীরে স্পর্শ মাত্র করে; চীৎকারেও উহা অতি সামান্য স্পর্শ-বোধ হইবে। ধীরে বলিলেও ঠিক ঐরূপই হইবে। বিজ্ঞানের বোধে শব্দের উচ্চ বা ধীরের ভেদে কোন ভেদ হইবে না। যে কোন শব্দ-বোধই উচ্চ এবং ধীরে একই পরিমাপে বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করিবে। 'ক'কে যত উচ্চৈই বল, আর ধীরেই বল,

---

* এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে ধ্বনিগুলি যে "শক্তি" ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাহারা বুঝিতে চাহে তাহারা উপযুক্ত গুরুর নিকট বীজ মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১০/ ৫ দিন মন্ত্রযোগ অবলম্বন করিয়া সাধনা করুন। মন্ত্রশক্তির প্রভাবে মনে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় বুঝিতে পারিবেন। বহুদিন সাধনার পর ধ্বনিগুলির মধ্যে যে শক্তির সংস্থান আছে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

উহা খ হইতে কম বেগে বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করিবে। ওখানে ক, খ এর ভেদ আছে, কিন্তু একই ধ্বনির উচ্চ নীচ ভেদ নাই।

'চ' বর্গের বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'যং'; অর্থাৎ চং, ছং জং, ঝং, ঞং, বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে না। ইহাদের যে কোন শব্দের বিজ্ঞান প্রতিনিধি 'যং'; ইহা ধূম্রবর্ণ শান্তি-বোধ। ট বর্গের (টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং) বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'রং'; ইহা লোহিতবর্ণ শান্তি-বোধ। প বর্গের (পং, ফং, বং, ভং, মং) বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'বং'; ইহা শুভ্রবর্ণ শান্তিবোধ। ত বর্গের (তং, থং, দং, ধং, নং) বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'লং'; ইহা পীতবর্ণ শান্তি-বোধ। বোধটাই ধ্বনি জানিতে হইবে। অর্থাৎ পীতবর্ণ শান্তি-বোধ এবং লং ধ্বনি এক কথা জানিতে হইবে। সাধক বোধে ডুবিয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন। বোধের কম্পন স্পন্দন বা ক্রিয়া আছে। ক্রিয়া হইলেই ধ্বনি হইবে। যাহা হউক পাঠক জানিয়া রাখুন বোধই এখানে ধ্বনি, সাধক ভূতশুদ্ধির স্তরে অবস্থিত হইয়া লং জপ করুন, দেখিবেন পীতবর্ণ শান্তি-বোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা সুষুপ্তিতে স্থিত হইলে আমাদের বিজ্ঞানময় কোষ যে জাগ্রত থাকে তাহার প্রমাণ আমরা দিয়াছি। আবার সুষুপ্তিকালে আমরা যে ধ্বনি শুনিতে পাই কিন্তু কি শুনিলাম উহা কেন বলিতে পারি না উহা মোটামুটি বুঝিয়া লইলাম; অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আমাদের বিজ্ঞানময় কোষ জাগ্রত থাকে, আর বিজ্ঞানময় কোষে 'হং, যং, রং, বং, লং' ভিন্ন অন্য কোন ধ্বনিও প্রবেশ করে না। সুষুপ্তিতে মনোময় কোষ অর্থাৎ চিত্ত, বুদ্ধি এবং মন অংশ নিদ্রিত থাকিলেও আমরা বিজ্ঞান স্তরের মধ্য দিয়া ধ্বনিরূপেই গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ মাত্রাকে বোধ করিয়া থাকি। একটী ছোট বটবীজের মধ্যে একটী বটবৃক্ষ যেমন সূক্ষ্ম রূপে বিরাজ করে, ঠিক সেইরূপ মাত্রা বোধ-বীজের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধমাত্রা) মধ্যে আমাদের জ্ঞেয় বিষয়ের সমস্ত উপাদান বীজরূপে অবস্থান করে। মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্র স্পর্শ করিয়া সেই মাত্রা স্পর্শটী নাম, রূপ, আকার, দেশ, কাল, পাত্র, ভাল, মন্দ, প্রিয়, অপ্রিয়, রূপে পরিণত হয়।

জীবের প্রাণক্রিয়া ও মনের চিন্তাগুলিও ধ্বনিময়; সেই সব ক্রিয়াও ধ্বনিরূপে আমাদের বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়াই আমাদের মনোময় কোষের নিকট উপস্থিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোনস্থানে নিদ্রিত আছি; কোন কিছু ভীষণ বিপদের সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বক্ষণেই জাগিয়া গেলাম। সেই সময়েও বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়া বোধধারা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছে। জাগিয়াই দেখা গেল ''কালরূপী শত্রু নিকটে অবস্থিত''। সে নিতান্ত নিঃশব্দে নিজের কাজ হাসিল করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহার মনোময় কোষে উত্থিত ভাবরাশি ধ্বনিরূপে আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া শত্রুর মানসক্রিয়া ধ্বনিরূপে আমাদের বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করে ইহার প্রমাণ বহুলোকই নিজের জীবনে বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞান-বোধের দুইটা দিকের একটা ধ্বনি-বোধ এবং অন্যটা স্পর্শ-বোধ। স্পর্শ-বোধের সহিত বিজ্ঞানের বোধের শান্তি-বোধ বিদ্যমান থাকিবে; অর্থাৎ এই শান্তি বোধ যতক্ষণ বিদ্যমান ততক্ষণ বিজ্ঞানের স্তরে স্পর্শ-বোধ হইতেছে এবং 'অহঙ্কারটী' আছে জানিতে হইবে। বিজ্ঞানের বোধে শান্তি-বোধটী না থাকিলে স্পর্শ-বোধটী আর ফুটিবে না। তখন ধ্বনি-বোধ

(স্ফটিকবর্ণ বোধ) মাত্রই বিদ্যমান থাকিবে। (সুষুপ্তিতে ধ্বনি-বোধ এবং শান্তি-বোধ দুইই বিদ্যমান থাকে)।

কথাগুলি একটু পরিষ্কার করিয়া দিই। বিজ্ঞানময় কোষে ৩টী কেন্দ্রে কাজ হয়। একটী বুদ্ধি-কেন্দ্র; ইহার কাজ হইল স্থিরভাবে একটা বস্তুকে ধরিয়া রাখা। দ্বিতীয়টী অহঙ্কার কেন্দ্র; ইহার কাজ হইল শান্তিকে বিকিরণ করা। তৃতীয়টী মহৎ-তত্ত্ব; ইহাই বোধ-শক্তি। বোধ (জ্ঞান), শান্তি এবং স্থিরতা এই তিনটী মিলিয়া বিজ্ঞানময়কোষের অনুভূতি হয়। গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ বিজ্ঞানের প্রত্যেকটীতেই ঐ তিনটা কেন্দ্রীয় শক্তি বিদ্যমান। বোধ মানেই ধ্বনিবোধ, ধ্বনিগুলিই বোধ বা জ্ঞান-প্রতীক। মহৎ-তত্ত্বের কেন্দ্রে বোধকে আমরা ধ্বনি-বোধ নামে প্রকাশ করিতে পারি।

মহৎ-কেন্দ্রকে মিটাইয়া দিলে বোধ আর হইবে না। অহঙ্কার কেন্দ্রকে মিটাইয়া দিলে কোন বোধ ধারাই মনোময় কোষে প্রবেশ করিবে না। বিশুদ্ধ বোধ বিজ্ঞান-কেন্দ্রে আসিয়া বিভক্ত বোধ হয়, অহং-কেন্দ্রে আসিয়া উহাতে শান্তি সংযুক্ত হয় এবং এই শান্তি-বোধের মধ্য দিয়াই উহা মনোময় কোষে প্রবেশ করে।

প্রথমে 'ধ্বনি-বোধ'। এই ধ্বনি-কেন্দ্রেই মহৎ-কেন্দ্র। সমস্তটা সৃষ্টিই এই মহতের আশ্রয়ে অবস্থিত। এই মহৎই (গীতার) মহৎ ব্রহ্ম। এই মহৎ ব্রহ্মই জীবমাত্রের আদি জননী। এই মহতের গর্ভেই সমস্তটা সৃষ্টি অবস্থিত। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবই এই মহতের গর্ভমধ্যস্থিত। এই মহতের গর্ভেই আমি, তুমি ও সকলে। মৎস্য যেমন জলের গর্ভে বিচরণ করে ঠিক সেইরূপ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই মহতের গর্ভেই স্থিত। সকলেই এই মহতের গর্ভে ডুবিয়া রহিয়াছে, এই মহৎ মানে জ্ঞান-জগৎ, ধ্বনি-জগৎ। এখানে কেবলই ধ্বনির খেলা আমাদের যত কিছু বোধধারা বাহিরে বা ভিতরে - এই মহতের মধ্য দিয়াই আসা যাওয়া করে। তোমাতে আমাতে কোন প্রকার আদান প্রদানের প্রথম স্থান মহৎ জগৎ। বিস্তারিত বলিবার নাই, ইহা এতই জটীল বিষয় বিস্তারিত বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা পরিশ্রম হইবে। যাঁহারা বুঝিবেন তাঁহারা এই সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক প্রথম ধ্বনি-বোধ, তাহার পর বিজ্ঞান ও শান্তি-বোধ। যে কোন বোধই প্রথমে মহতের কেন্দ্রে যায়। তাহার পর বিজ্ঞানময় কোষের অন্যান্য কেন্দ্রে ঐ বোধ চলিয়া আসে। ইহার পর ঐ বোধ মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্রে চলিয়া আসে। মহতের কেন্দ্রে ধ্বনি-মাত্রায় উহার প্রথম বোধ; পরে বিজ্ঞানময় কোষে গণেশ এবং অভিমানের কেন্দ্রে আসিলে উহাতে শান্তি-স্পর্শ-বোধ মিলিত হয়। ইহাকেই আমরা স্পর্শ-বোধ বলিয়াছি। তন্মাত্রার ধ্বনি-বোধই বিজ্ঞানময় কোষের মহৎ অংশ এবং তন্মাত্রার স্পর্শ-বোধই বিজ্ঞানের নিম্নাংশ। বিজ্ঞান ক্ষেত্রকে বুঝিবার জন্য বিজ্ঞানাংশ এবং জ্ঞানাংশ এইরূপ ভাবে ভাগ করিয়া লইলাম। মহৎ অংশই জ্ঞানাংশ, ইহাই ধ্বনি-বোধ; এবং নিম্নাংশই বিজ্ঞানাংশ। বিজ্ঞানাংশে কেন্দ্র তিনটি; গণেশ, শিব ও মহৎ (৭, ৪, ৫ কেন্দ্র) এবং জ্ঞানাংশে কেন্দ্র দুইটী; গণেশ ও মহৎ (৭, ৫ কেন্দ্র)।

বিজ্ঞানাংশে শব্দ সমষ্টি পাঁচটী, 'হং, যং, রং, বং, লং'। এবং জ্ঞানাংশে শব্দমাত্র একটী :- 'হং', বিজ্ঞানাংশের শব্দ ৫টীকে বিশ্লেষণ করিলে ঃ, ং, অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই

৭টী ধ্বনি পাওয়া যায়। জ্ঞানাংশকে বিশ্লেষণ করিলে ৩টী ধ্বনি পাওয়া যায় ঃ, অ, ং।

ঃ, অ, ং, মিলিয়া ‘হং’ হয়, এই ‘হং’ই পুরুষ। ইহাই সাংখ্যের পুরুষ। গীতাকার এই পুরুষকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন। অক্ষরপুরুষ অর্থে অবিনাশী পুরুষ। এই পুরুষ না মানিলে সৃষ্টি মানা চলে না। সৃষ্টি না মানিলে এইসব বিচার বিতর্কও চলে না। (বেদান্তবাদীরা সৃষ্টি মানেন না, কিন্তু বিচার বিতর্কটা খুব করেন)। বেদান্তদর্শনের ভিত্তি শক্তি-স্তর। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। সে স্তরে না দাঁড়াইলে বেদান্ত কেবল কথার কথা হয় মাত্র। সে স্তরে দাঁড়াইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি না মানা অর্থে আত্মপ্রবঞ্চনা করা। যাহা হউক সাংখ্যের পথে সৃষ্টি তত্ত্ব মানিতে হইলে পুরুষ প্রকৃতিকে অনাদি মানিতে হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে অনাদি মানিতে হইলে সৃষ্টিকেও অনাদি মানিতে হইবে। মহৎ-তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিকাশে সাধক সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহাতে পুরুষ প্রকৃতিকে অনাদি মানিতেই হইবে। ইহাই সাংখ্য ভিত্তিতে সৃষ্টি-তত্ত্ব। সাংখ্য বহু পুরুষ মানিয়াছেন। বহু পুরুষ অনাদি কি করিয়া হইবে? এরূপ প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই যতক্ষণ একই তত্ত্বে যাইয়া আমরা দাঁড়াইব না ততক্ষণ সৃষ্টির মূল বাহির হয় নাই জানিতে হইবে। কাজেই সাংখ্য যতটা বলিয়াছেন উহা খুব ঠিক কথা হইলেও সৃষ্টির শেষ মীমাংসা এখানে হয় নাই। বহুপুরুষ মানিলে এই বহুপুরুষ কোথা হইতে আসে ইহাও স্থির করা প্রয়োজন। কাজেই সৃষ্টির শেষ মীমাংসা এই স্তরে হইবে না।

এখানে আমরা যে সব কথার আলোচনা করিয়া চলিয়াছি ইহা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা বুঝিবার জন্য ব্যস্তও হইবেন না। সকল কথা সকলের প্রয়োজনেও আসিবে না। আসল কথা সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা না হইলে কর্ম-তত্ত্বের মীমাংসা হয় না, তাই কর্ম-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিতে হয়।

সাংখ্যমতে সৃষ্টি-তত্ত্বের শেষ মীমাংসা হয় নাই। সাংখ্য মতে সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষের বিজ্ঞান এবং জ্ঞানাংশ সম্বন্ধে নিখুঁত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির আনন্দময়* কোষ সম্বন্ধে কোন আভাষ উহাতে নাই।

সৃষ্টির আনন্দময় কোষে ঃ, ঁ, অ, ই, উ, ঋ, ৯ ইহারা শক্তিরূপে অবস্থিত। এই স্তরে ইহাদের এক একটীতে এক এক প্রকার শক্তি নিহিত আছে। ইহাদের সকলের মিশ্রণে শক্তির পূর্ণ বিকাশ। ইহাই পূর্ণ শক্তি-কণা বা পুরুষোত্তম। এই কথাগুলি আমরা একটু ভাষান্তর করিয়া প্রকাশ করিতে চাই। সৃষ্টির মূলে পূর্ণ-শক্তি বিদ্যমান। এই পূর্ণ-শক্তিতে

---

* আনন্দময় কোষ শব্দটী আমরা যে স্তরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছি উহা শক্তিস্তর। অনেক দার্শনিকগণ ইহাকে যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন উহাতে আমাদের দেওয়া সংজ্ঞায় ভেদ হইবে। সে সব দর্শন ব্যাখ্যাকারগণ আনন্দময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের যেরূপ লক্ষণ প্রদান করেন তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে তাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষ অর্থে বুদ্ধি কেন্দ্রের কাজ এবং আনন্দময় কোষ অর্থে চিত্ত কেন্দ্রের কাজকে (সুখের স্তরকে) নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। আমরা আনন্দময় কোষ যেরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি পাঠকগণ ইহা শক্তি-স্তর রূপে গ্রহণ করিবেন।

সাত প্রকারের শক্তির সংস্থান আছে; এই সাত প্রকার শক্তি মহৎ আদি ব্যক্ত সৃষ্টির মূলে অবস্থিত। ইহারাই অব্যক্ত শক্তি (কর্তৃত্ব-শক্তি), জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, বিজ্ঞান-শক্তি, শান্তি-শক্তি, কর্ম-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি। অব্যক্ত-শক্তি কৃষ্ণবর্ণ শক্তি-কণা, জ্ঞান-শক্তি স্ফটিকবর্ণ শক্তি-কণা, ইচ্ছা-শক্তি অরুণবর্ণ শক্তি-কণা, বিজ্ঞান-শক্তি ধূম্রবর্ণ শক্তি-কণা, শান্তি-শক্তি শুভ্রবর্ণ শক্তি-কণা, কর্ম-শক্তি অগ্নিবর্ণ শক্তি-কণা ও প্রাণ-শক্তি পীতবর্ণ শক্তি-কণা। এই স্তরে শক্তির গতি আছে, কিন্তু ধ্বনি নাই। ইহাই সৃষ্টির আনন্দময় কোষ। সৃষ্টির আনন্দময় কোষ এবং আমাদের শক্তি-স্তর এক কথা বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষে সমস্ত সৃষ্টি জ্ঞান বা ধ্বনিময়। সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি; সে সম্বন্ধেও বলা হইবে। সৃষ্টির আনন্দময় কোষের জ্ঞান-শক্তি এবং ইচ্ছা-শক্তির মিলনে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইচ্ছা শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি মিলিত হইলে মহৎ-তত্ত্ব হয়। এই মহৎ-তত্ত্বই প্রথম ধ্বনি। ইচ্ছা-শক্তি ‘অ’ ও জ্ঞান-শক্তি ‘ং’ এই দুইয়ের মিলনে ‘অং’ ধ্বনিই মহৎ-তত্ত্ব। ব্যক্ত সৃষ্টির মূলে মহৎ-তত্ত্ব অবস্থিত। এই মহৎ-তত্ত্ব একাধারে ইচ্ছা এবং জ্ঞান-শক্তির আধার। এখান হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ এবং এখানেই সৃষ্টির অন্ত হয়।

শক্তি হইতে প্রথম সৃষ্টি ধ্বনিময়, নাদময় বা জ্ঞানময়। এই ধ্বনির প্রথম বিকাশ ‘অং’ই মহৎতত্ত্ব। এই ‘অং’ সহিত ঃ বা অব্যক্ত শক্তি (কর্তৃত্ব শক্তি) মিলিত হইলে (ঃ+অং) হং হয়। এই ‘হং’ই গীতায় অক্ষর পুরুষ। ইনি সাংখ্যের পুরুষ (ইনি পুরুষোত্তম নহেন)।

শক্তিস্তরের আশ্রয়ে এইরূপ ইচ্ছা-শক্তি কণা ও জ্ঞান-শক্তি কণার মিলনে হয় ত বা কতশত ব্যক্ত সৃষ্টির সূত্রপাত হইতেছে আবার কতশত সৃষ্টির প্রথম ব্যক্ত ভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মিলনেই সৃষ্টি; ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মিলন ভাঙ্গিয়া গেলেই সৃষ্টি আর থাকে না। ইচ্ছার প্রাধান্যে সৃষ্টির আরম্ভ এবং জ্ঞান-প্রাধান্যে সৃষ্টির শেষ হয়।

ইচ্ছা ও জ্ঞান-শক্তির মিলনে যে স্তর সৃষ্ট হইল ইহা মহৎ-জগৎ। এই মহতের কোলে অন্যান্য শক্তিগুলি আসিতে থাকিলে শক্তিরূপে স্থিত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার অনাদি উপাদান ধ্বনি রূপে পরিণত হয়। শক্তি হইতে ধ্বনিরূপে পরিণত সৃষ্টির এই স্তরই বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞানাংশ। মহৎ-তত্ত্ব বা ইচ্ছা + জ্ঞানশক্তি সৃষ্টির শক্তিস্তরস্থিত অনাদি উপাদানকে নিজের কোলে আশ্রয় দিলে ধ্বনিময় সৃষ্টি হয়; শক্তিরূপী সৃষ্টির উপাদান ধ্বনিরূপে বিবর্ত্তিতা হয়। এই ধ্বনিময় সৃষ্টিকে বিজ্ঞান-শক্তি (ই) এবং শান্তি-শক্তি (উ) নিজের কোলে তুলিয়া লয়। এইরূপে তুলিয়া লইবার দরুণ ধ্বনিময় সৃষ্টি বিজ্ঞানময় হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞান অংশ বুঝিবার জন্য দুইভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। উহার একাংশ ধ্বনিময় অন্যাংশ শান্তিময়। জ্ঞানময় সৃষ্টিকে বিজ্ঞানময় করিবার মূলে বিজ্ঞান-শক্তি (ই) বিদ্যমান্; এই বিজ্ঞান-শক্তি জ্ঞানময় সৃষ্টিকে নিজের কোলে স্থান দিয়া জ্ঞানময় সৃষ্টিকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করে। ইহার পর ‘উ’কার শক্তি (শান্তি-শক্তি) আসিয়া ঐ বিভিন্ন প্রকারে বিভাজিত সৃষ্টির ধ্বনিময় উপাদানকে নিজের কোলে টানিয়া লয়, যাহার ফলে সেই উপাদানে শান্তির অংশ আসিয়া যায়। এই পর্য্যন্তই সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষ। ধ্বনিময় অংশই জ্ঞানাংশ এবং শান্তিময় অংশই বিজ্ঞানাংশ। শক্তি হইতে সৃষ্টির

বিবর্ত্তনে যে স্তরে সৃষ্টির অনাদি উপাদানগুলি ধ্বনিরূপে পরিণত হয় ব্যক্ত শক্তির ঐ স্তরের নাম জ্ঞান-জগৎ। এই ধ্বনিময় সৃষ্টির উপাদানকে শান্তি ও বিজ্ঞান-শক্তি নিজের কোলে তুলিয়া লয়। এই বিজ্ঞান ও শান্তি মিশ্রিত জ্ঞান বা ধ্বনিময় সৃষ্টিই সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানের স্তরে 'ই' এবং 'উ' শক্তি জ্ঞানময় সৃষ্টিকে ধারণ করিয়াছে। এই পর্য্যন্তই সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষ। ইহাই আমাদের গ্রন্থে বিবর্ত্তনের দিক দিয়া শিব। পাঠকগণ ক্রম-বিকাশের পথে শিব-স্তরের আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন।

(১) পূর্ণশক্তি স্তর। এই স্তরে সপ্ত শক্তি ঃ, ং, অ, ই, উ, ঋ, ৯ একই শক্তিরূপে অবস্থিত; ইহাই গীতার পুরুষোত্তম।

(২) সপ্ত-শক্তির স্তর। এই স্তরে সপ্ত শক্তি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাই সৃষ্টির আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষ হইতে সৃষ্টির বিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাই গীতার পরা-প্রকৃতি (সাধকগণ জানিয়া রাখিবেন - অনুভূতিতে পুরুষোত্তম স্তর ও সপ্ত শক্তির স্তর রূপে দুইটা স্তর পাওয়া যায় না। সপ্ত শক্তি পুরুষোত্তম স্তরের অন্তর্গত সপ্তশক্তি। একটা স্তরকেই পাঠকগণের সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন মনে করি না।)

(৩) মহত্তত্ত্ব। ইহাই সমস্ত ব্যক্তসৃষ্টির প্রথম জননী। মূল সপ্ত শক্তির দুইটি শক্তি মিলনে এই স্তর প্রথম সৃষ্টি হয়। চিত্রে 'অ' ইচ্ছা-শক্তি এবং 'ং' জ্ঞান-শক্তি এই দুইএর মিলন দেখান হইয়াছে। এই 'অং'ই মহত্তত্ত্ব।

(৪) গীতার অক্ষর পুরুষ; ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অব্যক্ত-শক্তি (কর্ত্তৃত্ব শক্তি ' ঃ') মহত্তত্ত্বে মিলিত হইলে এই পুরুষ উৎপন্ন হয়। চিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই পুরুষ হইতেই সমস্ত ধ্বনি-জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনি অক্ষর পুরুষ; ইঁহার প্রকৃতিকে আমরা অক্ষরা-প্রকৃতি নামে অভিহিত করিব। 'হং' অক্ষর পুরুষ। ক্ষ ষ স ইহারা অক্ষরা-প্রকৃতি। গীতা বা কোন শাস্ত্রেই ক্ষরা বা অক্ষরা প্রকৃতির উল্লেখ নাই। আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য এইরূপ নাম প্রয়োগ করিলাম। এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে। সাংখ্যের মতে এই অক্ষর-পুরুষ এবং এই অক্ষরা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ এই অক্ষর-পুরুষ এবং অক্ষরা প্রকৃতি সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি। সাংখ্যে শক্তি-স্তরের সন্ধান নাই, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাংখ্যের বিচারে যাহা পুরুষ শক্তি-স্তরের বিচারে উহা অব্যক্ত, জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তির মিলন। আবার সাংখ্য বহুপুরুষ যদি বলিতে চান তবে উহা অহংতত্ত্বই হইবে। পরে বিস্তারিত বলা যাইতেছে।

সৃষ্টির মনোময় কোষের মূল বুঝিতে হইলে অহং-তত্ত্ব প্রথম বুঝা প্রয়োজন। অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি না হইলে মনোময় কোষ উৎপন্ন হয় না। অহং-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মনোময় কোষ জীবিত থাকে। অহং-তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া গেলে মনোময় কোষও ভাঙ্গিয়া যায়। তখন মনোময় কোষের শক্তিগুলি মূল সপ্ত-শক্তির অন্তর্গত হইয়া যায়।

মহত্তত্ত্বে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইলে অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়; এই অহং-তত্ত্বই জীব মাত্রের অভিমান। মহত্তত্ত্বে যে অংশে (১ কলা, ২ কলা ইত্যাদি) পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হয়, অহংকারটী তেমনই শক্তিসম্পন্ন বীজরূপে পরিণত হয়। ১ হইতে ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্ত অহং-তত্ত্বে বিকাশ থাকিতে পারে।

বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত সৃষ্টির বিবর্তন ইঙ্গিত চিত্র

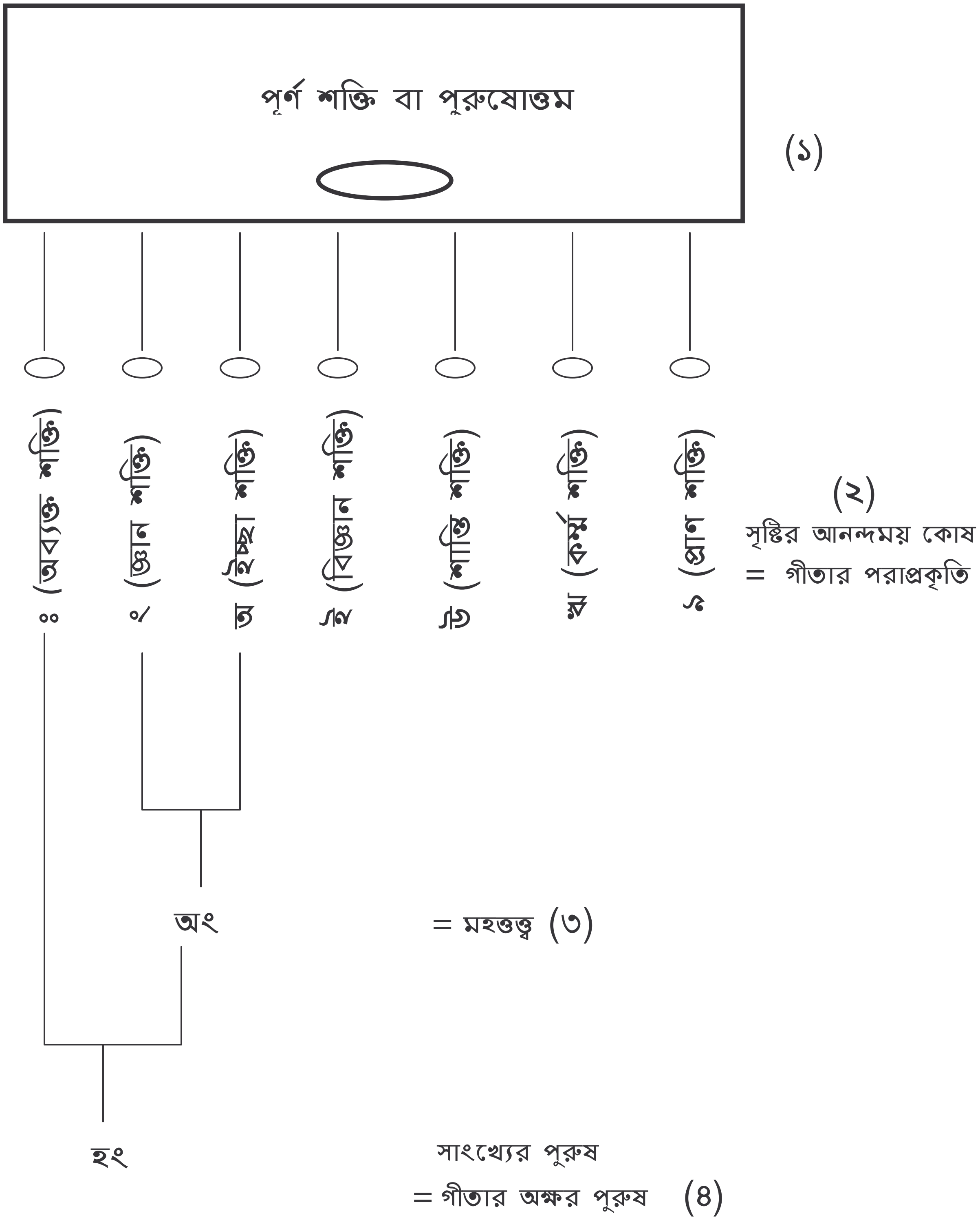

অহং তত্ত্বের মাতৃস্থান মহৎগর্ভ, পিতৃস্থান পুরুষোত্তম প্রতিবিম্ব। এই অহং-তত্ত্বই বীজরূপী জীব। মহত্তত্ত্বে ইহার উৎপত্তি হয় এবং শান্তি-শক্তি ইহাকে নিজের কোলে আশ্রয় দেয়।

শান্তির কোলে অবস্থান করিতে করিতে শান্তির প্রভাব এই বীজে আসিয়া যায়। শান্তি উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে অহং-তত্ত্বে অভিমান আসিয়া যায়। পাঠকগণের মনে থাকিবে "আমরা শিব অংশে বলিয়াছি সুষুপ্তিকালে জীবমাত্রই নিজ নিজ অহংকারস্থিত শান্তির কোলে বিশ্রাম করে।" শান্তি মিশ্রিত অহংতত্ত্বে বিজ্ঞান-শক্তির প্রভাব আসিলে এই বীজে বিজ্ঞান শক্তি (বুদ্ধিশক্তি) আসিয়া যায়। পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বকে মহত্তত্ত্ব নিজের কোলে স্থান দিবার দরুণ সেই প্রতিবিম্বের জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তি আসিয়াই গিয়াছিল। জ্ঞানের অংশ তারতম্যই বীজটিকে স্থূল পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জাদি বিভিন্ন স্তরের জীব পরিণত করিবে। যাহা হউক বীজটীতে মনোময় কোষের শান্তি (অভিমান), বুদ্ধি, মন ও জ্ঞান-শক্তির অংশ যে ভাবে আসিয়াছে তাহা পাঠকগণ বুঝিলেন। বীজ জগতে অবস্থান কালেই বীজে ঐ সব শক্তি আসিয়া যায়। ইহার মধ্যে জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তি সে মহৎ গর্ভেই লাভ করিয়াছে। এই জ্ঞান শক্তিই মুক্তির প্রেরণা দেয় (মুক্তি মানে নিজেকে জানা) এবং ঐ ইচ্ছা শক্তি জীবের অন্তরে সৃষ্টির চেষ্টা রূপে অবস্থিত। এই পর্য্যন্তও বীজটী প্রকৃতির বিজ্ঞানময় কোষেই আছে। এবার প্রকৃতির মনোময় কোষ এই বীজটিকে নিজের কোলে টানিলে মনোময় কোষস্থিত শক্তি ইহাতে সংযোজিত হইবে।

অহং তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সমস্তটাই গীতার ক্ষর-পুরুষ। ভূমি, অপ, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার ইহারা এই ক্ষর পুরুষের (অহং তত্ত্বই গীতার ক্ষর পুরুষ) ৮টী ক্ষরা প্রকৃতি। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জড়ায়ুজ, সাধারণ মানুষ, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের মানুষ সকলেই ক্ষর-প্রকৃতির কোলের পুতুল। ক্ষর-পুরুষ (অহং-তত্ত্বই গীতার ক্ষর-পুরুষ) এবং ক্ষর-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিলাম না। বিজ্ঞানময় কোষের উপাদানগুলি মনোময় কোষে কিরূপে, ভূমি, অপ আদি স্থূল পঞ্চভূতে পরিণত হয় এবং আমাদের শরীরে ঐ পঞ্চভূত কিরূপে স্থান পাইয়াছে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মূল উপাদান কোথা হইতে আসিয়াছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। তাই তৎসম্বন্ধে আলোচনা আমরা করিব না।

এ পর্য্যন্ত আমরা পুরুষ তিনটী পাইলাম। প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ, ও তৃতীয় ক্ষর পুরুষ। প্রকৃতিও তিনটী সাজান হইল পরা প্রকৃতি, অক্ষরা প্রকৃতি ও ক্ষরা প্রকৃতি।

সাধক ক্ষরা প্রকৃতির পরপারে অক্ষরা প্রকৃতির কোলে যাইবেন। মনোময় কোষের সৃষ্টি এবং আমাদের গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের জ্ঞান এবং কর্ম্ম ক্ষরা প্রকৃতির অন্তর্গত বিকাশ জানিতে হইবে। অক্ষরা প্রকৃতি শিব-স্তরের বিকাশের অন্তর্গত। ক্ষরা প্রকৃতির পরপারে অক্ষরা প্রকৃতি অবস্থিত। অক্ষরা প্রকৃতির মূলে অনাদি শক্তি রূপে পরা প্রকৃতি বিদ্যমান। সাধক অক্ষরা প্রকৃতির কোল অতিক্রম করিলে এ কথা স্পষ্ট জানিতে পারিবেন যে তিনি সব যুগেই পরা প্রকৃতির কোলেই ছিলেন। পরা প্রকৃতি আপন খেলাঘরে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বকে লইয়া খেলিতেছেন মাত্র। এই খেলার সঙ্গে সাধকের

জ্ঞানউদয়ে আর কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না। সাধক তখন পুরুষোত্তম হইবেন। এরূপ খেলা প্রকৃতির স্বভাব। সাধক একস্তরে ক্ষরা প্রকৃতির অধীন থাকেন, পরে অক্ষরা প্রকৃতির অধীন হন এবং অবশেষে পরা প্রকৃতির পরপারে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হন।

অক্ষর পুরুষই হং। ইহার প্রকৃতি ক্ষ ষ স। অক্ষর পুরুষই সাংখ্যের পুরুষ। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি। অতএব পুরুষকে মানিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচারে প্রকৃতিকেও মানিতে হইবে।

ঃ এবং অং মিলিয়া হং হয়। এই 'হং'ই পুরুষ ক্ষ ষ স ইহারা এই 'হং' এর নিত্য প্রকৃতি।

প্রথম ধ্বনি অং। এই ধ্বনি স্থির হইলেই ঃ হয়। অতএব প্রথম ধ্বনিকে হং বলা যায়।

ধ্বনি জগতের প্রথম বিকাশ

হং = পুরুষ

ক্ষ	ষ	স = প্রকৃতি
সত্ত্ব	রজঃ	তমঃ

'হং' পুরুষ। ইঁহার প্রকৃতি ক্ষ ষ স ইঁহারা ধ্বনিময়ী প্রকৃতি। (শক্তি হইতে) প্রথম সৃষ্টির উপাদানে ধ্বনিই বিদ্যমান। পাঠকগণ এখন শক্তিস্তরের কথা ভুলিয়া যাইয়া এই পুরুষ প্রকৃতিকেই সৃষ্টির মূলে স্থাপন করুন। 'হং' পুরুষ ধ্বনি; ক্ষ ষ স* ঐ স্তরেরই ধ্বনি-প্রকৃতি। ক্ষ সাত্ত্বিক ধ্বনি-প্রকৃতি, ষ রাজস্-ধ্বনি প্রকৃতি ও স তামস ধ্বনি-প্রকৃতি।

---

* 'স' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় - ভারতীয় বর্ণমালায় তালব্য, মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য এই তিনটি 'স' আছে। আমরা ক্ষ (খ), ষ, স এই তিনটি 'স'কে হং এর প্রকৃতি রূপে প্রকাশ করিয়াছি। 'ক্ষ'কে কেহই 'স' বলে না (?) কিন্তু আমরা 'ক্ষ'কে 'স' রূপে না হইলেও 'স' এর সমকক্ষ বা হং এর প্রকৃতিরূপে প্রকাশ করিয়াছি। 'স'গুলির উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা যাইতেছে। তাহাতেই 'ক্ষ'কে 'স' বলিবার কারণ বুঝা যাইবে। লিখিবার বেলায় আমরা যেরূপ আকারেই লিখি না কেন, উচ্চারণকে অবলম্বন করিয়াই জপে শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে। 'মূর্দ্ধণ্য ষ'কে মূর্দ্ধণ্য 'ষ'ও বলে আবার ইহাকে 'খ'

(ক্ষ) এর মত উচ্চারণ করিবার প্রথাও আছে। ইহারও কারণ থাকা প্রয়োজন। তালব্য শ কে আমরা প্রকৃতির কোন গুণেরই প্রতীক-রূপে স্থাপন করি নাই। কারণ তালব্য শ টি সত্ত্ব ও রজো গুণের মিশ্রণ-ধ্বনি। যাহা হউক তালব্য শকে লইয়া 'স' হয় মোট চারটী।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যেরূপ উচ্চারণ 'স' এর হয় উহা খাঁটী মূর্দ্ধণ্য ষ। বাংলায় শিখিবার বেলায় তিনটি 'স' এর ব্যবহার থাকিলেও বলিবার বেলায় শুধু মূর্দ্ধণ্য 'ষ'ই উচ্চারিত হইয়া থাকে। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে 'স' এর তিন প্রকারের উচ্চারণ হইয়া থাকে। দন্ত্য 'স' (ঠিক দন্ত্য স বলা যায় না ইহার উচ্চারণ পশ্চিমদেশে কতকটা দন্ত্য তালব্য স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে), মূর্দ্ধণ্য ষ এবং কণ্ঠ্য 'ষ' (ক্ষ, খীয় বা খ)। তালব্য 'শ'কে ঠিক তালু হইতে উচ্চারণ করিলে ইহার আওয়াজ প্রায় দন্ত্য 'স' এর মতই হইয়া থাকে। ঠিক ঠিক দন্ত্য 'স' সাধারণতঃ কেহই উচ্চারণ করে না। দন্ত্য 'স'কে সাধারণতঃ দন্ত্য-তালব্য স্থান হইতেই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। তালব্য 'শ'কে কাশী অঞ্চলে ঠিক মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারণ করা হয়। মূর্দ্ধণ্য 'ষ'কে কখনও (খুব কম স্থানে) মূর্দ্ধা হইতে কখনও কণ্ঠ হইতে ('খ' এর মত) উচ্চারণ করিতে শোনা যায়। যাহা হউক কাশী অঞ্চলে উচ্চারিত 'স' তিনটী একটি দন্ত্য স, ২য়টি মূর্দ্ধণ্য 'ষ' (তালব্য 'শ'কে ইহারা মূর্দ্ধা হইতেই উচ্চারণ করে), ৩য় টী কণ্ঠ্য 'ষ', 'ক্ষ' (ক্ষীয়) বা 'খ'।

ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের জন্য অ, ই, উ, ঋ এবং ৯ এই পাঁচটী ঘাট আছে। 'অ'কার সাত্ত্বিক ঘাট, ইকার সত্ত্বরাজস ঘাট, উকার রজঃ তামস ঘাট, 'ঋ'কার রাজস্ ঘাট এবং '৯' তামস ঘাট। 'অ' কারের ঘাট হইতে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয় উহারা সাত্ত্বিক স্তরের ধ্বনি। ইহারা অ, হ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং ক্ষ (খ)। ইহারা জ্ঞানবর্দ্ধক ধ্বনি। 'ই' কারের ঘাট হইতে ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এবং শ উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহারা সত্ত্ব-রাজস স্তরের ধ্বনি। ইহারা ত্যাগ এবং বিচারশক্তিবর্দ্ধক ধ্বনি। 'উ' কারের ঘাট হইতে উ, প, ফ, ব, ভ, ম উচ্চারিত হয়। ইহারা শান্তিবর্দ্ধক ধ্বনি। ইহারা রজ তামস স্তরের ধ্বনি। 'ঋ' কারের ঘাট হইতে ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এবং (মূর্দ্ধণ্য) ষ উচ্চারিত হয়। ইহারা রাজস স্তরের ধ্বনি। ইহারা কর্ম-শক্তি ও তেজ-বর্দ্ধক। ৯ কারের ঘাট হইতে ৯, ত, থ, দ, ধ, ন এবং স (দন্ত্য) উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহারা তামস স্তরের ধ্বনি। ইহারা প্রাণ-শক্তি বর্দ্ধক ধ্বনি।

৯ কারের ঘাটের বর্ণগুলি উচ্চারণ করুন ঐ স্থানে জিহ্বা রাখিয়া সিস্ দিলে যে 'স' উচ্চারণ হইবে উহাই দন্ত্য 'স'। ইহাই তামস স। কাশী অঞ্চলে এই স বেশ উচ্চারিত হয়। ঋ কারের ঘাটের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিয়া 'ঋ' কার ঘাট স্থির করুন। এখানে জিহ্বা রাখিয়া সিস্ দিলে যে 'ষ' হইবে উহাই মূর্দ্ধণ্য ষ। বাঙ্গালী মাত্রই এই 'ষ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন। (তালব্য 'শ' উচ্চারণ করিতে হইলে 'ই'কারের ঘোটে সিস্ দিন)। 'অ'কার ঘাটস্থিত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া সেই ঘাটে জিহ্বা রাখিয়া সিস্ দিলে 'খ'র মত উচ্চারণ হইবে ইহাই আমাদের সত্ত্বগুণের 'ষ' বা ক্ষ (ক্ষিয়)। 'ষ'কারগুলি সিস্

হ এবং স একই ধ্বনির পুরুষ প্রকৃতির ভেদ লইয়া অবস্থিত হইবার দরুণই বহুস্থানে ভাষার মধ্যে স স্থানে হ বলিবার স্বাভাবিক প্রকৃতি দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুদিন ভ্রমণ করিলে একথা পরিষ্কার দেখা যাইবে। স এর ব্যবহার বেশী লোকই জানে না। স কে হ রূপে উচ্চারণ করিবার প্রথা অত্যন্ত প্রবল।

ধ্বনি (Whistling Sounds)। ইহারা অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণের মত স্থান স্পর্শে উচ্চারিত হয় না। 'ক্ষ' (ক্ষিয় 'স') এর ঠিক উচ্চারণ হয় না। ইহা পুরুষের ('হং' এর) খুব নিকটস্থ প্রকৃতি।

পাঠকগণ আমাদের এইসব কথা পড়িয়া কথা বলিবার বা পুস্তক পাঠ ব্যাপারে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটাইবেন না। ভাষায় যাহা আছে থাকুক, যেমন বলিয়া অভ্যস্ত বলিয়া চলুন, যেমন শিখিতে হয় শিখুন; ভাষা ও ধ্বনির যে বিজ্ঞান আছে ইহা বুঝানো ভিন্ন আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই। যাঁহারা মন্ত্র জপ করিবেন তাঁহারা ঠিক ঠিক উচ্চারণ শিখিয়া লইবেন। তাহা না হইলে শক্তি সঞ্চিত হইতে বাধা পাইবে। যাঁহারা ভাববাদী তাঁহারা ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবিয়া যাহা করুন, তবে যাঁহারা শক্তিলক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন তাঁহারা যে বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রসর হইবেন ইহা স্বাভাবিক।

ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরিবর্তন চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধকদের মধ্যে ইহার পরিবর্তন কখনও হয় নাই। ইহার কারণ মন্ত্রযোগ সাধনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রক্ষা করিয়াই ইঁহাদিগকে চলিতে হয়। বৌদ্ধ যুগে এই বর্ণমালার ছাট কাট হইয়াছিল কিন্তু সাধকগণ ঐ ছাট কাটের বাহিরে থাকিতে বাধ্য ছিলেন। তাই যুগ পরিবর্তনে বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা আবার ভাষায় স্থান পাইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় ভারতের নব্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বর্ণমালার ছাট কাটের স্বপ্ন জাগিয়াছে, কাজেই বর্ণমালার ছাটকাট হয়তো শীঘ্রই ফলবতী হইবে। কিন্তু প্রকৃত সাধকগণের মধ্যে ইহার কোন প্রভাবই প্রতিফলিত হইবে না। ধ্বনি যে শক্তির স্বরূপ ইহা বুঝিবার মত শক্তি সাধন-জ্ঞানহীন পুঁথিগত বিদ্যার পণ্ডিতের কোন যুগেই হইবে না। দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের ছুঁতা ধরিয়া কাজের মত কাজ কিছু না করিয়া নাম করিবার সুযোগ করিবার জন্য যেসব পণ্ডিত ফাঁদ পাতিয়া দিন কাটান তাঁহারা এসব সুযোগ ত্যাগ কেন করিবেন? বর্ণমালাগুলিকে কাজের মত ব্যবহার করিবার জন্য ইহাদের আকারের কিছু পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে উহাতে বাধা দিবার লক্ষ্যে আমরা কোন কথাই বলিতেছি না। বর্ণমালার আকার সম্বন্ধেও তন্ত্রে যেসব কথা আছে তাহাতে এইরূপ আকারগুলি পরিবর্ত্তনও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। এক একটী বর্ণের আকারের কোন অংশটায় কিরূপ শক্তির সংস্থান উহাও তন্ত্রে উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমরা করিতে চাই না। আমরা শুধু ধ্বনির দিক দিয়াই আলোচনা করিলাম। আকারের দিকটার আলোচনা যন্ত্রতত্ত্বের কথা। আমরা ধ্বনি-বিজ্ঞান (যন্ত্রতত্ত্ব নহে) লইয়া কথা বলিতেছি। ধ্বনিগুলিকে লিখিবার সুবিধার জন্য কোন কোন বর্ণের পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন যদি পণ্ডিতগণ মনে করেন সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না। তবে ইহা অত্যন্ত সত্যকথা যে আমরা বিদেশী অক্ষরে বাংলাভাষা শিক্ষা দিবার বিরোধী।

সাত্ত্বিক প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে যে ধ্বনি হইল উহা ‘হং’ (?)[*]। রাজস প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে যে ধ্বনির সৃষ্টি হইল উহা ‘রং’। তামস প্রকৃতির সহিত পুরুষ মিলনে যে ধ্বনি হইল উহা ‘লং’। সত্ত্ব রজঃ মিশ্রিত ধ্বনি-প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে ধ্বনি হইল ‘যং’ এবং রজঃ তামস প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে ধ্বনি হইল ‘বং’।

পুরুষ ভোক্তা প্রকৃতি ভোগ্যা। ধ্বনির বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থা আছে। দুইটি বস্তুর মিলনেই ধ্বনি হয়। এই ধ্বনির উত্থানে বাল্য, ধ্বনির পূর্ণ পুষ্ট অবস্থাই যৌবন এবং ধ্বনির লীন অবস্থাই বৃদ্ধাবস্থা জানিতে হইবে। ধ্বনির পূর্ণ যৌবনেই পুরুষ ধ্বনিকে ভোগ করেন। এখানে ভোগ করা মানে মিলিত হওয়া বা জানা। একটা ধ্বনিকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধ্বনি উত্থিত হয়। আবার সেই উত্থিত ধ্বনিটা পূর্ণ-বিকাশের অবস্থায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ আবার তাহাকে জানিয়া ফেলেন। এই ভাবেই ধ্বনি জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ক্ষ ষ স প্রকৃতির এই গুণ-ত্রয়ের মূল উপাদানে শক্তি-স্তরের অ, ঋ, ৯ এই তিনটী অনাদি শক্তি বিদ্যমান আছে। পুরুষ ও প্রকৃতির মূল উপাদানে যেমন ঃ এবং অং বিদ্যমান ঠিক তেমনই প্রকৃতির ত্রিগুণ উপাদানের মূলে অ, ঋ, ৯ বিদ্যমান। ইহারা মূলে (অর্থাৎ শক্তি-স্তরে) বিদ্যমান আছে বলিয়াই ধ্বনি-স্তরে ক্ষ ষ স হইয়াছে। ঃ এর প্রাধান্যে পুরুষ এবং ৺ এর প্রাধান্যে প্রকৃতি (ইহা ‘ ঃ’ ভিন্ন সমস্ত ধ্বনির সমষ্টি)। অ এর প্রাধান্যে সত্ত্ব, ঋ এর প্রাধান্যে রজঃ, ৯ এর প্রাধান্যে তমঃ, ই এর প্রাধান্যে সত্ত্বরজঃ এবং উ এর প্রাধান্যে রজস্তমঃ। অনাদি শক্তিরূপে ঃ কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, ৺ জ্ঞান-শক্তি, অ ইচ্ছা-শক্তি, ঋ ক্রিয়া-শক্তি, ৯ প্রাণ-শক্তি, ই বিজ্ঞান-শক্তি, উ শান্তি-শক্তি। অ এবং ‘৺’ মিলিয়া অং হয়। এই অং (মহত্তত্ত্ব) ব্যক্ত সৃষ্টির আরম্ভ। ইহা প্রথম ধ্বনি। ব্যক্তসৃষ্টির মূলে ঃ এর প্রাধান্যে পুরুষ ইহাই হং। হং এর উপর অ এর প্রাধান্যে ক্ষ, ঋ এর প্রাধান্যে ষ, ৯ এর প্রাধান্যে ‘স’ হইয়া থাকে। ধ্বনি সৃষ্টির উপাদানের মূলে শক্তি-স্তর যে বিদ্যমান ইহা বুঝাইবার জন্য এই সব কথা লিখিলাম। আমরা এখন সাংখ্য ভিত্তিতেই নাদ বা ধ্বনি জগতের সৃষ্টির আলোচনা করিব।

---

[*]এই হং আকাশ-তত্ত্ব। এই হংকারের ধ্বনিটী প্রায় অংকারের মত। পুরুষ হং আর এই আকাশ-তত্ত্বের হং (?) এক নহে। এই আকাশ-তত্ত্বের প্রতীক হং কারের সহিত আমরা (?) এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিব। কারণ ইহার উচ্চারণ ঠিক ‘হং’ নহে। ইহা অনেকটা অ + অং ধ্বনি। বহুস্থানের কথার মধ্যে ‘হ’কে ‘অ’ বলার অভ্যাস আছে। ইঁহারা সব ‘হ’কেই ‘অ’কার উচ্চারণ করেন না। যাহা হউক আকাশ তত্ত্বের প্রতীক ‘হং’ = অ + অং জানিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ তত্ত্বের প্রতীক ‘হং’টী ‘অ + অং’ নহে। উহা ‘ ঃ + অং’।

ধ্বনি জগতের দ্বিতীয় বিকাশে

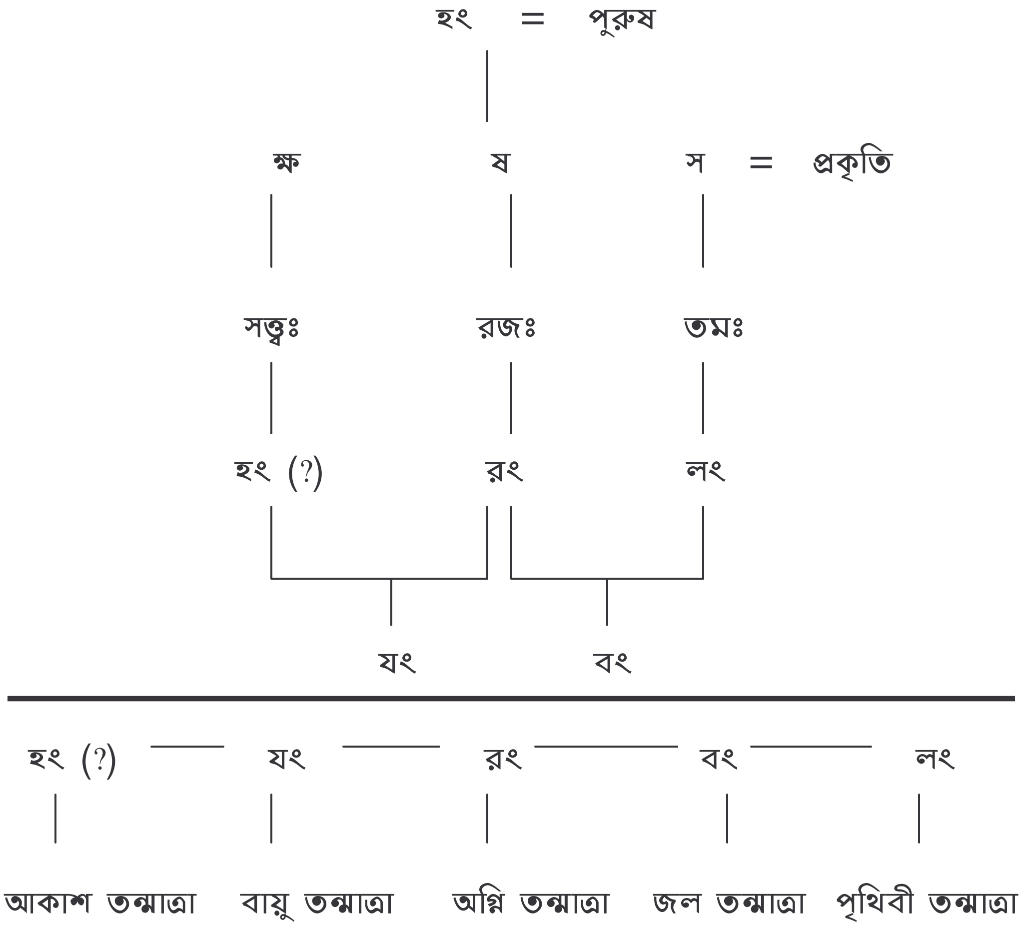

এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞানময় কোষ; অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত যে সব ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে ইহারা বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত স্থিত জানিতে হইবে। ইহার পর যে সব ধ্বনি উৎপন্ন হইবে উহারা বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আর শ্রুত হইবে না; উহারা মনোময় কোষের ধ্বনি।

এবার পুরুষ হং এবং ইহার প্রকৃতি হং (?)* যং রং বং ও লং এই পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে উত্থিত ধ্বনি হইবে কং চং টং পং তং।

---

* ইতি পূর্বে ফুট নোটে 'হং' পুরুষতত্ত্ব, এবং 'হং' (?) আকাশ তত্ত্বের উচ্চারণ ভেদ বলিয়াছি। হং যং এবং বং এর দুই প্রকার উচ্চারণ আছে। হং কে হং উচ্চারণ করিলে পুরুষ তত্ত্ব জানিতে হইবে আবার অ + অং উচ্চারণ করিলে আকাশ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যংকে য়ং (ই + অ + ং)ও বলা যায় আবার যং ও বলা যায়। 'যং' বলিলে ইহাতে 'ঃ' এর অংশ মিশ্রিত হইল জানিতে হইবে। 'বং' কে 'বং'ও বলা যায় আবার 'উ + অ + ং' ও বলা যায়। 'বং' বলিলে ধ্বনির মধ্যে বিসর্গের অংশ আসিল বুঝিতে হইবে। কাজেই মন্ত্রযোগী সাধক জপকালে যেমন জপ করিবেন শক্তিও তেমনিই হইবে। পাঠকগণের মনে রাখা প্রয়োজন যে আমরা মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধেই বলিয়া

হং = পুরুষ

হং (?)	যং	রং	বং	লং	= প্রকৃতি
|	|	|	|	|	
কং	চং	টং	পং	তং	

পুরুষ হং, প্রকৃতি কং, চং, টং, পং, তং। ইহাদের মিলনে উৎপন্ন ধ্বনি হইবে খং, ছং, ঠং, ফং, থং। এইভাবে পুরুষ হং, প্রকৃতি খং, ছং, ঠং, ফং, থং, উৎপন্ন ধ্বনি হইবে গং, জং, ডং, বং, দং। পুরুষ হং, প্রকৃতি গং, জং, ডং, বং, দং, উৎপন্ন ধ্বনি হইবে ঘং, ঝং, ঢং, ভং, ধং। পুরুষ হং, প্রকৃতি ঘং, ঝং, ঢং, ভং, ধং, উৎপন্ন ধ্বনি হইবে ঙং, ঞং, ণং, মং, নং।

হং = পুরুষ

কং	চং	টং	পং	তং	প্রকৃতি
|	|	|	|	|	
খং	ছং	ঠং	ফং	থং	
|	|	|	|	|	
গং	জং	ডং	বং	দং	
|	|	|	|	|	
ঘং	ঝং	ঢং	ভং	ধং	
|	|	|	|	|	
ঙং	ঞং	ণং	মং	নং	

ঙং, ঞং, ণং, মং এবং নং কে আর প্রকৃতি বলা চলে না। ইহারা শক্তিস্তরেই ফিরিয়া আসিয়াছে। যে মূল উপাদান হইতে (অর্থাৎ হং (?), যং, রং, বং, লং) কং, চং, টং, পং, তং এর বংশবর্গ চলিয়াছিল ঙং, ঞং, ণং, মং, নং-এ সেই মূল-তত্ত্ব

চলিয়াছি। শক্তিই বিবর্ত্তিত হইয়া বিজ্ঞান সৃষ্টির স্তরে আসিয়াছে। ধ্বনিগুলি যে শক্তির বিবর্ত্তন ইহা বুঝানো ভিন্ন আমাদের কোনই লক্ষ্য নাই।

ফিরিয়া আসার দরুণ এই ধ্বনিগুলি আর যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; তাই পুরুষ ইহাদিগকে ভোগ করিতে আর ধাবিত হন নাই। বাল্যাবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা ধ্বনি-জগতের মূল-তত্ত্বে ফিরিয়া আসিয়াছে; অর্থাৎ মকারে লীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের ধ্বনিগুলির যেন বাল্যাবস্থার শেষ হইল না। জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মায়ের কোলে লীন হইয়া গিয়াছে।

হং (?), যং, রং, বং, লং, এই ধ্বনি হইতেই ক, চকারাদির বংশবর্গ চলিয়াছিল। শেষকালে ইহা ঙং, ঞং, ণং, মং, নং, পর্য্যন্ত আসিয়া স্থির হইল। পাঠকগণ আরম্ভ এবং শেষ অবস্থার মিল করিয়া বুঝিয়া লউন। এ সম্বন্ধে আমরা আর বেশী আলোচনা করিতে চাহি না।

আরম্ভ প্রকৃতি	হ (?)	= ঃ (?) + অ	শেষ পরিণতি[*]	ঙ	= ঃ (?) + ং + অ
,,	য	= ই + অ	শেষ পরিণতি	ঞ	= ই + ং + অ
,,	র	= ঋ + অ	,,	ণ	= ঋ + ং + অ
,,	ব	= উ + অ	,,	ম[†]	= উ + ং + অ
,,	ল	= ঌ + অ	,,	ন[‡]	= ঌ + ং + অ

যে কোন ধ্বনিই হউক না কেন, উহার মূলে হং-কার বিদ্যমান থাকে। এই হংকারের প্রকৃতি ক্ষ ষ স। তন্ত্রে 'হংস' মন্ত্র আছে; ইহাকে মহামন্ত্র বলা হয়। যত প্রকারের সন্ন্যাস পন্থী আছেন সকলেই এই 'হংস' মন্ত্রের উপাসক। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণও এই 'হংসঃ' মন্ত্রের উপাসক। এই মন্ত্রকে উল্টাইয়া দিলে "সঃ হং" – "সোহং" হয়; অপভ্রংশে সোঽহং। সম্প্রদায় ভেদে এই 'হংসঃ'-স্তরের মন্ত্রের কিছু কিছু ভেদ আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহা "হেসৌঃ[§]" বীজরূপে পরিণত হইয়াছে।

---

[*] পাঠকগণের মনে থাকে যেন ঃ (?) = অ। অনেক স্থানের ভাষাতে 'হ'কে 'অ' বলিবার প্রাকৃতিক অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। "হইবে"কে "অইবে" বলার অভ্যাসকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বাস্তবিক 'হ' দুইটী উহার একটীতে প্রায় 'অ'কারের উচ্চারণ হইয়া থাকে।

[†] ম-এর উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনে মনে উ বলিয়া পরে ং + অ বলিতে হয়। তবেই ইহার ঠিক উচ্চারণ হইবে। মনে থাকে যেন ইহা ওষ্ঠবর্ণ নহে; ইহা অনুনাসিকবর্ণ। সাধারণতঃ ম-কারকে ওষ্ঠবর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। সমস্তগুলি স্বর ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ইহার সমকক্ষ মধুর ধ্বনি একটীও নাই। জপকালে উচ্চারণের দিকে নজর না রাখিলে মন্ত্রশক্তির কাজ মোটেই হইবে না। যে সব ধ্বনিগুলি ঠিক ঠিক স্থান হইতে উচ্চারিত হইবে না, সেগুলির শক্তি সঞ্চিত হইবে না।

[‡] ন ধ্বনির উচ্চারণের উপাদানে ঌ + ং + অ আছে ইহাও অনুনাসিক বর্ণ। ইহার উচ্চারণ সকলেই ঠিক মত করিয়া থাকেন। ঌ কারের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে ইহার উচ্চারণ ভুল হইবে।

[§] প্রকাশকের নিবেদন - মূলের "হে সীঃ" স্থানে "হেসৌঃ" গৃহীত হল।

এই মন্ত্রটীকে যিনি যেমন ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, ইহা ‘পুরুষ প্রকৃতি’ মন্ত্র। এই একটী বীজ মন্ত্রে সমস্তটা ব্যক্ত-সৃষ্টি জ্ঞান বা ধ্বনিরূপে যে অবস্থিত তাহার প্রমাণ পাঠকগণ পাইলেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে এই বীজমন্ত্রটীর অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাঁহারা ‘সোহং’ বলিতে ‘আমিই সেই পরমাত্মা’ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়া ইহাতে গোল বাধাইয়াছেন। শ্রীমৎ চৈতন্যদেবও এই ‘হংস’ বা ‘সোহং’ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। আমিই যে পরমাত্মা এইরূপ ভাবনা বৈষ্ণবদের জন্য বিশেষ মনঃপীড়াদায়ক কথা। আসল কথা ‘আমিই ঈশ্বর’, ‘আমিই পরমাত্মা’ এরূপ যুক্তি কোন দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তি নহে। ইহা কোন ভাবপ্রবণ ভাবুকের কল্পনা ভিন্ন কোন দর্শনেরই মত নহে। যাঁহারা সোঽহং-এর সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা সোহংএর তত্ত্ব জানেন না। আমিই সেই পরমাত্মা এরূপ ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব সাধকগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা ‘আমি দাস’ এ কথার সঙ্গে উহার অসামঞ্জস্য হয় দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া যান। শেষকালে নাকি ইহার অর্থ করা হইয়াছে ‘তাঁহার আমি’। পাঠকগণ জানিয়া রাখুন ‘হংস এবং সোহং’ একটী বীজ-মন্ত্র। ইহার অর্থ পুরুষ-প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-পুরুষ; তত্ত্বতঃ একই। অর্থাৎ ‘হং’ও যাহা - ‘সঃ’ও তাহা; আবার ‘সঃ’ও যাহা - ‘হং’ও তাহাই।

এই ‘হংস’মন্ত্রই অজপা মন্ত্র। পাঠকগণ মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৫ ও ৬ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখুন। এই ৫ চিহ্নিত কেন্দ্রই মহত্তত্ত্ব; ইহাই ‘অং’। ৬ চিহ্নিত কেন্দ্রই অব্যক্ত কেন্দ্র; উহাই ‘ ঃ’। এই ঃ এবং অং মিলিয়া ‘হং’ হয়। এই ‘হং’ ধ্বনি পুরুষ, ‘সঃ’ ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের কেন্দ্রস্থান এবং ঐ মহৎ অব্যক্ত স্থান একই স্থান জানিতে হইবে। আমরা যে শ্বাসটা টানি এবং ছাড়ি ইহার মূল যোগসূত্র ঐ মহৎ অব্যক্তকেন্দ্রে বিদ্যমান। কি ভাবে উহা বিদ্যমান তাহা বলিতেছি। শ্বাসটা টানিবার সঙ্গে স্থূলভাবে দুইটা গতি যে কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শ্বাস টানিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গতি নাভি হইতে লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত গমন করে দেখিতে পাওয়া যায়। আসল কথা এই গতিটী মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত মূলাধারের কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত গতিসম্বন্ধযুক্ত বায়ুকে অপান বায়ু বলে। এই বায়ুই প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে টানিয়া লয়। এইভাবে টানিয়া লইয়া অপান বায়ুটা মূলাধার হইতে ফিরিয়া নাভি পর্য্যন্ত চলিয়া আসে; সঙ্গে সঙ্গে আমরা শ্বাসটা ছাড়িয়া দিই। অনেকে স্থূল শ্বাসপ্রশ্বাসে অজপা জপে উপদেশ দেন। এরূপ মোটা উপদেশের হাল দেখিলেই বুঝা যায় যে ইঁহারা অজপা-জপ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নিজেরা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ হইতে লাভ করেন নাই। ইহা অজপার অত্যন্ত স্থূল কথা। মস্তিষ্কের ৯ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখুন। ইহাকে আমরা প্রাণকেন্দ্র নাম দিয়াছি। মূলাধার হইতে এই কেন্দ্র পর্য্যন্ত একটা নাড়ী আছে (মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত এই পথে বহু নাড়ী আছে, ইহাদের মধ্যে এই প্রাণ নাড়ী একটী)। এই নাড়ী পথে একটা সূক্ষ্ম প্রাণ-গতি উঠা নামা করে। এই প্রাণগতিটা যখন মূলাধার হইতে মস্তিষ্কে প্রাণকেন্দ্রে গমন করে, তখন এই গতিটাই স্থূল নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত অপান বায়ুকে টানিয়া মূলাধারে আনে। আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস টানি ও ফেলি উহার মূলে অপান বায়ুর আকর্ষণ বিকর্ষণ বিদ্যমান। আবার অপান বায়ু যে একবার নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত যাতায়াত করে তাহার মূলে মেরুদণ্ড মধ্য পথস্থিত মূলাধার

হইতে মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রাণ গতির আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিদ্যমান। পাঠকগণ নিজেদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সহিত মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। । এবার মস্তিষ্কের ৫ ও ৬ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখুন। এই কেন্দ্র হইতে মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত একটা সূক্ষ্ম গতি বিদ্যমান। এই গতিটা যখন প্রাণকেন্দ্র (৯ চিহ্নিত কেন্দ্র) হইতে মহৎ তত্ত্ব পর্য্যন্ত গমন করে তখন মূলাধার হইতে প্রাণের গতি মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত গমন করে। আবার ঐ গতি যখন মহৎ অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে প্রাণকেন্দ্রে ফিরিয়া আসে তখন মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র হইতে প্রাণগতিটা মূলাধার পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাসটা টানি ও ফেলি উহার মূলস্থানে বিদ্যমান দুইটী গতি - যাহার একটা গতি মহৎ অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত আসে, আবার আর একটা গতি প্রাণকেন্দ্র হইতে ফিরিয়া মহৎ অব্যক্ত কেন্দ্রে যায়, যখন গতিটা অব্যক্ত হইতে নামিয়া প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত আসে, তখন ধ্বনি হয় 'হং'। আবার যখন গতিটা প্রাণকেন্দ্র হইতে ফিরিয়া অব্যক্ত কেন্দ্রে যায় তখন ধ্বনি হয় 'সঃ'। অজপা-জপের মূলে এই 'হংসঃ' বিদ্যমান। আমরা চলিত কথায় যাহাকে ব্রহ্ম-তালু বলি উহারই নিম্নে মস্তিষ্কের মধ্যে মহৎ অব্যক্ত-কেন্দ্র বিদ্যমান। সদ্যঃজাত শিশুদের এই স্থানটী খুবই কোমল থাকে, সদ্যঃজাত শিশুদের ব্রহ্মতালু দেখিলে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এই স্থানটা যে সম্বন্ধ রাখে ইহা বুঝা যাইবে।

ভারতের বর্ণমালার সহিত বিশ্বসংসারের বিবর্ত্তন-লীলা কি সুন্দর ফুটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিবার বিষয়! ক্রমবিকাশের শেষ স্তরে বিকশিত হও তবেই বিবর্তন-লীলা রহস্য ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে। এই পৃথিবীতে মানুষের শাসন, ধর্ম্ম, সমাজ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে 'তুমি' ভাব তোমার বিকাশটা কোন্ স্তরে আসিয়াছে; তাহার পর যাহা ইচ্ছা বল। আর মানুষকেও আমাদের ইহাই বলিতে হইতেছে "তুমি কোন একটা নীতি বিধি মানিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া লইও তোমার উহা বিকাশে কতটা সাহায্য করিবে। যাহারা আসুরিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা নিজেদের বিকাশের কথা ভাবে না; সমাজেরও বিকাশের বিষয় ভাবে না। তাহারা চায় নিজের ভোগটী ষোল আনা বুঝিতে আর সেইটুকুর সুবিধার জন্য সমস্ত পৃথিবীর সর্বনাশ করিতে। সত্য কথা ত ইহারা কোন দিনই বলিবে না। যে কোন প্রকারে মিথ্যা সংস্কারে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদের স্বার্থটি নিষ্কণ্টক করিয়া লইতে চায়। কাজেই তুমি সাবধানে চলিও।"

ভারতের সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি, ধর্ম সবটাই সৃষ্টির বিবর্ত্তন ধারার সহিত গ্রথিত। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, সঙ্গীত*, সমাজনীতি, রাজনীতি একই ধারার সহিত

---

* সঙ্গীত শাস্ত্রে ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিনীর উল্লেখ আছে। (সঙ্গীত অবলম্বনেও বিজ্ঞানময় কোষের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া যায়)। এই ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিনী (৬×৬) শিবের ছয়টী মুখের স্বরূপ। ইহাদিগকে 'ধ্রুবপদ' বলে। সঙ্গীতের এত উন্নত বিকাশ সম্বন্ধে কাহারও যদি কিছু বুঝিতে হয় তবে ভাল সঙ্গীত সাধকের গান শ্রবণ করুন। আপনি নিবিষ্ট হইয়া শুনিবার পর সঙ্গীত শেষে আপনার মনে হইবে যে আপনি নিদ্রা হইতে

গ্রথিত। বর্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় বর্ণমালার মধ্যে এমন বৈজ্ঞানিক বিবর্তন-সৌন্দর্য্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা তিনটা স (শ, ষ, স) থাকাতে অসভ্যতা মনে করেন। দুইটা ন (ণ, ন), দুইটা য (জ, য), তিনটা র (র, ড়, ঢ়), আবার ছয়টা অনুনাসিক বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং) ইহা তাঁহাদের নিতান্তই চক্ষুশূল। আবার কেহ কেহ স্বপ্ন দেখিতেছেন (প্রায়) ৫০টী বর্ণের স্থলে ইংরাজী ২৬টি বর্ণের প্রবর্ত্তন করা যায় কি না। কাহারও মতে ভারতীয় অক্ষরে লেখাপড়া বড়ই কষ্টকর। অক্ষরের কোণাকাণি থাকার দরুণ উহা নাকি তাহাদের চক্ষের মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দেয়। শেষকালে কেহ কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন ইংরাজী বর্ণমালা এবং ২৬টী বর্ণের সাহায্যে তাঁহারা লেখাপড়ার প্রবর্তন করিবেন। এই কোণাকাণিগুলি ঘষিয়া মাজিয়া না দিলে নাকি প্রেসের কাজেরও ক্ষতি হইতেছে।

বাল্যকালে প্রথম শিক্ষার সময় এইরূপ অক্ষরগুলি তাঁহাদের নাকি ভারি যাতনার কারণ হইয়াছিল। যাঁহারা এরূপ ভাবেন তাঁহাদের এই অস্বাভাবিক স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি! হাজার বৎসরের অধীনতা একটা জাতকে কি রকম অন্ধ অনুকরণের কথা ভাবাইতে পারে তাহার প্রমাণ বোধ হয় ইহা হইতে স্পষ্ট আর কোনটাতেই হইতে পারে না।

এই বর্ণমালাগুলি ভারতের গৌরব। অনেকের ধারণা - ভারতের অধঃপতনের মূলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদই দায়ী। ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যাইবার মূলে দায়ী ভারতের অধ্যাত্মবাদ নহে, বরং ভারতের শক্তি ও গৌরব উহাতেই বিদ্যমান। ভারতকে সর্বনাশের স্তরে আনিয়াছে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পুরোহিতবাদ। পদাঘাত করিতে হইবে এই ভণ্ডামীর মূলে। ভারত জড়বাদের ভিত্তি লইয়া কখনও স্বাধীন হইবে না, এ কথা আপনারা স্থির জানিয়া রাখিবেন। ভারত স্বাধীন হইবে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি লইয়াই। পাশ্চাত্যের হাওয়ার গতি দেখিয়া সে তালে নাচানাচি করিয়া "নামকো-ওয়াস্তে" যিনি যতই স্বপ্ন দেখুন না কেন, যাঁহাদের চরিত্রবল আছে এমন কর্ম্মিগণ ইঁহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারেন। ৪০০/৫০০ বৎসর পূর্বে হিন্দী ভাষাকে আরবী অক্ষরে লিখিবার চেষ্টা করা হয়। ক্রমে উহা উর্দ্দূ ভাষাতে পরিণত হইয়াছে। ইহার যে কি ভীষণ বিষময় ফল হইয়াছে তাহা এখন ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। ইহার ফলে এক প্রকাণ্ড অংশ ভারতবাসী (কেবল মুসলমানই নহে, বহু হিন্দু) নিজেদের সভ্যতার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিদেশীয় মুসলমান শাসকগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে কায়েম রাখিবার জন্য ইহাই হইয়াছিল প্রধান সহায়। এখন ভারতের এক প্রকাণ্ড অংশ নিজেদের সভ্যতাকে এমনভাবে ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই ভাষার মধ্য দিয়া যদি আরবীয় সভ্যতারও প্রতিবিম্ব দেখা যাইত তবুও কোন কথা ছিল না, কিন্তু কেমন একটা কাল্পনিক সভ্যতা বহু উর্দ্দূ ভাষা-ভাষীগণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা যেন ভারতবাসীও নহেন, আরবীয়ও নহেন। ভারতের সুখ-দুঃখে ইঁহাদের বেদনা হয় না,

---

উঠিয়াছেন। ঐ রাগ-রাগিনীগুলি সম্পূর্ণরূপে অভিমান ও বিজ্ঞানময় কোষের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি সুষুপ্তি কালে আমরা অভিমানের কেন্দ্রে আসিয়া যাই।

ভারতের গৌরবকেও ইঁহারা গৌরব মনে করেন না। এখন চেষ্টা চলিয়াছে ভারতীয় টাইপকে ইংরাজী টাইপে কিভাবে পরিণত করা যায়। তাহা হইলে সোনার সঙ্গে সোহাগার মিল হইয়া ইহার রং আরও জাঁকাল হইয়া উঠিবে। ইহার ফলে ভারতের সুখ-দুঃখ ও চিন্তাধারা হইতে বঞ্চিত থাকিবার জন্য আরও একটা দল গড়িয়া উঠিতে পথ পাইবে। বালকগণকে বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু টাইপের অক্ষর তো শিক্ষা করিতেই হইতেছে, এবার আবার ইংরেজী টাইপের বর্ণমালাও বালকগণকে আয়ত্ত করিবার জন্য বৃথা পরিশ্রম বৃদ্ধি করিতে হইবে।

যাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের কথা ভাবিতেছেন তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য আমরা জানাইতেছি যে ভারতের উন্নতির পথ ভারতীয় সভ্যতার উপাদানকে ভিত্তি করিয়া করিতে চেষ্টা করিবেন। ঐ ভিত্তির উপর পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তিকে টানিয়া আনুন, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু সাবধান! বাহিরের সভ্যতার উপাদানকে ভিত্তি করিয়া কিছু করিতে গেলে ইহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইবে। মনে রাখিবেন কুচক্রীর দল ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ সহস্র বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই চক্রের লক্ষ্য যে কোন ভাবে ভারতের সমাজকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেওয়া। আপনি আপন সভ্যতার ভিত্তি ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু গড়িবেন উহাই ভারতের অমঙ্গলের কারণ হইবে। বেশী বলার প্রয়োজন নাই; নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবেন না। এখন চাই সমাধান, সমস্যার সময় নাই। যাহা হউক এবার আমরা আমাদের মূল বিষয়ে প্রবেশ করিব।

বিজ্ঞানের বোধের মধ্যে যতক্ষণ শান্তির অংশ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানের স্তরে বদ্ধ থাকেন। এই শান্তির অংশ কাটিয়া গেলে বিজ্ঞানের কেন্দ্রে অহং তত্ত্বেরও বিলয় হয়। অহং তত্ত্বের বিলয় হইলে বিজ্ঞাতা জ্ঞাতারূপে পরিণত হন। অর্থাৎ বোধ মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে চলিয়া আসে এবং বোধকর্ত্তা 'জ্ঞাতা' নামধারণ করেন।

এই জ্ঞাতা এবং বিজ্ঞাতা তত্ত্বতঃ এক বস্তু বলিয়াই মানিয়া লওয়া যায়। অষ্টম কলার বিকাশে যিনি বিজ্ঞাতা পঞ্চদশ কলার বিকাশে তিনি জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতাই সাংখ্যের পুরুষ। মহত্তত্ত্বই জ্ঞানশক্তি। জ্ঞাতা-পুরুষ এই জ্ঞান-শক্তির জ্ঞাতা। আমাদের পুরুষোত্তম্ এবং সাংখ্যের পুরুষে যাহা ভেদ তাহা এখানে এবার স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সাংখ্যকার বহু পুরুষ বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা বহু পুরুষ স্বীকার করি না। আমরা বহু অহংকার (অহংকারই ক্ষর-পুরুষ) (পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বই অহংতত্ত্ব, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) স্বীকার করি কিন্তু বহু পুরুষ স্বীকার করি না। বিজ্ঞান ক্ষেত্রের বিজ্ঞাতাই অহংকার আর ঐ অহংকার যখন পঞ্চদশকলা বিকাশের ক্ষেত্রে আসেন তখন তিনি জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতাই সাংখ্যের পুরুষ। এই জ্ঞাতাপুরুষই অক্ষর-পুরুষ। পুরুষ এক কি বহু বলা যায় না। বিচার করিলে এ পুরুষকে বহু পুরুষ স্বীকার করা যায়। কারণ তিনটী শক্তি (ঃ + অ + ং) মিলিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। শক্তিস্তরের আধারে এইরূপ বহু অক্ষর পুরুষ থাকিতে পারেন। একটী অক্ষর পুরুষের মুক্তি হইলে একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তি হইয়া যাইবে। একটি ক্ষর পুরুষের মুক্তি হইলে একটী মাত্র জীবের মুক্তি হইল। সাংখ্য এই স্তরের অক্ষর পুরুষকেই বহু পুরুষ বলিতে চান কিনা ইহার বিচার আমরা করিব না।

আমরা যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিতেছি তিনি যদি সাংখ্যের পুরুষ হইতেন তবে সাংখ্যকার বহু পুরুষ বলিতে পারিতেন না। মহতের কেন্দ্রে স্থিত হইলে বহু পুরুষের কোন আভাষই পাওয়া যাইবে না। তবে বহু অহংকারকে দেখিয়াই সাংখ্য বহু পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পুরুষোত্তমের স্তরে আসিলে ইহা বুঝা যাইবে অহং-তত্ত্বের বাস্তবিক কোন ভিত্তিই নাই; উহা মহৎ-গর্ভে পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রতিবিম্বই জীবরূপে এই বিশ্বে বিচরণ করিতেছে।

এখন পাঠকগণের ধারণা হইতে পারে যে সাংখ্য-পথে তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত বিকাশের কথা নাই। সেরূপ ধারণাও ঠিক হইবে না। সাংখ্য শেষ-বিকাশ (ষোড়শ কলা) পর্য্যন্ত গিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্যকার পুরুষোত্তম স্তরের কথা জানেন নাই। ইহার কারণ সাংখ্যকার গণেশ ও শিব-স্তর প্রধান অনুভূতির পথে আসিয়াছিলেন, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতির পথ ধরিয়া আসিলে পুরুষোত্তম-স্তরে আসা যাইবে। আবার গণেশ শিব-পথে আসিলে পুরুষোত্তম-স্তরে না আসিলেও বিকাশ উভয় পথেই ষোড়শ-কলা পর্য্যন্ত হইবে। বিকাশের দিক দিয়া বিচার করিলে কোন পথই কম নহে।

পুরুষোত্তম-স্তর তিনগুণের অতীত। সাংখ্যের পথেও তিনগুণের অতীত অবস্থা লাভ হয়। সাংখ্যের ত্রিগুণাতীত অবস্থা এবং পুরুষোত্তম-স্তরের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সামান্য ভেদ আছে। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ তিনগুণ। জ্ঞানে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, কর্মে রজোগুণের এবং ভোগ-মোহে তমোগুণের আধিক্য বুঝিতে হইবে। সত্ত্বগুণযুক্ত পুরুষই জ্ঞাতা পুরুষ। রজোগুণযুক্ত পুরুষ কর্মী পুরুষ এবং তমোগুণযুক্ত পুরুষ বদ্ধ পুরুষ। বৃক্ষাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাখী, পশু ও গণেশ-স্তরের বিকাশ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ বদ্ধ জীবের অন্তর্গত। ইহারা বাঁচিয়া থাকা, আহার করা এবং সন্তান উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্যই বুঝে না। গণেশ চরিত্র মানুষ, গণেশ + সূর্য-চরিত্র মানুষ, গণেশ + বিষ্ণু-চরিত্র মানুষ 'কর্ম্মী'। সূর্য্য - গণেশ (গণেশহীন সূর্য্য), বিষ্ণু - গণেশ (গণেশহীন বিষ্ণু) এবং অপুষ্ট বিষ্ণু (নিম্ন স্তরের শিব হইতে সঙ্গ প্রভাবে যাহারা বিষ্ণু চরিত্র আয়ত্ত করে) মানুষই অসুর হয় বা অসুরের সাহায্যকারী হয়। ইহারা বদ্ধ জীবের মতই বাঁচিয়া থাকা, আহার করা এবং সন্তান উৎপন্ন করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু ইহারা বদ্ধ-স্তরের জীবের মত অন্যের বিকাশে অবিরোধী নহে। ইহারা নিজেদের ভোগ ও আহারাদির সুবিধার জন্য অন্যের বিকাশ রুদ্ধ করিবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। 'খাও, সন্তান জন্মাও আর অন্যকে বিকাশে বাধা দাও' ইহারই জন্য ইহারা বিপুল কর্ম্মী। কর্ম্মী হইলেও ইহারা মোহবদ্ধ জীব। উন্নত শিব-স্তরের মানুষই জ্ঞানী। এই জ্ঞানের পূর্ণস্তরে মহৎ-তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের পরপারে অব্যক্ত-তত্ত্ব। অব্যক্ত-তত্ত্বের অনুভূতি আসিলে সাধকের আর জ্ঞান মোহ থাকে না, ইহারই নাম ত্রিগুণাতীত অবস্থা। সাংখ্য-পথেও এ অবস্থা লাভ হয়।

শক্তি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে অব্যক্তের গর্ভে যাঁহার জ্ঞানরাশি নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় তিনি এখানেই শেষ সমাধি লাভ করেন। তিনি আর পুরুষোত্তমের স্তরে যান না। এরূপ মহাপুরুষদিগকেই শাস্ত্রে ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। যাঁহারা যোগ পথে (কর্মের পথে) অব্যক্তের অনুভূতি লাভ করেন, তাঁহাদের

সমস্ত জ্ঞানরাশি অব্যক্তের গর্ভে বিলীন হয় না, কিছু থাকিয়া যায়। এই জ্ঞানরাশি বিলীন হওয়া বা না হওয়া কাহারও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নহে। ইহা সাংখ্য এবং যোগ-পথের ফল মাত্র। যাঁহারা যোগ-পথে আসেন তাঁহারা পুরুষোত্তম-স্তরে স্থিত হন। ইঁহারাই ঈশ্বরকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও ত্রিগুণাতীত। আবার ঈশ্বর-কোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও ত্রিগুণাতীত।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বিকাশের বিচারে উভয়েই সমান। ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্তগণ অব্যক্তের সন্ধান পাইবার পর অব্যক্তে জ্ঞানাংশ নিঃশেষ করিতে করিতে যতদিন কাটে ততদিন থাকেন। এভাবে বহু বৎসরও থাকিতে পারেন। ঈশ্বরকোটীর জীবন্মুক্তগণ অব্যক্তের সন্ধান পাইবার পর পুরুষোত্তম স্তরে স্থিত হন। এবং কর্ম্মাংশ নিঃশেষ হইতে হইতে যতদিন কাটে ততদিন অপেক্ষা করেন। ইঁহারাও বহুদিন থাকিতে পারেন। অহংকার উভয়েরই কাটিয়া গিয়াছে। সৃষ্টির যাহা রহস্য তাহা উভয়েই জানিয়া লইয়াছেন। অভিমানের ভ্রান্তির উপরই সৃষ্টির খেলা অবস্থিত। উহা ৭৷৷০ কলা বিকাশের পরেই শেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, অষ্টম কলায় অভিমান শেষ হইয়া গিয়াছিল; পরে জ্ঞান-শক্তির পূর্ণ বিকাশে উভয়েই মহতের কেন্দ্রে আসিয়াছেন। একজনের জ্ঞান কলায় কলায় শেষ হইয়া - ১৫ কলাই শেষ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে তিনি ত্রিংশ কলায় (১৫ জ্ঞান-কলা + ১৫ অব্যক্ত-কলা) বিকশিত হইয়াছেন। আর একজন কর্ম্মের বেগ লইয়া আসিয়াছেন; কর্মশেষে ইঁহারও শরীর পতন হইবে। ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্তই জগৎ। এই ৭৷৷০ কলা ৩০ কলার ৪ অংশের ১ অংশ; ইহাতেই পরিবর্ত্তনশীল জগৎটা অবস্থিত। গীতায় বিভূতিযোগের অধ্যায়ে সে কথা বলা আছে। অর্থাৎ ৪ অংশের ১ অংশে জগৎটী স্থিত। তুমি যে জগৎটীকে দেখিতেছ উহার স্থিতি তোমার অভিমানটী পর্য্যন্ত। ইহার পর বিজ্ঞান-স্তরও ১৫ কলার শেষ হইয়া গিয়াছে। ৩০ কলার জ্ঞানও অন্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এ প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা গীতা করিয়াছেন। ‘‘যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানাং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।’’ সাংখ্য-পথে যে স্থান লাভ করা যায় - যোগ পথেও সেই স্থান লাভ হয়। সাংখ্য ফল এবং যোগফল একই; এরূপ যিনি দেখেন তিনিই ঠিক দেখেন। সাংখ্য-দর্শনে বহু পুরুষ উল্লেখ থাকিলে, একটা ত্রুটী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু বিকাশের পথে উভয়েই ত্রিগুণাতীত।

সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য পুরুষোত্তম-স্তরই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে হইবে। তাহার পর যাঁহার যেমন ইচ্ছা বলিতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝা। আমরা দার্শনিক মতবাদ লইয়া ঝগড়া করিতে চাহি না। উহা কোন কাজে আসিবে না। যিনি সাধক তিনি সাধনায় বুঝুন, যিনি কর্ম্মী তিনি কাজ করুন। যাঁহারা সাধনার ধার ধারেন না, কর্ম্মও করেন না, তাঁহারা তর্ক করিয়া হাত চাপড়াইয়া টেবিল ফাটাইতে চান ফাটান। যিনি কর্ম্মী তিনি ঠিক কর্ম্মের উপাদান বাছিয়া লইবেন। আর যিনি সাধক তাঁহারও যেখানে যেটুকু প্রয়োজন তাহা ঠিকই পাইবেন। এবার আমরা পুরুষোত্তম-স্তরের অন্যান্য কথা বলিব।

অব্যক্ত অনুভূতি-স্তরে যাঁহার জ্ঞান বা বোধ নিঃশেষে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায় তাঁহার শরীর তখনই ত্যাগ হইয়া যায়। বোধের সঙ্গেই শরীরের সমস্ত প্রকার ক্রিয়া

কলাপ চলিয়াছে। বিকাশ যে কোন স্তরেই থাকুক না কেন বোধের মধ্য দিয়াই শরীর রক্ষা হইয়া থাকে। বোধের কেন্দ্র নষ্ট হইয়া গেলে শরীর তখনই মৃতবৎ পতিত হইবে। শক্তি-স্তর হইতেই আমাদের শরীরটা যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে, একথা সত্য। কিন্তু শক্তিস্তরের সঙ্গে শরীরের প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান বোধের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন শক্তির কেন্দ্র থাকুক না কেন বোধশক্তি শরীরের সমস্ত অণু পরমাণুতে মহৎ কেন্দ্র* হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। শরীরের সুখ দুঃখ আমাদের অভিমান কেন্দ্রে বা মনোময় কোষে আসুক চাই নাই আসুক শক্তিস্তরে উহা পৌঁছিলেই শরীরের কাজ ঠিকমত চলিতে থাকিবে। বোধ-শক্তি যে মুহূর্ত্তে অব্যক্ত শক্তিতে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই শরীরটা নিশ্চল হইবে। শরীরের অণুপরমাণুর অভাব অভিযোগ সবটাই বোধের মধ্য দিয়া শক্তি স্তরে যায়। শক্তিস্তর ইহার জন্য যখন যেটুকু করাইবার প্রয়োজন হয় তাহা অন্যান্য কেন্দ্রশক্তি সাহায্যে করাইয়া থাকেন। শরীরের মধ্যস্থিত শক্তিলীলা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। বিজ্ঞান এবং জ্ঞান-স্তরে প্রতিষ্ঠিত যোগী মহাপুরুষ বহুদিন সমাধিস্থ থাকিলেও তাহাদের শরীর নষ্ট হয় না। শরীরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সেই সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না। সে সময় শক্তিস্তর হইতেই তাঁহাদের শরীর রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথরূপে হইয়া থাকে। শরীরের সম্বন্ধে সুখ দুঃখ তাঁহাদের মনোময় কোষে প্রবেশ না করিলেও তাঁহাদের শরীর শক্তি-স্তরের মধ্য দিয়াই রক্ষিত হইয়া থাকে। যতদিন এই স্তরের যোগীগণ মহত্তত্ত্বে স্থিত থাকিবেন ততদিন তাঁহাদের শরীর নষ্ট হইবে না। কিন্তু যদি তাঁহারা অব্যক্ত স্তরের শেষ কলায় আসিয়া যান, তবে তাঁহাদের শরীর আর থাকিবে না।

মানুষ যখন মানুষের উপর অত্যন্ত নির্দ্দয় নির্ম্মম অত্যাচার করে তখন অত্যাচারিত মানুষকে সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতে দেখা যায়। মানুষ যতটা দুঃখ সহ্য করিতে পারে দুঃখের মাত্রা উহা হইতে অধিক হইলে ঐ দুঃখবোধধারা আর মনোময় কোষে প্রবেশ করিবে না। (মানুষ যতটা সুখ-স্পন্দন সহ্য করিতে পারে, সুখ স্পন্দন উহা হইতে অধিক হইলেও সেই সুখ-স্পন্দনও আর মনোময় কোষে প্রবেশ করিবে না; অর্থাৎ অত্যধিক সুখে মানুষ সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইবে)। অর্থাৎ মানুষের মনোময়কোষের চিত্ত-অংশ তখন স্তব্ধ হইয়া যায়। তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া অত্যাচারের পীড়ন শক্তি স্তরে গমন করে এবং প্রাণশক্তি নিতান্ত অন্ধের মত হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। হয়ত কেহ কাহাকেও ফাঁসি রজ্জুতে মারিবার চেষ্টা করিল। অসহায় ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া গেল। সে অবস্থায় তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিলে সে নিজের সুখ-দুঃখ কিছুই জানিতে পারিবে না, কারণ তাহার অন্তঃকরণস্থিত সুখ দুঃখবোধ-স্থান স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহারা সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুলীলা নিকটে অবস্থান করিয়া দর্শন করিবে তাহারা

---

* মস্তকে যেমন মহৎ কেন্দ্র আছে মেরুদণ্ডের মধ্যেও তেমনি মহৎ কেন্দ্র বিদ্যমান। যে সব জীবে বিকাশাল্পতার জন্য মস্তিষ্ক-অংশ প্রস্ফুটিত হয় নাই তাহাদের বোধ-কেন্দ্র বিশুদ্ধ চক্রে বিদ্যমান থাকে। বিশুদ্ধাখ্য এবং মহৎ কেন্দ্র একটি নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত আছে। ইহার একটি কেন্দ্র স্পন্দিত হইলে অন্যটিও স্পন্দিত হয়। নাড়ী সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই; সুযোগ হইলে আমরা সময়ান্তরে বলিব।

হয়ত দেখিবে লোকটা ছটফট করিতেছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে যাহার মৃত্যু সে কিছুই জানিতে পারিবে না! যে ঐরূপ ভাবে একজনকে মারিতে প্রস্তুত হয় সে তাহার নিজের মনুষ্যত্বকে নিজের বিবেকের নিকট এবং সমাজের নিকট হীন করে। সে তাহার বিকাশকে অত্যন্ত হীনস্তরে আবদ্ধ রাখিবার আয়োজন মাত্র করে। কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইল তাহার কষ্ট ততক্ষণ যতক্ষণ সে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায় নাই (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত রহস্য আমরা এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কারণ স্থানাভাব)। এরূপ মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কোন শক্তিমান পুরুষের কৃপায় সে যদি জীবনলাভ করে তবে তাহাকে চৈতন্য সঞ্চার করিয়া - সে যে হাত পা ছুঁড়িতেছিল এবং গোঁ গোঁ করিতেছিল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারিবে না। এ সব ব্যাপারের সবটাই শক্তিস্তর হইতে হইতেছিল। আমাদের শরীরের মধ্যে যে সব ঘটনা প্রতিনিয়ত হইয়া চলিয়াছে তাহার অতি সামান্য জ্ঞানও আমাদের হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক বিজ্ঞান ও জ্ঞান জগতের মধ্য দিয়া বোধ-ধারা শক্তিস্তরে গমন করিলে সেখান হইতে যে ইহার প্রতিক্রিয়া আসিতে থাকে এরূপ প্রমাণ পাঠকগণ এরূপ বহু ঘটনা হইতে জানিতে পারিবেন। এই শক্তিস্তরই আমাদের আনন্দময়-কোষ। জ্ঞান জগৎ মিটিয়া গেলে এই আনন্দ-জগৎ এর সঙ্গে আমাদের শরীরের সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া যায়।

অব্যক্তের পরপারে শক্তিস্তরের অবস্থিতি। এ স্তরের সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করা সহজ নহে। এখানের যাহা তত্ত্ব তাহা বেদান্তদর্শনের প্রথম তিনটী সূত্রে উল্লেখ আছে। শ্রীসপ্তশতী-চণ্ডীতে লীলারূপেও এই শক্তি-লীলা বর্ণিত আছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজার মধ্যেও এই শক্তিস্তরের কথাই স্পষ্ট আছে।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে - (১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা), দ্বিতীয় সূত্রে তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে - "যাহা হইতে সৃষ্টি আদি হয় তিনি ব্রহ্ম"। (২। জন্মাদ্যস্য যতঃ)। তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন "যাহা হইতে নিখিল শাস্ত্র (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে তিনি ব্রহ্ম" (৩। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ)।

জ্ঞান হইতে সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যে যেমন জানে সে তেমন বলে ও লিখে। বিকাশ যাঁহার যেমন স্তরে তিনি সে স্তরের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন। আত্মবিকাশের স্তর ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। উহাই বিদ্যালয়ে পড়ান হইয়া থাকে। আত্মা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

আমরা দর্শন-শাস্ত্রের কথার কাটাকাটি না করিয়া - খুব সরলভাবে এই সূত্রগুলির লক্ষ্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে "শক্তি হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং ধ্বনি হইতে সমস্ত জ্ঞান আসিয়াছে"। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, অং, অঃ - ইহারাই ধ্বনি। পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রের পাতা খুলিয়া অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত মৌলিক ও মিশ্র ধ্বনির প্রতীকগুলিকে সাজাইয়াই সমস্ত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। আকারে প্রকারে মতভেদ যতই থাকুক না কেন সমস্ত দেশের শাস্ত্রের উপাদানে ঐ ধ্বনি-সপ্তকই বিদ্যমান। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, অং, অঃ ইহারাই শক্তি। সমস্ত জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তন। মন্ত্র অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সমস্তটা সৃষ্টি এই সপ্ত-শক্তির খেলা। এই

শক্তিগুলি সকলে যখন একই শক্তিরূপে পরিণত হয় তখন পুরুষোত্তমের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

পূর্ণ শক্তিতে সাতটী শক্তি রহিয়াছে। সমস্ত স্তরের সৃষ্টি এই সাতটি শক্তি লইয়াই অবস্থিত। সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু আলোচনা হইয়াছে, এখন আবার কিছু বলা হইবে।

‘ ঃ’ অব্যক্তশক্তি। এই শক্তিকণাগুলি অন্ধকার বর্ণ; ইহা সমস্ত সৃষ্টির বিলয়কারিণী শক্তি, মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থূল ব্যক্ত-সৃষ্টি যখন প্রতিলোমগতিতে প্রলয়মুখী হইতে থাকে, তখন জীবের স্থূল শরীর নষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম শরীর লাভ হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হইয়া কারণ শরীর বা বীজ শরীররূপে পরিণত হয়। এরূপে প্রকৃতির অন্নময় (ও প্রাণময়) ও মনোময়কোষ প্রলয়মুখী হইয়া বিজ্ঞানময় কোষে স্থিত রয়। এই বীজগুলি প্রকৃতির বিজ্ঞানময় কোষের বিলয়ে অব্যক্ত স্তরের (ঃ শক্তিতে) শক্তির আশ্রয়ে আসিয়া আশ্রয়লাভ করে। পুনরায় নূতন সৃষ্টির সময় ইহারা আবার বীজ-জগতে আসে এবং ক্রমে স্থূল জগতে বীজ রূপ সৃষ্ট হইয়া থাকে। বীজ-জগৎটাই ‘উ’ (শান্তি) শক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত। মহতে (ং) পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইয়া বীজ সৃষ্ট হইয়া শান্তি-জগতে অবস্থান করে। আবার অব্যক্ত-জগৎ হইতেও পূর্ব্বসৃষ্টির প্রলয়ের বীজ আসিয়া শান্তি-জগতে বীজরূপে স্থিত হয়, এখানে আমরা দুই রকমের বীজ পাইতেছি। এক তো পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বে বীজ হয়। ইহাদিগকে আমরা সদ্যঃ-প্রতিবিম্বিত বীজ বলিব, আর এক রকম বীজ হয়, যাহারা পূর্ব্ব সৃষ্ট জীবের অব্যক্ত-গর্ভস্থিত বীজ। যে সব বীজ কখনও স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর একবারও ধারণ করে নাই উহারা সৃষ্টি-বিলয়ে অব্যক্ত স্তরে অবস্থান করে না, যে সব বীজ একবার সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর লাভ করিয়াছে তাহারাই বীজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির এই অব্যক্ত আধারে আশ্রয় লাভ করে। বিলোমে যখন সমস্ত সৃষ্টির বিলয় হয়, তখন সদ্যঃ প্রতিবিম্বিত বীজগুলি আর অব্যক্ত স্তরে গমন করে না। ইহারা তখন নিজেদের অস্তিত্ব হারায়।

যে সব মহাপুরুষ অনুভূতিতে পূর্ণ শিব-স্তরের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহারা স্থূল শরীরে, সূক্ষ্ম শরীরে বা বীজ শরীরে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন ইঁহারাও সদ্য-প্রতিবিম্বিত বীজগুলির মত বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অভিমানের কেন্দ্র ভেদ হয় নাই, এমন লোক যদি বলেন যে তিনি মৃত্যুর পর একেবারেই থাকিবেন না (যেমন নাস্তিকবাদীরা বলেন) (সূক্ষ্ম শরীরেও) তাহা হইলে জানিতে হইবে তিনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, কারণ অভিমানের কেন্দ্র ভেদ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবমাত্রেরই এরূপ ধারণা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। জীবমাত্রই নিজের অন্তরে জানে ‘‘আমি চিরদিন আছি এবং চিরদিনই থাকিব’’, ইহার ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারে না। পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রকৃতি নিজে লীলা করিয়া চলিয়াছেন, জীবন্মুক্তির দশায় সাধকমাত্রই ইহা জানিতে পারেন। পুরুষোত্তম যেমন এই সৃষ্টির কোন স্থানেই লিপ্ত নহেন, পুরুষোত্তমে যেমন অভিমান বলিয়া কোন বস্তু নাই, ঠিক তেমনি জীবন্মুক্তির দশায় সাধকমাত্রেই অভিমান বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। তাঁহার দিক দিয়া যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। শরীরটা খসিয়া গেলে পৃথিবীর লোকমাত্র জানিবে ‘‘তিনি গেলেন’’, কিন্তু জীবন্মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন মানুষের অন্তরই

একথা বলিতে বা ভাবিতে পারিবে না যে তিনি শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়া যাইবেন। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক কথা। জীব জীবন্মুক্তির স্তরেই থাকুন বা জীব-দশায় থাকুন তাঁহার অন্তরাত্মা একথা প্রমাণ দিবে না যে তিনি থাকিবেন না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জানেন তাঁহার যাহা আসল সত্ত্বা তাহা চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। অভিমানের বেড়াপাকে পড়িয়া তাঁহার জীবত্বের ভ্রান্তি হইয়াছিল, সেই ভ্রান্তির নেশাতেই তিনি জন্ম-মৃত্যুর পেষণে এতকাল নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। এখন তাঁহার আর সে ভ্রান্তি নাই। যাঁহারা জীবত্বের দশায় আছেন তাঁহারা যদি বলেন শরীর গেলে তিনিও মিটিয়া যাইবেন, আর এই কথাই তাঁহার অন্তরের কথা - পাঠকগণ জানিয়া রাখুন ইহা কখনও হয় না। তিনি মুখে ঐ কথা বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ঐ কথা কিছুতেই মানিতে পারে না। ইহা একেবারে মনোবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলিতেছেন।

"আমি থাকিব না বা ছিলাম না" একথার ঠিক ঠিক স্মরণ হওয়া মাত্র মানুষের হৃদয় মুশড়াইয়া যাইবে। ছোট ছোট বালক-বালিকাগণকে নিদ্রা হইতে জাগার পর কাঁদিতে দেখা যায়, এই কান্নার কারণ পাঠকগণ বোধ হয় জানেন না। ইহার কারণ উহারা জাগিয়াই কোথায় ছিল, সে কথা বুঝিতে চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ধারণা হয় যে উহারা ছিল না। এরূপ ধারণা আসিবার সঙ্গে উহাদের হৃদয়ের তন্তুতে ভীষণ আঁচড় লাগে; উহাতেই উহারা কাঁদিতে থাকে। "আমি ছিলাম না বা থাকিব না" একথা জীব যে মুহূর্তে ভাবিতে চেষ্টা করে তখনই তাহার হৃদয় কাটিয়া ছিড়িয়া যায়। পাঠকগণ নিজের জীবনেও ইহার অনুভব করিতে পারিবেন। নিদ্রা হইতে জাগিয়াই কোন কোন দিন যদি ঠিক ঠিক প্রশ্ন জাগে "কোথা ছিলাম", আর যদি মনে হয়, "ছিলাম না" - তখনই দেখিবেন হৃদয়ের মধ্যে কি ভীষণ অবসাদ আসিয়া আপনাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক জীবের অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না। সৃষ্টিকালে কখনও বীজরূপে, কখনও সূক্ষ্মরূপে, কখনও স্থূল শরীরে অবস্থান হয়, আবার মহাপ্রলয়ে বীজাকারে অব্যক্ত আধারে নিমজ্জিত থাকে। আবার পুনরায় সৃষ্টির সময় অব্যক্ত হইতে মহতের মধ্য দিয়া বীজজগতে আসিয়া থাকে। (অব্যক্ত-জগতে যত বীজ আছে সকলেই যে একেবারে বীজ-জগতে চলিয়া আসিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। অব্যক্ত-জগতে যত বীজ আছে তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র বীজ-জগতে আসিয়া থাকে)। অব্যক্তস্থিত বীজ যেমন মহতের কোল হইয়াই বীজ-জগতে আসে তেমনই পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব বীজও মহতের কোলের মধ্য দিয়াই বীজ জগতে আসিয়া থাকে।

'ং' জ্ঞানশক্তি। এই শক্তি জীবকে জীবের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। সাতটি শক্তির মধ্যে শুধু এই শক্তিই জীবকে নিজের প্রকৃতিকে জানাইয়া দিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। জ্ঞান + ইচ্ছাশক্তিতেই (মহত্তত্ত্বে) পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব-বীজ হয়। জ্ঞান-শক্তি স্ফটিকবর্ণ শক্তিকণা। এই শক্তির গতি এরূপ যে ইহা সৃষ্টিকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চায়।

'উ' শান্তিশক্তি। এই শক্তির আশ্রয়েই সৃষ্টিকালে জীবের বীজ রক্ষিত থাকে। বীজকে অঙ্কে ধারণ করাই ইহার কাজ। ইহা শুভ্রবর্ণ শক্তিকণা, ইহা স্থৈর্য্য শক্তিদানকারিণী কণা।

ইহার কোন দিকেই বেগ নাই। যোগিগণে এই কণাশক্তির বিশেষ বিকাশ থাকে। এই কণা যেখানে বেশী সংগঠিত সেখানেই মানুষ আত্মসমর্পণ করিয়া বেশী শান্তিলাভ করিয়া থাকে। গুরুর নিকট হইতে শিষ্য এই কণাই আহরণ করিতে চায়। গুরু যখন আর দিতে পারেন না তখন শিষ্য আর অধীন থাকিতে চান না। এই শক্তিকণার আবেশ না থাকিলে গুরুগিরি করা চলে না। এই কণাশক্তি মানুষকে দীর্ঘজীবি করে।

'ই' ত্যাগ-শক্তি। ইহা ধূম্রবর্ণ কণা; ইহা জীবকে উন্নত-বিকাশে অগ্রসর করিয়া দিতে বেগ প্রদান করে। ইহা বিকাশমুখী গতিসম্পন্ন শক্তিকণা। ইহা সৃষ্টি বিরোধী শক্তি-বেগ প্রদান করে। ইহা ত্যাগ প্রধান মনোবৃত্তি প্রস্তুত করে। এই শক্তির সংগঠন যাহার মধ্যে যত বেশী সে যুবকদের তত বেশী প্রিয় হয়। ইহা জীবকে সহিষ্ণু ও দৃঢ় করে। খুব অল্প অবলম্বনের মধ্যে বৃহৎ কর্ম্ম করিবার শক্তি ইহা হইতে মানুষ লাভ করে।

'অ' ইচ্ছা-শক্তি। এই শক্তি সৃষ্টিকে প্রকাশ করে। ইহা সৃষ্টিমুখী বেগদায়িনী শক্তি-কণা। ইহা অরুণবর্ণ শক্তি-কণা। এই শক্তি সৃষ্টবস্তুতে আকার দান করে। 'ই' শক্তি 'অ' শক্তির কাজকে ছাঁটিতে কাটিতে চায়, 'অ' এবং 'ই' বিপরীত কার্য্যকারিণী শক্তি।

'ঌ' প্রাণশক্তি। ইহা বহু জড়কণাকে জড় করিয়া রাখিতে চায়। ইহার কাজ হইল জড়িত বা একত্রিত করিয়া রাখা। ইহা অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং যুদ্ধপ্রিয়-কণা। ইহা কোন দিকেই বেগ দেয় না। পঞ্চ-মহাভূতের কণারাশি একত্র করিয়া লইয়া - এই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের এই শরীরটা গড়িয়া চলিয়াছে। প্রাণশক্তি অন্ধের মত কেবল গড়িতেই থাকে। 'অ' শক্তি সেই গড়াটীর উপর আকার দেয়। 'ই' শক্তি ছাঁটিয়া কাটিয়া আকারটীকে বিকাশের অনুকূল করিয়া দিতে চেষ্টা করে।

'অ' কার সৃষ্টিমুখী বেগ দেয়। ৮ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদের শরীরে এই শক্তি-কণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহার সৌন্দর্য্যে মেয়েদের উপর ছেলেদের আকর্ষণ হয়। সেই শক্তিকণাগুলিকে ভোগ করিবার জন্য পুরুষের মন ধাবিত হয়। স্ত্রীর শরীরে পুরুষ এই শক্তিকণা আহরণ করিতে যাইয়াই ভোগে আবদ্ধ হয় এবং সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। যাহারা খুব স্নেহশীলা তাহাদের শরীরে এই শক্তিকণা বহুদিন বর্ত্তমান থাকে। তাহাদের সৌন্দর্য্যও যায় না। স্ত্রীর শরীরে যত বেশী স্নেহের বিকাশ থাকিবে পুরুষ ততই তাহার অধীন থাকিবে।

যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই স্বভাবতঃ 'ই' শক্তি বৃদ্ধি হয়। 'ই' শক্তি হইতে সংযম আসিয়া থাকে। যৌবনকালে স্ত্রীতে যেমন 'অ' শক্তি বৃদ্ধি হয় সেইরূপ পুরুষেও যৌবনকালে ' ঃ' (কর্ত্তৃত্ব-শক্তি) বৃদ্ধি হয়। ইহা কেবল সৃষ্টিলীলাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য হইয়া থাকে। যৌবনকালে পুরুষে ' ঃ' শক্তি এবং স্ত্রীতে 'অ' শক্তি বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের 'ই' শক্তিও বৃদ্ধি হয়; কাজেই প্রকৃতি সে সময় উভয়কেই প্রচুর সংযম-শক্তিও প্রদান করিয়া থাকে, কাজেই উচ্ছৃঙ্খল হইবার কোন ইসারা প্রকৃতির ইচ্ছা নহে, ইহা বুঝা যায়।

'ঋ' কার কর্ম্মশক্তি। ইহা অগ্নিবর্ণ-কণা। প্রাণশক্তির কাজ জড় করা, ইহার কাজ ছিৎরাইয়া দেওয়া। 'ঌ' এবং 'ঋ' বিপরীত কার্য্যকারিণী শক্তি। 'ঋ' জীবনীশক্তি ক্ষীণ করে।

'ঋ' শক্তিই অগ্নিরূপে জীবশরীরে বিদ্যমান। এই শক্তিই আমাদের মধ্যে ক্ষুধারূপে অবস্থিত। অন্নকে পরিপাক করিয়া এই শক্তি অন্নকে রূপান্তরিত করে। প্রাণ এই রূপান্তরিত অন্নকণাকে নিজের কাজে লাগাইয়া লয়; ইহাতেই আমাদের শরীর প্রস্তুত হয়। শরীরের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিকণা নিজ নিজ কাজ স্বভাবতঃই ঠিক মত করিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখের দিকে কেহ তাকায় না, ভাঙ্গা-গড়া যাহার যেমন কাজ সে তেমন নিজের শক্তি অনুসারে করিয়া চলিয়াছে। অথচ শরীর-যন্ত্রের কাজটী ঠিক মতই চলিয়াছে। অগ্নিকণা প্রাণের দ্বারা একত্রিত কণাগুলিকে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। প্রাণকার্য্যকে এই অগ্নিকণা যেন দাবিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। অগ্নি নিত্য নূতন চায়, নচেৎ ইহার অস্তিত্ব রক্ষা হয় না। তাই জীবের ক্ষুধারূপে অগ্নি জীবকে তাড়না করে। জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণা তৃপ্তির জন্য যাহা আহুতি দেয় অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিতে যাইয়া ছোট ছোট কণায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেয়। প্রাণ আবার ঐ কণাকে আহরণ করিয়া জীবের শরীরের যেখানে যেমন প্রয়োজন গড়িতে থাকে। অগ্নি এবং প্রাণের এই কার্য্যধারা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এসব শক্তিস্তরের কথা। বিস্তারিত আলোচনা করিবার সুযোগ আমাদের হইবে না।

দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিপূজাতে অষ্ট শক্তির পূজা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অষ্ট-শক্তিকে পূজাতে 'আ, ঈ' ইত্যাদির প্রতিভূ করা হইয়াছে। 'আ' ব্রহ্মাণী। ইহা সৃষ্টিকরিণী শক্তি। আমরা হ্রস্ব স্বরগুলিকে লইয়াই শক্তি বিচার করিয়াছি। পূজাদিতে দীর্ঘস্বরগুলিকে 'শক্তি' এবং হ্রস্ব স্বরগুলিকে সেই শক্তির 'ভৈরব'রূপে পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহা লইয়া আমাদের বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা একই শক্তির পুরুষ-প্রকৃতি ভেদ মাত্র। কোন শক্তিকণারই পুরুষ-প্রকৃতি মিলনেই ঐ শক্তির কাজ হয়। কোন শক্তিকণাই যখন প্রকৃত কর্ম্মশক্তিরূপে পরিণত হয় তখন উহার পুরুষ প্রকৃতি মানিতেই হইবে। তাহা না হইলে শক্তিবেগ আসা এবং যাওয়া সিদ্ধ হয় না। 'ঈ' বৈষ্ণবী; ইনি পূজা-পদ্ধতির বিচারে পালনী-শক্তি। আমাদের বিচারে 'ঈং'-এর সহিত ইহার পার্থক্য আছে। আমরা 'ই'-কারকে ধূম্রবর্ণা শুষ্ককণারূপে স্থান দিয়াছি। আমাদের 'ই'-কারে এবং এই 'ঈ'-কারে পার্থক্য আছে। পাঠকগণ শুধু বুঝিয়া লইবেন। এ সব লইয়া তর্ক করা ঠিক হইবে না। 'ঊ' মাহেশ্বরী। আমাদের দেওয়া নির্দ্দেশের সহিত ইহার অমিল নাই। মাহেশ্বরী অর্থে ধর্ম্মশক্তি বা শিবাণী। 'ঋ' চামুণ্ডা; চামুণ্ডা অর্থে অসুর নিধনে অত্যন্ত কর্ম্মশক্তির বেগ বুঝায়। আমাদের সঙ্গে ইহারও অমিল নাই। 'ঌ' কৌমারী, কৌমারী অর্থে ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচর্য্যই প্রাণের শক্তি। বালিকারা পরিশ্রমকাতরা হয় না, খাটাইতে পারিলে খুব খাটিতে পারে। প্রাণকেন্দ্রের কোন স্বাধীন বিচার শক্তি নাই। ইহা মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের অধীন হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া কেবল খাটিয়াই চলিয়াছে। অন্ধের মত নির্ব্বিচারে খাটিয়া যাওয়া প্রাণশক্তিরই কাজ। আমাদের দেওয়া নির্দ্দেশের সঙ্গে ইহারও অমিল নাই। 'ঐ' অপরাজিতা; ইহা একারের দীর্ঘস্বর, এ, ঐ, ও এবং ঔ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই, কারণ ইহারা মৌলিক ধ্বনি নহে; ইহারা মিশ্র ধ্বনি। যাহা হউক ঐ কারে অ + ই আছে। 'অ'কার কোমল হৃদয়, 'ই' কঠোর। অপরাজিতার স্তোত্রে (চণ্ডী দেখুন) দেবীকে কোমল হৃদয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে

কঠোর হৃদয় বলিয়া বর্ণনা করা আছে। ‘‘ও’’ বারাহী; বারাহী অর্থে পৃথিবীকে দাঁতে চিরিয়া ওলট-পালট করিতে পারে এরূপ শক্তি। ইহাও আমাদের বিজ্ঞানে মিলিবে না। ও কারে অ + উ আছে। ‘অ’ কোমল হৃদয়, ‘উ’ শান্তি শক্তি। ইহা দৈবী সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট চরিত্র-লক্ষণ। শ্রীরামচন্দ্র এরূপ প্রকৃতির ছিলেন। ‘ ঃ’ নারসিংহী; ইহা পুরুষ-সিংহেরই (স্ত্রী) নামান্তর। ধ্যানে পুরুষসিংহের কথা আছে, ‘ ঃ’ পূর্ণশক্তির বিকাশ; ইহা আমাদের দেওয়া বিজ্ঞানে মিলিবে। পূজা পদ্ধতিতে ‘অং’ কারের স্থান নাই। ইহাকে ‘অঃ’ কারের হ্রস্ব স্বরের স্থানে রাখা হইয়াছে। ‘অং অঃ’ একই স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ নহে। আমরা অনুভূতির ভিত্তি ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। শাস্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এসব কথা বলা হইল। কেহ যেন শাস্ত্রবিধির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা কর্ম্ম বিজ্ঞান বুঝিতে চাই, সাধনার দ্বারা শক্তিশালী হইতে চাই, সাধক এবং কর্ম্মিগণ জানিয়া রাখুন মূল শক্তিতে যে সব শক্তির সমাবেশ আছে, যাহা হইতে সৃষ্টির বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ঐ সব শক্তির সব উপাদানই জীবের মধ্যে আছে। ঐ সব শক্তি বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট ইসারা ইঙ্গিত দেওয়া হইল। আমরা খুব সংক্ষেপে এ সবের আলোচনা করিলাম; পাঠকগণ নিশ্চয়ই চিন্তাশীল হইয়া ইহার আলোচনা করিবেন।

শক্তিতত্ত্ব বিচার-বিতর্কে বুঝাইয়া দেওয়া খুব কঠিন। চণ্ডীতে শক্তিতত্ত্বকে লীলারূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনে দার্শনিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া শক্তি-তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দার্শনিকগণের কথার মারপ্যাঁচে পড়িলে ইহার কোন কথাই বুঝা যাইবে না। বেদান্তদর্শন শক্তিস্তরের শেষ প্রান্তের দর্শন; উহা দুইটা কথা দিয়া বুঝান যাইবে না। বেদান্তবাদ বুঝিবার পূর্ব্বে শক্তিবাদ বুঝা প্রয়োজন। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিলেও বেদান্তের আভাস পাইবেন। বেদান্তবাদীদের টীকা কেবল অন্যান্য দর্শনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বেদান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদান্তের আসল মূল কথা হইল ‘‘প্রথম তিনটি সূত্রের মধ্য’’, বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান প্রচারক আচার্য্য শঙ্কর একজন বিরাট কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত শক্তিশালীই (কর্ম্মবাদীই) বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী। চণ্ডীর লীলাকথা শক্তিবাদী কর্ম্মীদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে। গীতা, চণ্ডী ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ একই স্তরের আদর্শের উপর স্থাপিত। চণ্ডীর লীলাকথা, কর্ম্মযোগীর দিগদর্শন - ইহার ভাষা এবং মন্ত্রমাধুর্য্য সাধকগণের সাধনশক্তি উদ্দীপক। এমন মধুর এবং সাধন-শক্তিদায়ী গ্রন্থ আর নাই বলিলেই চলে। শক্তিবাদীগণ এই লীলাপ্রসঙ্গে কর্ম্মের যে ধারা পাইবে ইহাদ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ কাজ দিবে।

চণ্ডীর তিনটি রূপ আছে। এই তিনরূপে তেরটি অধ্যায় আছে। প্রথম রূপে একটি অধ্যায়, দ্বিতীয় রূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অবস্থিত। পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত তৃতীয় রূপের অন্তর্গত।

চণ্ডীর প্রথম রূপের সংক্ষেপ কথা - ব্রহ্মা চণ্ডীর স্তুতি করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইয়া দিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া মধু এবং কৈটভকে বধ করিলেন। ব্রহ্মা এখানে সূর্য্যস্তরের কর্ম্মশক্তি, মধু-কৈটভ ব্রহ্মাকে (এখানে শিক্ষাবিভাগকে) গিলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ অসুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। আসুরিক শক্তির কর্ম্মবৈশিষ্ট্যের ইহা একটা দিক। ‘মধু’

এবং 'কটু' অর্থাৎ মিষ্ট এবং তিক্ত ভাব আনিয়া প্রথমে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করাইতে হয়, আমাদের সভ্যতার সমস্ত উপাদানই মধু আর তোমাদের সভ্যতার সমস্ত উপাদানই কটু (তিক্ত)। এই ভাব শিক্ষাশক্তিকে বিষাক্ত করিয়া দিলে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। সমাজ (বিষ্ণু) যতদিন জাগিবে না ততদিন ইহার প্রতিকার নাই। শিক্ষাবিভাগ নিজে কখনও অস্ত্র ধারণ করে না; ইহার কাজ সমাজকে জাগাইয়া দেওয়া। শিক্ষাবিভাগ সমাজকে না জাগাইয়া যদি 'মধু-কটুর' সহিত কথা কাটাকাটি করে তবে ইহার ফল ভাল হইবে না। প্রচারের ইহাই মূল বিজ্ঞান।

চণ্ডীর দ্বিতীয় রূপের প্রধান বিষয় সংগঠন। চণ্ডীর প্রথম রূপের উদ্বোদ্ধা 'ব্রহ্মা' (শিক্ষক)। দ্বিতীয় রূপের প্রধান কর্ত্তা বিষ্ণু (সমাজকর্ত্তা)। ব্রহ্মা এখানেও আছেন, কিন্তু প্রধান কর্ত্তা বিষ্ণু। দেবতাদের (দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন কর্ম্মীই দেবতা) উপর পীড়নে ইনি ব্যথিত হন। কি করা প্রয়োজন ইহা স্থির করিবার জন্য বিষ্ণু শিবের নিকট গমন করিলেন। শিব অর্থে 'ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারস্থিত জ্ঞানী মহাপুরুষ'। শিব সমাজের জ্ঞানশক্তি।

দুইটা লেক্‌চার দিতে পারেন বা দুই পাতা প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবিদেশে নাম অর্জ্জন করিয়াছেন এমন লোককে কেহ যেন জ্ঞানী না মনে করেন। ইহা শিক্ষাবিভাগ; জ্ঞান-বিভাগ নহে। শিব, বিষ্ণু-প্রমুখ দেবতাদের উপর আসুরিক শক্তির পীড়নের মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। শুনিতেই শিবের অন্তরে তেজের সঞ্চার হইল (অন্যায় অত্যাচার হইতে থাকিলে জ্ঞানীদেরও সমাধি ভঙ্গ হয়), তাঁহার চক্ষুর মধ্য হইতে এক প্রকাণ্ড জ্যোতি বাহির হইয়া আসিল, সেই জ্যোতির সঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের জ্যোতিও আসিয়া মিলিত হইল। সেই জ্যোতি পর্ব্বত পরিমিত হইয়া উঠিল এবং সেই জ্যোতির সমষ্টিতে এক শক্তি মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ ঐ শক্তিকে নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র ও সাজ-সজ্জা দান করিলেন।

একটা প্রপীড়িত সমাজ কিরূপে সংগঠিত হইয়া একই বিরাট শক্তিরূপে পরিণত হয় ইহাতে তাহারই বিজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মা মধু-কৈটভের সহিত যুদ্ধ করিতে যান নাই, তিনি বিষ্ণুকে (সমাজকে) জাগাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে কোন পরাধীন ও প্রপীড়িত জাতির শিক্ষাবিভাগই রাজশক্তির চালের সহিত পাল্লা দিতে পারে না। শিক্ষাবিভাগ সব সময় রাজশক্তির অধীন। শিক্ষাবিভাগে যাঁহারা উন্নত সম্মানে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে চতুর রাজশক্তি অর্থ ও যশদানে বশ করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু যিনি ব্রহ্মার মত চতুর তিনি সমাজকে সজাগ করিয়া নীরব হন।

এই সংগঠন-অধ্যায়ে বিষ্ণুর কার্য্যাবলীও ভাবিবার কথা। বিষ্ণু (সমাজকর্ত্তা) নিজে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি শিবের নিকট গমন করিলেন। শিবের (ধর্ম্ম-গুরুর) শক্তিতে তিনি এবং অন্যান্য দেবতাগণ নিজেদের শক্তি দান করিলেন। সেই সংগঠিত শক্তির সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল।

যখনই কোন সংগঠিত শক্তির সম্মুখীন হইতে হয় তখন কর্মের একটা বিজ্ঞান স্থির করিয়া সেই বিজ্ঞানে সমাজের সর্ব্বপ্রকার কর্মশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে

অগ্রসর হইতে হয়। কর্মসম্বন্ধে বহু দূর ভাবিয়া একটা বিজ্ঞান দেওয়াই শিবের জ্যোতি। সেই বিজ্ঞানটাকে খুব ভাবিয়া বুঝিয়া উহাতে বিষ্ণু (সমাজকর্তা) ও অন্যান্য দেবশক্তি মিলিত হইলেই প্রকৃত শক্তি প্রস্তুত হয়।

মানুষের কর্মনীতি যখন বিকাশ-বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া ইহসর্বস্ব হয়, তখন একদল মানুষ সমাজে উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ্য ভোগ অবলম্বন করে এবং ভোগকে স্থায়ী রাখিবার জন্য এমন নিয়ম প্রস্তুত করিয়া লয় যাহাতে অন্যের উপর দিনের পর দিন কেবল দুঃখের বোঝাই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই আসুরিক অত্যাচার। এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য মানুষ নূতন কর্ম-বিজ্ঞানে প্রস্তুত হইতে বাধ্য হয়, যুগ যুগান্তর ধরিয়াই মানবসমাজে এই অত্যাচার-লীলা চলিয়াছে - আবার ইহার প্রতিকারের জন্য নূতনভাবে কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন হইয়া চলিয়াছে। মানুষের জ্ঞানশক্তিই এই যুগান্তরের পুরোহিত। সেই অত্যাচারের সময় কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল মহাপুরুষ সমাজের সামনে নূতন এক কর্ম্মবিজ্ঞান দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। সমাজ সেই বিজ্ঞানে ঢালিয়া যাইয়া আসুরিক অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া লইতেছে। জ্ঞানী যত দূরদর্শী হন তাঁহার নির্দেশে সমাজ তত বেশীদিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে। জ্ঞানীর দূরদর্শিতা কম থাকিলে সমাজের উপর এই অত্যাচার একটা নিত্যকর্মে দাঁড়ায়। কারণ এই প্রকার আসুরিকতার মূলোচ্ছেদ করিতে যাইয়া জ্ঞানীদের দূরদর্শিতার অভাবে আর একটা আসুরিক মতই দাঁড়াইয়া যায়।

চণ্ডীর তৃতীয় রূপের ভিত্তিতে আর কোন নূতন কর্মভিত্তি দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় লীলার সংগঠনবিজ্ঞানের উপরেই এই যুদ্ধলীলা অঙ্কিত আছে। সেই চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া তৃতীয় রূপের সমস্ত যুদ্ধলীলা শেষ করেন। এই তৃতীয় লীলার যুদ্ধ ব্যাপারে শেষ শুম্ভ-বধ। এই যুদ্ধ ব্যাপারে শক্তিস্তরের সমস্ত উপাদান স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির অন্তর্গত কর্ম এবং যুদ্ধলীলা কত সুন্দর এবং কত গভীর ইহা দু'কথায় লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। স্থূল শরীরস্থিত রক্তমাংস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় (শক্তিস্তর) কোষ পর্য্যন্ত সর্বত্রই যুদ্ধলীলা প্রকটিত। যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই স্থিতি। যুদ্ধই প্রাণ, যুদ্ধই বহিঃ, যুদ্ধই অন্তঃ এবং যুদ্ধই সব। ইহাই চণ্ডীলীলার মর্ম্মকথা! শরীরতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, বিকাশতত্ত্ব, যে কোন স্তরের তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা কর না কেন সকল স্থানেই সকল ক্ষেত্রেই একই যুদ্ধলীলা দেখিতে পাইবে। সর্ব্বত্র একদল আসুরিক আদর্শ লইয়া ক্ষেত্রকে কলুষিত ও ধ্বংস করিতেছে। অন্য একদল ইহার প্রতিকার করার জন্য যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। একদলে বিকাশ বিরুদ্ধ শক্তি অন্যদলে বিকাশ অনুকূল শক্তি জাগ্রত থাকিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধলীলা চালাইয়া চলিয়াছে, তুমি চণ্ডী পাঠ কর, তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে।

শুম্ভ বধের পূর্বক্ষণে শুম্ভের সমস্ত সৈন্য শেষ হইয়া গিয়াছে। একদিকে শুম্ভ একা, অন্যদিকে চণ্ডীর সঙ্গে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী আদি অষ্ট শক্তি সহ মূলশক্তি। উল্লাসের সহিত চণ্ডী ও অষ্টশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন। শুম্ভ দেবীকে বলিলেন "তুমি আটজন সহ যুদ্ধ করিতেছ, আর আমি একা; তুমি একা হইয়া আইস, দুজনে যুদ্ধ করি।" একথা শুনিয়া চণ্ডী বলিলেন "আমি একা নইত আমার আবার দ্বিতীয় (পাঠকগণ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ

বুঝুন) কে আছে।'' এই কথা বলিবামাত্র ঐ অষ্ট শক্তি চণ্ডীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। দেবী বলিলেন, ''এবার দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।'' শুম্ভ বধ হইয়া গেলেন।

যে শক্তি একদিন শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের শক্তিসমষ্টি হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, মূলতঃ সেই শক্তি যে কে তাহা শুম্ভ বধে প্রকটিত হইয়া গেল। আমার, তোমার ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কোন জীবের যে তেজ, যে কর্ম ও যে জ্ঞানশক্তি ইহাদের সকলেরই মূলে যে ঐ অষ্ট শক্তি (আমরা ইহাকে সপ্ত শক্তি বলিয়াছি) বিদ্যমান, আর ঐ অষ্ট শক্তিই যে একই শক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত তাহা চণ্ডীর তৃতীয় রূপে প্রকটিত হইয়া গেল। পাঠকগণ এবার সমস্ত মন্ত্রশক্তি অধ্যায় পাঠ করিয়া যদি তাহা অনুধাবন করিতে পারেন তবে বেদান্তদর্শনের যে মূল কোথায় তাহা বুঝিতে পারিবে।

সমস্তগুলি শক্তিকণাই একই মূলশক্তিতে নিহিত আছে। যাঁহারা বিকাশের পথে এ স্তরে আসেন নাই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই যে মূলশক্তিকণা ইহাও দৃশ্যকণা, ইহারও গতি আছে কিন্তু ধ্বনি নাই। কণাগুলি হইতে রশ্মি বিকিরণ হয় না, তেজঃশক্তি কণাগুলির মধ্যেই নিহিত। ইহা কোথায় আছে খুঁজিবার চেষ্টা হইবামাত্র সাধক এই স্তর হইতে নামিয়া আসিবেন। (ইহা সর্বত্র আছে, কিন্তু শক্তিস্তর ভিন্ন অন্য কোন স্তরে ইহার অনুভূতি হইবে না)। এই কণা দৃশ্যকণা; ইহার দ্রষ্টা কে এরূপ প্রশ্ন সাধকের হওয়াই স্বাভাবিক। কণার দ্রষ্টা কে একথা তখনই স্থির হইবে, যখন কণাটির গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবার পূর্বাবস্থায় আসিবে, এরূপ অবস্থায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ স্থির হইয়া যাইবে - দৃশ্য বলিয়া কোন পদার্থ কোন যুগেই ছিল না। দৃশ্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহার দ্রষ্টাও এই কণাটি নিজেই, যতক্ষণ কণাটী গতিবিশিষ্ট ততক্ষণ ইহা দৃশ্যকণা। যখন ইহা স্থির হইবার পূর্ব্বাবস্থায় আসে, তখন ইহা স্পষ্ট স্থির হইয়া যায় যে কণাটি নিজেই দ্রষ্টা, কাজেই আমরা এই কণাকে চিৎকণা বা চিৎঅণুও নাম দিতে পারি।

কণাটী গতিবিশিষ্ট, তাই সৃষ্টি চলিয়াছে। তাই বেদান্তদর্শনে বলা হইয়াছে ''জন্মাদ্যস্য যতঃ''। সৃষ্টির সমস্ত উপাদান ঐ কণাতে রহিয়াছে। কণাটী যখন স্থির হইবার পূর্ব্বাবস্থায় আসে তখন ইহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে। ''সৃষ্টি কোন যুগেই হয় নাই।'' দৃশ্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই। যাঁহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন তাঁহারা বেদান্ত-দর্শনের শঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করুন। তিনি কেন যে বেদান্তদর্শনের ওরূপ ''জগৎ-মিথ্যা'' ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তান্ত্রিক সাধক পূর্ণাভিষেক দীক্ষায় যে ব্রহ্মমন্ত্রের দীক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে এই সৎকণা ও চিদ্-অণুতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া লইবেন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের সেই ব্রহ্মমন্ত্রটী ''সচ্চিদেকং ব্রহ্মং'' অর্থাৎ ''সৎ' এবং 'চিৎ' এক ব্রহ্ম'' মিলাইয়া দেখুন গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, ঋষিবাক্য এবং আপনার অনুভূতি এক কিনা।

আবার তুমি দেখ, তুমি তোমার বাল্যকালে প্রথম বিদ্যারম্ভের সময় তোমার গুরুমহাশয় তোমার জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম শিক্ষায় শিখাইয়াছিলেন ''অ, আ, ই ইত্যাদি''। জ্ঞানের আরম্ভে যাহা পাইয়াছিলে, যাহার সাহায্যে তুমি জীবনভর জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি, নীতি, এবং কত কি শিক্ষা করিয়াছিলে, দীক্ষার সময় গুরুদেব সেই বীজ মন্ত্রেরই শক্তি

তোমার অন্তরে জাগাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের শেষ প্রান্তে এবং পরে তাহারও পরপারে অর্থাৎ বেদান্তের কোলে (বেদ = জ্ঞান; জ্ঞান যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে সেই কোলে) আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আজ দেখ! আরম্ভে যাহা শেষে তাহাই বিদ্যমান কিনা! যিনি সমস্ত সৃষ্টির উপাদানভূত অনাদিশক্তি বা 'সৎ' তিনিই সৃষ্টির পরপারস্থিত চিৎ-অণু। যিনি সৃষ্টির উপাদানমূলক সপ্ত শক্তির সমষ্টি তিনিই সেই শক্তিকে জানিবার উপাদানরূপে ধ্বনির আকারে (অ, আ, ই রূপে) আমাদের কণ্ঠে বাজিয়া উঠিতেছেন। ইহার সহিত বেদান্তের তৃতীয় সূত্র "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" মিলাও।

এখন দেখা যাইতেছে "শক্তিই চিৎ"। আবার এই শক্তিই আনন্দময় কোষ, মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও অন্নময় কোষরূপে পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু চৈতন্যে গড়া। সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণু সৎ কণার পরিণতি! সৎ-কণাই চিদ্-অ। তাই ঋষি আনন্দে গাহিয়াছিলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

যতক্ষণ তুমি শক্তিস্তরের শেষ প্রান্তে আসিতে পারিবে না ততক্ষণ এই কথা কথামাত্রই থাকিবে। এই সত্য যাহারা বুঝিতে চাও, তাহাদিগকে শক্তিস্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব যে কোন স্তরের অনুভূতি আসিলেই তোমার সাধনা শেষ হইয়া যায় নাই। যদিও তোমার মনে হইবে যে তোমার বেদান্ত বুঝা হইয়া গিয়াছে। শক্তিস্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুমি শূন্য-বোধ, ভাব-বোধ (লীলা-বোধ), সুখ-বোধ, শান্তি-বোধ এবং পূর্ণবোধ স্তরে আসিবে মাত্র, কিন্তু ঠিক ঠিক বেদান্ত বুঝা তোমার কোন স্তরেই হইবে না। যদি কোন দিন শক্তিস্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে পার, তবেই বুঝিবে বেদান্তের ভিত্তি কোথায়।

শক্তিস্তরের পতাকাটা কিরূপ হইবে ইহা জানিবার জন্য হয়ত কর্ম্মিগণ উৎসুক হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের জন্য এ কথা বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন শক্তির পতাকা 'রক্তবর্ণ এবং অসি-চিহ্নিত'। যুদ্ধই শক্তিস্বরূপ, ইহাই রক্তবর্ণের মর্ম্মকথা। অসি ঐ শক্তির অস্ত্র। বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিবার জন্য যাহারা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে নষ্ট করিয়া - নিজেদের ভোগের ব্যবস্থায় তৎপর এমন যে নিষ্ঠুর পুরুষ সেই অসুর। সেই অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধই শক্তি। অসি সেই যুদ্ধেরই ইঙ্গিত। চণ্ডীর একাদশ মাহাত্ম্যে অষ্টবিংশ শ্লোকে উল্লেখ আছে - অসুরাসৃগ্ বসাপঙ্ক চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ। শুভায় খড়্গো ভবতু - চণ্ডিকে ত্বাম্ নতা বয়ম্॥ (দেবতাগণ চণ্ডী-স্তোত্রে বলিতেছেন) "হে চণ্ডিকে! অসুরদের রক্তবসাপঙ্কচর্চ্চিত দীপ্তিশালী খড়্গ আমাদের মঙ্গলের কারণ হউক, আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি।" আমরা বিস্তারিত আর কিছু বলিতে চাহি না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া অসুরদের রক্তবসারূপকর্দ্দমে শক্তির খড়্গ চর্চ্চিত হইতে থাকুক, তাহা হইলেই পৃথিবীতে মানুষের আত্মবিকাশের পথ চির-মুক্ত থাকিবে।

চতুর্থ ভাগ

অষ্টম অধ্যায়

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও ব্রহ্মনাড়ী

"শক্তি কুণ্ডলিনী পরা॥"

কুণ্ডলিনী শক্তিই মূল শক্তি। ভারতীয় উপাসনায় এই শক্তিরই উপাসনা হয়। বেদ, তন্ত্র, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও বৌদ্ধবাদে ও অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ে কুণ্ডলিনী শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত আছে। ভারতীয় উপাসনায় ইহাই ভিত্তি! শক্তিবাদের মূল ভিত্তি কুণ্ডলিনী শক্তি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা আমাদের "ক্রমবিকাশের পথে" নামক গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছি। এবার আমরা উক্ত গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সমূহের আলোচনা করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের তুলনায় এই অধ্যায় বিলক্ষণ কঠিন মনে হইতে পারে। ইহাকে সহজ বোধ্য করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যগত সুষুম্না মার্গকে আশ্রয় করিয়া আমাদের আত্মা অবস্থান করেন। মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে অনেক শক্তিকেন্দ্র বিদ্যমান। প্রত্যেকটি শক্তিকেন্দ্রে নাড়ী সূত্রগুলির কেন্দ্র আছে। এই সব নাড়ীগুলি এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংযোগ সাধন করে। আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ব্রহ্মনাড়ী। এই নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথে সর্ব্বনিম্ন প্রান্ত হইতে মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাড়ীর আশ্রয়ে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি কেন্দ্র (অব্যক্তকেন্দ্র) গুলি অবস্থিত। এই নাড়ীকে আশ্রয় করিয়াই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, ও আজ্ঞাকেন্দ্র বিদ্যমান। আত্মা ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত সমস্তগুলি মর্ম্মকেন্দ্রে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। প্রত্যেক মর্ম্মকেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া অনেক নাড়ী বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছে। এই ভাবেই আত্মা মর্ম্মজগতের সমস্ত স্থানে ব্যাপ্ত আছেন। এক একটি মর্ম্মকেন্দ্র এক একটি মর্ম্ম জগৎ। আত্মা এই নিয়মেই সমস্ত জগতেই ব্যাপ্ত আছেন। আত্মার প্রধান আশ্রয় ব্রহ্মনাড়ী। ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থান করিয়া আত্মার সূক্ষ্ম কার্য্যকলাপ কিভাবে আমাদের শরীরে ও মনোজগতে পরিচালিত হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা এই নাড়ীতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

মস্তিষ্কস্থিত শক্তিনাড়ী আমরা গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডে দেখাইয়াছি। এই শক্তিনাড়ীই ব্রহ্মনাড়ী। ইহারই ব্যাপ্তি মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মনাড়ী ও ইহার শাখা প্রশাখা নাড়ীগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকদের ধারণা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। নাড়ীগুলি সবই অতি সূক্ষ্ম মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্ম তার বিশেষ। ব্রহ্মনাড়ী কিন্তু সেইরূপ কোন তার নহে। ইহা

একটি তারের অস্তিত্বহীন তার স্বরূপ। একটি অতি সূক্ষ্ম কফের মত বস্তুতে গড়া তারের মত বস্তু। কুণ্ডলিনী জাগরণের পর এই কফবৎ স্নিগ্ধ তারটির অস্তিত্ব থাকে না। তখন এই নাড়ীটি একটি ফাঁকা নাড়ীতে পরিণত হয়। তখন ইহাকে আকাশে গড়া নাড়ী বলা যায়। একবার কুণ্ডলিনী জাগরণের পর বহু দিন জ্ঞান ও সাধনার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া অজ্ঞান জগতে জড়াইয়া গেলে এই আকাশবৎ নাড়ীটি পুনঃ কফে বা তামসিকতায় জড়াইয়া যায়। এই জন্য কুণ্ডলিনী সাধক মহাপুরুষগণ জ্ঞান অনুশীলন, যোগসাধনা ও অসুর বাদবিরোধী সমাজকল্যাণকর কার্য্যে সংযোগ রাখিয়া থাকেন। যাঁহার ব্রহ্মনাড়ী যত স্বচ্ছ তিনি তত উচ্চস্তরের মানব। ব্রহ্মনাড়ী স্বচ্ছ না থাকিলে মানব অসুর প্রকৃতির ও অসুর তোষক দুর্ব্বল প্রকৃতির হইয়া থাকেন।

জীবের জীবত্ব, পশুত্ব, মানবত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ও ব্রহ্মত্ব সবই এই নাড়ীজগতের বিভিন্ন স্তরে আত্মবিকাশের ফলে হইয়া থাকে। জীব বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নাম ধারণ করে। যাহারা পিশাচ ও অসুর প্রকৃতির মানুষ এবং যাহারা অসুরতোষক অতি দুষ্ট প্রকৃতির ধাপ্পাবাজ হয়, তাহারা নাড়ী জগতের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক ক্রিয়া সৃষ্টি করে; ফলে ব্রহ্মনাড়ী আরও আবরিত হইয়া যায়। ক্রমে সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং দুষ্কৃতি-সিদ্ধি লাভ করে। ঐ সব লোকও সৎসঙ্গের প্রভাবে স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারে। মহর্ষি বাল্মীকির চরিত্র উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরের মানবের স্বভাব ও কর্ম্মধারাতে যে মূলগত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মূলে নাড়ী বিশেষের বেশী ক্রিয়াশীলতাই বুঝিতে হইবে। একটা বড় তিনতলা বাড়ীতে প্রতি তলাতে ৬ খানা ঘর আছে। এক একটি লোক এক এক গৃহে থাকে। প্রত্যেক ঘর খানার পারিপার্শ্বিক আলো বাতাস ও সুবিধা এবং গৃহমধ্যস্থিত দ্রব্যাদি এক নহে। এইরূপ, দেহমধ্যে এক এক জন মানুষ এক একটি নাড়ীকে অধিক প্রিয় করিয়া লইতেছে, কাজেই মানুষের স্বভাবও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া যাইতেছে।

একই লোকের অনেক স্বজন আছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু ইত্যাদি। একই মানুষের হৃদয়ের আকর্ষণ ও মতভেদ যে স্থানে প্রবল, সেখানের ভাবনা তাহার প্রবল হয়। যখনই সেই মানবের সম্মুখে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে, তখন সেই মানবের মনে সেই প্রিয়তমের কথা জাগিয়া উঠে। নাড়ী জগতের খেলারও ইহাই বিশেষত্ব। মানুষের বিকাশের স্তর অনুসারে সকলেরই একটা নাড়ী বিশেষ কম্পিত হয় এবং তাহার স্বভাবে ও কর্ম্মে উহা ফুটিয়া উঠে। পূর্ণরূপে বিকশিত মানবই পুরুষোত্তম বা শক্তি স্তরের মানব। বিভিন্ন স্তরের মানব বিকশিত হইয়া কি ভাবে পূর্ণত্ব লাভ করে, এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে গ্রন্থের ১ম হইতে ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্ত হইয়াছে। স্থূল শরীরে জীবের আসল বাসস্থান মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্না পথ ও মস্তিষ্কস্থিত নাড়ী মণ্ডলী। ঐ সবের আলোচনা আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাবলীতে করি নাই। গ্রন্থের এই ৮ম অধ্যায়ে সেই সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা হইবে। শক্তিস্তরের প্রধান লক্ষণ ‘‘অসুর-বিরোধ’’।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যপথ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না হইলে নাড়ী সংস্থান বুঝিতে যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক, দুইটি ছোট মস্তিষ্ক, দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী শিবপিণ্ড (বা মস্তিষ্ক সেতু), সুষুম্নাশীর্ষ, এবং মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্নাপথ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া নাড়ী মণ্ডল সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবেশ করা প্রয়োজন।

যাঁহারা যোগবিদ্যা ও তান্ত্রিক সাধনায় প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদের জন্য উক্ত স্থানগুলির জ্ঞান বিশদভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। যোগমার্গের মূল কথা এই নাড়ী মণ্ডলীর সংস্থান ও ইহাদের কার্য্যধারা। এই নাড়ী মণ্ডলীই আমাদিগকে ভোগী, যোগী, জ্ঞানী, ও মহাত্মা করে অথবা অসুর এবং অসুরতোষক দুর্ব্বলবাদী বা ভণ্ড প্রস্তুত করে। যোগমার্গের অনুশীলন আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে ইহার বিশদ আলোচনা আছে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, মনুগণ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ সকলেই মহাযোগী মহাপুরুষ ছিলেন। মস্তিষ্ক ও সুষুম্না মার্গের স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে সিদ্ধযোগী হওয়া অসম্ভব। শক্তিবাদীরা শ্রেষ্ঠ যোগী, অসুরবাদীরা চেষ্টা করিলে মধ্য যোগী হইতে পারেন, দুর্ব্বলবাদী (অসুরতোষক ভণ্ড) দের যোগে প্রবেশ নাই।

যোগমার্গ বুঝিবার জন্য আমরা চিত্রাদির সাহায্য লইতেছি। চিত্রগুলিতে সংস্কৃত সংখ্যা ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকদের অসুবিধা হইবে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা আমরা প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে হইতে জানিতাম। আমাদের ধারণা ছিল হিন্দী সংখ্যাগুলির সাহায্য লইলে ভারতের যে কোন ভাষার পুস্তকে ব্লকগুলি ব্যবস্থা করা চলিবে। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হইলেও হিন্দীসংখ্যা রাষ্ট্রীয় সংখ্যার স্থান লয় নাই। সংখ্যার জন্য ভারতরাষ্ট্র ইংরেজী সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বইগুলিও প্রথমে হিন্দীতে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। যাহা হউক একটু চিন্তাশীলতার সহিত অনুশীলন করিলে সংখ্যার জন্য বিশেষ অসুবিধা হইবে না।*

মস্তিষ্ক পরিচয় সম্বন্ধীয় বহু চিত্র বর্ত্তমান কালে স্কুল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষায় স্থান পাইয়াছে। পাঠকগণ ও যোগবিদ্যায় প্রবেশকারিগণ সেই সব চিত্রের সাহায্য লইবেন। যাঁহারা মাংসাহারী, তাঁহারা যে কোন জীবের মস্তিষ্কের খোলী ভাঙ্গিয়া ইহার মোটামুটি আভাষ পাইতে পারেন। শিবের মূর্ত্তিই মস্তিষ্কের স্থূল প্রতীক। যোগ বিদ্যায় প্রবেশ ও শিব উপাসনা একই। যোগ শাস্ত্রে যাহাকে আজ্ঞাচক্র বলা হইয়াছে, উহাই মস্তিষ্ক এবং উহাই শিবমূর্ত্তি। আমরা যখন প্রথম যোগবিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন গুরুদেব আমাদিগকে দ্বিদল চক্র ও মস্তিষ্ক বুঝাইবার জন্য একটি দ্বিদল বিশিষ্ট কার্পাস চারার সাহায্য লইয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের আজ্ঞাচক্র অংশ বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই। তিনি আমাকে চারাটির সাহায্যে দ্বিদল চক্র বা আজ্ঞাচক্র বুঝাইবার পর ‘‘আরুণি’’ ক্রিয়া শিক্ষা দিলেন। বলিলেন, কয়েকদিন এই ক্রিয়া অভ্যাস কর, অনাহত নাদ শুনিতে পাইবে। ২, ৩ দিনের মধ্যেই অনাহত শব্দ জাগ্রত হইল। দিন রাত সেই স্নিগ্ধ ওঁকার ধ্বনি শুনা যাইত। পরে আর ক্রিয়া করিবার প্রয়োজন হইত না। মস্তিষ্কের মধ্যে ও মেরুমধ্যে মন ফিরাইলেই ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। এই দ্বিদল চক্রের উপরি

* প্রকাশকের নিবেদন - যেহেতু বর্তমান সংস্করণে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে, এই অনুচ্ছেদটি বর্তমান সংস্করণে প্রাসঙ্গিকতাবিহীন।

অংশে তন্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুরু পাদুকা (শিব সংহিতা দ্রঃ) কি ভাবে অবস্থিত তাহাও বুঝাইবার জন্য গুরুদেব দ্বিপত্র বিশিষ্ট প্রথম চারা গাছের সাহায্য লইতেন। চিত্র সাহায্যে মস্তিষ্ক, আজ্ঞা, ষট্‌চক্র ও শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে বুঝানো যাইতেছে।

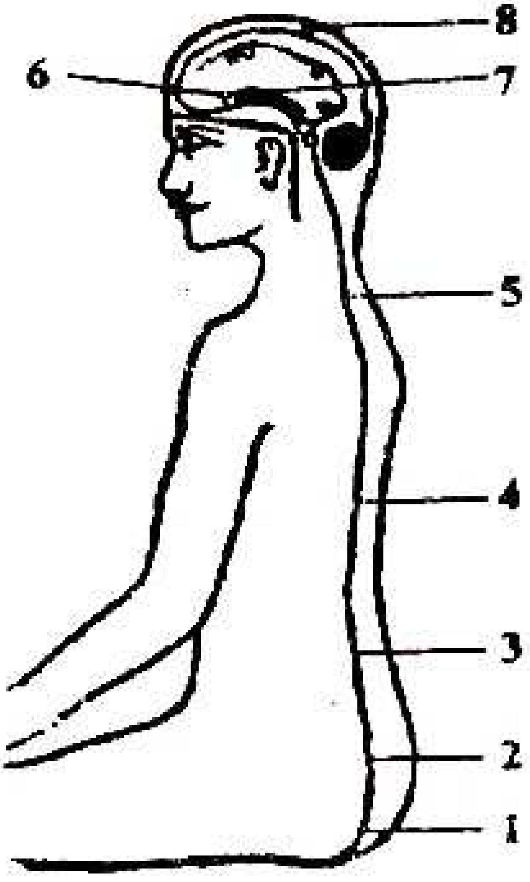

ব্রহ্মনাড়ী চিত্র

ব্রহ্মনাড়ী চিত্র পরিচয়।

১। মূলাধার চক্র কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে কুণ্ডলিনী শক্তি থাকেন। ইহা অত্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্র। ইহাকে বেদে ‘ভূঃ’ স্থান বলে।

২। স্বাধিষ্ঠান চক্রকেন্দ্র। এখানে জীবের সৃষ্টি চক্র বিদ্যমান। এই চক্রের মধ্য দিয়া আত্মা গর্ভে আসেন এবং বদ্ধ হন। ইহা বেদমতে ‘ভুবঃ’ কেন্দ্র।

৩। মণিপুর কেন্দ্রস্থান। ইহা আমাদের মনের স্থান। ইহা বেদমতে ‘স্বঃ’ স্থান।

৪। ইহা অনাহত স্থান। আমাদের মন যোগপথে যখন এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল হয় তখন আমাদের মন এত হাল্কা হয় যে আমরা অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাই। ইহা ভালবাসার কেন্দ্র। সব প্রকার দৈবীভাবের ইহাই কেন্দ্র। এবং অসুরভাবগুলিরও ইহাই কেন্দ্র। বেদমতে ইহা 'মহঃ' কেন্দ্র।

৫। ইহা বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্র। ইহা জ্ঞান কেন্দ্র। ''ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'' (গীতা)। ''জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু এই বিশ্বে নাই।'' এর জন্যই এই কেন্দ্রের নাম বিশুদ্ধাখ্য। ইহা 'জনঃ' কেন্দ্র।

৬। সম্পূর্ণ মস্তিষ্কই আজ্ঞা চক্র। এই আজ্ঞার এক অংশ বুদ্ধি কেন্দ্র নামে খ্যাত। ৬ চিহ্নিত কেন্দ্রই বুদ্ধি কেন্দ্র। ইহা 'তপঃ' কেন্দ্র। বুদ্ধিই তপস্যার মূল স্থান।

৭। গুরু পাদুকা স্থান। লয় যোগের ক্রিয়া বিশেষকে গুরু পাদুকা বলে। আজ্ঞা ও সহস্রার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গুরু পাদুকা স্থান বলে। ইহা সত্য স্থানের অন্তর্গত।

৮। ইহা সহস্রারের আবরণ; মস্তিষ্কের শেষ ঢাকনা।

১, ২, ৩, ৪, ৫ চিহ্নিত কেন্দ্রগুলি যে রেখাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, উহারই নাম ব্রহ্মনাড়ী। এই ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্দ্ধ্ব অংশ মস্তিষ্কের উপরেও ব্যাপ্ত আছে। অন্য চিত্র সাহায্যে বুঝানো হইবে।

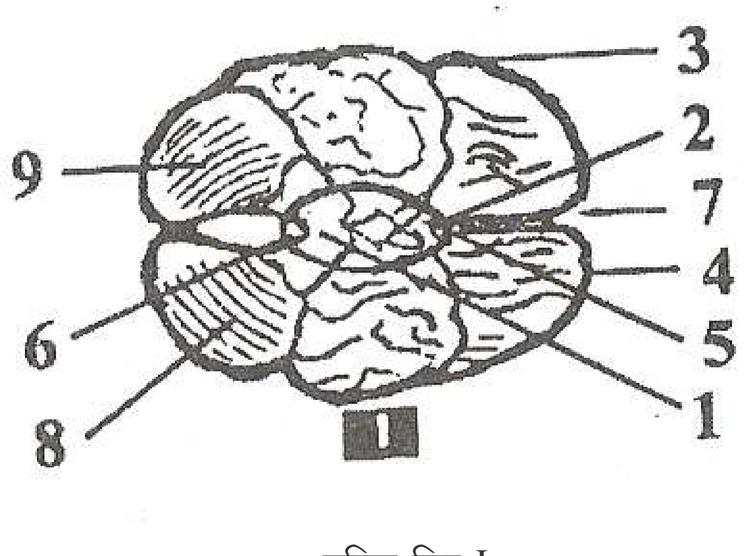

মস্তিষ্ক চিত্র I

মস্তিষ্ক কেন্দ্র I চিত্র পরিচয়।

আমাদের মস্তিষ্কটা উল্টাইয়া রাখিলে এই চিত্রের মতন দেখায়।

১। শিব পিণ্ডের সমসূত্র স্থান। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক যেখানে যুক্ত আছে উহার নাম শিবপিণ্ড।

২। ২ এবং ৫ বুদ্ধি কেন্দ্রের সমসূত্রস্থান।

৩। দক্ষিণ মস্তিষ্ক (মোটা রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ)।

৪। বাম মস্তিষ্ক (মোটা রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ)।

৬। প্রাণ কেন্দ্রের সমসূত্রস্থান। এখান হইতেই সুষুম্না-শীর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। মেরুদণ্ড মধ্যবিস্তৃত সুষুম্না মার্গ এখানে শেষ হইয়াছে।

৭। মস্তিষ্কের কপালের দিক।

৮। ছোট মস্তিষ্ক (ডান)।

৯। ছোট মস্তিষ্ক (বাম)।

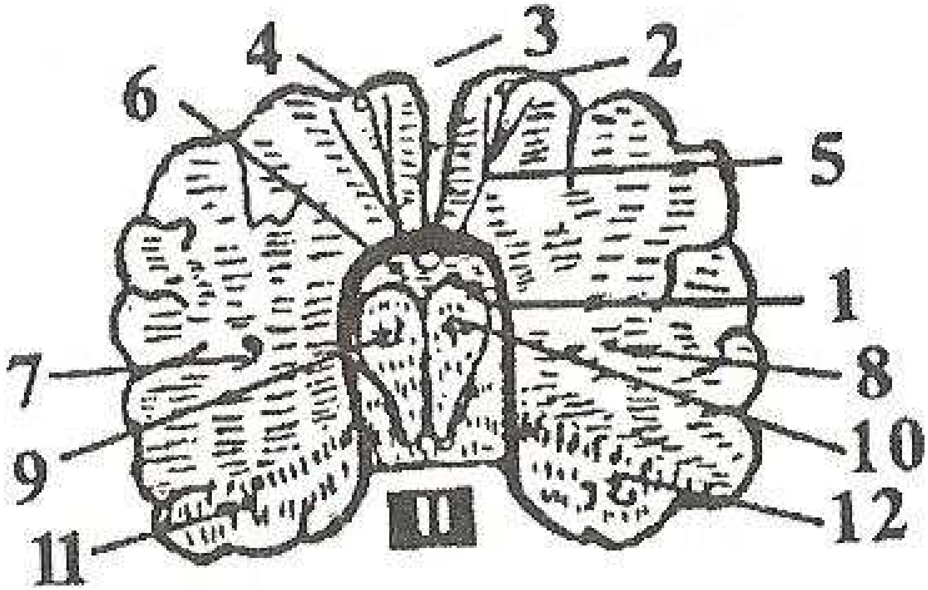

মস্তিষ্ক চিত্র II

মস্তিষ্ক কেন্দ্র II চিত্র পরিচয়

আমাদের মস্তিষ্কটি যদি কর্ণের সমসূত্র ভাবে কাটা যায় তবে এই চিত্রের মতন আকার হয়।

১। শিব পিণ্ড। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক এই পিণ্ডে যুক্ত আছে। শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশ আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত এবং ইহার ঊর্দ্ধ অংশ গুরুপাদুকাস্থান বা সহস্রার গর্ভস্থান নামে খ্যাত। সহস্রারের ঊর্দ্ধ অংশে যে সব কেন্দ্র আছে, (যেমন, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি, IIIনং মস্তিষ্ক চিত্রে ২, ৩, ৪ প্রভৃতি কেন্দ্র), সবগুলিই শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধ স্থানে যুক্ত আছে। ঐ সব কেন্দ্র হইতে নাড়ীগুলি নামিয়া আসিয়া শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধ অংশ ভেদ করিয়া অবস্থিত আছে। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড স্থান সমস্ত যোগবিদ্যার কেন্দ্র স্থল। আজ্ঞা চক্র, গুরু পাদুকা চক্র ও সহস্রার চক্রের ইহাই মর্ম্মস্থান। শিবপিণ্ডে ধ্যান জমাইতে না পারিলে যোগ বিদ্যার কোন রহস্যই ভেদ করা সম্ভব নহে।

২। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধপ্রান্তে ইহা একটি কেন্দ্র। III চিত্রস্থিত ৪ চিহ্নিত কেন্দ্র ও এই কেন্দ্র একই কেন্দ্র। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধ অংশস্থিত ডান বা বাম কেন্দ্র হইতে নাড়ীগুলি বাহির হইয়া কি ভাবে শিবপিণ্ড বা গুরুপাদুকা ভেদ করিয়া বিপরীত মস্তিষ্কস্থিত সমসূত্র কেন্দ্রে মিলিত হইয়াছে, ইহা বুঝিবার জন্য ২ এবং ৪ চিহ্নিত কেন্দ্র এবং কেন্দ্র দুইটিকে সংযোগকারী নাড়ীটি দেখুন। এই নাড়ীটি শিবপিণ্ড ভেদ করিয়াছে।

৩। দুইটি মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা স্থান। এই ফাঁকা স্থানের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডকে দেখিলে মনে হইবে, একটি যোনির আকার বিশিষ্ট গর্ভস্থানে শিব অবস্থিত। এই শিবপিণ্ডের শাস্ত্রীয় নাম "ইতরলিঙ্গ*"। বিস্তারিত ধর্ম্মশিক্ষা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৪। ইহা ২ চিহ্নিত কেন্দ্রের বিপরীত কেন্দ্র। ৪ হইতে ২ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি নাড়ী শিবপিণ্ড ভেদ করিয়াছে।

৫। একটি নাড়ী যাহা ২, ৪ কেন্দ্রকে সংযোগ করিয়াছে।

৬। শিবপিণ্ডস্থিত ঊর্দ্ধ অংশ। ইহার নাম গুরুপাদুকা বা সহস্রার গর্ভ চক্র।

৭, ৮। দক্ষিণ ও বাম মস্তিষ্ক। চিত্র মধ্যস্থিত বেড় ভাবে অঙ্কিত রেখা দ্বারা যতটা অংশ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, মস্তিষ্কস্থিত এই অংশ সহস্রার এর অন্তর্গত।

৯, ১০। শিবপিণ্ড স্থিত অংশ আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত। এই স্থান এবং ১১, ১২ স্থান দাঁড়া রেখা দ্বারা দেখানো হইয়াছে।

১১, ১২। একই মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করিয়া আজ্ঞা, সহস্রার ও গুরুপাদুকা চক্র অবস্থিত। দাঁড় করা রেখায় সীমাবদ্ধ অংশ আজ্ঞা চক্র।

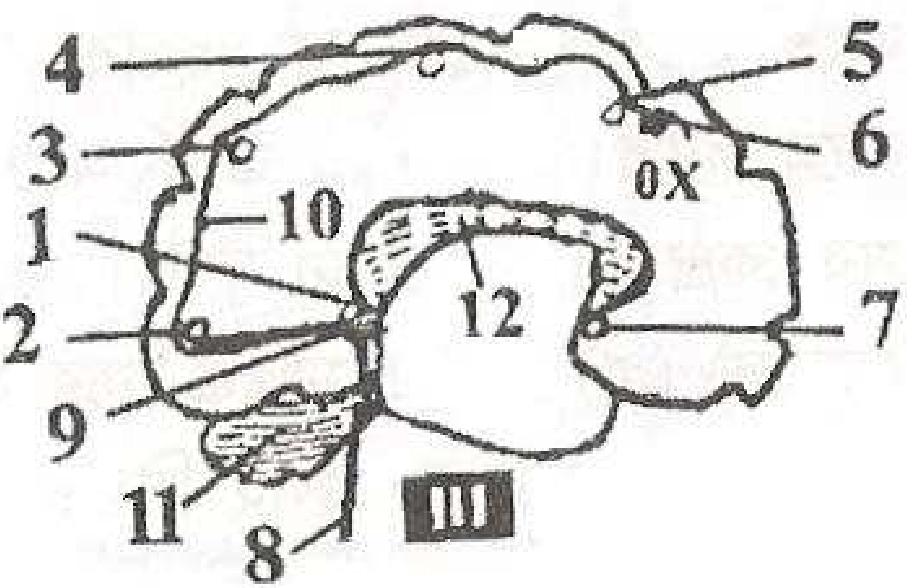

মস্তিষ্ক চিত্র III

* প্রকাশকের নিবেদন - "ঈতর" স্থানে "ইতর" গৃহীত হল।

মস্তিষ্ক কেন্দ্র III চিত্র পরিচয়

মস্তিষ্কের ভ্রূমধ্য ও শিখার সমসূত্র স্থানে কাটিয়া দুইভাগ করিলে যেরূপ আকার পাওয়া যায়, এইটি উহারই চিত্র।

১। মনের কেন্দ্র। ইহা প্রাণ কেন্দ্রের একটু উপরে অবস্থিত।

২। সূর্য্য কেন্দ্র।

৩। বিষ্ণু কেন্দ্র।

৪। শিব কেন্দ্র।

৫। উন্নত শিব কেন্দ্র।

৬। অব্যক্ত কেন্দ্র। ইহা শক্তি জগতের অন্তর্গত।

৭। গণেশ বা বুদ্ধি কেন্দ্র।

৮। মেরুদণ্ড মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ী, বা সুষুম্না পথ।

৯। প্রাণ কেন্দ্র।

১০। ইহা মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ী। মস্তিষ্কের সমস্তগুলি কেন্দ্র এই নাড়ীতে অবস্থিত আছে।

১১। ছোট মস্তিষ্ক।

১২। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। এই শিবপিণ্ডই উভয় মস্তিষ্কমধ্যস্থিত সেতু। চিত্রে ইহা দুইভাগে ছিন্ন হইয়া এক অংশ দেখা যাইতেছে।

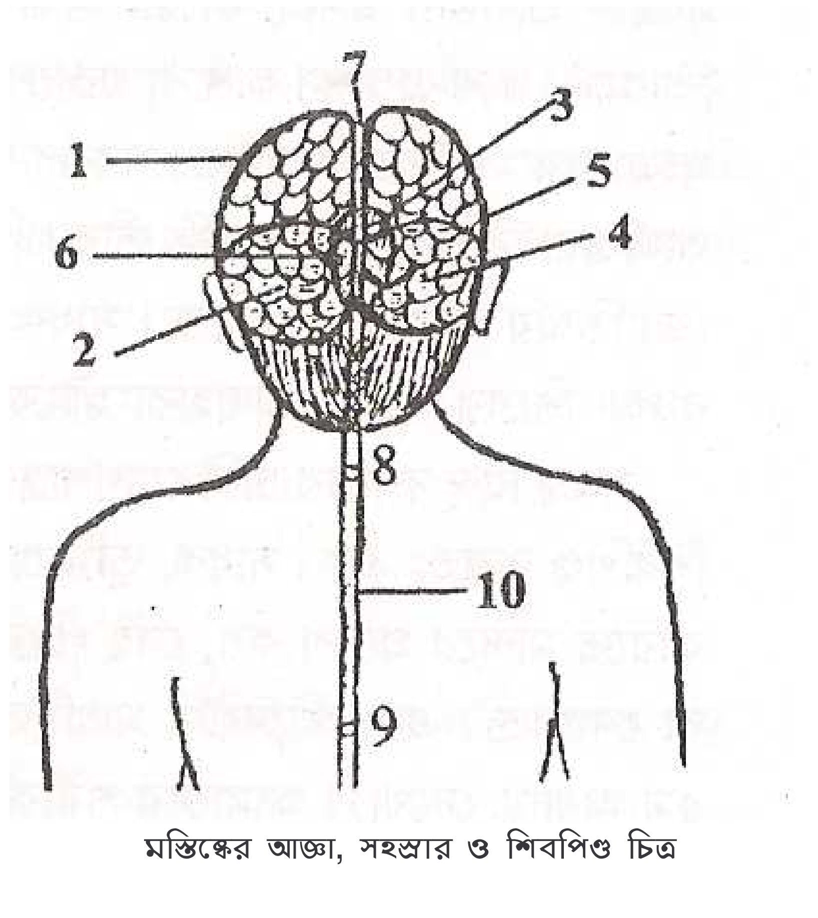

মস্তিষ্কের আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র

মস্তিষ্কের আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র পরিচয়।

১। বাম মস্তিষ্কে সহস্রার।
২। বাম মস্তিষ্কে আজ্ঞা চক্রের বাম পত্র।
৩। শিব পিণ্ডের অন্তর্গত গুরু পাদুকা।
৪। আজ্ঞা চক্রের দক্ষিণ পত্র।
৫। দক্ষিণ মস্তিষ্কে সহস্রারের অর্দ্ধাংশ।
৬। উভয় মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী সহস্রার গর্ভস্থিত এবং আজ্ঞাচক্রের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড।
৭। দুইটি মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা স্থান।
৮। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্র।
৯। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত অনাহত চক্র।

মস্তিষ্ককে ধ্যান করিবার জন্য শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির আবিষ্কার হইয়াছে। এই মূর্ত্তি এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইলে একখানা বড় বই লিখিতে হইবে। যদি কখনও "শিব পূজা" বিধি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার সুযোগ হয় তবে সেখানে শিবপিণ্ড সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড যোগাভ্যাসীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সমস্ত যন্ত্রের মূলগুলি বহু নাড়ীর মূলরূপে শিবপিণ্ডে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কৈলাসের পথে নন্দাদেবীর দৃশ্যের সহিত শিবপিণ্ডের দৃশ্যের তুলনা করা যায়। শীতকালে নন্দাদেবীকে বহু দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই নন্দাদেবীর সম্মুখে ত্রিশূল। নন্দাদেবীকে দেখিয়া মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের ধারণা স্পষ্ট করিবার জন্য অনেক সাধক শীতকালের শেষ ভাগে উত্তরাখণ্ডের দিকে ধাবিত হন। "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং" ধ্যান তখন সহজ হয়।

সাধক! তোমার কি যোগবিদ্যায় প্রবেশের ইচ্ছা আছে? ঋষিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ যোগবিদ্যার দিকে তোমার মন আকৃষ্ট হয় কি? তুমি কি তোমার এই অস্থি মাংসময় মলিন শরীরের মধ্যস্থিত জ্যোতির্ম্ময় শিবমূর্ত্তির দর্শন করিতে চাও? তোমার শরীরের অণুপরমাণুতে সেই শিবদেবতার স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ গড়া সুন্দর মূর্ত্তি অনুসৃত আছেন। সেই স্নিগ্ধ রূপের কেন্দ্র মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। যদি তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইতে চাও, তুমি ঐ শিবপিণ্ড ধ্যান কর। যদি তুমি তোমার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাবলী কার্য্যক্ষম সতেজ রাখিতে চাও তবে তুমি ঐ শিবপিণ্ডের ধ্যান কর। যদি তুমি মনকে বশীভূত করিতে চাও তবে শিবপিণ্ডের ধ্যান কর। তুমি মন্দিরে বা বৃক্ষতলে শিবমূর্ত্তি দেখ নাই কি? এই শিবপিণ্ডের ধ্যানকে সহজ করিবার জন্যই শিবের মূর্ত্তি পরিকল্পনা। যে মূর্ত্তি স্থাপনার জন্য এই যে সব বিশাল বিশাল মন্দির সমস্ত ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই মূর্ত্তি তোমার মস্তিষ্কেই আছে। সেই প্রিয়তম আত্মমূর্ত্তিকে, জ্ঞান মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্যই কাশীর বিশ্বনাথ। প্রকাশে ভরা বিশ্বনাথ মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে বিদ্যমান। কাশ = প্রকাশ॥ কাশ বা প্রকাশে মূর্ত্তিমান স্থান = কাশী। বিশ্বনাথ এই জ্যোতির্ম্ময় সহস্রার এর মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। সর্ব্বদা শরীরের মধ্যে নাড়ী মণ্ডলের মধ্য

দিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যধারা বিদ্যুতের মত অতি তীব্র গতিতে দৌড়া দৌড়ি করিতেছে, এজন্য শিবপিণ্ডকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিয়াছে। সাধক তুমি শিবধ্যানে তন্ময় হও, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্যাপক শিবের দর্শনে আত্মহারা হইবে। এই শিবই নাড়ী জগতের কেন্দ্র স্বরূপ।

সমস্ত হিন্দু দর্শনের চাবি যোগশাস্ত্র। এই যোগের দেবতা শিব। ঐ শিব ও মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ড তত্ত্বতঃ এক। সাধক, তুমি যে উত্তরদিকে রক্ষিত পীনেটের মধ্যস্থিত শিবপূজা করিতে মন্দিরে প্রবেশ কর, সেই পীনেট আজ্ঞা চক্র। ঐ পীনেটের উত্তর দিকটিই বুদ্ধি বা ধ্রুবকেন্দ্র। এবং পীনেটের মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গটিই শিবপিণ্ড। (বিস্তারিত ধর্ম্মশিক্ষা ও ক্রমবিকাশের ৫ম অধ্যায় দেখো।) আমাদের শরীরস্থিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি নাড়ী ও শক্তিরূপে এই শিবপিণ্ডে বিদ্যমান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, গুহ্য আদি ইন্দ্রিয়, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় আদি বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান আদি পঞ্চপ্রাণ এবং শরীরের মধ্যস্থিত সমস্ত যন্ত্রাবলীর শক্তি ও উহাদের পরিচালনার শক্তি, সবই শিবপিণ্ডে বিদ্যমান। তুমি শিবপিণ্ডের ধ্যান কর তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে, ইঁহার ধ্যান কেবল যোগীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট নহে। কুমার ও কুমারী, গৃহী ও সন্ন্যাসী, যোগী ও ভোগী সকলের একমাত্র আরাধ্য দেবতা 'শিবপিণ্ড'। ইনি ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম এবং নাস্তিক বাদীর শরীরকেন্দ্র।

শিবপিণ্ডেই সগুণব্রহ্ম, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্রা ও উহার অনুভূতির কেন্দ্র বিদ্যমান। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি এবং দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, প্রেত, পিশাচ, সমস্ত দেবতা উপদেবতা বিদ্যমান। পাঠক নাড়ীতত্ত্বে প্রবেশ করুন, মানবের আসল স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক সত্য জানিতে পারিবেন। আজ দুই পাতার কম্যুনিজম পড়িয়া আমাদের দেশের শিক্ষিতগণ ও যুবক যুবতীগণ নাস্তিকবাদী হইয়াছেন। আমরা বলি, নাস্তিকবাদীদের শিবমূর্ত্তি ধ্যানে কোনই ক্ষতি নাই। শিব জড় কি চেতনা, অথবা জড় ও চেতনার সমন্বয় মূর্ত্তি সে সম্বন্ধে বিচারের ইহা স্থান নহে। শিব অত্যন্ত মঙ্গলময় বিগ্রহ। ইহার ধ্যান কর, তুমি নাস্তিক হও তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি আস্তিক হও তোমারও মঙ্গল হইবে। ইহা জড় শরীরের কেন্দ্র ইহা আত্মারও কেন্দ্র।

আমরা আজ শিবদেবতার কথা যতই ভাবিতেছি ততই মানস সরোবরের পথে সেই বরফে ঢাকা অনন্ত স্নিগ্ধ জ্যোতি উদ্ভাসিত নন্দাদেবী ও ত্রিশূলের কথা স্মরণে আসিতেছে। মনে হয় সেই দিব্য স্নিগ্ধ ও পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় শিব আমার অন্তরে সদা বিরাজিত আছেন। হে শিব, হে মঙ্গলময়! তুমি আমার চক্ষের জ্যোতি। তুমি আমার কর্ণের শ্রুতি, তুমি আমার নাসিকার ঘ্রাণশক্তি, তুমি আমার জিহ্বার রস, তুমি আমার ত্বকের স্পর্শ, তুমি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চিত্তের আকর্ষণ, তুমি আমার অহং এর আশ্রয়। তুমি খণ্ডব্রহ্ম, তুমি অখণ্ড ব্রহ্ম, তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে আমার মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান। তুমি নির্গুণ ব্যাপক, ও পরব্রহ্মরূপে আমার মস্তিষ্কেই বিদ্যমান। হে আমার মস্তিষ্কের মণি প্রিয়তম হৃদয় দেবতা! তোমাকে বার বার প্রণাম। তুমি জীবের মস্তিষ্কে যুগ যুগান্তর বিদ্যমান আছ। তোমাকে ঋষিগণ অনেক ছন্দে ও অনেক (বৈদিক) মন্ত্রে কত স্তুতি করিয়াছেন।

"ওঁ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্

বাচো হ বা বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষু রতি মুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মল্লাকাদমৃতা ভবন্তি।”

“তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, ধীরগণ তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াও অমর হন।”

যোগিগণ তোমাকে শেষ সমাধির ইচ্ছা করিয়া ধ্যান করিয়াছেন, আমিও সদা সেই ভাবে তোমাকে ধ্যান করি। হে শিব! তুমি আমাকে শেষ বিশ্রাম দিও।

“ওঁ আরাধয়ামি মণি সন্নিভ মাত্মলিঙ্গং
ময়া পুরী হৃদয় পঙ্কজ সন্নিবিষ্টং।
শ্রদ্ধানদী বিমল চিত্ত জলাবগাহম্
নিত্যং সমাধি কুসুমৈরপুনর্ভবায়॥”

“মণির মত জ্যোতি বিশিষ্ট আত্মরূপ লিঙ্গকে আরাধনা করি। তিনি সহস্রার কমলের হৃদয় মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট আছেন। শ্রদ্ধারূপা নদীতে ও জ্ঞানরূপা জলে (শ্রদ্ধা ও জ্ঞান ঐ লিঙ্গেই বিদ্যমান) অবগাহন করিতেছি। সমাধিরূপ কুসুমে (যে শক্তির প্রভাবে মন স্তব্ধ হইয়া সমাধি হয় উহা ঐ শিবপিণ্ডেই বিদ্যমান) পূজা করিতেছি। ইহার ফলে নির্ব্বিকল্প যোগ আসিবে।”

হে মঙ্গলময় শিব! তোমাতে এক অলৌকিক রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্তুতিতে আমিও তোমার উপাসনা করিতেছি।

“ওঁ গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চঽসিতং হস্তে কপালং সিত,
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গা ফেনসিতা জট পশুপতেশ্চন্দ্রেঃ সিতো মূর্দ্ধনি,
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্কর॥”

“যাঁহার শরীর শ্বেত, অসিত বর্ণ ভস্ম শ্বেত রূপে আছে, যাঁহার হস্তে শ্বেতবর্ণ কপালপাত্র বিদ্যমান। যাঁহার হস্তস্থিত গদাও শ্বেতবর্ণ, যাঁহার বাহন বৃষভও শ্বেতবর্ণ। যাঁহার কর্ণে শ্বেতবর্ণ কুণ্ডল বিদ্যমান। হে পশুপতে! গঙ্গার শ্বেতবর্ণ ফেনায় তোমার জটা শ্বেত হইয়াছে, তোমার কপালে শ্বেতবর্ণ চন্দ্র শোভায়মান। হে পাপক্ষয়কারী সর্ব্বপ্রকারে শ্বেত শঙ্কর! তুমি আমাকে বিভব দান কর।” বিভব মানে ঐশ্বর্য্য, শিবধ্যান ধনবর্দ্ধক।

শিব মূর্ত্তি ও মস্তিস্ক এবং ব্রহ্মনাড়ী বুঝিবার জন্য আমরা চিত্র প্রদান করিলাম। জীবমাত্রেই শিবপিণ্ড বিদ্যমান। বৃক্ষে এই শিবপিণ্ড কোথায়, চিত্রে উহাও দেখানো হইবে।

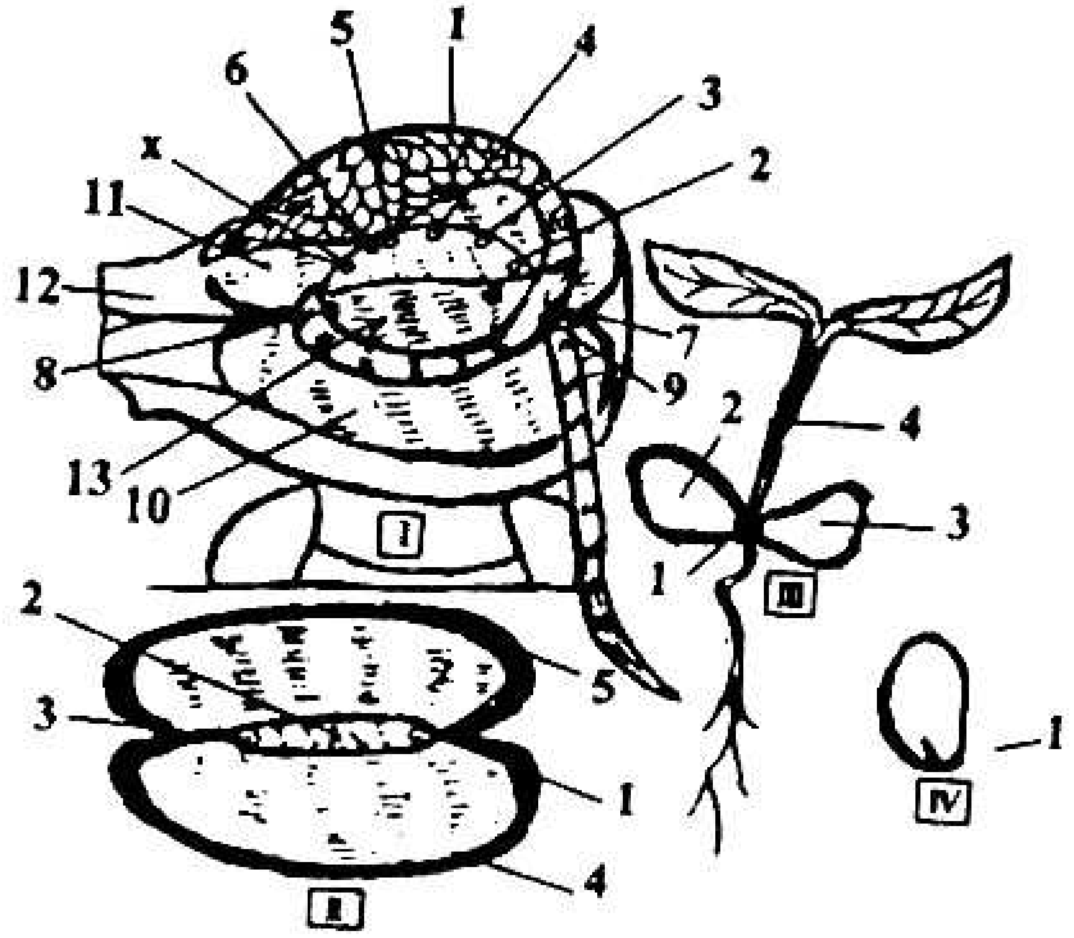

এখানে ৪টি চিত্র আছে। I শিবমূর্ত্তি। II আজ্ঞাচক্র। III কচিবৃক্ষ, IV বীজ চিত্র।

I নং চিত্র পরিচয়

১। সর্পফণা। মস্তিষ্কে ইহাই সহস্রার। এই সর্পের এক অংশ মূলাধার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই সর্পই জীবের শরীরে জীবনীশক্তি। শাস্ত্রে ইহাকেই অনন্তনাগ বলে। এই নাগের (ব্রহ্মনাড়ী) উপর বিষ্ণু শয়ন করেন। শিবের মাথায় এই সাপ ব্রহ্মনাড়ীর প্রতীক মাত্র।

২, ৩, ৪, ৫, ৬, X চিহ্নিত কেন্দ্রগুলি শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে গুরু পাদুকার ১২টি কেন্দ্রের এক ধারের ৬টি কেন্দ্র। এই গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যথা স্থানে আলোচনা হইবে।

৭। মনের কেন্দ্র।

৮। বুদ্ধির কেন্দ্র।

৯। প্রাণের কেন্দ্র।

১০, ১১। শিব পীনেটের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদল। শিবের পীনেট সব সময় উত্তর মুখে থাকে বলিয়া এই পাতা দুইটি একটি পূর্ব্বদিকে ও অন্যটি পশ্চিমেই থাকে। ইহারাই আজ্ঞাচক্রের দুইটি দল।

১২। শিবের পীনেট। ইহা সব সময় উত্তর দিকে থাকে। শিবমূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায় উত্তর দিক কোনটা।

II নং চিত্র পরিচয়

১। আজ্ঞা চক্রে মনের কেন্দ্র। মস্তিষ্কের পিছনের দিকে।

২। আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড।

৩। আজ্ঞাচক্রে বুদ্ধিকেন্দ্র, মস্তিষ্কের সামনের দিকে।

৪। আজ্ঞা চক্রের বাম পাতা।

৫। আজ্ঞা চক্রের দক্ষিণ পাতা।

III নং চিত্র পরিচয়

বৃক্ষে শিবপিণ্ড কোথায় ইহা বুঝিবার জন্য এই চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

১। ইহা শিবপিণ্ড স্থান। এই স্থানেই বৃক্ষের প্রাণ থাকে। এই কেন্দ্র হইতে এক অংশ উপরের দিকে চলিয়া যায়। ইহাই বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা এবং ফুল ফল পত্রে বর্দ্ধিত হয়। এই কেন্দ্র হইতে এক অংশ মাটির নিম্নদিকে চলিয়া যায়। বৃক্ষের প্রাণ এই কেন্দ্রে অবস্থান করে। এই স্থান হইতেই উপরের কাণ্ড ও ডাল পালা এবং মাটির নিম্নস্থিত মূল ও শিকড় প্রবাহিত হয়। বৃক্ষের মূলে বৃক্ষের মস্তিষ্ক অবস্থান করে। আমাদের মস্তিষ্ক থাকে আকাশের দিকে, বৃক্ষের মস্তিষ্ক থাকে মাটির মধ্যে ও মাটির দিকে। বৃক্ষশরীরের অধঃ অংশ মাটির উপরি ভাগে থাকে কিন্তু ঊর্দ্ধ অংশ মাটির ভিতর অবস্থান করে।

২। বীজের দুইটি দল। একটি ছোলা বা বীজ ভাঙ্গিলে দুইটি দল ও একটি ছোট অঙ্কুর পাওয়া যায়। দল দুইটিই জলের ও মাটির সংযোগে ২, ৩ আকার ধারণ করে। এবং অঙ্কুরটির এক অংশ মাটির নীচে যায় এবং অন্য অংশ কাণ্ডরূপে উপরে যায়। এবং তাহাতে ডাল পাতা হয়।

২,৩ আমাদের মস্তিষ্ক স্থিত দ্বিদল এবং ৪ অংশ এবং মাটির নিম্নস্থিত মূল ভাগই ব্রহ্মনাড়ীর স্থূল পরিণতি।

IV নং চিত্র পরিচয়

ইহা একটি বীজ চিত্র। এই বীজস্থিত ১ (এক চিহ্নিত) অংশই অঙ্কুর এবং ইহাই ব্রহ্মনাড়ীর বীজ অবস্থা। এই অঙ্কুরই ওঁকার। জল ও মাটির সংযোগ পাইলে এইরূপ একটি বীজই III নং চিত্রের মতন আকার ধারণ করে।

শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের চেষ্টা ম্লেচ্ছ ও যবনরা অনেক করিয়াছে। পৌরোহিত্যবাদীরাও শূদ্রগণে শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে আসল কথা ঢাকা রাখিবার জন্য অনেক কুৎসিত কথা পুরাণের অনেক স্থানে লিখিয়াছে। পাঠক জানিয়া রাখুন, শিবমূর্ত্তি অর্থে মস্তিষ্ক। শিব যোগের দেবতা, এই মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করিয়াই যোগ সাধনায় প্রবেশ করিতে হয়।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ। সমস্তটা মস্তিষ্ককেই শিবমূর্ত্তি মানিয়া লইয়া সাধনার অভ্যাস করিতে হয়। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক, দুইটি ছোট মস্তিষ্ক, একটি শিবপিণ্ড ও সুষুম্না শীর্ষ এ সব অংশগুলি মিলিয়া মস্তিষ্কটি অবস্থিত। সমস্তগুলি নাড়ীই শিবপিণ্ডে আসিয়া মিলিয়াছে এবং অনেক নাড়ীই শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া দক্ষিণ অঙ্গের নাড়ীগুলি বাম মস্তিষ্কে গিয়াছে এবং বাম অঙ্গের নাড়ীগুলি শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া দক্ষিণ মস্তিষ্কে গিয়াছে। উল্টা পাল্টা হওয়া নাড়ীজগতের এক বিচিত্র নিয়ম বলিতে হইবে। অনেক নাড়ী আছে, যেগুলি মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্না মার্গ ধরিয়া মস্তিষ্কের কোন বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আসিয়া মিলিয়াছে, কিন্তু শিবপিণ্ড ভেদ করে নাই। এইরূপ নাড়ীর সংখ্যা খুব কম।

দেহতত্ত্বে শিবজ্ঞান। শুধু মস্তিষ্কেই জ্ঞানকেন্দ্র বিদ্যমান, এইরূপ মনে করা ভুল। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা ও সহস্রার, সর্ব্বত্র জ্ঞানকেন্দ্র বিদ্যমান। প্রত্যেকটি জ্ঞানকেন্দ্রই এক একটি শিব। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় সহস্র সহস্র শিবের অবস্থান আমাদের শরীরে বিদ্যমান। আমরা মোটামুটি শিবের পরিচয় দিব। একটা প্রাচীন জাতি, যোগবিদ্যার যে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে সব ভাবিতে বিস্ময় লাগে। মনে হয়, একমাত্র শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা যায়, তবে ৫০০ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থে কুলাইবে না। ঋষিদের সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম দেহতত্ত্ব জানিবার এত স্পৃহা কেন হইয়াছিল এবং তাঁহারা কেনই বা ঐ সব জটিল তত্ত্বকে সমাজে দিবার চেষ্টা করিলেন, কে জানে? সব থাকা সত্ত্বেও একমাত্র শক্তিবাদ ও রাজনীতি জ্ঞানের অভাবে ভারত আজ সহস্র বৎসর কাঙ্গাল।

দেহতত্ত্ব ও শিবলিঙ্গ। তন্ত্র মতে মূলাধার কেন্দ্রে স্বয়ম্ভূশিবলিঙ্গ, মণিপুরে মহাকাল শিবলিঙ্গ, হৃদয়ে বানাখ্য শিবলিঙ্গ, বিশুদ্ধায় সদা শিবলিঙ্গ, আজ্ঞায় ইতরলিঙ্গ শিব, আজ্ঞার উপরে মহানাদাখ্য শিবলিঙ্গ বা পরম শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। লিঙ্গ মানে ব্রহ্ম বা ব্যাপক তত্ত্ব। প্রত্যেকটি স্তরের জ্ঞানই একটি শিব ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পথে এ সব জ্ঞানের স্তর ভেদ করিতে হয়। এইসব বিভিন্ন স্তরে, সৃষ্টির বিভিন্ন অংশ বা মন লীন হয়, এজন্য ইহাদের নাম লিঙ্গ। লীনং গচ্ছতি ইতি লিঙ্গম্।

দেহতত্ত্বে অষ্টমূর্ত্তি শিব। মূলাধারে ক্ষিতিমূর্ত্তি শিব, ইঁহার নাম 'সর্ব্ব'। স্বাধিষ্ঠানে অপ্‌মূর্ত্তি শিব, ইঁহার নাম 'ভব'। লোকে ভবসাগর পার হইবার কথা বলে। এই 'ভব' স্বাধিষ্ঠান জগৎ। ইহা সৃষ্টির চক্র। যাঁহাদের ভোগের বেগ থাকে না, তাঁহারা ভবসাগর

পার হইয়া যান। যাহাদের ভোগাকর্ষণ থাকে, তাহাদেরই জন্ম হইবে। মণিপুরে অগ্নিমূর্ত্তি শিব, ইঁহার নাম ‘রুদ্র’। অনাহতে বায়ুমূর্ত্তি শিব, ইঁহার নাম ‘উগ্র’। বিশুদ্ধাখ্যে আকাশমূর্ত্তি শিব, ইঁহার নাম ‘ভীম’। আজ্ঞাচক্রে যজমান মূর্ত্তি শিব। ইঁহার নাম ‘পশুপতি’। আজ্ঞার উপরে সোম চক্রে সোমমূর্ত্তি শিব, ইঁহার নাম “মহাদেব”। এই শিবকেন্দ্র হইতে সর্ব্বদা অমৃতধারা ক্ষরিত হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে। মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে সূর্য্যমূর্ত্তি শিব। ইঁহার নাম ঈশান, ঈশান অর্থে ঈশ্বর বা পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। একই ঈশ্বর বিভিন্ন সৃষ্টির স্তরে অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। ঐ সব দার্শনিক স্তরগুলিই বিভিন্ন নামের শিবমূর্ত্তি। লিঙ্গ মানে মন বিলয়ের পথ, মূর্ত্তিগুলি হইতেছে বিভিন্ন দার্শনিক স্তর। স্পর্শজ্ঞানে মন বিলীন হয়। রূপজ্ঞানে দার্শনিক রূপ উদ্ভাসিত হয়।

দেহতত্ত্বে ষট্ শিব। মূলাধারের শিবের নাম ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানের শিবের নাম বিষ্ণু, মণিপুরের শিবের নাম রুদ্র, অনাহতস্থিত শিবের নাম ঈশ্বর, বিশুদ্ধাখ্য স্থিত শিবের নাম সদাশিব। আজ্ঞাচক্রস্থিত শিবের নাম পরশিব। ইঁহারা বিভিন্ন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সাধকের ও বিশ্বের কল্যাণকারক বলিয়া ইঁহাদের নাম ষট্ শিব। ইঁহারাই গুরু, এজন্য সিদ্ধ সাধক পরম্পরায় “ওঁ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ” (অর্থাৎ ছয়টি শ্রীযুক্ত গুরুকে প্রণাম) লিখিবার নিয়ম আছে। এই ছয়টি স্তরের পর শক্তিস্তর, যাহা এই ছয়টি স্তরের সমষ্টি।

> “ওঁ ব্রহ্মাশ্চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
> ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
> তস্যোপরি মহাশক্তিঃ মহাকালী বিরাজিতা।”

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, ইঁহারাই ষট্‌শিব। এই ষষ্ঠ শিবের উপরের স্তরে মহাশক্তি মহাকালী অবস্থিত। ইনি শক্তিনাড়ী।

একটা স্তরের শক্তিতে অনেক প্রকার ক্রিয়া জড়িত। সেই সব ক্রিয়া ও রহস্য বুঝাইবার জন্য অনেক নামের প্রয়োজন। একখানা রেলগাড়ীকে ৫নং ট্রেন বলিয়া বুঝাইলে গাড়ীখানার যাতায়াত সময়ের সূচীর বেশী উহা দ্বারা বুঝা যায় না। গাড়ীখানার প্রত্যেকটি অংশেরই নাম দেওয়া আছে। সে সব নামের সাহায্য ভিন্ন গাড়ী খানাকে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না।

পঞ্চমুখ ও ষড়াম্নায় শিব। ঈশান, তৎপুরুষ, বামদেব, অঘোর ও সদ্যোজাত। ইঁহারা পঞ্চমুখ শিব। ইঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রের বিভিন্ন ক্রিয়া মূর্ত্তি।

> “ওঁ ঊর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা।
> দক্ষিণাস্যং তৎপুরুষো অব্যয়ে গিরিনায়কঃ।
> অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বাস্যং পরিরক্ষতু॥
> বামদেবঃ পশ্চিমাস্যং সদা মে পরিরক্ষতু।
> উত্তরাস্যং সদাপাতু সদ্যোজাত-স্বরূপধৃত॥”

“ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্দ্ধ অংশই ‘মূর্দ্ধান’ এই মূর্দ্ধানই ঈশান। উহাকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণে তৎপুরুষ, পূর্ব্বে অঘোর, বামদেব পশ্চিমে, উত্তরে সদ্যোজাত।”

এই পাঁচটি কেন্দ্র ভিন্নও আরও একটি কেন্দ্র আছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে পশুপতি নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই পাঁচটি কেন্দ্র সংযুক্ত শিব উচ্চ তন্মাত্র ভূমি এবং পশুপতি নামক শিব “অহং তত্ত্ব”। যাঁহারা সাধক তাঁহারা ক্রমবিকাশ ২য় ভাগ পাঠ করুন। ঐ পাঁচ মুখ + পশুপতি = ষড়াম্নায় শিব। গুরু পাদুকা সাধনায় যে ষড়াম্নায় শিবের কথা আছে তাহা এই শিবকে বুঝায়। শিবের ৫টি মুখ জ্ঞানবিজ্ঞান শাস্ত্রগুলির প্রকাশক, ষষ্ঠ মুখে মারণ আদি আভিচারিক শাস্ত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ যোগসিদ্ধ যোগিগণ একস্তরে এক প্রকার জ্ঞান ও শক্তি লাভ করেন এবং শাস্ত্রের নামে উহা প্রকাশ করেন। দেহতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর তত্ত্বের সব স্তর সকলের জ্ঞানের মধ্যে আসে না, কিন্তু ব্রহ্মনাড়ী ও শিবপিণ্ড বুঝিলে যতটুকু জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাতে তৃপ্তি ও আনন্দ প্রচুর পাওয়া যায়।

যাহারা একেশ্বরের কথা বলিয়া একটা দুষ্ট পিশাচকে উপাসনা করে তাহারা পিশাচের মত হীন ও দুর্জ্জন হয়; কিন্তু যাঁহারা শিবজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মনাড়ীর সামান্য অংশও জানিতে পারেন, তাঁহারা তৃপ্ত হন এবং বিশ্ব তাঁহাদের প্রভাবে মহান হইতে পথ পায়। শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ীই শিবমূর্ত্তি। ইহাই মানব মাত্রের একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। এই মূর্ত্তিকেই হিন্দুরা মন্দিরে স্থাপনা করিয়াছে। আল্লাহ্ বাদী ও জড়বাদী যবনেরা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সামনে বাইবেল ও কুরাণের মূর্খতা আর ঢাকা দিতে পারিতেছে না, কাজেই মূর্খের দল হিন্দুধর্ম্মকে মূর্ত্তিপূজক ও লিঙ্গপূজক বলিয়া মিথ্যার বেসাতি চালাইয়াছে। আমরা যে সব নাড়ী সম্বন্ধে এ গ্রন্থে আলোচনা করিব, সেই নাড়ীগুলিও এক একটি শিব। প্রত্যেক নাড়ীতে শক্তি নিহিত আছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেও শক্তি আছে। যেমন মূলাধারে ডাকিনী শক্তি, স্বাধিষ্ঠানে রাকিনী, মণিপুরে লাকিনী, অনাহতে কাকিনী, বিশুদ্ধায় শাকিনীশক্তি এবং আজ্ঞায় হাকিনী শক্তি বিদ্যমান। বেদের মতে মূলাধারাদি কেন্দ্রগুলিতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এবং সত্য লোক সংস্থিত। প্রত্যেক কেন্দ্রেই মন লীন হয় এজন্য ইহাদের নাম লিঙ্গ। প্রত্যেক কেন্দ্রেই মন কোন না কোন রূপে ক্রিয়াশীল হয় এবং সেজন্য সুখ দুঃখ আছে, এজন্য কেন্দ্রগুলি এক একটি লোক। প্রত্যেক কেন্দ্রেই শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যাপার আছে এজন্য প্রত্যেক কেন্দ্রই এক এক জন গুরু। এই জ্ঞানই শিবত্ব দান করে, এজন্য প্রত্যেক কেন্দ্রেই শিব আছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেরই ঈশ্বরত্ব বা কর্ত্তৃত্ব আছে, এজন্য প্রত্যেক কেন্দ্রই এক একটি ঈশ্বর। আমাদের প্রত্যেক কথার পেছনে শাস্ত্রের সমর্থন আছে, কিন্তু সে সব উদ্ধৃত করা ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে।

বহু শিব, বহু ঈশ্বর, বহু শক্তির নাম দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। শিবতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বগুলিকে যোগের মধ্য দিয়া বুঝাইবার জন্য এবং দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়া স্পষ্ট করিবার জন্য, বহু নাম ও বহু রূপভেদ করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু যে কোন শক্তি বা কোন শিব বা যে কোন দেবতা বা তত্ত্বকে বুঝিবার জন্য আজ্ঞাচক্রস্থিত শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান যথেষ্ট। শিব মূর্ত্তিতে কেবল শিব পূজাই হয়

না, সমস্ত দেব-দেবী, সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম, অবতার, মহাপুরুষ, উপদেবতা, ও শক্তি, সব পূজাই শিবমূর্ত্তিতে বৈধ। কাজেই সব রকম পূজাই শিবলিঙ্গে করিবার বিধান আছে। শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি একটি যন্ত্র, ইহার লক্ষ্য মস্তিষ্কমধ্যস্থিত শিব পিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ী। ইহাকে শ্বেতবর্ণ, শীতল বরফের মতন শীতল স্বচ্ছ সহস্রারের ছত্রাকার ঢাকনার মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া ধ্যান করিবে। ইহাতে শরীর ভাল থাকে, আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং ইঁহার ধ্যানের ফলে মস্তিষ্কস্থিত সঞ্চিত সুকৃতির ফলগুলি ফলোন্মুখ হইয়া মানবের জীবন সুখময় ও সমৃদ্ধিশালী হয়; অর্থ শক্তি, কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি হয়। এই শিব হইতেই রসধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের শরীরকে ও মনকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে। এই রস প্রবাহই মা গঙ্গার ধারা। এই শিবই সর্ব্বশিব, ইনিই সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বশক্তির স্বরূপ।

যাঁহারা যোগমার্গে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদের জন্য নিত্য ষট্ চক্র ধ্যান ও যোগক্রিয়া অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ষট্চক্র ধ্যান, শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানেরই বিস্তৃত সাধনা। আনন্দমঠ পরম্পরা সাধনায় যোগদীক্ষাটি অত্যন্ত লম্বা। এই সময় ষট্চক্রাদির অনুশীলন বিশেষ ভাবেই করা প্রয়োজন। শুধু বৈজ্ঞানিক ভাবে দেহতত্ত্ব আলোচনায় ফল হয় না; সঙ্গে ধ্যান থাকা চাই। কর্ম্মীরা শুধু শক্তিবাদ পড়িলে শক্তিবাদী হইতে পারিবেন না, ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ নিত্য উপাসনা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক ধ্যানহীন মতবাদ মানুষকে মূর্খ, বর্ব্বর ও পশু করে।

মস্তিষ্কে যে সব কেন্দ্র আছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। সে সব কেন্দ্র এবার বুঝানো যাইতেছে। পাঠক, চিত্র দেখুন।

১। মস্তিষ্কে মনের কেন্দ্র। হিন্দুশাস্ত্রে মনকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। ইহা শিবপিণ্ডের এক প্রান্তে অবস্থান করে। এই কেন্দ্রটি আজ্ঞা চক্রের অংশ। মনের কেন্দ্র মস্তিষ্কে একটি এবং ইহা দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের সংযোগস্থলে বিদ্যমান। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ককে আমরা জ্ঞানমস্তিষ্ক এবং দুইটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে আমরা প্রাণমস্তিষ্ক বলিয়াছি।

২। মস্তিষ্কে সূর্য্যকেন্দ্র। এখানে আমাদের স্মৃতির স্থূল ভাগ অবস্থান করে। মস্তিষ্কে ইহার দুইটি কেন্দ্র আছে, একটি বাম মস্তিষ্কে ও অন্যটি দক্ষিণ মস্তিষ্কে। শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধদিকে সবগুলি কেন্দ্রই দুইটি করিয়া অবস্থিত। বামদিকের কেন্দ্রগুলি জ্ঞানপ্রধান এবং দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রগুলি কর্ম্ম প্রধান। কর্ম্ম প্রধান সূর্য্যস্তর অপেক্ষা জ্ঞানপ্রধান সূর্য্যস্তরের লোকদের চরিত্রে ও ব্যবহারে মাধুর্য্য বেশী। বিদুর, চৈতন্য, যিশু, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিতে জ্ঞান প্রধান সূর্য্যস্তর খুব স্পষ্ট বিকশিত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, ঢাকার আনন্দময়ী মা'র চরিত্রে সূর্য্যস্তর বেশ জাগ্রতভাবে বিদ্যমান।

জ্ঞান প্রধান সূর্য্যকেন্দ্র ও কর্ম্ম প্রধান সূর্য্যকেন্দ্র একটি নাড়ীদ্বারা যুক্ত আছে। সেই নাড়ীটি শিবপিণ্ডকে ভেদ করিয়া অবস্থিত। পাঠক চিত্র পরিচয়ে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। কর্ম্মপ্রধান সূর্য্যশক্তি ও জ্ঞান প্রধান সূর্য্যশক্তিতে ভেদ আছে। এ সম্বন্ধে পাঠক ক্রমে সব জানিতে পারিবেন। সূর্য্য প্রেমশক্তি। ইহাই আর্য্য জাতির প্রাতঃ সন্ধ্যার উপাস্য ব্রহ্মাণী, ইচ্ছাশক্তি - 'অ'। পূজা ও যজ্ঞবিধানে ব্রহ্মাণী শক্তির পূজার ব্যবস্থা আছে। ক্রমবিকাশের পথে ইহা ৬ কলার বিকাশ ক্ষেত্র। এই কেন্দ্রটি মস্তিষ্কের সহস্রার এর অন্তর্গত কেন্দ্র।

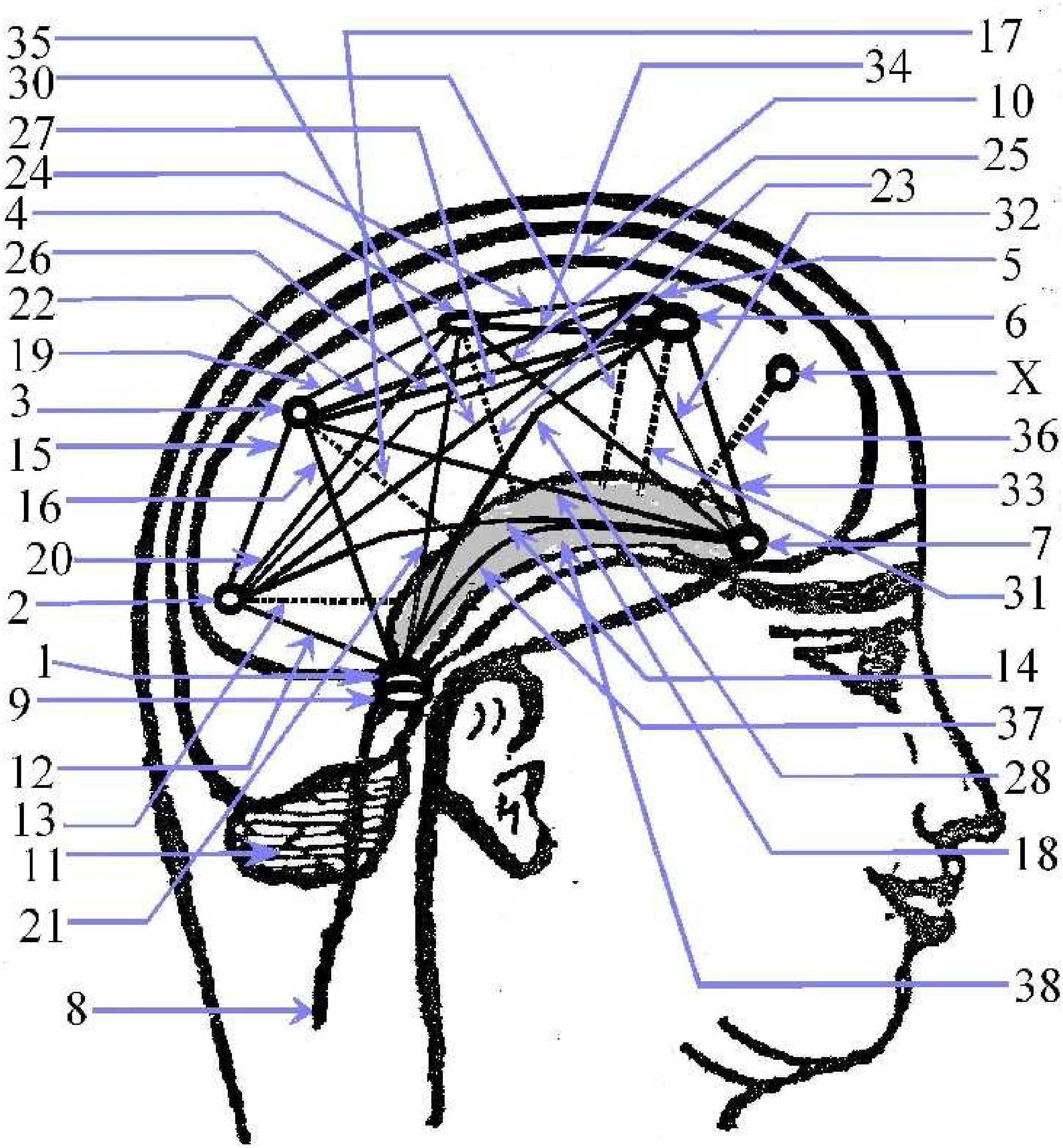

মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র

৩। বিষ্ণু কেন্দ্র। ইহা সুখশক্তির কেন্দ্র। এখানে স্মৃতির সূক্ষ্ম অংশ জমা থাকে। স্মৃতিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিয়াছি। উহার এক অংশে কোন ঘটনার লীলা ভাগ থাকে, অন্য অংশে ঐ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখ থাকে। বিষ্ণু কেন্দ্রে সুখ ও দুঃখ দুইই সুখময়। বিষ্ণুকেন্দ্রে সুখ ও দুঃখবোধ সুখময় মনে হইলেও, দুঃখ ও সুখ সূর্য্য কেন্দ্রে আসিয়া দুরকম রূপ লয় - ইহার একটা জীব ভালবাসে, অন্যটা জীব চায় না, কাজেই ইহা বুঝা যায় যে সুখ দুঃখ সুখময় হইলেও এক নহে, এবং ইহাতে ভেদ আছে। বিষ্ণুস্তরে সুখের প্রভাব এত বেশী যে দুঃখকে বোধ করিতেই দেয়না। মানব

ক্রমবিকাশে সুখ দুঃখময় জগৎগুলি বিষ্ণুস্তরে প্রবেশ করিলেই অতিক্রম করে। বিষ্ণুস্তরের ইহা সব চেয়ে বড় রহস্য। সূর্য্য কেন্দ্রেরই মত, বিষ্ণু কেন্দ্রের স্থান মস্তিষ্কে দুইটি। উহার একটি বাম মস্তিষ্কে এবং অন্যটি দক্ষিণ মস্তিষ্কে বিদ্যমান। বামটি জ্ঞান ও অনুভূতি প্রধান, ডানটি কর্ম্মপ্রধান। দুইটি কেন্দ্র একটি স্বতন্ত্র নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত আছে, যাহা শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া অবস্থিত। এই কেন্দ্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত কর্ম্ম ও সংস্কার জমা থাকে। সৎ কর্ম্ম, সৎ জ্ঞান, সৎ ব্যবহার ও মহাপুরুষের সেবা ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্ম ফলোন্মুখ হয়। যাহার ফলে মানবের জীবন সুখময় হয়। ইহার বিপরীত আচরণে, বিশেষ করিয়া বিনা কারণে উন্নত স্তরের শক্তিশালী যোগীর মর্ম্ম পীড়ার কারণ হইলে, সুকৃতি ফলোন্মুখ হইতে বাধা পায় এবং সঞ্চিত দুষ্কৃতি ফলোন্মুখ হইতে পথ পায়। যে সব যোগী এই স্তরের কর্ম্মরহস্য ভেদ করিতে পারেন, তাঁহাদের জীবনে একমাত্র প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য কোন দুঃখই আসে না। প্রারব্ধের দুঃখভোগের মধ্যেও যোগীরা সুকৃতি ফলোন্মুখ করিতে সক্ষম হন এবং অবশ্যম্ভাবী দুঃখময় প্রারব্ধের সঙ্গে প্রচুর সুখ ভোগ করিতে সক্ষম হন। পাঠক জানিয়া রাখুন, এই বিশ্বে যোগের ফলেই মানব সুখী, রাজা, ধনী, যশস্বী ও জ্ঞানী হন। এখানে বিষ্ণুস্তরে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, ডেমোক্রেট, কম্যুনিজম, অসুর, দেবতা ভেদ নাই। সুকৃতির ফলে এবং প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির চাপে যাঁহার যেখানে প্রয়োজন সেখানে জন্ম নেন এবং সুখভোগ করেন। যাঁহাদের মধ্যে দৈবীভাব থাকে, তাঁহারা প্রজার জন্য ভাবেন। যাঁহাদের সেটা নাই, তাঁহারা অবিচলিত ভাবে গুণ্ডামী করেন। কাহার শক্তি যোগভ্রষ্টকে বাধা দেয়?

যাহারা যোগ করে না, তাহারা মূর্খ। যাহারা ধর্ম্মের নামে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসরণ করে তাহারা আরও মূর্খ। বিষ্ণু শক্তিই আর্য্য উপাসকগণের মধ্যাহ্নকালীন উপাস্য বৈষ্ণবী শক্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচিত “ও” শক্তি। মহাশক্তি “ত্রিপুরার” উপাসনা দ্বারা এই কেন্দ্র বিশেষ ভাবে পুষ্ট হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা ও ভারতের প্রায় সব রাজা মহারাজাই ত্রিপুরার উপাসক ছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে শক্তি উপাসনা ও যোগবিদ্যার অনুশীলন কমিয়া গিয়াছে এবং সাধনজ্ঞানহীন দুর্ব্বল স্তরের মহাত্মাগণ (?) জনতাকে ভ্রান্ত পথের নির্দ্দেশ দিতেছেন। আমরা জনতাকে বলি - যদি নাচ তামাসাই দেখিতে চাও, তো নাট্যশালায় যাও। আর জীবনে যদি কিছু সঞ্চয় করিতে চাও তবে সন্ধ্যা পূজা ও যোগবিদ্যায় প্রবেশ কর।

৪। মস্তিষ্কে শিবকেন্দ্র। ইহা শান্তিশক্তির কেন্দ্র। সূর্য্য ও বিষ্ণু কেন্দ্রের মত ইহাও সহস্রার এর অন্তর্গত কেন্দ্র। মস্তিষ্কে শিবকেন্দ্র দুইটি, একটি বাম মস্তিষ্কে অন্যটি দক্ষিণ মস্তিষ্কে অবস্থিত। মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইলে উহার স্পন্দন এই শিবকেন্দ্র পর্য্যন্ত চলিয়া আসে। এই শিবকেন্দ্রটি চিত্রিণী নাড়ীর ঊর্ধ্বপ্রান্ত। মূলাধারে কুণ্ডলিনী এই নাড়ীতেই স্পন্দিতা হন। শিবকেন্দ্র হইতে সর্ব্বদা অমৃতরস নির্গত হইতেছে। অর্থাৎ চিত্রিণীর ঊর্ধ্বপ্রান্ত শিব হইতে সর্ব্বদা অমৃতরস চলিয়া আসিতেছে। ইহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং চন্দ্রের মত প্রভাসম্পন্ন। ইহারই নাম সোমরস। শিব ঐ সোমচক্রের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তিপ্রধান দুইটি শিবকেন্দ্রকে একটি নাড়ী সংযোগ সাধন করিতেছে, নাড়ীটি শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া অবস্থিত। এই কেন্দ্রে আমাদের

‘অহং’টি অবস্থান করে। এই ‘অহং’ই “পশুপতিনাথ” শিব। মস্তিষ্কস্থিত দুইটি এক জাতীয় কেন্দ্রকে কিভাবে একটি নাড়ী সংযুক্ত করে উহা পাঠক পরে চিত্রে জানিতে পারিবেন। এই কেন্দ্র শক্তিই আর্য্য জাতির সায়ংকালীন উপাস্য দেবী রুদ্রাণী। ইনি শান্তি শক্তি - “উ”। পূজা বিধিতে ও যজ্ঞাদিতে এই শক্তিকে “মাহেশ্বরী” বলা হইয়াছে।

৫। মহৎকেন্দ্র। ইহা জ্ঞানকেন্দ্র। ইহা পূর্ণবোধের কেন্দ্র। ইহা ধ্বনিজগতের কেন্দ্র। আমরা যখন কথা বলি তখন কথার মধ্য দিয়া ধ্বনিগুলি এখান হইতেই চলিয়া আসে। ইহার সঙ্গে সূর্য্যকেন্দ্রের নাড়ীদ্বারা সংযোগ আছে, সেই পথে ধ্বনিগুলি সূর্য্যকেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এবং সূর্য্যকেন্দ্রস্থিত কম্পিত ভাবটি ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়। মহৎ কেন্দ্রের সঙ্গে বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্রও নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত আছে। বিশুদ্ধাখ্য চক্র আমাদের ঘণ্টিকা যন্ত্রের ঠিক পিছনে থাকিয়া ঘণ্টিকাকে নিয়মিত করে। একটা কথা উচ্চারণ করিতে হইলে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত বহু কেন্দ্র ও অনেক নাড়ীর সাহায্য লইতে হয়। মস্তিষ্কে মহৎকেন্দ্র দুইটি। উহার একটি বাম মস্তিষ্কে থাকে এবং অন্যটি দক্ষিণ মস্তিষ্কে অবস্থান করে। ইহার বোধ শুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ। ইহাই আর্য্যজাতির জ্ঞানশক্তি সরস্বতী। ইনি জ্ঞান শক্তি ‘ ং’।

৬। অব্যক্ত শক্তি। ইহা কর্ত্তৃত্ব শক্তির কেন্দ্র। যাঁহারা বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাঁহাদের মধ্যে এই শক্তি প্রবল। এই শক্তির বলে ইঁহারা ন্যায় অন্যায়, সত্যমিথ্যা ও নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য করেন না। যাহা করাইবার করাইয়া লন। আমাদের অহংটি শিবকেন্দ্রে থাকে, কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি আসে অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে। গ্রন্থের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বিকাশ এ স্তরে আসিলে আমরা শক্তিস্তরে প্রবেশ করি এবং ঠিক ঠিক শক্তিমান হই। বিকাশ এই কেন্দ্রে আসিবার পর গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও মহৎ কেন্দ্রগুলি আর বোধকেন্দ্র থাকে না, ইহারা এখন হইতে এক একটি শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধকের যে সব অপূর্ণতা থাকে, সে সব অপূর্ণতা এখানে আসিলে আর থাকে না। জীবনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। গণেশে বিজ্ঞানশক্তি, সূর্য্যে প্রেমশক্তি, বিষ্ণুতে সুখ-শক্তি, শিবে শান্তিশক্তি, মহতে জ্ঞানশক্তির কেন্দ্র বিদ্যমান। এই সব কেন্দ্র সব জীবেই বিদ্যমান, কিন্তু জীবের বিকাশ কম থাকিলে এসব কেন্দ্রশক্তি পূর্ণ কাজ করিতে ক্ষেত্র পায় না। এজন্য ইহারা পূর্ণভাবে কাজ দেয় না। জীবের বিকাশ অব্যক্ত কেন্দ্র পর্য্যন্ত আসিলে এসব কেন্দ্রগুলি বিনা বাধায় পূর্ণ ভাবে কাজ করিতে সুযোগ পায়। সাধকের কর্ম্মক্ষেত্র ছোট থাকুক বা বড় থাকুক, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মে আর কোন ত্রুটি থাকে না, বিকাশের পথে, সাধক এক একটি স্তরে একটু একটু করিয়া অধিক শক্তিমান হইতে থাকেন। অব্যক্ত বিকাশের পর সব কেন্দ্রগুলিই দুর্ব্বলতাহীন হইয়া যায়।

সাধক, একটু অন্তর লক্ষ্যের সহিত মস্তিষ্ক কেন্দ্র বিচার করুন। দেখিতে পাইবেন, সাধকের বা মানবের বিকাশ যে স্তরেই থাকুক না কেন, মানব সব সময়ই সব শক্তির অধিকারী, কারণ সব শক্তির কেন্দ্রই সব জীবে বিদ্যমান। এজন্য একজন দুর্ব্বল স্তরের কর্ম্মী বা মহাপুরুষ কোন কোন সময় শক্তিবাদীর মত ব্যবহার ও কথা বলেন। ইহা দেখিয়া কোন দুর্ব্বল স্তরের কর্ম্মী বা দুর্ব্বল স্তরের মহাপুরুষকে শক্তিবাদী মনে করিবার

কারণ নাই। আমরা যতই শ্রীকৃষ্ণকে বিচার করি, ততই দেখিতে পাই, তিনি সত্যই শক্তিস্তরের বিকাশসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন। এমন একটি নিখুঁত চরিত্র ভারতে আর হয় নাই। তাঁহাকে, দুর্ব্বলস্তরের ধর্ম্মপ্রচারকগণ টানিয়া হিঁচড়াইয়া দুর্ব্বলস্তরে নামাইয়া যে সব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহাতে আমাদের সমাজজীবনের ও অধ্যাত্মবিকাশের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। বঙ্গদেশে কৃষ্ণকে রাধাকৃষ্ণ (প্রেমে কান্নাকাটি ও গড়াগড়ি) করিয়া ফেলিয়াছে। কচ্ছ দেশে কৃষ্ণকে রণছোড়জী (যুদ্ধের নাম শুনিলেই পালাও) করিয়াছে। একমাত্র মহারাষ্ট্র কৃষ্ণকে গীতার কৃষ্ণ (পার্থ সারথি) করিয়াছে। আমরা কৃষ্ণবাদী, রামবাদী, বুদ্ধবাদী সকলকে গায়ত্রীব্রহ্ম মন্ত্রে উপাসনা করিতে বলি। দুর্ব্বলস্তরের কর্ম্মী ও দুর্ব্বল জ্ঞানীর পাল্লায় পড়িয়া শক্তিবাদী ভারতের অনেক দুরবস্থা হইয়াছে।

প্রত্যেকটি কেন্দ্রই বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে কাজ দেয়। একটি ছাগের মস্তিষ্কগঠনে ও মানবের মস্তিষ্কগঠনে একটুও ভেদ নাই। বিকাশের ভেদে একজনের বুদ্ধি ও কর্ম্মের সঙ্গে অন্যের বুদ্ধি ও কর্ম্মে ভেদ হইয়া যায়। এইভাবে গণেশ স্তরের মানবে ও সূর্য্যস্তরের মানবে চরিত্র ভেদ হয়। গণেশ স্তরের অনুভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষে এবং সূর্য্যস্তরের অনুভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষে কিভাবে এবং কেন এত ভেদ হয়, তাহা পাঠক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যখন সাধক অব্যক্তস্তরের অনুভূতি লাভ করেন তখন তাঁহার মস্তিষ্কস্থিত অন্যান্য সব কেন্দ্রগুলিতে শক্তিস্তরের প্রাধান্য প্রবল হয় এবং অন্যান্য স্তরের প্রভাব কমিয়া যায়।

একটা জাতিগঠনেও এইরূপ বিকাশ-বিজ্ঞান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কম বিকশিত স্তরের মতবাদ যদি কোন জাতিতে বেশী প্রচার করা যায় তবে তাহাদের জাতিগত চরিত্র দুর্ব্বল হইয়া যায়। তাহারা বড় বড় কথার আস্ফালন দেখায়, কিন্তু কাজের সময় দেখা গিয়াছে, অসুরবাদের নিকট আত্মরক্ষাও করিতে পারে নাই। গান্ধিবাদীরা ভারতভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন; কিন্তু বিনা কারণে ভারতভাগ মানিয়া লন। এক তরফা রিফিউজী মানিয়া মানিয়া ভারতের অন্ন-বস্ত্র সমস্যা সৃষ্টি করিবার কোনই কারণ ছিল না, দেখা গেল তাও মানিয়া লইয়াছেন। ভারতের অর্থমান নমিত করিয়া পাকিস্থানের উচ্চ অর্থমান মানিবেন না বলিয়া নেতারা বলিয়াছেন, কিন্তু বিনা কারণে উহা মানিয়া লওয়া হইল। বাজারে পাকিস্থানের টাকার দর ভারতের অর্থমানের প্রায় সমান; কিন্তু উভয় সরকারের লেনদেনে, ভারত দিন দিন নিঃস্ব হয়। পাকিস্থান ১০০ টাকা দিয়া ভারতের ১৪৪ টাকা পায়। এইভাবে আসাম ও কাশ্মীরও হয় তো চলিয়া যাইবে। একটা জাতি দুর্ব্বলস্তরের চিন্তাধারা প্রবল করিলে সে জাতি বাঁচিতে পারে না। ১৯৫২ সনের ইলেকসনে দেখা গেল, অখণ্ডভারত ও শক্তিবাদী দলগুলি হারিয়া গিয়াছে এবং দেশের বহু দুঃখের ও দুর্নীতির প্রতিষ্ঠাতারা জয়ী হইয়াছে। দেশে শক্তিবাদী লোক অনেক আছেন, কিন্তু জাতিগত ভাবে শক্তিবাদ নির্জ্জীব হইয়া রহিয়াছে। এইরূপেই মস্তিষ্কের উচ্চস্তরের প্রবাহ আমাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয় না, যদি আমাদের বিকাশ কম থাকে, অথবা সর্ব্বদা অল্পস্তরের চিন্তাধারার বেশী মূল্য দিই। ভারতভাগের পর আমরা বহু নির্য্যাতিত নিপীড়িত ও বহিষ্কৃত জনতাকে অখণ্ড ভারত ও শক্তিবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে ভোট দিতে দেখিয়াছি। রিফিউজীদের বেশীর ভাগ লোককেই, শক্তিবাদী দলগুলিকে, কম্যুনেল বলিয়া গালি দিতে, আমরা দেখিয়াছি। পাকিস্থানকে বর্ব্বর বলিলে,

সর্ব্বধর্ম্মবাদী ও কংগ্রেসবাদী রিফিউজিরা তেলে বেগুনের রূপ ধারণ করে। যখন সর্ব্বধর্ম্মই সমান, তবে তোমরা মুসলমান হইয়া গেলে না কেন? এই প্রশ্ন করিলে, ইহারা উল্টা আক্রমণ করিতে আসে। একটা জাতিকে শক্তিশালী করিতে হইলে শক্তিবাদীয় উপাসনা, শক্তিশালী কর্ম্মধারা, ও শক্তিশালী জ্ঞান-ধারার প্রচার চাই। একটা মানুষ, নিজের চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিবাদী হয়, আবার একটা মানুষ পশুস্তরেই থাকিয়া যায়। ভারতের একদিকে এত সব উন্নতস্তরের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার এবং অন্যদিকে সমাজ জীবনের দৈন্য; ইহার কারণ, দুর্ব্বল ধর্ম্ম, দুর্ব্বল কর্ম্ম ও দুর্ব্বল স্তরের মহাপুরুষদের লইয়া বেশী নাচানাচি। তুমি যদি ইহার প্রতিকার চাও, তবে তোমাকে ঐ সব ভণ্ডামী লইয়া নাচানাচি ত্যাগ করিতে হইবে এবং উহা হইতে দূর হইয়া জীবন লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে।

পাঠক, চিত্র দেখুন, দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেকটি কেন্দ্র হইতে চারিদিকে নাড়ীগুলি সংযোগ করিতেছে। কাজেই বিকাশ যখন উন্নত স্তরে আসে তখন প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সেই বিকশিত কেন্দ্রটির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটিই কেন্দ্র, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের কর্ম্মের জন্য বিভিন্ন প্রকার নাড়ী তাহাকে সাহায্য করে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়স্তরে কেন্দ্রগুলির কাজ একরূপ থাকে না। তখন কেন্দ্রগুলি স্তর বিশেষের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়। পাঠক জানিয়া রাখুন, পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পরিবর্ত্তনে আমাদের পরিবর্ত্তন হইলেও শক্তিজগতের কার্য্য কখনও বন্ধ থাকে না। অধিক কি, সমাধি কালেও শক্তিস্তরের কার্য্য বন্ধ থাকে না। মস্তিষ্কে অব্যক্ত কেন্দ্র দুইটি। ইহার একটি বাম মস্তিষ্কে এবং অন্যটি দক্ষিণ মস্তিষ্কে অবস্থিত। দুইটি অব্যক্ত কেন্দ্র একটি নাড়ীদ্বারা সংযুক্ত আছে। নাড়ীটি শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া দুইটি কেন্দ্রকে যুক্ত করিয়াছে। ইহা গভীর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারবোধরূপিণী। ইহাই আর্য্য দেবতা মহাকালী। ইনি অব্যক্ত শক্তি - অঃ। ইহা সহস্রার অন্তর্গত কেন্দ্র।

৭। গণেশ শক্তি। ইহাই বিজ্ঞানশক্তি। গণেশ কেন্দ্র মস্তিষ্কে একটি। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের সংযোগস্থানে, ভ্রূমধ্যস্থানের সমসূত্র স্থানে এই কেন্দ্র অবস্থিত। বিজ্ঞান জগতের সমস্ত প্রকার অধিকার এই কেন্দ্র শক্তির বিশেষত্ব। যাঁহার এই কেন্দ্রটি শক্তিশালী তিনি তত উন্নত স্তরের বৈজ্ঞানিক। যাঁহারা জড়জগতের বাস্তবরূপ দেখেন, তাঁহাদের এই কেন্দ্র খুবই পুষ্ট। জড়বিজ্ঞান এবং উন্নত অনুভূতিতে বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান ও তন্মাত্রবোধ সবই এই কেন্দ্রশক্তির কাজ। আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার, বিবেক, কলাকৌশল, সবই এই কেন্দ্র শক্তির কাজ। আজ মানুষকে এই বিশ্বে অনেক চমৎকার শক্তিখেলা দেখাইয়াছে, ইহা এই কেন্দ্র শক্তিরই মহিমা। প্রাচীন যুগেও এ স্তরের বিকাশে বিকাশীগণ অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা আর্য্যদের গণপতি ঈশ্বর। গণশক্তির উপর এই কেন্দ্রশক্তির অসীম বিশ্বাস। ইনি বিজ্ঞান শক্তি - 'ই'।

৮। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক সংযোগকারী নাড়ীপথ। এই পথে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠক ক্রমে আরও জানিতে পারিবেন।

৯। প্রাণকেন্দ্র। ইহা প্রাণশক্তির কেন্দ্র। শরীরের প্রত্যেকটি যন্ত্র ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই শক্তির অধীন। পেশী সঞ্চালন শক্তি এই কেন্দ্র হইতে প্রবাহিত হয়। বিদ্যুতের তারের মধ্য দিয়া যেভাবে পাওয়ারহাউস হইতে বিদ্যুৎ ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন আলো, অগ্নি,

ও শক্তির কাজ চলে; ঠিক সেইরূপ, আমাদের শরীরস্থিত প্রাণশক্তি শরীরের পেশীগুলিতে প্রবাহিত হইলেই যন্ত্রগুলি চলিতে পারে। অন্তঃকরণ যদি হাতখানা তুলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রাণকেন্দ্র যদি প্রাণশক্তি না দেয় তাহা হইলে কিছুতেই হাতখানা উঠিবে না। শুধু পেশী এবং শুধু ইচ্ছাশক্তি হাতখানা তুলিতে পারে না, যদি প্রাণ তাহার শক্তিদান না করে। প্রাণকেন্দ্র উভয় মস্তিষ্কে একটি। ইহা মস্তিষ্কের পেছন দিকে থাকে। ইহা আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত কেন্দ্র। প্রাণকেন্দ্র দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের সংযোগ স্থলে অবস্থান করে, ইহা মনের কেন্দ্রের ঠিক নিম্নে অবস্থিত। ছোট মস্তিষ্ক এই প্রাণশক্তিরই একটি কর্ম্মস্থল। ছোট মস্তিষ্ক দুইটিকে আমরা প্রাণমস্তিষ্ক নাম দিতেছি। শরীরের অণুপরমাণুকে এই প্রাণশক্তিই সংবদ্ধ করে। শরীরের মধ্যে প্রাণই সব চেয়ে বেশী কর্ম্মঠ। ইহার শ্রান্তি নাই, বিশ্রামও নাই। শরীর শ্রান্ত হয়, শরীরের পেশী সমূহে ব্যথা হয়, কিন্তু প্রাণশক্তির ব্যথা নাই। স্থূল শরীরের অণুপরমাণুতে প্রাণশক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে। মনের শ্রান্তি আছে, প্রাণের নাই। শ্বাস প্রশ্বাসের চালকও এই প্রাণ। ইনি অনেক সময় জ্ঞান মস্তিষ্কেরও আজ্ঞা বহন করেন, ইহা সত্য কথা; কিন্তু প্রাণ তাঁহার বেশীর ভাগ কর্ম্ম নিজে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করেন। ইঁহার কার্য্যধারা বিচার করিলে মনে হয় শরীরে ইনিই আত্মা। আর্য্যদের উপাসনায় ইনি কৌমার্য্যশক্তি। ইনি সব সময়ই শক্তিস্তরের শক্তি। এজন্য নিত্য উপাসনায় ইঁহাকে প্রাতঃধ্যানে স্থান দেওয়া হইয়াছে। নৈমিত্তিক উপাসনায় কৌমার্য্য শক্তির পূজার বিধান আছে। শরীরে ইনিই ব্রহ্মচর্য্য। তন্ত্র বিদ্যায় ইনি প্রাণশক্তি - '৯'।

১০। শক্তিনাড়ী। এই শক্তির আশ্রয়ে কর্ম্মশক্তি (১নং), প্রেমশক্তি (২নং), সুখশক্তি (৩নং), ধর্ম্মশক্তি (৪নং), জ্ঞানশক্তি (৫নং), কর্ত্তৃত্বশক্তি (৬নং), বিজ্ঞান শক্তি (৭নং), প্রাণ শক্তি (৯নং) ধৃত আছে। এই শক্তিনাড়ীরই এক প্রান্ত ৮ চিহ্নিত নাড়ী পথে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। শক্তির এই অংশে বিশুদ্ধাখ্য, অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান, মূলাধার ধৃত আছে।

১১। ছোট মস্তিষ্ক বা প্রাণমস্তিষ্ক। প্রাণকেন্দ্র (৯নং) এই মস্তিষ্কটির প্রধান পরিচালক। প্রাণকেন্দ্র আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্র। অতএব প্রাণ মস্তিষ্কটি আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত। প্রাণ মস্তিষ্কের সঙ্গে জ্ঞানমস্তিষ্কের (বৃহৎ মস্তিষ্কের) সোজা নাড়ীদ্বারা সম্বন্ধ আছে। এজন্য বৃহৎ মস্তিষ্ক সময় সময় প্রাণমস্তিষ্কদ্বারা কাজ লইতে পারে। প্রাণমস্তিষ্কটি শক্তিস্তরের কর্ম্মবিভাগ। ইহা স্থূল শরীর গঠন ও পরিচালনার প্রধান কর্ম্মস্থল। আমাদের মনোময় কোষ বিশ্রাম করে, কিন্তু প্রাণমস্তিষ্ক, প্রাণময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ (বিজ্ঞানময় কোষের কিছু অংশ সমাধিকালে বিশ্রাম করে) এবং আনন্দময় কোষ বা শক্তিস্তর বিশ্রাম করে না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ৭ম অধ্যায়ে দেখুন। ৯ম অধ্যায়ে আরও কিছু আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

৩৮। শিবপিণ্ড। মস্তিষ্কের মধ্যে ইহাই প্রধান আজ্ঞাচক্র। এই শিবপিণ্ডের উপরের অংশকে গুরুপাদুকা বলে। ঐ অংশের মধ্য দিয়া বৃহৎ মস্তিষ্কস্থিত একজাতীয় দুইটি কেন্দ্রকে সংযোগকারী নাড়ীগুলি ভেদ করিয়াছে। শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা সংযুক্ত নাড়ীগুলি সংযুক্ত। দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিচালক

নাড়ীগুলিও এখানে আসিয়াছে। শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশেই আজ্ঞাচক্র এবং ঊর্ধ্ব অংশ সহস্রারের অন্তর্গত।

সহস্রারকে সাধারণতঃ সহস্রদল কমল বলে। যোগ সাধনায় ইহাতে অং হইতে ক্ষং পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণ ধ্যান করিতে হয়। কুড়িটি ঘেরায় এই (৫০×২০) সহস্রদল অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে সাত রং-এ ধ্যান করিতে বলেন। নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, ইহাকে শ্বেত বর্ণ ধ্যান করিলে বেশী আরাম পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ জানেন, ৭ রং ও শ্বেত রং একই কথা। শীতল স্পর্শ, শ্বেত ও স্নিগ্ধ সহস্রার, সমস্তটা মস্তকে একটি গভীর ঢাকনার মত আছে; এইরূপ ধ্যান করিয়া ঘেরায় ঘেরায় অং আং ইত্যাদি ক্রমে হং ক্ষং পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইতে হয়। খুব আলগা মনে ধ্যান করা প্রয়োজন, যেন মনে বা স্নায়ুজগতে চাপ না পড়ে। সমস্ত দিন রাতের মধ্যে একটি বার এই নিয়মে ঘেরা গুলিতে মনকে ঘুরাইয়া দিবার পর, মন যে কতটা হালকা ও স্বচ্ছ হইয়াছে উহা পরক্ষণেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

সহস্র + অর = সহস্রার। যে কোন চাকার কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঘেরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দণ্ডগুলিকে 'অর' বলে। সহস্র অর অর্থে অসংখ্য বুঝিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে এই সহস্র অরের কেন্দ্র কোথায়। ইহার কেন্দ্র শিবপিণ্ড, না কি মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ী? "অহং" কেন্দ্র ভেদ হইলে লয় যোগ শেষ হয়। চক্রধ্যান লয় যোগের সাধনার অঙ্গ। মস্তিষ্কে শিবকেন্দ্রে "অহং"টি থাকেন। কাজেই ইহাই সহস্রারের কেন্দ্রস্থল। শান্তিশীতল এই স্থানকে কেন্দ্র জানিয়া সহস্রার ধ্যান করিতে হয়। সহস্রারের গর্ভে গুরুপাদুকা অবস্থিত। গুরুপাদুকার সংযোগ ত্যাগ করিয়া সহস্রার ধ্যান করা যায় না। শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধতম স্থানকে গুরুপাদুকাস্থান বলে, একথা আমরা অনেক স্থানে বলিয়াছি। গুরুপাদুকা কেন্দ্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমরা এই গ্রন্থেই করিব। সাধকগণ লক্ষ্য রাখিবেন, অহং কেন্দ্রটি শিবকেন্দ্রে থাকে (৪নং কেন্দ্র)। এই শিবকেন্দ্রটি ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যস্থিত একটি কেন্দ্র। কিন্তু সোজা শিবকেন্দ্র হইতে ব্রহ্মনাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিতে হইলে জ্ঞানকেন্দ্র এবং অব্যক্তকেন্দ্র ভেদ করিতে হইবে। শক্তিস্তরই ব্রহ্মনাড়ী। ইহাই পুরুষোত্তম স্তর। যাহা হউক, অহং কেন্দ্র পর্য্যন্তই লয় যোগ। কাজেই শিবকেন্দ্রই সহস্রারের কেন্দ্র।

মস্তিষ্কে নাড়ী সংস্থান

মস্তিষ্কের মধ্যে বহুনাড়ী বিদ্যমান। আমরা কয়েকটি নাড়ীর আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি, দুইটি সূর্য্যকেন্দ্র (২নং), দুইটি বিষ্ণু কেন্দ্র (৩নং), দুইটি শিবকেন্দ্র (৪নং), দুইটি উন্নত শিবকেন্দ্র বা মহৎ কেন্দ্র (৫নং), দুইটি অব্যক্ত কেন্দ্র (৬নং) শিবপিণ্ড ভেদ করিয়াছে। শিবপিণ্ডকে আরও একটি নাড়ী ভেদ করিয়াছে। মস্তিষ্ক চিত্রে X চিহ্নে ইহার কেন্দ্র চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কি কার্য্য, উহা ঠিক বুঝা যায় নাই। এজন্য

এই কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। মনে হয় ইহাও শক্তিনাড়ী সংযুক্ত কেন্দ্র এবং বুদ্ধি কেন্দ্রের (৭নং) সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। মস্তিষ্ক চিত্রে গুরু পাদুকানাড়ীগুলিকে ভগ্নরেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। আমরা প্রথম এই ৬টি নাড়ী সম্বন্ধে বলিব। এই ৬টি নাড়ী কি ভাবে শিবপিণ্ড ভেদ করিয়াছে উহা বুঝিবার জন্য মস্তিষ্ক চিত্রে দেখুন।

মস্তিষ্ক হইতে যে সব নাড়ী সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করিয়াছে সেই সব নাড়ী সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। মৃত শরীরে এসব নাড়ী অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার তারের আকারে পাওয়া যাইবে। জীবিত কালে এই সব নাড়ীগুলি এক প্রকার তড়িৎ শক্তিতে পূর্ণ থাকে। আমরা নাড়ীগুলির স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাদের নামকরণ করিলাম। যাঁহারা সাংখ্য, যোগ ও তান্ত্রিক দার্শনিকতা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই নামগুলি বিশেষ সহায়ক হইবে। নাড়ী সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমরা সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

বিমলযশা। চিত্রে ১৩নং নাড়ী দেখুন। দুইটি সূর্য্যকেন্দ্র যে নাড়ীটি দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে, সেই নাড়ীটির নাম 'বিমলযশা'। বিমলযশা শিবপিণ্ড ভেদ করিয়াছে। দুইটি সূর্য্যকেন্দ্রকে সংযোগ করা ভিন্ন এই নাড়ীর আর কোনই কাজ নাই। একটি জ্ঞানপ্রধান ও অন্যটি কর্ম্মপ্রধান সূর্য্যকেন্দ্রকে সর্ব্বদা এক করিয়া রাখা এই নাড়ীর বিশেষ কার্য্য। ইহাই আর্য্যদেবতা সূর্য্য ঈশ্বর। ইহার স্পন্দনপ্রবাহে যখন সাধক আসেন তখন তিনি প্রেমে মজিয়া যান। ইহা অত্যন্ত সৌন্দর্য্যময়, অরুণাভ, স্নিগ্ধ ও প্রেমময় স্পর্শ। ইহার বা এই দুইটি কেন্দ্র সংযুক্ত কোন শাখা নাড়ীর জাগৃতি যে সব মানবে হয়, তাঁহারা এই বিশ্বে নাম, যশ, খ্যাতি অর্জ্জন করেন। যাঁহারা কবিতা, নৃত্য ও সঙ্গীত-কলায় বিশ্বকে মুগ্ধ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই নাড়ীর কোন না কোন শাখার প্রভাব আছে। যেসব মহাপুরুষ এই স্তরের পূর্ণ বা অংশের স্পর্শ পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের মহাপুরুষ হন। নানক, কবীর, তুলসীদাস, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, যিশু প্রভৃতির চরিত্রে এ স্তরের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। মধুর চরিত্র, মধুর ব্যবহার, জনসাধারণকে বশীভূত করিবার শক্তি এই স্তরের নাড়ীগুলি প্রদান করে। এস্তরের মহাপুরুষগণ অনেক স্থানে আসুরিক ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছেন দেখা যায়। এই স্তরের কর্ম্ম-বিজ্ঞানে সমাজ গড়িলে উহা অসুরতোষক ও আত্মনাশক হয়। এ স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞানে সমাজ চলে না, এবং ইহা দ্বারা সমাজ দুর্ব্বল হয়।

ধ্যানশ্রীয়া। চিত্রে ১৭নং নাড়ী দেখুন। জ্ঞান মস্তিষ্কস্থিত (বৃহৎ মস্তিষ্ক) দুইটি বিষ্ণুকেন্দ্র (৩নং) সংযোগকারী নাড়ীর নাম ''ধ্যানশ্রীয়া''। ইহা আর্য্যদের সগুণব্রহ্ম - বিষ্ণু। এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে বিষ্ণুস্তর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ধ্যানশ্রীয়ার এক প্রান্তে কর্ম্ম প্রধান বিষ্ণুস্তর এবং অন্যপ্রান্তে জ্ঞান প্রধান বিষ্ণুস্তর অবস্থিত। ইহা শিবপিণ্ড ভেদ করিয়াছে। ধ্যানশ্রীয়া সুখবোধের নাড়ী। মনে হয় আলতার আভা মিশ্রিত সুবর্ণবর্ণ পাহাড়ের অস্তিত্বে নিজের সংস্কার ও অস্তিত্ব এবং সব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব যেন ডুবিয়া গিয়াছে। এখানকার স্পন্দনগুলি এত ঘন ও সূক্ষ্ম যে প্রথমটায় এর চেয়ে সাধক আর বেশী কিছুই বুঝিতে পারেন না। এই নাড়ীর অনুভূতিই বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি। ধ্যানানন্দে যে সুখ উহা এই নাড়ীরই আভাস মাত্র। এই নাড়ীর আশ্রয়ে সুখজগৎ অবস্থিত।

এ স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক আর কাহারও সঙ্গে মিশিতে চান না। খুব গোপনে ও নীরবে থাকিতে ভালবাসেন। ইঁহারা যশকে কোন বড় বস্তু মনে করেন না। সর্ব্বদা ধ্যানসুখে মজিয়া থাকিতে ভালবাসেন। ধ্যানশ্রীয়া স্তরের সাধকগণ ভক্ত লইয়া মত্ত থাকিতে মোটেই ভালবাসেন না। 'বিমলযশার' সঙ্গে 'ধ্যানশ্রীয়ার' স্বভাবে ইহাই প্রধান ভেদ যে ধ্যানশ্রীয়া আত্মপ্রিয় ও আত্মরাম, কিন্তু বিমলযশা প্রশংসাপ্রিয় ও ভক্ত প্রিয়। যশলোভী পাপীরা "বিমলযশা" স্তরের সাধকের প্রচুর সেবা করে, কিন্তু পাপের পথ ছাড়ে না। বিষ্ণুস্তরের শোষক ও অসুরবাদীরা সূর্য্যস্তরের মহাপুরুষদের সামনে রাখিয়া নিজেরা ভক্তও হন, সমাজেরও সর্ব্বনাশ করেন। ধ্যানশ্রীয়া স্তরের সাধকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মধারা সাধারণতঃ শিবস্তরের অনুভূতির পর আরম্ভ হয়। ইঁহারা কর্ত্তব্যশীল ও আড়ম্বরহীন হন। ইহা আর্য্যের সগুণ-ব্রহ্ম বিষ্ণু। এবং তান্ত্রিক মহাবিদ্যায় - "ও"।

অমৃতা। এই নাড়ীটি মস্তিষ্কস্থিত দুইটি শিবকেন্দ্র (৪নং) সংযুক্ত করিয়াছে। চিত্রে ২৩নং দেখুন। ইহা শান্তিবোধের স্তর। এখান হইতে সর্ব্বদা শীতল স্বচ্ছ শান্তিরস ক্ষরিত হইতেছে। এই স্তর বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, মন ও প্রাণ কেন্দ্রকে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত করিতেছে। এই রসধারা মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্না পথে প্রবাহিত হইয়া বিশুদ্ধাখ্য, অনাহত, মণিপুর, ও স্বাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া সকলকে কর্ম্মশক্তি দান করিতেছে। ইহাই শিবের মাথায় পতিত পাবনী মা গঙ্গা। এই নাড়ী বিগলিত অমৃতধারা যদি যথেষ্ট সঞ্চয়ের সহিত ব্যয় করা না হয় তবে মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইবে এবং মানুষ পাগল হইয়া যাইবে। পাগল হওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যাধি। শিবকেন্দ্রেই আমাদের 'অহং'টি অবস্থিত। যাহাতে অহং এর কেন্দ্রে প্রচুর শান্তি জমা থাকে, এ জন্য প্রকৃতি প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সাধক লাউ, তরমুজ বা যে কোন বীজ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, বীজগুলিকে প্রকৃতি কত শীতল স্নিগ্ধ স্থানে রাখিয়া সেইগুলিকে পুষ্ট করেন। আমাদের অহংই বীজ শরীর। এই বীজ শরীর অত্যন্ত শীতল স্নিগ্ধ স্থানে মস্তিষ্কে অবস্থান করে। অহং এর শান্তির স্থিতি যাহাতে রক্ষিত হয়, এজন্য সন্ধ্যা পূজা যোগ ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এবং খুব নিশ্চিন্ত থাকিয়া শান্তিরসের ক্ষয় কমাইতে হয়। ফলে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে। শান্তিরসের ক্ষয় কম হইলেই আয়ু বৃদ্ধি হয়। এবং শান্তিরসের ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে আয়ু কমিয়া যায়। অহংকে প্রচুর শান্তির মধ্যে রাখিয়া সাধক সাধনার অভ্যাস করিবেন, ফলে জ্ঞানে পুষ্ট হইতে সুবিধা হইবে। বেশী চিন্তা ভাবনা করিলে, ক্রোধ করিলে, অহং-এর আশ্রয় শান্তির ক্ষয় হয়। শরীর ও মনের তেজভাব (অন্যায় বিরোধিতা) জাগ্রত হইলেও অহং-এর আশ্রয় শান্তির ক্ষয় হয়। তবে তেজ সঞ্চারে যেমন কিছুটা ক্ষয় যায়, তেমনই ইহাতে শরীর ও মনের বহু ময়লা জ্বলিয়া যায়। ফলে শরীর ও মন নির্ম্মল হয়। ক্রোধে শরীর ও মন মলিন হয়।

শান্তির কোলে অহংটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে থাকে। অভিমান, সংস্কার, মোহ, ভোগ, ও কোনও প্রকার চঞ্চলতাহীন অহংই বিশুদ্ধ 'অহং'। বিশুদ্ধ 'অহং' সর্ব্বদা শান্তিরসে ডুবিয়া থাকে। শিবের কেন্দ্র শান্তির কেন্দ্র। 'অহং' (আমিত্ব) এখানে আছে বলিয়াই এখান হইতে শান্তিরস স্রাব হয়। এই শান্তিরস জ্ঞানেরই তরল অবস্থা। অহংকে ধরিয়া সৃষ্টি ও সংসার-মোহ-রূপ কলঙ্ক থাকে বলিয়া এই রসস্রাব হয় এবং সংসারকর্ম্মে এই রস

ব্যয় হইতে বাধ্য হয়। আমাদের আমিত্ব যখন সম্পূর্ণরূপে মোহ, আসক্তি, সংস্কার ও ভোগশূন্য হয়, তখন এই শান্তিরসধারাকে অহং পূর্ণভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এবং অতি শীঘ্র পূর্ণজ্ঞানের উপযুক্ত হয়। এইভাবেই সাধক জ্ঞানের (৫নং কেন্দ্র) অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানের স্তর সম্বন্ধে ‘‘নির্ব্বাণা’’ অংশে বিস্তারিত দেখুন। শিবকেন্দ্র দৈবজগৎ এবং বিজ্ঞানজগতের কেন্দ্র স্থান। অর্থাৎ শিবকেন্দ্রের একদিকে দৈবজগৎ এবং অন্যদিকে তন্মাত্র জগৎ। এখানে আকাশ তন্মাত্রা ভিন্ন আর ৪টি তন্মাত্রা অনুভব হয়। ইহাই চিত্তবৃত্তিহীন যোগভূমি। অহং শুধু অহংটি লইয়া তৃপ্ত নহে, ইহাই অহং-এর দুর্ব্বলতা। সে চিত্ত, মোহ, ভোগ, সংসারও চায়; এ ভাবে অহং নিজের নির্ম্মলতায় ময়লা মাখে এবং এই দুর্ব্বলতার দরুণ অহং শান্তিরসটুকুর সবটা নিজে ভোগ করিতে পারে না। ইহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। যখন ‘অহং’ সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখন এই শান্তিরসের সবটুকুই অহং ভোগ করিতে পারে। শান্তিরসের বৃথা ব্যয় নষ্ট হইলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও শরীরের সমস্ত অণুপরমাণু শান্তিরস প্রচুর পায়। শরীরে জ্যোতি হয় এবং স্বাস্থ্য সুন্দর হয়। অহংএ বা আমিত্বে মালিন্যই শান্তিরসে বঞ্চিত হইবার প্রধান কারণ। অমৃতা শুভ্রশান্তিবোধের ক্ষেত্র। সগুণব্রহ্ম শিব ঈশ্বরের এক অংশ ‘অমৃতা’, অন্য অংশ সম্বন্ধে ‘‘নির্ব্বাণাতে’’ বলা হইবে। ইনি তন্ত্রের শব্দব্রহ্ম ‘‘উ’’।

নির্ব্বাণা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩০নং। বৃহৎ মস্তিষ্কস্থিত দুইটি মহৎকেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ীর নাম নির্ব্বাণা। চিত্রে ৫নং কেন্দ্র ও ৩০নং নাড়ী দেখুন। নির্ব্বাণা পূর্ণবোধের কেন্দ্র। ইহা বর্ণহীন স্ফটিকবর্ণ বোধকেন্দ্র। ইহাই আকাশ বা শব্দ তন্মাত্রা বোধের স্তর। ইনি শিবের ঈশান মুখ। আর্য্যদের সগুণব্রহ্ম শিব ‘‘অমৃতা + নির্ব্বাণা’’। তন্ত্রমতে ইনি মহানাদাখ্য শিব। ইনি বিশুদ্ধ শব্দব্রহ্ম। ৫ম অধ্যায় দেখুন। তন্ত্রমতে ইনি ‘‘ঁ’’; জ্ঞান শক্তি।

নিষ্কলা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩১নং। নিষ্কলা জ্ঞানমস্তিষ্ক (বৃহৎ মস্তিষ্ক) স্থিত দুইটি অব্যক্ত কেন্দ্র সংযোগ কারিণী নাড়ী। চিত্রে ৬নং কেন্দ্র দেখুন। এবং ৩১নং নাড়ী দেখুন। অনুভূতিতে ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইনি সমস্ত সৃষ্টিকে প্রলয় করিয়া দেন। গীতায় ‘‘রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে’’ ইত্যাদি দেখুন। ‘‘নিষ্কলা ও নির্ব্বাণা’’ এই দুইটি নাড়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ‘‘রাত্রি ও দিবা’’। এখান হইতে নাড়ী গণেশ, প্রাণ, মন, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সব কেন্দ্রেই গমন করিয়াছে। এখান হইতে নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যেও গমন করিয়াছে। ইনি তন্ত্রমতে শব্দব্রহ্ম ‘‘ ঃ’’।

অতিমানসা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৬নং নাড়ী। বৃহৎ বা জ্ঞান মস্তিষ্কস্থিত দুইটি অতিবুদ্ধি স্তরের কেন্দ্রকে সংযোগকারী নাড়ীটির নাম অতিমানসা। কর্ম্মের গতি ধরিয়া উহার ফল বা পরিণতি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে, এমন শক্তি অনেকেরই কিছু না কিছু আছে। মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক প্রত্যেকটি ঘটনা, যাহা চক্ষের সামনে ঘটে, উহার পরিণতি বুঝিতে চেষ্টা করে। কর্ম্মের গতি বিচার করিয়া একটা ভবিষ্যৎ কিছু বুঝিয়া লওয়ার শক্তি প্রত্যেক নেতারই কিছু না কিছু থাকে। আমরা অনেক ধাপ্পাবাজ লোককে একটা ফন্দি করিয়া, আইনকে ও দণ্ডকে ফাঁকি দিয়া স্বার্থ সিদ্ধি ও অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের দেশের দল বিশেষের নেতারা ধাপ্পা দিয়া ইলেকসন জয়ী হইবার অসীম দূরদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা অনেক চিন্তাশীল

নেতা ও কর্ম্মীদের ভারতীয় রাজনীতির পরিণতি সম্বন্ধে আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কি ভাবে জনতাকে ধাপ্পা দিয়া ইলেকসন জয় করিতে হয়, ইঁহাদের সে শক্তি কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। আমরা বাজারের অনেক দোকানদার, ছুটকা দোকানদার ও দুধওয়ালা ও ফিরিওয়ালাদের তো সর্ব্বদা মাপে কম দিয়া ঠকাইতে দেখি। লৌকিক বহু ঘটনায় দেখা যায়, মানুষ এক একটি ফন্দি করে এবং উহার ফলকে পূর্ব্বেই জানিতে পারে। দেখা গিয়াছে, তাহারা উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঘটনার গতি দেখিয়া একটা পরিণতি স্থির করা, একটা কর্ম্মের প্রোগ্রাম করিয়া উহার একটা পরিণতি অনুমান করা এবং সফল হওয়ার ঘটনার অভাব নাই। এইরূপ ঘটনার গতি জানার বাইরেও এক প্রকার অতীত ভবিষ্যৎ জানিবার শক্তি আছে। ‘‘অতিমানসা’’ সেই শক্তির কেন্দ্র। ইহাতে ঘটনার কোনই অঙ্ককষার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ফল জানা যায়। ঘটনার পরিণতিতে এইরূপ ফল জানার শক্তি অনেক ঋষি মহর্ষিদের ছিল। ঘটনার গতি দেখিয়া, উহার ফল অনুমান করিয়া, অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে উহা সত্য হইয়াছে। আবার ঘটনার গতি বুঝিয়া একটা ফল অনুমান করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, কোন অনুমানের বাইরের কোন ঘটনা আসিয়া, সেই ফলকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কর্ম্মের গতি ধরিয়া ঘটনার পরিণতি বুঝায় অনেক স্থানে ভুল হইতে পারে; কিন্তু অতিমানসার দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায় উহা নিশ্চয়ই হইবে।

কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া দেখা গিয়াছে প্রবল বাধা আসিয়াছে এবং উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু কয়েক বৎসর বাদ দেখা গেল, ঘটনাচক্রে সেই কার্য্য সঠিক ফল দিয়াছে। এসব ঘটনা অতিমানসার কাজ। চিত্রে, অতিবুদ্ধি কেন্দ্র দুইটিকে X চিহ্নে দেখানো হইয়াছে। অতিমানসা ৩৬নং নাড়ী।

অতিবুদ্ধির কেন্দ্র এবং সূর্য্য কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া লয়যোগের একটি ক্রিয়া করিতে হয়। ইহাকে ‘আরুণী’ ক্রিয়া বলে। কয়েক দিন এই ক্রিয়া অভ্যাস করিলে অনাহত নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নাদ শুনিতে পাইবামাত্রই ক্রিয়াটি বন্ধ রাখিয়া একাগ্রমনে নাদ শ্রবণ করিতে হয়। তাহার পর এমন হয় যে ৪, ৫ সেকেণ্ড ক্রিয়া করিলেই নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পর ক্রিয়া না* করিলেও দিন রাত্র সুন্দর স্নিগ্ধ ও মন আকর্ষণকারী নাদের শ্রবণ হইতে থাকে। নাদে জ্যোতি এবং নাদে রস অনুভব করিয়া মন ক্রমে উন্নত স্তরে অগ্রসর হইতে পথ পায়।

গুরুপাদুকা

বিমলযশা, ধ্যানশ্রীয়া, অমৃতা, নির্ব্বাণা, নিষ্কলা, এবং অতিমানসা এই ছয়টি নাড়ী গুরুপাদুকা কেন্দ্রের প্রধান অবলম্বন। জীবনের উন্নত বিকাশের জন্য গুরু পাদুকার অবলম্বন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। আমরা শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানের কথা

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘না’’ শব্দটি আমাদের সংযোজন।

বলিয়াছিলাম। ইহা প্রাথমিক সাধকের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ইহার পর আমরা ষট্চক্র ধ্যানের কথা বলিয়াছি। ইহা মধ্য স্তরে সাধকদের জন্য প্রয়োজন হয়। যাহাদের জীবনের লক্ষ্য অত্যন্ত উন্নত তাহাদের জন্য গুরুপাদুকা ধ্যান ভিন্ন পথ নাই। আমরা সাধকগণকে প্রথমেই ব্রহ্মনাড়ী ও শিবপিণ্ডের কথা বলি। পরে গুরু পাদুকার নির্দ্দেশ দিতে হয়। ষট্চক্রের ধ্যান মধ্যকালে কয়েক বৎসর বেশ ভালভাবেই অনুশীলন করিতে হয়। গুরু-পাদুকা-ধ্যান আয়ত্ত হইবার পর, ইহার সঙ্গে রাজযোগ নির্দ্দিষ্ট ''প্রাণক্রিয়া'' অভ্যাস করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত আরামদায়ক সাধনা। ইহাতে মস্তিষ্ক খুব হালকা ও মন নির্ব্বিকার হইয়া যায়।

গুরু পাদুকা স্তোত্রম্ :

ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে, নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং।
কুণ্ডলী বিবরকাণ্ড মণ্ডিতং, দ্বাদশার্ণ সরসীরুহংভজে॥ ১
তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে, ক্লীপ্তরেখমকথাদি রেখয়া।
কোণ লক্ষিত হ ল ক্ষ মণ্ডলী ভাব লক্ষ্যমবলালয়ং ভজে॥ ২
তৎপুটে পটুতড়িৎ কড়ারিম স্পর্দ্ধমান মণি পাটল প্রভাম্।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্নাদ বিন্দু মণিপীঠ মণ্ডলম্॥ ৩
ঊর্দ্ধমস্য হুতভূক শিখাত্রয়ং তদ্বিলাস পরিবৃংহণাস্পদম্।
বিশ্বঘস্মরমহচ্চিদোৎকটং ব্যামৃষ্যামি যুগমাদি হংসয়োঃ॥ ৪
তত্র নাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবঝরী মরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দ শীতলং, মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্॥ ৫
নিসক্ত মণি পাদুকা নিয়মিতাঘ কোলাহলং,
স্ফুরৎ কিশলয়ারুণং নখ সমুল্লসচ্চন্দ্রকম্।
পরামৃত সরোবরোদিত সরোজ সদ্রোচিষং
ভজামি শিরসিস্থিতং গুরু পদারবিন্দদ্বয়ং॥ ৬
পাদুকা পঞ্চক স্তোত্রং পঞ্চ বক্তাদ্বিনির্গতম্।
ষড়াম্নায় ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুর্ল্লভম্॥ ৭

- মাতৃকাভেদ তন্ত্র

অনুবাদ -

১। ব্রহ্মরন্ধ্রে (সহস্রার) কমলের উদরে নিত্য সংলগ্ন, কুণ্ডলীকাণ্ড বিবর (ব্রহ্মনাড়ীর) মধ্যস্থিত, বারটি বর্ণযুক্ত শ্বেত কমলকে আমি ধ্যান করি।

টিপ্পনী। শিবপিণ্ডকে ৬টি নাড়ী ভেদ করিলে শিবপিণ্ডের এক দিকে ৬টি ও অন্য দিকে ৬টি, এইরূপে ১২টি রেখা হইল। ইহাই গুরুপাদুকার দ্বাদশার্ণ। ''হ স খ ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যুঁ'' ইহারা ১২টী বর্ণ। গুরু পাদুকার সাধক, শিবপিণ্ডকে ভেদকারী অতিমানসা, নিষ্কলা, নির্ব্বাণা, অমৃতা, ধ্যানশ্রীয়া এবং বিমলযশার ডানদিকে ক্রমে (কপালের দিক হইতে) হ, স, খ, ফ্রেঁ, হ, স, দেখুন এবং শিবপিণ্ডের পেছন দিকে হইতে সামনের দিকে

(বাম দিকে) দেখুন ক্ষ, ম, ল, ব, র, যুঁ। অর্থাৎ অতিমানসার ডানে হ, বামে যুঁ॥ নিষ্কলার ডানে স, বামে র॥ নির্ব্বাণার ডানে খ, বামে ব॥ অমৃতার ডানে ফ্রেঁ, বামে ল॥ ধ্যানশ্রীয়ার ডানে হ, বামে ম॥ বিমলযশার ডানে স, বামে ক্ষ॥

মস্তিষ্কস্থিত শক্তিনাড়ীই ব্রহ্মনাড়ী (১০নং)। এই নাড়ী দুইটি মস্তিষ্কের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বাস্তবিক পক্ষে গুরুপাদুকার ৬টি নাড়ী এই ব্রহ্মনাড়ীতেই সংযুক্ত। কাজেই স্তোত্রে ‘‘নিত্যলগ্নং’’ কথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ হইয়াছে।

২। উক্ত দ্বাদশদলপদ্মের দ্বারা সংযুক্ত কর্ণিকা মধ্যে (মধ্যস্থিত স্থানে) মধ্যে অ ক থ আদি রেখা দ্বারা চিহ্নিত শক্তিস্থান (ত্রিকোণ যন্ত্রকে) যাহার তিনটি কোণে হ ল ক্ষ তিনটি বর্ণ রহিয়াছে, আমি সেই শক্তিপীঠকে ভজনা করি।

টিপ্পনী। ছয়টি নাড়ী শিবপিণ্ড ভেদ করিবার দরুণ যে বারটি নাড়ী হইল বা দ্বাদশবর্ণযুক্ত একটি কমল হইয়াছে এবং কেন্দ্রস্থানটি একটি কমলকোরক হইয়াছে, সেই কোরকে ‘‘অ হইতে অঃ’’, ‘‘ক হইতে ত’’ এবং ‘‘থ হইতে স’’ পর্য্যন্ত প্রতি রেখায় ১৬টি করিয়া অক্ষরে চিহ্নিত ত্রিকোণপীঠের কথা বলা হইতেছে। এই ত্রিকোণের তিনটি কোণ হ ল ক্ষ এই তিনটি বর্ণে গঠিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে জ্ঞান ও শক্তিরূপা ৫১টি বর্ণে গঠিত শক্তিমূর্ত্তি, মস্তিষ্কে গুরুপাদুকার ১২শ দল কমলের মত ইহার কি কোন বাস্তব সত্ত্বা আছে, না কি ইহা সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক চিৎ সত্ত্বা? আমরা এখন ইহার উত্তর দিলাম না। এই গুরুপাদুকা স্থানের মধ্য দিয়া বহু নাড়ী গমন করিয়াছে। আমরা এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি, শিবের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যখন আমরা সাধনায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাদের তখন ধারণা ছিল, গুরুপাদুকার কোন বাস্তব সত্ত্বা নাই। সাধনার ক্রম শেষ করিয়াও গুরুদেবের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলাম - ‘‘এখনও কিছু বুঝা যায় নাই, করিয়া চল, শিব জানাইলে জানিতে পারিবে’’। নাড়ীতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া যখন ১২টি পত্রের বাস্তবরূপ বুঝিলাম তখন আনন্দের আর সীমা রহিল না। পাঠক গ্রন্থে প্রবেশ করুন, বুঝিতে পারিবেন, সমস্ত নাড়ী ও সমস্ত জ্ঞানের মূল এই গুরুপাদুকার বারটি নাড়ী। আমরা এতটা বলিয়া রাখি, গুরুপাদুকা স্তোত্রের প্রত্যেক অঙ্গেরই বাস্তব সত্ত্বা আছে। সেই সব ব্যাখ্যা করিলে পাঠকগণের পক্ষে জটিল হইবে।

৩। আমার হৃদয়স্থিত উক্ত ত্রিকোণ মধ্যে অতিশয় প্রকাশমান, বিদ্যুৎ সদৃশ, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ (অগ্নিবর্ণ) তেজপূর্ণ পাটলবর্ণমণিসদৃশ, নাদবিন্দু স্বরূপ মণিময় পীঠকে আমি চিন্তা করি।

টিপ্পনী। এখানে নাদবিন্দু ধ্যানের কথা বলিতেছেন। ‘‘অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত’’ প্রণবের এই সাত অঙ্গের মধ্যে নাদ = মহত্তত্ত্ব, বিন্দু = অহমাত্মা, কলা = অব্যক্ত, কলাতীত = পুরুষোত্তম।

নাদ চন্দ্র প্রভাযুক্ত তত্ত্ব, বিন্দু সূর্য্যপ্রভাযুক্ত অহমাত্মা। গুরুপাদুকা মস্তিষ্কের মধ্যস্থান। গুরুপাদুকার মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের সবগুলি নাড়ীই প্রবাহিত। কাজেই মস্তিষ্কের সবগুলি কেন্দ্রেরই প্রভাবযুক্ত এই গুরুপাদুকা-ক্ষেত্রেই সব কেন্দ্রের তত্ত্বধ্যান সন্নিবেশ করা

হইয়াছে। 'নাদে' মন একেবারে বিলীন হয়। কাজেই এসব স্তরে ধ্যানের কথাই খাটে না। তবুও ধ্যান করিতে হইবে, যোগীদের জন্য শিবের আদেশ।

৪। এই মণিপীঠ মণ্ডলের উপর তিনটি জ্যোতিঃ শিখা উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধে একত্র হইয়া একটি বিন্দুতে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা মহাপ্রলয়কারী মহাদীপ্তি-বিশিষ্ট। ইহাতে আমি ধ্যান করি। ইনিই আদি "হংসঃ" যুগল।

টিপ্পনী। অ ক থ রেখার তিন কোণে হ ল ক্ষ তিনটি বর্ণ হইতে জ্যোতি উঠিয়া উপরে এক বিন্দুতে মিশিয়াছে। সম্পূর্ণ বাম মস্তিস্কটি হ স্বরূপ, ইহা স্নিগ্ধ চন্দ্রজ্যোতি স্বরূপ। এই মস্তিস্কে জ্ঞান প্রধান সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, মহৎ, অব্যক্ত ও অতিমানসা কেন্দ্র বিদ্যমান। সম্পূর্ণ দক্ষিণ মস্তিস্ক ক্ষ স্বরূপ, ইহা কর্ম্ম প্রধান সূর্য্যজ্যোতি। দক্ষিণ মস্তিস্কে কর্ম্মপ্রধান সূর্য্য, বিষ্ণু আদি কেন্দ্রগুলি রহিয়াছে। এই কর্ম্মপ্রধানসূর্য্য ও চন্দ্রজ্যোতি বিশ্বকে রক্ষা ও পালন করেন। ইহা ভিন্ন আরও একটি জ্যোতি আছেন উহার নাম "অগ্নিজ্যোতি"। অগ্নিজ্যোতিই আত্মজ্যোতি। এই অগ্নিজ্যোতি বিশ্বকে নাশ করেন। ইঁহারা আমাদের শরীরের অণুপরমাণুকে গড়েন, রক্ষা করেন ও ধ্বংস করেন। ইঁহারা একটি রক্ষাকারী দার্শনিকতা, একটি পালনকারী দার্শনিকতা, একটি ধ্বংসকারক দার্শনিকতা। তিনটি দার্শনিকতা এককেন্দ্রে হংসঃ পীঠে মিলিত হইয়াছে। চন্দ্রজ্যোতি পুষ্টিকারক, রবিজ্যোতি কর্ম্মকারক, অগ্নি জ্যোতি (বা আত্ম জ্যোতি) মহা প্রলয় কারক। এই আত্মজ্যোতি কি এবং কোথায়, এসম্বন্ধে এখন আমরা বলিলাম না।

হংসঃ পীঠকে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রলয় স্থান বলা হয়। জ্ঞানের প্রলয়, কর্ম্মের প্রলয়, শ্বাস ও প্রাণক্রিয়ার প্রলয়, সবই ঐ শিখাত্রয়ের শেষ প্রান্তে সাধিত হয়। সাধক নিত্য গুরুপাদুকা ধ্যান করিয়া চল। ইহা এমন এক স্থান, যাহার জ্ঞান ও দার্শনিকতার অতি সামান্য মাত্র আলোচনা ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রগুলিতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার বিশদ আলোচনা অসম্ভব।

৫। এখানে হংসঃ পীঠের উপর শ্রীনাথের চরণ যুগল আছে। যেখানে কুঙ্কুম প্রভাযুক্ত সুধা বিগলিত হয়, যেখানে দুইটি সুধার চন্দ্র রহিয়াছে, যাহা স্মরণে মঙ্গল দান করে।

টিপ্পনী। ইতিপূর্ব্বে আমরা অমৃতা নাড়ীর কথা বলিয়াছিলাম। সাধক দেখিতে পাইতেছেন - এই অমৃতার দুই প্রান্তস্থিত দুইটী কেন্দ্রই "দ্বন্দ্বমিন্দু"। যেখান হইতে অমৃত ক্ষরণ হইতেছে।

৬। যেখানে সংলগ্ন মণিপাদুকাদ্বয় পাপনাশক ও কোলাহল (চঞ্চলতা) নাশক, সেখান হইতে নবপত্রের রংএর মত অরুণাভ জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ প্রকাশমান অমৃত আছে। উহা সরোবরে প্রকাশিত দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। উহা অত্যন্ত নির্ম্মল কিরণবিশিষ্ট, আমি ঐ শিখাত্রয়ের মস্তিকস্থিত গুরুপদারবিন্দদ্বয়কে আরাধনা করি।

টিপ্পনী। ৫ম্ শ্লোকে যে গুরুপাদুকার কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে উহা তুলনামূলক ভাবে বুঝানো হইয়াছে।

৭। এই "পাদুকা পঞ্চক স্তোত্র" শিবের ৫টী মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। (শিবের জ্ঞানময় পঞ্চমুখ হইতে প্রকাশ হইবার দরুণ ইহা কেবলই জ্ঞানদাতা স্তোত্র নহে)। ইহা

শিবের ষষ্ঠ মুখের কার্য্যেও সিদ্ধিদান করে। (শিবের ৬ষ্ঠ মুখ হইতে যে সব তন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে, সেইগুলিকে মারণ, উচাটন, বশীকরণ আদি আভিচারিক কর্ম্ম বলে)।

টিপ্পনী। এখানে পাদুকা পঞ্চক বলা হইয়াছে। পাদুকা অর্থে পদরক্ষার পীঠ। গুরুপাদুকা অর্থে ব্রহ্মপদ প্রকাশের ৫টী পীঠ বুঝিতে হইবে। গুরু ও ব্রহ্ম একার্থ বাচক। ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতেও সন্দেহ নাই। পাঁচটী পাদুকা কি? ১ম পাদুকা ১২টি অক্ষর বিশিষ্ট কমল। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক পাদুকার এই অংশের ধ্যানে বিশেষভাবে মন দিবেন। ২য় পাদুকা অ ক থ রেখা ও হ ল ক্ষ নামক ত্রিকোণ। ক্রমাভিষিক্তগণ পাদুকার এই অংশে ধ্যান নিবিষ্ট করিবেন। ৩য় পাদুকা হইতেছে 'নাদবিন্দু' ধ্যান, ইহাই মণিপীঠ মণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডল নাদ ও উহার উপর বিন্দু স্বরূপ সূর্য্য। ইহাই 'নাদ বিন্দু'। সাম্রাজ্য দীক্ষায় 'নাদ বিন্দু' ধ্যান করিতে হয়। ৪র্থ পাদুকা হইতেছে শিখাত্রয় যাহা হ ল ক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া 'নাদবিন্দুকে' আবরণ দিয়া উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই শিখাত্রয় একটা বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এই বিন্দুই ৫ম পাদুকা। এই একটা বিন্দুই দুইটি চন্দ্র স্বরূপ। এই বিন্দুই 'হং সঃ' পীঠ। পাঠক মস্তিষ্ক চিত্রে ৪নং স্থান দেখুন। দক্ষিণ ও বাম মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্র দেখুন। এখানে আসিয়া গুরুপাদুকা শেষ হইয়াছে। ইহাই ''দ্বন্দ্বমিন্দু''। মস্তিষ্ক চিত্রে যে সব কেন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে গুরুপাদুকার সব কথা মিলাইতে চেষ্টা করিবেন না। গুরুপাদুকার এক প্রান্ত শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধতম প্রান্ত, যাহা ছয়টি নাড়ীদ্বারা ভেদ হইয়া ১২টি নাড়ীতে (হ স খ ফ্রেঁ হ শ ক্ষ ম ল ব র যুঁ) পরিণত হইয়াছে। গুরুপাদুকার ঊর্দ্ধতম প্রান্তে দ্বন্দ্বমিন্দু, যাহা মস্তিষ্ক চিত্রে দুইটি শিবকেন্দ্র (৪নং)। ইহাই সোমনাথ শিব। মধ্যস্থানের ধ্যান যেমন শিব বলিয়াছেন, করিয়া চলুন। আমরা সব কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া সাধনার বিভ্রাট সৃষ্টি করিতে চাই না। গুরুপাদুকা ধ্যানের সঙ্গে রাজযোগ নির্দ্দিষ্ট প্রাণক্রিয়া জড়িত আছে। সে সব এখানে আলোচনীয় বিষয় নহে।

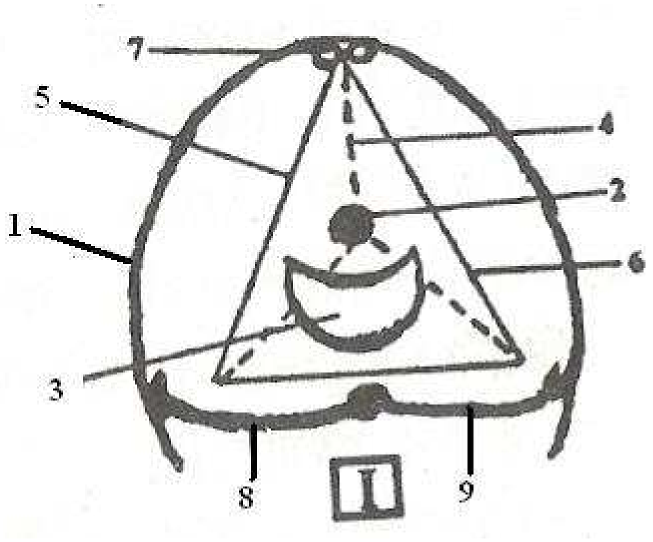

গুরুপাদুকা চিত্র I

I চিত্র পরিচয়

১। সহস্রারের ঘেরা। এই সহস্রারের গর্ভে গুরুপাদুকা অবস্থিত।

২। গুরুপাদুকা মধ্যস্থিত 'বিন্দু'।

৩। গুরুপাদুকা মধ্যস্থিত 'নাদ'।

৪। ল বিন্দু হইতে উত্থিত শিখা।

৫। হ বিন্দু হইতে উত্থিত শিখা।

৬। ক্ষ বিন্দু হইতে উত্থিত শিখা।

৭। শিখাত্রয়ের উপরিস্থিত দ্বন্দ্বমিন্দু। ইহাই মস্তিষ্ক চিত্রে দুইটি শিবকেন্দ্র (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪নং)।

৮, ৯। গুরুপাদুকা কমলের নিম্ন প্রান্ত যেভাবে সহস্রারের সঙ্গে লাগিয়াছে, উহার তুলনা।

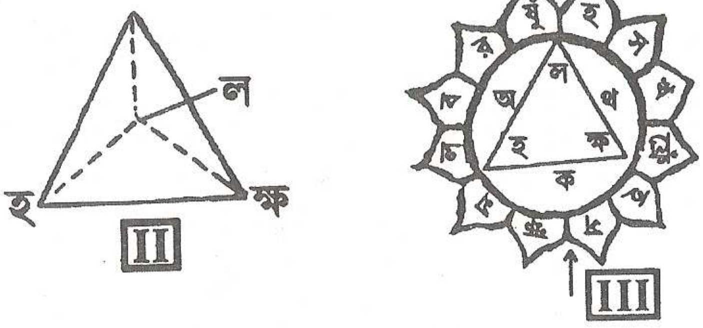

গুরুপাদুকা চিত্র - II এবং III

II চিত্রের পরিচয়

ইহাতে হ ল ক্ষ হইতে শিখা উত্থিত হইয়া যেরূপ ত্রিকোণ হয়, উহা দেখানো হইয়াছে।

III চিত্র পরিচয়

তীর চিহ্ন দ্বারা গুরুপাদুকার সামনা ও পেছন দেখানো হইয়াছে। দক্ষিণ শিবপিণ্ডে হ স খ স্ফ্রেঁ হ স এবং বাম শিবপিণ্ডে ক্ষ ম ল ব র যুঁ ধ্যান করিতে হয়। এই কমলটি সহস্রারের সঙ্গে সংলগ্ন আছে। দেখো I চিত্রে ৮, ৯, III চিত্রের মধ্যস্থিত অ ক থ রেখা দ্বারা ত্রিকোণে হ ল ক্ষ তিনটি কোণ।

মস্তিষ্কস্থিত সব চেয়ে মূল্যবান নাড়ী কয়টি সম্বন্ধে আলোচনা হইল এবং এই কয়টি নাড়ী গুরুপাদুকা সাধনার বিষয় বলিয়া চিত্র দ্বারা এ সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

মূলাধার ও কুণ্ডলিনী এবং সহস্রার ও গুরুপাদুকা, উচ্চ স্তরের সাধনার এই দুইটি অতীব বিস্ময়কর দুইটি কেন্দ্র। ব্রহ্মনাড়ী ও শিবপিণ্ড ধ্যানে প্রথম সাধনায় প্রবেশ

করিতে হয়। ষট্‌চক্রের প্রত্যেকটি চক্রই বিস্ময়কর কেন্দ্র। যাঁহারা কয়েক বৎসর ডাক্তারী পড়িয়া এনাটমী ফিজিয়োলজী মুখস্থ করিয়া ভাবেন, আমরা মস্ত বড় বিদ্বান হইয়াছি, তাঁহারা একবার নাড়ীতত্ত্বে প্রবেশ করুন; দেখিতে পাইবেন, মানবের মানবত্ব কত গভীরতম প্রদেশে বিদ্যমান।

সুখবহা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৫নং। জ্ঞান প্রান্ত ''বিমলযশা'' ও জ্ঞানপ্রান্ত ''ধ্যানশ্রীয়া'' যে নাড়ীটি দ্বারা সংযোগ লাভ করিয়াছে, উহার নাম ''সুখবহা''।

সুখধা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৫নং। ''বিমলযশার'' কর্ম্মপ্রান্ত ও ধ্যানশ্রীয়ার কর্ম্মপ্রান্ত যে নাড়ীদ্বারা সংযোগ লাভ করিয়াছে, উহার নাম ''সুখধা''।

বিষ্ণুস্তর সুখবোধের কেন্দ্র। এখানে স্মৃতির সূক্ষ্ম অংশ অবস্থান করে। আমাদের জন্মজন্মান্তরে ঘটিত সব ঘটনা এখানে সূক্ষ্ম আকারে জমা থাকে। সময় সময় সেই সব ঘটনা সমূহের কোন অংশ সূর্য্যস্তরে চলিয়া আসে এবং সেই সম্বন্ধে সমস্ত লীলা অংশ প্রস্ফুটিত হয়। এই সব রহস্য যাঁহারা ভেদ করিতে পারেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনেক ঘটনা জানিতে পারেন। অনেক সময় স্বপ্নেও অনেক পূর্ব্বজন্মের ঘটনা জানা যায়। অনেক সময় ভবিষ্যৎ ভবিতব্য ঘটনাও স্বপ্নে বা অন্যান্য অনেক কারণে জানা যায়। ''সুখবহা'' বিষ্ণু স্তরের অনুভূতির সুখ সূর্য্যস্তরে প্রবাহিত করে। ''সুখধা'' বিষ্ণুস্তরের কর্ম্মসুখ (বাহ্য সুখের সূক্ষ্ম অংশ) সূর্য্যস্তরে প্রবাহিত করে। সূর্য্যস্তরের সাধকগণকে যতদিন এই দুইটি নাড়ী প্রভাবিত করিবে না, ততদিন সূর্য্যস্তরের সাধুরা ভক্তে, নৃত্যে, ক্রন্দনে ও গানে মত্ততার মোহ কম করিতে পারিবেন না। জটিলতা কম করিবার জন্য আমরা কম কথায় বক্তব্য বলিব। প্রত্যেক কেন্দ্রেই বহু নাড়ী আসিয়া মিলিয়াছে। কাজেই একটা স্তরের অনুভূতির অনেক প্রকার ভেদ হয়। এসব কারণে অনেক বিষ্ণুমূর্ত্তি, অনেক প্রকার গণেশমূর্ত্তি, অনেক প্রকার সূর্য্যমূর্ত্তি, অনেক শিব ও অনেক শক্তিমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে।

যোগশিরা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৯নং। জ্ঞান প্রধান শিবকেন্দ্র (৪নং) অর্থাৎ অমৃতার জ্ঞানপ্রান্ত হইতে বিষ্ণুর জ্ঞানপ্রান্ত (৩নং) অর্থাৎ ধ্যানশ্রীয়া ও অমৃতার জ্ঞানপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ীর নাম ''যোগশিরা''। এই নাড়ী পথে শিবস্তরের শান্তি ও অমৃতধারা শিব হইতে বিষ্ণুকেন্দ্রে প্রবাহিত হইতেছে।

শান্তিশিরা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৯নং। শিবের কর্ম্মপ্রান্ত হইতে অর্থাৎ অমৃতার কর্ম্মপ্রান্ত হইতে বিষ্ণুর কর্ম্মপ্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত নাড়ীর নাম শান্তিশিরা। যোগশিরা ও শান্তিশিরা শিবের অনুভূতির অঙ্গ। এই নাড়ী দুইটিই ধ্যানযোগী সাধককে শান্তির সন্ধান ও আকর্ষণ দান করে। ইহাই ধ্যানযোগীকে প্রকৃত যোগী প্রস্তুত করে। এখানে স্পষ্ট বলা প্রয়োজন যে এই সব নাড়ীগুলির গতি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে। কাজেই বিষ্ণুস্তরের কোন উপাদানই শিবস্তরে প্রবেশ করে না। এইরূপে সূর্য্যকেন্দ্রের উপাদানও শিবে বা বিষ্ণুকেন্দ্রে যায় না। উপর হইতে ধারা নিম্নের দিকে লইয়া আসাই এই সব নাড়ীর স্বভাব। কিন্তু নিম্ন হইতে কোন ধারাই ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া যাওয়া এসব নাড়ীর কাজ নহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ঊর্দ্ধ মুখে যেসব নাড়ী বোধ-ধারা লইয়া যায় তাহারা কাহারা? প্রাণকেন্দ্র হইতে শরীরের অণুপরমাণুতে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কেন্দ্রে এবং প্রত্যেকটি ঊর্দ্ধ ও

অধঃ স্তরকেন্দ্রে নাড়ী গমন করিয়াছে। সেই সব নাড়ী অধঃস্তর হইতে ঊর্দ্ধস্তরে বোধধারা বহন করে। সেই বোধধারায় বাহ্য বিষয়ের সুখ দুঃখ ও মাত্রা বাহিত হইয়া সোজা জ্ঞানময় কোষে যায়। এবং সেইখান হইতে সেই সব ধারা নিম্নমুখে বিজ্ঞানময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও মনোময় কোষের সব কেন্দ্রে গমন করে। ঊর্দ্ধমুখে বোধধারা যাইবার নিয়ম ও অধঃমুখে বোধ ধারা নামিয়া আসিবার নিয়ম এক নহে। এসব স্তরের কার্য্য অত্যন্ত বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম। এসব লইয়া আলোচনা করিবার মত মানুষও অত্যন্ত কম। কাজেই এসব লইয়া আমরা সময় নষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি না। জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষ সম্বন্ধে বিস্তারিত ক্রমবিকাশের ৫ম্ ও ৭ম্ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

নিরুদ্ধা[১]*। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৪নং। যে নাড়ীটি নির্ব্বাণা ও অমৃতার জ্ঞান প্রান্ত (বাম মস্তিষ্ক) সংযোগ সাধন করে, উহা নিরুদ্ধা[১]। এখানে শান্ত যোগীর শান্তিবোধও নিরুদ্ধ হয়।

পশ্যন্তী। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৪নং। নির্ব্বাণা ও অমৃতার কর্ম্মপ্রান্ত (ডান মস্তিষ্ক) সংযোগকারী নাড়ী ‘‘পশ্যন্তী’’। নিরুদ্ধা[১] ও পশ্যন্তী মহত্তত্ত্ব কেন্দ্রের (৫নং) নাড়ী। মহৎ পূর্ণবোধের ও পূর্ণ জ্ঞানের কেন্দ্র। পূর্ণ জ্ঞানের বোধধারা এই সব নাড়ীদ্বারা শান্তিকেন্দ্রে (৪নং) নামিয়া আসে; কিন্তু ‘‘শান্তির বোধ’’ মহৎ কেন্দ্রে যায় না। পশ্যন্তী সম্বন্ধে বিস্তারিত ‘‘বৈখরীতে’’ দেখুন।

‘‘অমৃতা’’ ও ‘‘বিমলযশার’’ জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ী সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

বরুণা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২০নং। বিমলযশা ও অমৃতার জ্ঞানপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ী বরুণা।

জলদা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২০নং। বিমলযশার ও অমৃতার কর্ম্মপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ী জলদা। জলদা ও বরুণা শিবস্তরের শান্তি ও অমৃত ধারাকে সূর্য্যস্তরে বহন করিয়া আনে। সূর্য্যস্তরের প্রেমময় অনুভূতিতে শান্তিধারাও প্রচুর পাওয়া যায়, তাহা হইলেও এসব অনুভূতি শিবস্তরের মত গম্ভীর নহে। শান্তিহীন ও সুখের স্পর্শহীন প্রেমের ধারা ধরিয়া থাকিলে সাধকের বেশীক্ষণ তৃপ্তি থাকে না। শান্তি সুখের স্পর্শ সূর্য্যস্তরে সব সময় পাওয়া যায় না। এজন্য সূর্য্যস্তরের সাধকেরা ভক্তসহ কীর্ত্তন ও সঙ্গরস পাইবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র না গড়িয়া থাকিতে পারেন না।

সূর্য্যস্তরের সঙ্গে মহৎকেন্দ্র নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত আছে। অর্থাৎ বিমলযশার দুই প্রান্ত ও নির্ব্বাণার দুই প্রান্ত নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত। সূর্য্যকেন্দ্র হইতে আমাদের ভাব ও ভাষা প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিমলযশা ও নির্ব্বাণা সংযোগকারী নাড়ী দুইটি আমাদের ভাষা ও ভাব প্রকাশে ধ্বনি দান করে। আমরা যাহা বলি উহা ধ্বনিময় এবং যাহা ভাবি উহাও ধ্বনিময়। ভাবের যে ধ্বনিময়রূপ, উহারই নাম ‘‘মধ্যমা ধ্বনি’’। নির্ব্বাণা ধ্বনি জগতের নাড়ী। এই নাড়ীতে বীজরূপে অ আ ই ঈ ইত্যাদি আছে। সূর্য্যস্তরে আসিয়া এই ধ্বনিগুলিই মধ্যমারূপ ধারণ করে। ইহার পর কণ্ঠে প্রকাশিত হইলে, উহার নাম হয়

* প্রকাশকের নিবেদন - গ্রন্থকার দুইটি নাড়ীকে নিরুদ্ধা নামকরণ করিয়াছেন। আমরা পাঠকের সুবিধার জন্য নিরুদ্ধা[১] এবং নিরুদ্ধা[২] নামে তাহাদের যথাক্রমে অভিহিত করিলাম।

‘‘বৈখরী’’। স্বরজ্ঞান, সঙ্গীত, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, সূর্য্যস্তর হইতে আসিয়া থাকে। নির্ব্বাণা হইতে যে নাড়ী দুইটি বিমলযশার সঙ্গে সংযোগ করিয়াছে, তাহারা ভাবগঠনে এবং ভাব ও ভাষা প্রকাশে ধ্বনি দান করে। যে কোন জ্ঞান ও যে কোন উন্নত বোধ, উহা লৌকিকই হউক বা অলৌকিক হউক, সূর্য্যস্তরেই সেই সব কল্পিত আকারে মণ্ডিত হয়। এই সব কল্পিত ব্যাপারগুলি ধ্বনিময়। আমরা কথা বলিবার পূর্ব্বে কথনীয় বিষয়ের ভাবময় ছবি প্রস্তুত করিয়া লই। ইহা সূর্য্যস্তরে প্রস্তুত হয়।

ধ্বনির চারটা স্তর আছে। (১) বৈখরী, (২) মধ্যমা, (৩) পশ্যন্তী, (৪) পরা। ধ্বনি যখন পরারূপে থাকে, তখন ধ্বনিগুলি শক্তিরূপা থাকে। বোধের স্তরে ধ্বনিগুলি পশ্যন্তী নামে খ্যাত। ধ্বনিগুলি যখন স্বখবোধ ও ভাববোধের (বিষ্ণু, সূর্য্য) স্তরে থাকে, তখন উহারা মধ্যমা হয়। যখন ধ্বনিগুলি আমাদের ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন উহার নাম হয় ‘‘বৈখরী’’। সৃষ্টি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনার ইচ্ছা আছে। (৫ম্, ৭ম্ অধ্যায়ও দেখুন)। নির্ব্বাণাকে কেন্দ্র করিয়া ‘পশ্যন্তী ধ্বনি’ সমস্ত বিজ্ঞানজগতে ব্যাপ্ত। ইহাই ৫ম অধ্যায়ে প্রকাশিত বিজ্ঞানময় কোষ। পশ্যন্তীর দুইটি স্তর। ইহার একটা জ্ঞানময় ধ্বনি, ইহা নির্ব্বাণার জগৎ। অন্যটা বিজ্ঞানময় ধ্বনি, উহা অমৃতা জগতে ব্যাপ্ত। এইরূপে মধ্যমারও দুইটা স্তর, একটা স্তর ধ্যানশ্রীয়া জগতে ব্যাপ্ত, অন্যটা বিমলযশার স্তরে ব্যাপ্ত। ধ্যানশ্রীয়া ও বিমলযশা ‘‘দৈব জগৎ’’। সূর্য্যস্তর বা বিমলযশার স্তরকে কেন্দ্র করিয়া ধ্বনি লেখা, কথা ও ভাষার আকারে বৈখরীতে প্রকাশিত হয়। একজন বলিলে অন্যে শুনিতে পায়, ইহাই ধ্বনির বৈখরী। যখন আমরা ভাবি কিন্তু বলি না, ইহাই ধ্বনির মধ্যমা স্তর। ভাবিবার সময় ধ্বনিগুলি নির্ব্বাণার স্তর হইতে বিমলযশার স্তরে নামিয়া আসে। সূর্য্যস্তর যখনই ইচ্ছা করে তখনই ধ্বনি নির্ব্বাণার স্তর হইতে আকর্ষণ করিতে পারে। সূর্য্য আবার যে কোন ধ্বনির সমষ্টিকে যথাযথরূপে স্মৃতিতে জমা রাখিতে পারে। এজন্য অনেক পঠিত ও শ্রুত বিষয় না বুঝিলেও আমরা উহাকে চিত্তে জমাইয়া রাখিতে পারি। এবং উহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি।

নাদকলা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৫নং। যে নাড়ীটি নির্ব্বাণার জ্ঞান প্রান্ত হইতে বিমলযশার জ্ঞানপ্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত উহাই ‘নাদকলা’। ইহা সূর্য্যস্তরের সাধককে নাদজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান দেয়, যাহার ফলে নাদবিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, শাস্ত্রপ্রকাশরূপে বৈখরীর কর্ম্মে সে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

বৈখরী। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৫নং। ইহা নির্ব্বাণার কর্ম্মপ্রান্ত হইতে বিমলযশার কর্ম্মপ্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। ‘নাদকলা’ জ্ঞান প্রধান, কিন্তু বৈখরী কর্ম্মপ্রধান। কিছুটা জ্ঞান না থাকিলে উচ্চ বিদ্যা প্রকাশের ক্ষমতা হয় না। নাদকলা ও বৈখরীর ইহাই প্রধান ভেদ। এসব স্তরের কথার বৈজ্ঞানিক ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ছোট গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

নির্ব্বাণার সঙ্গে ধ্যানশ্রীয়ার সংযোগ আছে। একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। বিষ্ণুস্তরের সাধকরা যখন ‘‘নাদকলা ও বৈখরী’’ নাড়ীর দিকে আসেন, তখন গাওয়া অপেক্ষা ইঁহারা শুনিতে বেশী ভালবাসেন। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, ধ্বনিপ্রেমীদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রবণ ভালবাসেন, কেহ কেহ গাইতে ভালবাসেন। যতই

নাড়ী ও নাড়ীজগতের আলোচনা করা যায়, ততই বুঝা যায়, মানুষের অলৌকিক শক্তি কেবল যোগতপস্যার মধ্যেই বিকশিত নহে, ইহার বিকাশ নানা বিদ্যায় ও নানা পথে ব্যাপ্ত আছে। তবে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা ভিন্ন কোন বিদ্যা এবং কোন শক্তিই আত্মতৃপ্তির কারণ হয় না, অথবা ইহাদের অভাবে কোন বিদ্যাই পূর্ণ সফলতা দিতে পারে না। যে সব ধ্বনিপ্রেমীদের স্বরযন্ত্র অত্যন্ত মিষ্ট সতেজ ও স্পষ্ট তাহাদের অন্তরে ধ্যানশ্রীয়া ও নির্ব্বাণা-সংযুক্ত নাড়ীগুলির প্রভাব বেশী। ধ্বনিযোগীরাও পূর্ণজ্ঞানের পথিক। পূর্ব্বযুগে মহর্ষিগণ এই বিদ্যার গুরু হইতেন। বাল্মীকি ও নারদের মত মহর্ষিগণ এক যুগে যে মহাবিদ্যার গুরু ছিলেন, সেই মহাবিদ্যার গুরু এখন রামা শামায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমরা নাদ সাধকগণকে নাড়ীতত্ত্ব আলোচনা করিতে বলি। এবং গুরুপাদুকা ধ্যান সহ নাদবিদ্যা আলোচনা করিতে বলি। এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা করিতে বলি। সাধকের প্রতি বিশেষ অনুরোধ সত্য সত্যই কিছু না বুঝিয়া, কাউকেই মিথ্যা কথা বলিয়া বিভ্রান্ত করিবেন না।

আজকাল বাংলায় মাথামুণ্ডহীন সঙ্গীতের খুব চর্চ্চা হইতেছে। এ বিষয়ে সমস্ত ভারতের তুলনায় বাংলার পতন একটু বেশী হইয়াছে। এসবের আয়ু আর বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বের ইহাই নিয়ম যে উচ্চস্তরের বিকাশ কম লোকে থাকে। হালকা বিদ্যা ও হালকা আন্দোলনের প্রভাব জনতায় বেশী হয়, কারণ জনতায় সব সময়ই নিম্ন স্তরের বিকাশের সংখ্যা বেশী। কিন্তু ভিত্তিহীন বিদ্যার আয়ু বেশী দিন হয় না। কত উঠিল, কত ডুবিল; জীবন্ত রহিল কেবল সেইটুকু, যেটুকুর প্রবর্ত্তক মহর্ষি, মহাযোগী ও মহাজ্ঞানীগণ। এই ভারতে ও এই বিশ্বে, বিগত কয়েকশত বৎসরের মধ্যে কতধর্ম্ম, কত সমাজবাদ, কত রকমের ভ্রষ্টবাদ দেখা দিল; কিন্তু কেহই স্থায়ী হইল না। জগতের দুঃখ ও অজ্ঞানতার তাণ্ডব নৃত্যের আড়ালে থাকিয়া যাহারা মানবের অধ্যাত্ম বিদ্যার কঙ্কালটুকু রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক।

মহর্ষিগণ নৈমিত্তিক উপাসনা ও পূজায় বাদ্যবিদ্যার প্রবর্ত্তন করিয়া এই উচ্চ বিদ্যার কঙ্কাল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমাজে দিনের পর দিন যে ভাবে হালকা ধর্ম্ম ও হালকা রাজনীতির চাপ চলিয়াছে, তাহাতে বলা যায় না, মানব সমাজ আর কতকাল এই উচ্চ বিদ্যার কঙ্কাল রক্ষা করিতে পারিবে। আমরা সমাজে শক্তিবাদ ও শক্তিশালী সমাজবাদ স্থাপনার চেষ্টা করিতেছি এবং সেইদিকে প্রত্যেক নরনারীর আকর্ষণ কামনা করিতেছি। ধ্বনিকে অঙ্গরূপে স্থান দিয়া ঋষিগণ আর্য্যধর্ম্মকে উচ্চ গৌরবের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যমা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২২নং। নির্ব্বাণা ও ধ্যানশ্রীয়াকে যে নাড়ীটি জ্ঞানপ্রান্তে সংযোগ করিয়াছে উহার নাম মধ্যমা। মধ্যমা বিষ্ণুস্তরের সুখকে বেশী সৌন্দর্য্যময় করে, মধুর করে এবং গম্ভীর করে।

মধুরা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২২নং। নির্ব্বাণা ও ধ্যানশ্রীয়ার কর্ম্মপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ীর নাম মধুরা। মধুরা বিষ্ণুস্তরকে জ্ঞানমন্ত করে এবং বিষ্ণুস্তরের সুখকে বৃদ্ধি করে। বিষ্ণুস্তরটা নিজে জ্ঞান চায় না, এই জন্যই ইহা আসুরিকতারও কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

বিমলযশা, ধ্যানশ্রীয়া, অমৃতা ও নির্ব্বাণার জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ীগুলির কথা সংক্ষেপে বলা হইল। এবার আমরা গণেশ ও মনের কেন্দ্রের সঙ্গে এই সব নাড়ীগুলির প্রান্তভাগ যে সব নাড়ীদ্বারা সংযোগলাভ করিয়াছে, সেইগুলি সম্বন্ধে বলিব।

গণেশকেন্দ্র ও মনের কেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, সেইগুলির স্বভাব ও গতি ঊর্দ্ধমুখী। গণেশকেন্দ্রের নাড়ীগুলির স্পন্দন সব সময়ই রুক্ষ। এবং মনের কেন্দ্রের নাড়ীগুলির গতি গরম। গণেশ বায়ু প্রধান এবং মন অগ্নিপ্রধান কেন্দ্র। যাহাতে এই রুক্ষবায়ু ও অগ্নি উত্তেজিত হয়, এমন চিন্তা ভাবনা করিলে ব্লাড্‌প্রেসার রোগ দেখা দিবে। গণেশ রুক্ষকেন্দ্র হইলেও ইহা বিকাশের সহায়ক। গণেশ কেন্দ্রই বুদ্ধিকেন্দ্র, ইহা আজ্ঞাচক্রের সম্মুখ দিক (মস্তিষ্ক চিত্র ৭নং)। মনের কেন্দ্রই ব্রহ্মা। এইকেন্দ্র আজ্ঞাচক্রের পেছন দিক (মস্তিষ্ক চিত্র ১নং)।

কল্পনা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১২নং। মনের কেন্দ্র (১নং) হইতে জ্ঞান প্রধান সূর্য্যকেন্দ্র (মস্তিষ্ক চিত্র ২নং) পর্য্যন্ত যে নাড়ী গমন করিয়াছে, সেই নাড়ীর নাম কল্পনা। মনের কেন্দ্র অগ্নির স্থান। এ স্থান হইতে যে কোন নাড়ী যে কোন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, উহাদের প্রায় প্রত্যেকটির কাজই হইল অগ্নিকে বহন করিয়া সেই কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া এবং ঐ কেন্দ্রের আরাম ও সুখ ভঙ্গ করা এবং কেন্দ্রকে কর্ম্মে জড়াইয়া দেওয়া। সূর্য্যস্তরে স্মৃতির লীলাভাগ জমা থাকে। কল্পনার সংযোগে সেই লীলাগুলি জাগ্রত হয় এবং উহারা আপন মনে যেন রেকর্ডের মত বাজিতে থাকে। এই জন্যই কোন কারণ নাই কোন প্রয়োজন নাই, তবুও কল্পনা হইয়াই চলিয়াছে।

কল্পধারা[*]। মস্তিষ্ক চিত্র ১২নং। মনের কেন্দ্র হইতে জ্ঞান প্রধান সূর্য্যকেন্দ্রকে যে নাড়ী সংযোগ করিয়াছে, উহার নাম কল্পধারা। ভক্ত সাধকদের মধ্যে ভাব, মহাভাব ও ভাব সমাধির কথা প্রচলিত আছে। ভাবসমাধি সূর্যস্তরের জ্ঞানপ্রধান সমাধিকে বলে। এ সমাধি সাধারণতঃ বেশী গভীর হয় না। কারণ ইহা বেশী গম্ভীর স্তর নহে। কল্পধারা অতি সহজেই মানুষের ভাবের নেশা ভাঙ্গিয়ে দেয়। কল্পনা ও কল্পধারার কাজ অনেকটা একরূপ। এই দুইটি নাড়ী দ্বারা বিক্ষিপ্ত সূর্য্য কেন্দ্রই 'মন'। অগ্নি দেবতার প্রধান ঔষধ 'জল'। কাজেই যোগীরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন, শিবস্তরের শান্তিবোধের দিকে। চঞ্চল মনের একমাত্র ঔষধ শিব হইতে নিঃসৃত অমৃতধারা বা শিবগঙ্গা।

শ্রীভঙ্গা। মস্তিষ্ক চিত্র ১৬নং। মন ও জ্ঞানপ্রধান বিষ্ণু কেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ীর নাম "শ্রীভঙ্গা"। ইহা বিষ্ণুস্তরের জমাট সুখকে নাশ করিয়া দেয়। ইহার প্রভাবে ধ্যানযোগী সাধকের ধ্যানসুখ ভঙ্গ হয়। ইহা উন্নত স্তরের ধ্যানযোগীকে কর্ম্মে নামিতে বাধ্য করে। যাঁহারা বুদ্ধিমান সাধক তাঁহারা নিশ্চয়ই কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ একসঙ্গে চালাইবেন। নয় তো পরবর্ত্তীকালে, এই শ্রীভঙ্গা সাধককে বলপূর্ব্বক এমন কর্ম্মে নামাইয়া দিবে যে, উহা হইতে ছুটি লওয়া কঠিন হইবে। বিষ্ণুস্তরে জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মসংস্কার সঞ্চিত থাকে। কোন্ কর্ম্মফল কখন জাগ্রত হইবে কেহই জানেন না। কাজেই শ্রীভঙ্গার সঙ্গে বেশী চালাকি না করিয়া কর্ম্ম ও যোগ দুইই ধরিয়া রাখা শ্রেয়ঃ। বিষ্ণুকেন্দ্র হইতে মনের কেন্দ্রশক্তি অত্যন্ত বেশী শক্তিশালী। মস্তিষ্ক মধ্যে এই কেন্দ্র সবগুলি কেন্দ্র হইতে

---

[*] প্রকাশকের নিবেদন - এই নাড়ীটীর নাম পাঠভেদে "কল্পনাধারা"।

শক্তিশালী। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মন, কিন্তু ইহা মন নহে, ইহাই পরম পুরুষ ও পুরুষোত্তম। কর্ম্মশক্তিকে কেহই দমন করিতে পারে না, কারণ কর্ম্মই স্বয়ং ঈশ্বর; ইহাই অনাদি রজঃ; জীব জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সাধকের জানা প্রয়োজন, জ্ঞানের পরও কর্ম্ম থাকে।

শ্রীধরা। মস্তিষ্ক চিত্র ১৬নং। কর্ম্মপ্রধান বিষ্ণুকেন্দ্র ও মনের কেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ী শ্রীধরা। বিষ্ণুস্তরের যোগীরা যখন কর্ম্মী বা ভোগী হন, তখন তাঁহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য হইতে দেখা যায়। যোগভ্রষ্ট জ্ঞানীরাই রাজকুলে ও ধনীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীভঙ্গা ও শ্রীধরা বিষ্ণুস্তরের "অন্তঃসুখঃ, অন্তঃরামঃ ও অন্তর্জ্যোতিঃ"কে খর্ব্ব করিয়া সাধককে বহির্ম্মুখী করে। এবং ঐশ্বর্য্য ও ভোগের স্পৃহা জাগাইয়া দিতে থাকে।

তাপিনী। মস্তিষ্ক চিত্রে ২১নং। মন ও জ্ঞানপ্রধান শিব কেন্দ্র (৪নং) সংযোগকারী নাড়ীর নাম তাপিনী। শিবকেন্দ্রে 'অহং' অবস্থান করে। এই নাড়ীদ্বারা শিবস্তর উত্তপ্ত হয়। ফলে শিবস্তরের জমাট শান্তি উত্তপ্ত হইয়া গলিয়া যায়। সেই রসধারা বিষ্ণু ও সূর্য্যকেন্দ্রে চলিয়া আসে। ইহারই ফলে মনোময় কোষ কার্য্য করিতে শক্তি লাভ করে। মনের কাজই হইতেছে সব স্তরকে উত্তপ্ত করিয়া ঐ রস নিজের কাজে নিযুক্ত করা। শিবকেন্দ্র এই তাপদ্বারা উত্তপ্ত হয় এবং শ্রান্ত হয়। এই শ্রান্তির ফলে অহংএ অবসাদ আসে, ইহাই নিদ্রা নামে খ্যাত। নিদ্রা কালে অহং শান্তিরস পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে এবং সে আবার নবীন ও সতেজ হয়। অহং নিদ্রিত হইলে মন, বুদ্ধি, চিত্তও নিদ্রিত হয়। এবং ইন্দ্রিয়গণও নিদ্রিত হয়। অহং, চিত্ত, বুদ্ধি ও মন নিদ্রিত হইলেও বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য ও শক্তি কেন্দ্র নিদ্রিত হয় না। একই শরীর একই অধ্যাত্মজগৎ; কিন্তু দুই রকমের কার্য্য। এই সামান্য শরীর যন্ত্রের মধ্যে জীবের অহং কত ছোট স্থানে আছে এবং ইহার শক্তি কত কম, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য মনে হয়। নিদ্রাকালে শরীর যন্ত্রে যে কাজকর্ম্ম চলে, উহা আত্মার অধীন। সাধনায় ও তপস্যায় এই আত্মাকেই জানিবার চেষ্টা করা হয়। মানুষ ভোগ, মোহ ও অহং অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সবই জানিতে পারেন। সেই সব জ্ঞানীরাই মানবকে জ্ঞান দান করেন এবং সমাজে পূজ্য হন।

জ্বালিনী। মস্তিষ্ক চিত্রে ২১নং। কর্ম্মপ্রান্ত শিবকেন্দ্র এবং মনকেন্দ্র যে নাড়ীদ্বারা সংযোগ লাভ করিয়াছে, উহার নাম "জ্বালিনী"। অহং যতক্ষণ সক্রিয়, ততক্ষণ অগ্নি (মনের) কেন্দ্রের তাপ শিবস্তরের জমাট শান্তিকে বিগলিত করে। অহং নিদ্রার আবেশে ও তামসিকতায় নিষ্ক্রিয় হয়; অথবা সমাধিকালে শান্তি বোধের আতিশয্যে 'অহং' নিষ্ক্রিয় হয়। যাহার অহং যত নিষ্ক্রিয় তাহার শিবধারার ব্যয় তত কম। নিষ্ক্রিয় 'অহং' এর ক্ষেত্রে তাপিনী ও জ্বালিনীর আর তাপ থাকে না।

মনের কেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বলা হইল। মনের কেন্দ্র হইতে অব্যক্ত কেন্দ্রেও নাড়ী গিয়াছে। উহার কার্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। এবার বুদ্ধিকেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে সেইগুলি সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

বিশুষ্কা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৭নং। গণেশ ও মনের কেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ী 'বিশুষ্কা'। ইহা অত্যন্ত রুক্ষবোধ নাড়ী। ইহার সঙ্গে মরুভূমির ভয়ঙ্কর শুষ্কতারও তুলনা হয় না।

গণেশ শুষ্কবোধ কেন্দ্র, মন অগ্নি কেন্দ্র। সংসারে সুখ নাই, ইহা বিশুষ্কা স্পন্দিতা হইলে যে কোন সময়ই বুঝা যায়। কখন কাহার মনে বৈরাগ্য আসিবে তাও বলা যায় না। এই 'বিশুষ্কার' বিচিত্র প্রভাব। মনের কেন্দ্রে এমনই শান্তি নাই, ইহার উপর গণেশের সঙ্গে ইহার সংযোগ হইলে এই নীরসবোধ অত্যন্ত তীব্র হয়। ভালবাসার আঘাতে ইহার বোধ অত্যন্ত তীব্র হয়।

ইহা অত্যন্তই ভাগ্যের কথা যে মনের সঙ্গে সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবস্তরের সংযোগ আছে। তাই মানুষের অত্যুগ্র অতৃপ্তি সব সময় স্পষ্ট হয় না। এদিক ওদিকে করিয়া যে ভাবেই হউক অতৃপ্তির দহন জ্বালা হৃদয়ে বহন করিয়াও জীবনটা কাটিয়া যায়। কিন্তু কোন না কোন জন্মে বিশুষ্কা মানুষকে সর্ব্বত্যাগী করিয়া নিজের প্রভাবটা দেখাইয়াই ছাড়িবে। দেখা যায় স্বামী, স্ত্রী, মা পুত্র, বাপ কন্যা প্রভৃতির ব্যবহারপারম্পর্য্যে যখনই সূর্য্য (মোহ) ও বিষ্ণু (সংসার সুখ) আঘাত পায়, তখনই মানুষের মনে প্রবল বৈরাগ্য দেখা দেয়।

মনের কেন্দ্র হইতে অগ্নিধারা গণেশের দিকে যায় না। অগ্নিদেবতার কর্ম্মস্থল সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরেই বেশী। অহং নিষ্ক্রিয় হইলে অগ্নিদেবতা শিবের স্তরেও প্রবেশ করিতে পারে না। অহংটিও থাকিবে এবং সেটি আরামেও থাকিবে; ইহা অগ্নিদেবতা কিছুতেই সহ্য করিতে রাজী নহেন। তিনি কেবল অহংকে উত্তপ্তই করেন না, তিনি অহংকে বহির্ম্মুখীও করিয়া দেন। অহং কেন্দ্র (রুদ্রগ্রন্থি) ভেদকারী সাধককে অগ্নিদেবতা উত্তপ্ত করেন না, কিন্তু প্রারব্ধকর্ম্মভোগ কালে অগ্নি জ্ঞানী সাধককেও উত্তপ্ত করিয়া ছাড়েন। প্রাকৃতিক নিয়মে কোন যোগীই সর্ব্বদা জ্ঞান ও শান্তিজগতে থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে কোন না কোন সময় রাজস্প্রভাবে আসিতেই হইবে। সেই সময় অগ্নিদেবতা তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিবেন না। কাজেই, কর্ম্মজগতের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ করিয়া চলাই যোগীদের জন্য বেশী মঙ্গলকর। কর্ম্ম করিতেই হইবে, ইহা অগ্নিদেবতার একান্ত নির্দ্দেশ। জীবনের ইহা এক রহস্যময় উপাদান। মন বহির্ম্মুখী, গণেশ অন্তরমুখী। এই অন্তরমুখ ও বহির্ম্মুখের সামঞ্জস্য হইলে কর্ম্মে কোনই দোষ আসিতে পারে না।

বিতর্কা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৪নং। গণেশ ও সূর্য্যের জ্ঞানপ্রান্ত সংযুক্ত নাড়ীর নাম বিতর্কা। একটা ঘটনা দেখিয়া বা একটা শাস্ত্র পড়িয়া আমরা সেই ঘটনা ও সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা সঠিক সত্য অবধারণ করিতে পারি। ইহা বিতর্কার কাজ।

বিচারা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৪নং। গণেশ ও সূর্য্যের কর্ম্মপ্রান্ত সংযোগকারী নাড়ীর নাম বিচারা। 'বিতর্কা' আমাদিগকে যে সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দেয়, 'বিচারা' আমাদিগকে উহারই আচরণ করিতে প্রেরণা দেয়।

সূর্যকেন্দ্র বুদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মক্ষেত্র। বুদ্ধির কর্ম্মক্ষেত্র বিষ্ণুস্তরে আছে। কিন্তু সেই সব কর্ম্ম লৌকিক হইতে অলৌকিক কর্ম্মে বেশী সম্বন্ধ রাখে। বুদ্ধি নিজের ঘরে সূর্য্য বা বিষ্ণুর কোন উপাদানই আনয়ন করেন না। বুদ্ধি নিজের গৃহখানাকে একেবারে শূন্য রাখিতে ভালবাসেন। যখনই প্রয়োজন হয় তখনই বুদ্ধি নিজের শক্তি লইয়া সূর্য্য বা বিষ্ণুতে প্রবেশ করেন এবং সেখানের মীমাংসা শেষ করিয়া একেবারে শূন্য অবস্থায় নিজের কেন্দ্রে ফিরিয়া আসেন।

গণেশ ও বিষ্ণুকেন্দ্র সংযুক্ত নাড়ীর কাজ বুঝা একটু কঠিন হইবে। ইহার কারণ নিদ্রা অথবা ধ্যানাবস্থায় না আসিলে এই স্তরে আসা যায় না। গণেশে যেমন স্থৈর্য্য অত্যন্ত বেশী, বিষ্ণুস্তরে গাম্ভীর্য্য তেমনিই প্রবল। গণেশ স্থৈর্য্য, বিষ্ণু গাম্ভীর্য্য।

সম্বেগা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৮নং। গণেশ ও জ্ঞানপ্রধান বিষ্ণুকেন্দ্র সংযুক্ত নাড়ীর নাম সম্বেগা। বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিতে গণেশের স্থৈর্য্য প্রসার লাভ করিলে বিষ্ণুস্তরে শিবের অমৃতধারা আসিয়া উহা শীঘ্র ব্যয় হয় না। ফলে সাধক সুখময় বিষ্ণুস্তরে থাকিয়া শিবস্তরের আলো পাইয়া, একটা নূতন জ্ঞানের সন্ধান পান। সাধক যতই বুঝিতে পারেন ততই শিবের দিকে তাঁহার জীবনলক্ষ্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। সম্বেগা গণেশস্তরের স্থৈর্য্যকে বিষ্ণুস্তরে বহন করিয়া আনিয়া সাধককে সমতার দিকে (শিবের দিকে) লইয়া যায়।

বিবেকা। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৮নং। গণেশ ও কর্ম্মপ্রান্ত বিষ্ণুকেন্দ্র সংযুক্ত নাড়ীর নাম বিবেকা। বিবেক সম্বেগেরই বাহ্যরূপ। যে সব স্থূল ও বৈষয়িক সংস্পর্শে চিত্তের (ইহা বিষ্ণুস্তরে থাকে) বিক্ষেপ হয়, সেই সব হইতে চিত্তকে মুক্ত রাখিয়া সম্বেগ অভ্যাস করিতে হয়। বৈষয়িক সংস্পর্শে অত্যন্ত অনাসক্তির নাম "বিবেক"। ইহাই বিবেকার কার্য্য।

গণেশ ও শিবকেন্দ্র (৪নং কেন্দ্র) সংযুক্ত নাড়ী দুইটির কথা বলা যাইতেছে। শিব শান্তিবোধ কেন্দ্র। যাঁহারা সমস্ত জীবন এই দুইটী কেন্দ্র লইয়া কাটাইতে পারেন, তাঁহারা অতীব ভাগ্যবান। শান্তিবোধ-রূপ শিবকেন্দ্রের সঙ্গে বিজ্ঞানবোধরূপ গণেশকেন্দ্রের যোগ হইলে, বিজ্ঞান-বোধ-ক্ষেত্র পঞ্চ তন্মাত্রা বোধের অনুকূল হয়। গণেশ শিব হইতে শান্তিধারা নিজের কেন্দ্রে লইয়া যান না। কিন্তু গণেশ শিবের শান্তির স্পর্শ পাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন। শান্তিধারা শিবকেন্দ্র হইতে সর্ব্বদা ক্ষরিত হইতেছে। এই শান্তিধারা কিন্তু আসল শান্তি নহে। আসল শান্তি শিব কেন্দ্রস্থিত শান্তি। ক্ষরিত ধারা উহার তুলনায় অত্যন্ত হালকা বস্তু। গণেশ ক্ষরিত শান্তি পছন্দ করেন না। তিনি চাহেন, শিব স্তরের রসক্ষরণ বন্ধ হইয়া যাউক। যে ছিদ্র দ্বারা রসস্রাব হয় সেই ছিদ্রই 'অহং'। গণেশ চায়, রসবাহী ছিদ্র বন্ধ হউক, কিন্তু মন চায় সে ছিদ্র খোলা থাকুক। গণেশ শিবস্তরকে বিজ্ঞানবোধের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে চায়। কাজেই গণেশের চেষ্টা 'অহং' বোধ স্তব্ধ করিয়া দেওয়া। শিবকেন্দ্রে সর্ব্বদাই দুইটী কেন্দ্রের প্রভাব চলিয়াছে। 'তাপিনী' ও 'জ্বালিনী' চায় ছিদ্র খোলা থাকুক, গণেশ চায় উহা রুদ্ধ হউক। গণেশের চেষ্টা সফল হইলে মহৎ কেন্দ্র হইতে জ্ঞানধারা শিবকেন্দ্রে জমিয়া যায়। ফলে 'অহং' এর ভ্রান্তি জ্ঞানের স্পর্শে কাটিয়া যায়। একবার ভ্রান্তি কাটিবার পর, তাপিনী রসস্রাবের ছিদ্র যতই খুলিয়া দিক না কেন, 'অহং' তখন আর অজ্ঞানী 'অহং' থাকে না; তখন 'অহং' দগ্ধ-বীজবৎ হইয়া যায়। তখন 'অহং' কেবলমাত্র প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য থাকিয়া যায়। শরীর থাকিলে, প্রারব্ধ থাকে। প্রারব্ধ থাকিলে, ঐ রসছিদ্রও বার বার খুলিতে থাকিবে। গণেশ ও শিব সংযুক্ত নাড়ীর যাহা রহস্য উহা বলা হইল; এবার নাড়ী দুইটী সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

নিরুদ্ধা[২]। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৫নং। গণেশ ও জ্ঞানপ্রধান শিবকেন্দ্রযুক্ত নাড়ীর নাম 'নিরুদ্ধা[২]'। যোগদর্শনে নিরোধ সমাধির কথা আছে। অহং থাকিলেই চিত্ত কম্পিত হয়।

অহং না থাকিলে চিত্তের কম্পন স্তব্ধ হইয়া যায়। নিরুদ্ধা[১] নাড়ী শিবকেন্দ্রস্থিত শান্তিক্ষরণের ছিদ্রকে বন্ধ করিয়া দেয়, এই নাড়ীর নাম 'নিরুদ্ধা[২]'।

বিজ্ঞানা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৫নং। গণেশ ও কর্ম্মপ্রধান শিবকেন্দ্রযুক্ত নাড়ীর নাম 'বিজ্ঞানা'। শিবস্তরে বিজ্ঞানবোধ হয়। এখানে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ তন্মাত্রার অনুভব হয়। গণেশ শিবকেন্দ্রকে সেই ক্ষেত্রে পরিণত করিতে সাহায্য করে। কিছুক্ষণ শান্তিক্ষরণ নিরোধ থাকিলেই শিবকেন্দ্রটী বিজ্ঞান-বোধের ক্ষেত্র হয়। 'নিরুদ্ধা[২]' বিজ্ঞানবোধের পথ করে। 'বিজ্ঞানা' বিজ্ঞানবোধ করাইয়া দেয়।

গণেশ ও মহৎ (জ্ঞান) কেন্দ্র-সংযুক্ত নাড়ীর কথা বলা যাইতেছে। মহৎই পূর্ণজ্ঞানের কেন্দ্র। এখান হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। গীতার ভাষায় ইহাই মহৎব্রহ্ম (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এখানে কোনও প্রকার কর্ম্মবেগ নাই। পূর্ণবোধই এখানের জ্ঞান, এবং বোধরূপ ক্রিয়াই এখানে কর্ম্ম।

প্রজ্ঞানা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩২নং। গণেশ ও জ্ঞানপ্রধান মহৎ কেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ীর নাম প্রজ্ঞানা।

কৈবল্যা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩২নং। গণেশ ও কর্ম্মপ্রধান মহৎকেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ীই **'**কৈবল্যা**'**। গণেশের কাজ জীবকে বিকাশের দিকে লইয়া যাওয়া এবং সৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া। মহৎকেন্দ্রই সৃষ্টি ব্যক্ত হইবার প্রথম স্তর। মহতের উপাদানে শক্তিস্তরের দুইটি উপাদান বিদ্যমান। ইহারা - ইচ্ছাশক্তি **'**অ**'** এবং জ্ঞান শক্তি **'**ৎ**'**। এই মহৎব্রহ্মে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হন; ফলে **'**জীব-বীজ**'** সৃষ্টি হয়। মহতের মধ্যে **'**অ**'**রূপা ইচ্ছাশক্তি থাকিবার দরুণ বীজসৃষ্টি হয়। পাঠক ৭ম অধ্যায়ে দেখুন। সেখানে দেখিতে পাইবেন, বিজ্ঞানশক্তিই গণেশ। শক্তিস্তরে এই বিজ্ঞান-শক্তিই **'**ই**'**। এই শক্তির সহিত ইচ্ছাশক্তির (অ) চিরবিরোধ। **'**অ**'** সৃষ্টি চায়, **'**ই**'** সৃষ্টি স্তব্ধ করিতে চায়। যতক্ষণ **'**অ**'** প্রবল ততক্ষণ সৃষ্টির বেগ থাকিবেই, যখন **'**ই**'** প্রবল হয় তখন সৃষ্টি স্তব্ধ হয়। গণেশ প্রবল হইলেই সাধকের প্রজ্ঞান ও কৈবল্য; নয় তো সংসারলীলা। পৃথিবীতে কৈবল্য ক'জন লোক লাভ করেন? কৈবল্য লাভ করিয়া ক'জন মহাপুরুষ উহা ধরিয়া থাকিতে পারেন? প্রত্যেকটী স্তরে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবস্থান করিতেছে। গীতার কথা - নির্ম্মাণ মোহাঃ জিত সঙ্গদোষাঃ। অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সঙ্গৈঃ, গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ম্ তৎ॥ যাহা হউক এখান পর্য্যন্ত আসিয়া সাধক প্রারব্ধবেগে বহির্ম্মুখী হইলেও, তাঁহার জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হয় না। প্রারব্ধ অনেক কিছুই করাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সমভাবেই থাকিবে।

ক্রমবিকাশ ও শক্তিবাদের ভিত্তিতে বিকাশ এখানেই শেষ হইয়া যায় না। ইহার পরই অব্যক্ত স্তর অবস্থিত। অব্যক্ত স্তর শক্তিস্তরের অন্তর্গত স্তর। কাজেই অব্যক্তস্তর সংযুক্ত নাড়ীগুলি সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব।

মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক সংযোগাকারী নাড়ী

মেরুদণ্ড ও তন্মধ্যস্থিত সুষুম্নাপথ সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত বহু অস্থিসংযুক্ত এক অস্থিদণ্ড আছে। এই অস্থিদণ্ডের নাম মেরুদণ্ড। এই অস্থিদণ্ডের গর্ভস্থান মস্তিষ্কপদার্থদ্বারা পরিপূর্ণ। এই দণ্ডমধ্যে মস্তিষ্কের কেন্দ্রের মত অনেক কেন্দ্র ও মস্তিষ্কের নাড়ীর মত বহু নাড়ী বিদ্যমান। ভারতের যোগীদের দ্বারা আবিষ্কৃত এই মেরুপথকে খুঁজিবার পথে, বর্ত্তমান সময় বৈজ্ঞানিকগণেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। মেরুপথস্থিত মর্ম্মস্থানগুলি নাড়ীদ্বারা মস্তিষ্কের মর্ম্মস্থানগুলিতে সংযুক্ত আছে এবং মেরু পথস্থিত নাড়ীমর্ম্মগুলি হইতে বহু শাখা প্রশাখা শরীরের সমস্ত স্থানে ও যন্ত্রে ব্যাপ্ত আছে। প্রাচীনকালে নাড়ীতত্ত্ব জানিবার জন্য সাধকগণকে সিদ্ধান্ত-আচার গ্রহণ করিতে হইত (শক্তিশালী সমাজ দ্রষ্টব্য)। আমরা পাঠকগণকে ভাগাড়ে যাইয়া গো মহিষ ও উষ্ট্রাদির মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক দেখিয়া নাড়ী সংস্থান সম্বন্ধে একটু বাস্তব ধারণা অর্জ্জন করিতে বলি। দেখা যাইবে বহু ক্ষুদ্র ছিদ্রময় মেরুদণ্ডটির মধ্যে সংযোগ রাখে এমন বহু শুষ্ক নাড়ী মেরুদণ্ডটীতে জড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা যে সব নাড়ী সম্বন্ধে বলিব, সেগুলি সবই মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। বাহ্যদণ্ডে যে সব নাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইগুলির সঙ্গে মধ্যদণ্ড অবস্থিত নাড়ীর সংযোগ আছে। অস্থিগুলির পেছনদিকে দুইটি অস্থিনির্ম্মিত কাঁটার মধ্যে এই নাড়ীপথ বিদ্যমান। ইহা মূলাধার হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত মজ্জাদ্বারা পরিপূর্ণ স্থান। যাহারা মৎস্য এবং মাংসাহারী, তাহারা সহজেই মেরুপথ বুঝিতে পারিবে। যাহারা নিরামিষভোজী তাহাদের জন্য ভাগাড়স্থিত শুষ্ক কঙ্কাল সহায়ক হইবে।

ব্রহ্মনাড়ী (চিত্রে ১০নং নাড়ী)। **সুষুম্না**। **বজ্রা ও চিত্রিণী**।

মেরুবাহ্য প্রদেশে শশি-মিহির-শিরে সব্যদক্ষে নিষন্নে।
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।
ধুস্তুরস্মের পুষ্প গ্রথিত তমঃ বপুঃ স্কন্দমধ্যা চ্ছিরস্থা
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাজ্জ্বলন্তী॥ ১
তন্মধ্যে চিত্রিণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা
লুতাতন্ত পমেয়া সকল সরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্।
ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনবচনয়া শুদ্ধবুদ্ধি প্রবোধা,
তস্যান্তর্ব্রহ্মনাড়ীহরমুখ কুহরাদাদি দেবান্তরস্থা॥ ২

মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত বাহ্য প্রদেশে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি (যাঁহারা "মেরুবাহ্যপ্রদেশের" অর্থ মেরুদণ্ডের বহির্ভাগ বলেন, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে একমত নহি) এবং মধ্যভাগে এক নাড়ী বিরাজমান রহিয়াছে। উহারাই যথাক্রমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে অভিহিতা। ইড়া চন্দ্রপ্রভা তুল্যা এবং পিঙ্গলা সূর্য্যজ্যোতির মত প্রভাবতী। মধ্যস্থিতা সুষুম্না নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপা, সত্ত্ব রজ স্তমময়ী এবং প্রস্ফুটিত ধুস্তূর

পুষ্প সদৃশী। এই স্ুষুম্না আধার পদ্মের অভ্যন্তর হইতে মস্তকস্থিত সহস্রদলস্থ শিবলিঙ্গ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। এই স্ুষুম্নার মধ্যস্থিত রন্ধ্রযোগে বজ্রানাম্নী নাড়ী মেঢ্রদেশ হইতে শিরপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই নাড়ীটা দীপশিখার মত সমুজ্জ্বলা। ১॥

বজ্রাখ্যা নাড়ীর মধ্যস্থলে চিত্রিণী নামক আর একটী নাড়ী আছে, উহা লুতাতন্তুবৎ সূক্ষ্ম। কুণ্ডলিনীদ্বারা প্রদীপ্ত এই নাড়ী আদি, মধ্য ও অন্তভাগে প্রণবদ্বারা যুক্তা। ইহা যোগীদের ধ্যানগম্যা। ইহা লুতাতন্তুবৎ সূক্ষ্মা এবং মেরুমধ্যস্থ সমস্ত চক্রগুলি ভেদ করিয়া অবস্থিত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত চিত্রিণী নাড়ীকে জানা যায় না। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যস্থলে শুদ্ধবুদ্ধি ও জ্ঞানাখ্য ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। এই নাড়ী মূলাধারস্থিত শিবমুখ হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।

বিদ্যুন্মালা বিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা স্ুসূক্ষ্মা,
শুদ্ধ জ্ঞানপ্রবোধা সকলস্ুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি স্ুধাধার রম্য প্রদেশং
গ্রন্থিস্থানং তদেতং বদনমিতি স্ুষুম্নাখ্যানাভ্যা লপন্তি॥ ৪॥

"ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুল্লতার ন্যায় দেদীপ্যমানা। ইহা মুনিগণের হৃদয়ে সূত্রবৎ প্রকাশমানা। ইনি অতীব সূক্ষ্মা, শুদ্ধজ্ঞানগম্যা, সকল স্ুখময়ী ও শুদ্ধবোধ স্বভাবা। এই ব্রহ্মনাড়ীর মুখ প্রদেশেই ব্রহ্মদ্বার (মূলাধার) শোভিত রহিয়াছে, ইহা স্ুধাধার নিঃসৃত রম্য স্থান ; ইহা মূলাধার গ্রন্থিস্থান। ইহাই স্ুষুম্নার মুখ বলিয়া অভিহিত।"

স্ুষুম্না। ইড়া, পিঙ্গলা ও স্ুষুম্নার কথা সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রে একই রূপে ও একই নামে স্থান পাইয়াছে। যাঁহারা সামান্যও সাধন-ক্রিয়া করেন, তাঁহারাই এই তিনটি নাড়ীর নাম জানেন। ভারতের প্রত্যেক প্রান্তের লোক এই নাড়ী ৩টি সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিতে সক্ষম। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সম্প্রদায়ও এই নাড়ী ৩টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। স্ুফী সম্প্রদায়, আরবীয় বর্ব্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবার পর, হিন্দু সংস্কৃতির এই মূলধারা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কেহ বলেন ইড়া ও পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে এবং স্ুষুম্না মেরুদণ্ডের মধ্য স্থানে বিদ্যমান। আমাদের মতে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্ুষুম্না তিনটি প্রদেশই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। স্ুষুম্না মধ্যবর্ত্তী এবং ইড়া পিঙ্গলা পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ। যতই আলোচনা করিয়াছি, ততই আমাদের নিকট স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে মেরুদণ্ডের তিনটি প্রদেশ আছে, উহার একটি প্রদেশ মধ্যবর্ত্তী; ইহাই স্ুষুম্না। অন্য দুইটি প্রদেশ দুই দিকে, ইহারাই ইড়া ও পিঙ্গলা। যে সব নাড়ী মেরুমধ্যস্থলে থাকিয়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে সম্বন্ধ রাখে, সেইগুলির মধ্যে কতকগুলি নাড়ী আছে যাহারা একটি একটি। এই সব একক নাড়ীগুলি সবই স্ুষুম্না নাড়ী। আবার কতগুলি নাড়ী আছে; যাহারা জাতিতে প্রায় এক রকম, কিন্তু সংখ্যায় দুইটি করিয়া অবস্থিত। এই সব জোড়া নাড়ীগুলি মেরুদণ্ডের একই কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু মস্তিষ্কে আসিয়া শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কস্থিত এক জাতীয় দুই কেন্দ্র গমন করিয়াছে। এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট নাড়ীগুলি সবই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। সম্পূর্ণ বাম মস্তিষ্কটী ইড়া প্রদেশ এবং চন্দ্র-প্রদেশ, এই প্রদেশে জ্ঞানপ্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। সম্পূর্ণ দক্ষিণ মস্তিষ্কটি পিঙ্গলাপ্রদেশ বা সূর্য্য প্রদেশ, কর্ম্মপ্রধান কেন্দ্রগুলি এই প্রদেশে অবস্থিত। মেরুমধ্যপ্রদেশও এইরূপ বিভাগে

বিভক্ত। অনেকের মতে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী ত্রিবেণীর মত কখনও স্বষুম্নার দক্ষিণে কখনও স্বষুম্নার বামভাগ ধরিয়া ত্রিবেণীর মত প্রবাহিত। আমরা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলিতে চাই না। ইহা অতীব সত্য ঘটনা যে মস্তিষ্কে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীগুলি সকলেই শিবপিণ্ড ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে গিয়াছে। এই নিয়ম সমস্তগুলি চক্রে হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করিনা।

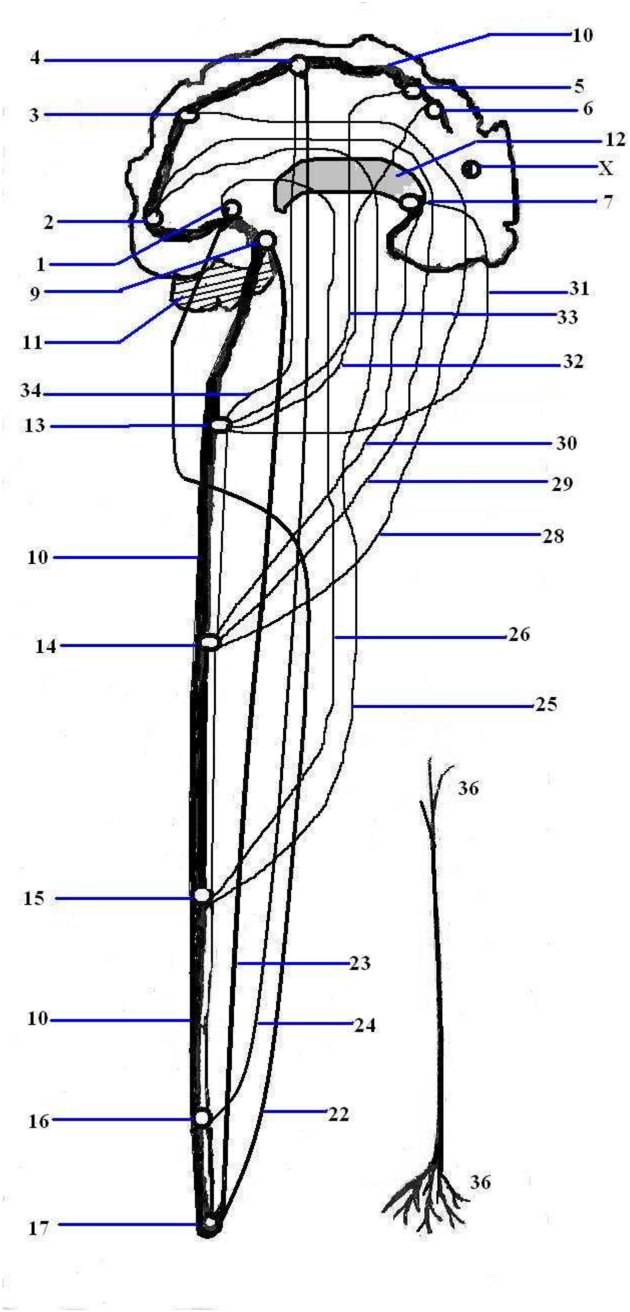

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড সংযোগকারী নাড়ী চিত্র

মেরুদণ্ডের কেন্দ্রগুলি সকলেই স্বষুম্নাপ্রদেশে অবস্থিত। যে সব নাড়ীগুলিকে আমরা স্বষুম্না নাড়ী বলিয়াছি, গমন পথে সেগুলি কোন মর্ম্মই ভেদ করে নাই। সে সব নাড়ীগুলি অন্যসব নাড়ীর মত মর্ম্মের ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। চিত্রিণী ভিন্ন কোন নাড়ীই মর্ম্ম ভেদ করে নাই। স্বষুম্না প্রদেশের মধ্য দিয়া একটা ফাঁকা পথ আছে, এই ফাঁকা পথ কফে ভরা থাকে, ইহাই চিত্রিণী। এই পথে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া সহস্রার প্রদেশে গমন করেন। এই চিত্রিণীর মধ্য স্থানই ব্রহ্ম নাড়ী। আমরা আমাদের গ্রন্থের আরম্ভেই বলিয়াছি, ব্রহ্মনাড়ী বলিয়া কোন বাস্তব নাড়ী নাই। ইহা নাড়ীহীন ব্রহ্মতত্ত্ব। চিত্রিণী যে পথের নাম, সেই পথই ব্রহ্মনাড়ী। পাঠকগণ মস্তিষ্ক নাড়ী "নিরুদ্ধা[২]" ও "বিজ্ঞানার" কথা আলোচনা করুন গণেশশক্তি এই দুইটি নাড়ীর সাহায্যে ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষরিত-ধারা বন্ধ করিয়া দিলে, বিজ্ঞানময়কোষ প্রস্ফুটিত হয়। বিজ্ঞানস্তরের স্থিতি একটু দীর্ঘ হইলেই বিজ্ঞানস্তর জ্ঞানের স্তরে পরিণত হয়। পাঠক কৈবল্যা ও প্রজ্ঞানা নাড়ী দেখুন; নিরোধ সমাধি আয়ত্ত হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্রসুধা আর ক্ষরিত হয় না। ক্ষরিত হইবার প্রয়োজনও থাকে না, কারণ অহং না থাকিলে মন, চিত্ত, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলেই স্তব্ধবৎ হইয়া যায় এবং এজন্য শরীর রক্ষার কোন খরচও বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে চিত্রিণীপথে ব্রহ্মরন্ধ্রক্ষরিত ধারা আসিয়া আর চিত্রিণীকে জড়তায় পরিণত করিতে পারে না। সেই সময়ই ব্রহ্মনাড়ী ঠিক ঠিক স্থূল নাড়ীর অস্তিত্বহীন ব্রহ্মনাড়ীতে পরিণত হয়।

শাস্ত্রের মতে স্বষুম্নার মধ্যে বজ্রানাড়ী ও বজ্রার মধ্যে চিত্রিণী এবং চিত্রিণীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। এ সম্বন্ধে সাধকের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্বষুম্না মেরুমধ্যস্থিত একটি প্রদেশ, যেখানে সবগুলি চক্র অবস্থান করে। বজ্রা এই স্বষুম্নার মধ্যগত নাড়ী। আমরা বজ্রাকে একটি গতি বলিয়াছি। উহাকে নাড়ী বলি নাই। ইহার গতি ঊর্দ্ধমুখী। ইহা অত্যন্ত তীব্রগতিবিশিষ্ট। চিত্রিণী নিম্নগতিবিশিষ্ট নাড়ী। ব্রহ্মনাড়ীতে কোন ঊর্দ্ধ বা অধঃগতি বুঝা যায় না, ইহা সাম্য নাড়ী। বজ্রা, চিত্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী একই নাড়ীর তিনটি স্তর। উহার প্রথম স্তরে বজ্রা, ইহার গতি ঊর্দ্ধমুখী। দ্বিতীয় স্তরে চিত্রিণী, ইহার গতি নিম্নমুখী। তৃতীয়স্তরে ব্রহ্মনাড়ী ইহার গতি নাই। ইহা সাম্য নাড়ী।

মূলাধার পদ্ম[*]। ইহা গুহ্যদ্বারের একটু উপরে মেরুদণ্ডে অবস্থিত। ইহাতে চারিটি দল বা মর্ম্মশাখা। বং শং ষং সং॥ যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ এই মর্ম্মের মনস্তত্ত্ব। ইহা শরীরের মধ্যে সব হইতে শক্তিশালী কেন্দ্র। ইহা মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশস্থল। এখান হইতেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন এবং মানবজীবনের সমস্ত স্তরের রহস্য ভেদ হইবার পর সাধক যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ, ও বীরানন্দ এই কেন্দ্রেই প্রাপ্ত হন। কুণ্ডলিনী ধ্যান ও পূজার অনুশীলন এই কেন্দ্রের প্রাথমিক কাজ। স্বাভাবিক বীরত্ব, স্বাভাবিক সহজত্ব, স্বাভাবিক আত্মানন্দ ও স্বাভাবিক যোগ, পূর্ণস্তরের মানবের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

আমরা যে সব নাড়ী সম্বন্ধে বলিব সেগুলি সবই মেরুমধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। মেরুদণ্ডের বাইরে কোন মর্ম্মনাড়ীই অবস্থিত বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। মেরুদণ্ডের বাইরের নাড়ীগুলি সবই শরীর-যন্ত্রচালক নাড়ী, সেইগুলির কোনটাই মর্ম্মনাড়ী নহে।

---

[*] প্রকাশকের নিবেদন - মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড সংযোগকারী নাড়ী চিত্রে ১৭ নং।

ব্রহ্মসূত্রী। চিত্রে ২৩নং নাড়ী। মূলাধার (চিত্রে ১৭নং) হইতে মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্র (৯নং) সংযোগকারী নাড়ী ব্রহ্মসূত্রী। যৌন সুখে এই নাড়ীর মধ্যে বিশেষ স্পন্দন হয়। যৌন ভোগের পর বীর্যক্ষয়ে ইহা নিস্তেজ হয়। ব্রহ্মচর্য্যে এই নাড়ী অত্যন্ত শক্তিশালী ও বীর্য্যবান থাকে। এই নাড়ীর সহিত আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধ রাখে। এই নাড়ীকে প্রফুল্ল ও সতেজ রাখাই ব্রহ্মচর্য্য। আমাদের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলেও এই নাড়ীতে আমাদের জীবন রক্ষিত থাকে। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই নাড়ীতে এত শক্তি জমিয়া যায় যে ইহার আনন্দে মেরুমধ্যগত সমস্ত নাড়ীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। শাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেতার কথা আছে। ব্রহ্মচর্য্যে এই নাড়ীর শক্তি বর্দ্ধিত হইলে ইহাতে স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতি আরম্ভ হয়। ফলে শরীরে ও মনে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে। এই নাড়ীর ঊর্দ্ধ গতিই ঊর্দ্ধরেতা। সেই সময় মূলাধার হইতে এক প্রকার ঊর্দ্ধগতি সম্পন্ন আনন্দ ধারা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। ফলে মেরুপ্রদেশের সমস্তগুলি কেন্দ্র ও নাড়ী সতেজ ও আনন্দযুক্ত হয়। মদ প্রস্তুত কালে যেরূপ ঊর্দ্ধগতি সম্পন্ন বুদ বুদ উৎপন্ন হইয়া উপরের দিকে চলিতে থাকে, ঊর্দ্ধরেত ক্রিয়ার গতি ঠিক সেইরূপ। কিন্তু সম্ভোগদ্বারা ধাতু নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রী নিস্তেজ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধ বুদবুদ ধারা বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহার ব্রহ্মসূত্রী ঊর্দ্ধগতি সম্পন্না হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। তাঁহার জীবন ধন্য ও আনন্দময়। তিনি নির্ভীক হন, নিরুদ্বেগ হন, তিনি সর্ব্ব কর্ম্মে উৎসাহী, সহিষ্ণু ও দক্ষতা লাভ করেন। ব্রহ্মসূত্রীর রং হালকা স্বর্ণ-আভা-বিশিষ্ট বিদ্যুত-বর্ণ। এই নাড়ীর ঊর্দ্ধ গতিই ব্রহ্মচর্য্য এবং নিম্ন গতিই বীর্য্যনাশ। সম্ভোগকালে যতক্ষণ অর্জ্জমা ও শুক্রশিরা কম্পিতা হয় না, ততক্ষণ ‘‘ব্রহ্মসূত্রীর’’ নিম্ন গতি আরম্ভ হয় না।

স্থতীব্রা। চিত্রে ২২নং নাড়ী। মূলাধার ও মস্তিষ্কস্থিত কর্ম্মকেন্দ্র (১নং) সংযুক্ত নাড়ী ‘‘স্থতীব্রা’’। সমস্ত শরীরের মধ্যে এমন তীব্র-গতি-সম্পন্ন নাড়ী আর একটিও নাই। ইহার একটি স্পন্দন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করিয়া দিতে সক্ষম। এই নাড়ীর এক প্রান্ত কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সংযুক্ত। এই নাড়ীরই স্পন্দন কুণ্ডলিনীর মধ্য দিয়া চিত্রিণীর পথে সহস্রারে গমন করে। স্থতীব্রার স্পন্দন যে পথে চিত্রিণীর পথে উত্থিত হয় উহাই ‘‘বজ্রা নাড়ী’’। আমাদের ধারণা ‘বজ্রা’ বলিয়া কোন নাড়ী নাই। কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধগতি বজ্রের মত অমিতবীর্য্য গতিতে গমন করে বলিয়া এই গতির নাম ‘বজ্রা’। আমাদের ধারণা বজ্রা নাড়ী নহে ‘‘বজ্রা’’ একটি গতি যাহাকে কুণ্ডলিনী শক্তির গতি বলা যায়। এই গতি অত্যন্ত তীব্র এবং ইহা কুণ্ডলীগতি সম্পন্না।

স্থতীব্রার স্পন্দনধারার একটা অংশ ব্রহ্মনাড়ী পথে চক্রগতিতে অত্যন্ত বেগে প্রবেশ করে। ফলে ব্রহ্মনাড়ীর পথ খুলিয়া যায়। মেরু মধ্যস্থিত সমস্তগুলি চক্রভেদ করিয়া এই স্পন্দন মুহূর্ত্তে সহস্রারে প্রবেশ করে। এইরূপ চক্রভেদ হইবার পর সাধকের মানসিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। সাধক বিশ্বকে যেরূপ জড় দৃষ্টিতে বাল্যকাল হইতে দেখিতে ছিলেন, সেই দৃষ্টি তাঁহার আর থাকে না। প্রথম ভেদের পর ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, মূলাধারে এক শক্তিশালী বজ্রপাত হইয়াছে, আর সমস্ত নাড়ীগুলিতে ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই কম্পনের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বজ্রা। যোগশাস্ত্রে সুষুম্নার মধ্যে 'বজ্রা' ও বজ্রার মধ্যে চিত্রিণী এবং চিত্রিণীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত বলিয়াছেন, চিত্রিণীর পথে বজ্রার মত কোন স্বভাব সম্পন্ন নাড়ী আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু চিত্রিণীর পথে সুতীব্রার, যাহার এক প্রান্ত কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সংযুক্ত, এক তীব্রগতি প্রথম কুণ্ডলিনী জাগরণ কালে অনুভব করা গিয়াছিল। সুতীব্রা চিত্রিণীর মত চক্রভেদ পূর্ব্বক অবস্থিত নাড়ী নহে। ইহা চক্রগুলির ধার দিয়া প্রবাহিত মূলাধার ও মস্তিষ্কের কর্ম্মকেন্দ্র সংযোগকারী নাড়ী।

কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা

যখন প্রথম কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়, তখন বজ্রা, চিত্রিণী, কুণ্ডলিনী, বা ব্রহ্মনাড়ী সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে রূপ বলিয়াছে সেই রূপ ধ্যান বা ধারণা আমার ছিলনা। তবে মোটামুটী একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার বাল্যকাল অবধিই ছিল। সেটা কি ভাবে হইয়া ছিল তাহাও আমার মনে নাই। গুরুপাদুকা ও চক্রধ্যানগুলিকে অবলম্বন করিয়া জপাদি ও মুদ্রাদির অনুশীলন আমার তখনকার নিত্য উপাসনার বিষয় ছিল। যেদিন কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়, সেই দিনের ৩, ৪ দিন পূর্ব্ব হইতেই মনের একটা পরিবর্ত্তন, অন্তরমুখিতা ও স্থৈর্য্যবৃদ্ধি দেখা দিল। 'বন্ধনত্রয়যোগ' সহকারে মুদ্রাদির অনুশীলন কালে, মন মূলাধারে, জানিনা কোন শক্তির প্রভাবে, একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যাইতেছিল। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের সামান্য কম্পনও মূলাধারে আঘাত দিত এবং সমস্ত সুষুম্না প্রদেশকে চমকাইয়া দিত। এই ভাবে ৩, ৪ দিন চলিবার পর, মহামুদ্রা অনুষ্ঠান কালে, কোন মহাশক্তির প্রভাবে মূলাধারে যেন বজ্রপাত চমকাইয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে - ষট্ চক্র ভেদ হইয়া গেল। এই চমক ও ঊর্দ্ধ গতিই যে বজ্রা, ইহাতে সন্দেহ নাই। শেষ রাত্রে এই ঘটনার পর সকালবেলা হইতেই কোন প্রকার কষ্টবিহীন এক সর্দ্দি দেখা দিল এবং কফ নির্গত হইতে লাগিল। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আমার সুষুম্নাতে চমকাইতে আরম্ভ করিল। আমার জড়দৃষ্টি এ জনমের মত এখানেই শেষ হইল। মূলাধার ও সহস্রার ব্যাপিয়া এক দিব্য, নির্ম্মল, শ্বেত ও হালকা বোধ ফুটিল। তখন বুঝিয়া ছিলাম, ইহাই চিত্রিণী নাড়ী।

কুণ্ডলিনীশক্তি যে সুতীব্রা নাড়ীরই একটী উল্টামুখী মুখ, এ সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। এই মহা শক্তির আধার বলিয়াই এই চক্রের নাম আধারপদ্ম বা আসনপদ্ম। সুতীব্রা নাড়ীর এক প্রান্ত মস্তিষ্কস্থিত কর্ম্মকেন্দ্রে ও অন্য কেন্দ্র মূলাধারে অবস্থিত হইলেও এই নাড়ীর মুখটী মূলাধারে বর্ত্তমান। ঐ মুখটাই সার্দ্ধ তিন বলয়াকারে মূলাধারস্থিত শিবকে জড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল, এই সুতীব্রা নাড়ীকেই বজ্রা নাম দিব। কিন্তু ইহার ফলে সাধকদের সাধনায় কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইলে ক্ষতি হইবে মনে করিয়া, আমরা উহা করিলাম না। কুণ্ডলিনীজাগরণ ও মর্ম্মভেদের পর ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, সমস্তগুলি চক্রের মর্ম্ম ছিড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাতে মন্দ মন্দ সুখময় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এবং মেরুদণ্ড সংযুক্ত সমস্ত নাড়ীগুলিতে এক প্রকার সুখরস ভিড়িয়া গিয়াছে। এই রস এত প্রচুর পরিমাণে সমস্ত নাড়ীতে ও ইন্দ্রিয়

পরিচালক নাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে যে চক্রভেদের পর মনে হয় এই পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। ভীষণ ভূমিকম্পের পর দেশের বহুস্থান ফাটিয়া ছিড়িয়া ও তাহা হইতে বহু প্রস্রবণ নির্গত হইতে দেখা যায়। কুণ্ডলিনী জাগরণে সাধকের ক্ষেত্র খানির ঠিক সেই দশা হয়। সমস্ত দৃশ্যে যেন এই অমৃতরস ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দৃশ্য মাত্রই নবীন রসে যেন প্রাণবন্ত হইয়া রহিয়াছে। কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই অমৃত প্রবাহ হইয়াছে।

চক্রভেদের পরই মেরুদণ্ডের মধ্যে ও বাহিরে, দক্ষিণে বামে, সামনে, পেছনে, শীতল ও সুখময় বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত অনেক নাড়ীর জাগরণেই শরীরে ও মেরুদণ্ডে নানা প্রকার সুখময়ধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু কোনটাই কুণ্ডলিনী জাগরণের মত এত ব্যাপক সুখময় নহে।

কুণ্ডলিনী জাগরণের পর সাধকের জ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়। ইহার পরও সাধকের মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ যোগের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। সাধকের জানিয়া রাখা প্রয়োজন, কুণ্ডলিনী জাগিলেই জ্ঞান হয় না; ইহা জ্ঞানের এক শক্তিশালী পথ খুলিয়া দেয় মাত্র।

স্বাধিষ্ঠান*। ইহা লিঙ্গমূলের সমসূত্র স্থানে মেরুদণ্ড মধ্যে অবস্থিত। বং ভং মং যং রং লং এই মর্ম্মকেন্দ্রে এইসব বর্ণ ধ্যান করিতে হয়। ইহাতে প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা এই ৬টি মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান। যৌনসুখের আশায় সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রায় প্রত্যেক নরনারীকেই এই যৌন বিকারের ফল ভোগ করিতে হয়। মানুষের যুক্তি, বিচার, প্রবোধ, ধর্ম্ম, শিক্ষা সব চেষ্টায়ও এসব মনোবিকারে প্রতিকারের পথ পাওয়া যায় না। ইহারা ভোগের বিকার বা ভোগ অবরোধের বিকার রূপে দেখা দেয়। এই সব বিকার যে সব নরনারীতে দেখা দেয় তাহাদের পক্ষে যোগ অসম্ভব।

অর্জ্জমা। (চিত্রে ২৪নং নাড়ী) স্বাধিষ্ঠান হইতে যে নাড়ী মস্তিষ্কস্থিত জ্ঞান-প্রধান-শিবকেন্দ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, উহার নাম অর্জ্জমা। ইহা পিতৃ নাড়ী।

শুক্রশিরা। ইহাও পিতৃনাড়ী। ইহা স্বাধিষ্ঠান হইতে কর্ম্ম-প্রধান-শিবকেন্দ্রে গমন করিয়াছে। অর্জ্জমা ও শুক্রশিরা শুভ্রবর্ণ ও নিম্নগতিসম্পন্না নাড়ী। শরীরের মধ্যে ইহাই চন্দ্র নাড়ী। যাহাদের মাথাধরা রোগ আছে তাহারা এই নাড়ীর ধ্যান করিলে ভাল থাকিবেন। স্ত্রী-পুরুষ মিলন-কালে এই নাড়ীর পথেই শিবকেন্দ্র হইতে জীববীজ গর্ভে চলিয়া আসে। ইহাই মৈথুনিক সৃষ্টি। মৈথুনিক সৃষ্টির বাহিরেও অনেক রকমের সৃষ্টি আছে, তাহাতেও বীজ জীবরূপে জগতে উৎপন্ন হইতে পারে। অর্জ্জমা ও শুক্রশিরা কম্পিত না হইলে শুক্রপাত হয় না। এই দুইটি নাড়ীকে ফাঁকী দিয়া যৌনভোগ লইতে পারিলে ভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দুইটি সফল হয়। আজ কাল ভোগীদের চেহারা দেখিলে মনে হয় ইহারা অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, এই সব লোক উপাসনা ও সন্ধ্যাদি করে না, বা করিলেও বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদের কোন ধারণাই নাই। যাই হউক, ভোগজীবনে জীবের এতটা নিস্তেজ হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের পতনের পর, ভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কম হইয়া আদর্শবাদীয় ব্রহ্মচর্য্যবাদ প্রবল হয়; ফলে ব্রহ্মচর্য্য বিধানকে আদর্শবাদে

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড সংযোগকারী নাড়ী চিত্রে ১৬ নং।

কোণঠাসা করা হয়। ইহার কুফল সমাজকে ভালভাবেই ভোগ করিতে হইতেছে। ছবিঘরের কুৎসিত ছবি ও সংযমহীন সাজ সমাজের কোণে কোণে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার মত যোগ্য লোক একটিও নাই। আমরা ভোগী, যোগী সকলকেই মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিতে বলি এবং মানব জীবনকে শক্তিশালী করিতে বলি। ভোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ত্যাগী সকলেরই শক্তি ঐ মেরুদণ্ডে বিদ্যমান।

মণিপুর। ইহার দশটি শাখা। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই সব বর্ণ এবং লজ্জা, পিশুনতা*, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয় এই দশটি মনোবিকার এ স্থানে বিদ্যমান। অধিক মানসিক পরিশ্রমে বা হাতে পায়ে কাজ না করিয়া মনে মনে বেশী কর্ম্মী হইলে এ সব বিকার দেখা দেয়।

মণিপুর হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, সেইগুলি সকলেই কল্পনায় সাহায্য করে। কল্পনায় আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পনা কমিয়া গেলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং শরীর ও মন সুস্থ থাকে। বেশী কল্পনা হইলেই হজম করিবার শক্তি কমিয়া যাইবে। মণিপুর যত স্নিগ্ধ থাকিবে হজম তত ভাল হইবে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। নাভিস্থানের সঙ্গে মণিপুর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাভি ধ্যান কর, নাভি চিন্তা কর, নাভিকে দেখ, নাভিকে ঠাণ্ডা রাখ, মন শক্তিশালী হইবে, মন সাম্য হইবে, মনের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হইবে, হজম ভাল হইবে, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিবে। যখনই সাধনায় বসিবে তখনই প্রথমে নাভি ধ্যান করিবে। নাভি যদি বায়ুকে ধরিয়া রাখিয়া চাপ না দেয়, তবে চিন্তা, কথা বলা, লেখাপড়া, সব বন্ধ হইয়া যাইবে। শরীরের মধ্যে নাভি এক আশ্চর্য্যজনক স্থান। দিন রাতের মধ্যে যখনই সময় ও সুযোগ হইবে তখনই ২, ৩ সেকেণ্ডও নাভিধ্যান করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা শরীর ও মন আশ্চর্য্যজনক ভাবে লাভবান হইবে।

অনেক অনভিজ্ঞ লোক হজমশক্তিহীন লোককে নাভিস্থানে অগ্নিকুণ্ড ধ্যান করিতে বলেন, শুনিয়াছি। আমরা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়া রাখিতেছি যে ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ ফল দান করিবে। নাভির সঙ্গে মণিপুর গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। মণিপুরের সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্ম্মকেন্দ্র সংযুক্ত, ফলে নাভিতে প্রচুর অগ্নি বিদ্যমান। এখানে অগ্নিধ্যানের প্রয়োজনই হয় না, বরং নাভিকে শীতল ও স্নিগ্ধ রাখিলেই হজম ভাল হইবে। নাভি গরম হইলেই সমান বায়ু বিকৃতি হইবে। এবং হজমে ও মল নিঃসরণের কার্য্যে বিঘ্ন হইবে।

অগ্নিস্রোতা। চিত্রে ২৬নং নাড়ী। মণিপুর হইতে মস্তিষ্কের কর্ম্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম অগ্নিস্রোতা। এই নাড়ীতে অগ্নি প্রবাহিত হয়। ইতিপূর্ব্বে সুতীব্রার কথা বলা হইয়াছে। সুতীব্রা কোন গরম নাড়ী নহে। উহা তীব্র গতিসম্পন্না। অগ্নিস্রোতা গরম নাড়ী। ইহা আমাদের জঠরাগ্নি। ইনিই বৈশ্বানর। এই নাড়ীর রং অগ্নি বর্ণ। জ্বররোগ এই নাড়ীরই উগ্রমূর্ত্তি। যখন শরীরে অম্লরস জমিয়া যায়, যাহার ফলে পাচন ক্রিয়া দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের অম্লরস আরও জমিয়া যায় ও বিকৃত রস বৃদ্ধি হয়; সেই সময় এই অগ্নিস্রোতা অগ্নিপ্রবাহ দ্বারা ঐ বিকৃত রস ও অম্লরসকে পরিপাক করিতে অগ্রসর হয়। ইহারই নাম

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের "পিংশুতা" স্থানে পিশুনতা গৃহীত হইল।

জ্বর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহারে, বিষাক্ত বাষ্প, বা বিষাক্ত জল বা পচা জলের সংস্রবে শরীরে বিকৃত রস জমিয়া গেলে, অথবা অন্য কোন কারণে রক্তের শক্তি কমিয়া গেলে, অথবা শরীর যুদ্ধ করিতে পারে না, এইরূপ শীতলতার সম্মুখীন হইলে, এই অগ্নি স্রোতা অগ্নি প্রবাহিত করিতে বাধ্য হয়। ইহাই জ্বর নামে খ্যাত। আঘাত, ঘা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি বহু কারণে শরীরের উষ্ণতা বেশী ব্যয় হইলে অগ্নিস্রোতা অগ্নিস্রোত দান করিয়া সেই কেন্দ্রকে উষ্ণ করিতে চেষ্টা করে এবং প্রয়োজন হইলে সমস্ত শরীরে নিজের স্রোত ঢালিয়া দেয়। ইহাই জ্বর। অগ্নিস্রোতা যাহাতে নিজের স্রোত প্রবাহিত না করিতে বাধ্য হয় এবং কঠিন ক্ষতযুক্ত মানবের জ্বর ও ক্ষতের ব্যথাকে অসহিষ্ণু করিয়া না দেয়, এজন্য মানবের সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন হইলেই গরম বস্ত্র, গরম জল ও অগ্নির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। কারণ জ্বর কেবল বিকৃত রসই পোড়াইয়া দেয় না, জ্বর শরীরের অনেক মূল্যবান শরীরাংশকেও ধ্বংস করে। মণিপুর হইতে মস্তিষ্কের কর্ম্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই নাড়ীই মানুষের মনের প্রধান অংশ। মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীরে শেষ বারের মত জ্বর হইতে দেখা যায়। অগ্নিস্রোতা এই সময় শরীরকে শেষবারের মত গরম করিয়া দেয়।

কল্পস্রোতা*। (চিত্রে ২৫নং নাড়ী) মস্তিষ্কের জ্ঞানপ্রধান সূর্য্যকেন্দ্র হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম কল্পস্রোতা।

প্রকল্পা। (চিত্রে ২৫নং নাড়ী) মণিপুর হইতে কর্ম্মপ্রধান সূর্য্যকেন্দ্র সংযুক্ত নাড়ীর নাম প্রকল্পা।

মণিপুর হইতে যে দুইটি নাড়ী সূর্য্যকেন্দ্রে গমন করিয়াছে, উহা মণিপুর হইতে উত্তাপরাশিকে মস্তিষ্কস্থিত সূর্য্যকেন্দ্রে বহন করিয়া লইয়া যায়। সূর্য্যকেন্দ্রে স্মৃতির লীলার অংশ জমা থাকে। সেই সঞ্চিত স্মৃতি কল্পস্রোতা ও প্রকল্পা দ্বারা উত্তপ্ত হয়। এবং সেই স্মৃতিরাশি আপনিই জাগিতে থাকে। ইহাই মানুষের অজ্ঞাত কল্পনা। ইতিপূর্ব্বে ‘‘কল্পনা’’ ও ‘‘কল্পধারা†’’ নাড়ীর কথা বলিয়া ছিলাম। তাহারাও সূর্য্যস্তরের স্মৃতিরাশিকে জাগাইতে থাকে। কাজেই মানুষ কিছুতেই তাহার কল্পনার স্রোত বন্ধ করিতে পারে না। কল্পনাস্রোত বন্ধ করিবার একমাত্র কেন্দ্র শিবকেন্দ্র। মন ইহার প্রভাবে ঠাণ্ডা হয়। নাভিকে ধ্যান করিলেও কল্পনার কতকটা অংশ বন্ধ হয়। নাভিধ্যানে মাত্র কল্পস্রোতা ও প্রকল্পার ক্রিয়া স্তব্ধ হয় কিন্তু কল্পনা ও কল্পধারার কার্য্য ইহা দ্বারা বন্ধ হয় না। পাঠকের মনে আছে ‘অহং’ শিবকেন্দ্রে অবস্থান করেন। প্রতিদিন এই কর্ম্মক্লান্ত ‘অহং’ তমসাচ্ছন্ন হন, তাই আমরা সুষুপ্তিতে অভিভূত হই। এইরূপ পরিস্থিতিতেই কল্পনার কার্য্য বন্ধ হয়। সুষুপ্তি ভিন্ন সাধারণ নিদ্রা ও স্বপ্নকালে কল্পনার কার্য্য বন্ধ হয় না। শিবস্তরে সমাধি হইলেও কল্পনা বন্ধ হইবে। কিন্তু উন্নত স্তরের যোগী ভিন্ন সুষুপ্তি কাহারও হয় না, কাজেই মনের কার্য্য অধিকাংশ লোকেরই সর্ব্বদা চলিতে থাকে। ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই বিরক্তিকর ঘটনায় মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয় তখনই সে যোগপথ ও যোগীর সঙ্গ চায়। যোগশাস্ত্রে ইহারই নাম ‘শুভেচ্ছা’ নামক প্রথম যোগভূমি।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ‘‘কল্পশ্রোতা’’ স্থানে ‘‘কল্পস্রোতা’’ শব্দটি গৃহীত হইল।

† প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘কল্পশিরা’’ স্থানে এই অনুচ্ছেদের সর্বত্র ‘‘কল্পধারা’’ শব্দটি গৃহীত হইল।

অনাহত[*]। এই মর্ম্মকেন্দ্রে ১২টি শাখা আছে। এখানে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং বর্ণমালা ধ্যান করিতে হয়। এই মর্ম্মে "আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিফলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ" অবস্থান করে। অনাহতের কেন্দ্রে আরও সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান। সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। আমরা স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত সম্বন্ধে পরে আবার বলিব। মানবের জীবনখানার বেশী ভাগটাই এই মর্ম্মের প্রভাবে পরিচালিত হয়। ইহা দৈবীভাব ও অসুরভাবের কেন্দ্র। দৈবীবাদীরা সব সময়ই দুর্ব্বল, কিন্তু অসুরবাদীরা সব সময়ই বেশী শক্তিশালী হইলেও অসুরবাদীদের বিকাশ বিষ্ণুস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু দৈবীবাদীরা শক্তিবাদ অনুসরণ করিলে শক্তিস্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হইতে পারেন এবং তাঁহারা অসুর হইতে শক্তিমান হন।

বিশোকা। চিত্রে ৩০নং নাড়ী। অনাহত হইতে একটি নাড়ী গণেশ কেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, ইহার নাম বিশোকা। এই নাড়ীর স্পন্দনপ্রবাহে আসিলে সাধক শূন্যবোধের স্তরে আসিয়া যান। আত্মা বা ঈশ্বর ব্যাপক ও শূন্যাকার, এ নাড়ীর বোধের ইহাই প্রধান কথা। ইহার স্পন্দন এত প্রভাবশালী যে নিমিষে সমস্ত অন্তর ও বাহ্য দৃশ্য শূন্যাকার হইয়া যায়। ইহার অসীম শক্তি। এই পৃথিবীর সর্ব্ববিধ দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি হইতে মুক্ত করিয়া ইহা মানুষকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। আমাদের চক্ষু যতটা দেখিতে পায়, মন যতটা কল্পনা করিতে পায়, সবই এই নাড়ীর স্পন্দনের সামনে আসিবামাত্র শূন্যাকার হইয়া যায়। সাধকের অন্তর ও বাহির জুড়িয়া এক আদি অন্তঃহীন মহাশূন্য বিরাজ করিতে থাকে। এই নাড়ীর প্রবাহে না আসিলে সাধকের সাধকজীবন আরম্ভই হয় না।

ইতিপূর্ব্বে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলিয়াছি। শূন্যবোধ, গুরুস্নেহ ও মুদ্রাদির অনুশীলন দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরণ সহজ হয়। গুরুস্নেহ ও শূন্যবোধ না থাকিলে শুধু হঠযোগাদির অনুশীলন দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরণ সহজ হয় না। বিশোকা মনকে এত তৃপ্তি দান করে যে প্রথম প্রথম মনে হয় আর জ্ঞানের কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সব পাওয়া গিয়াছে।

রাজযোগের ক্রিয়াতে বহু সহজ ক্রিয়া আছে যাহার দ্বারা মনকে খুব সহজে শূন্য করিয়া দেওয়া যায়। "কায়াকাশ" সম্বন্ধে ধ্যান করিলে মন তৎক্ষণাৎ শূন্যবোধে আসিয়া যায়।

যশপ্রভা। চিত্রে ২৯নং নাড়ী। অনাহত হইতে একটা নাড়ী জ্ঞানপ্রধান সূর্য্যকেন্দ্রে গমন করিয়াছে। এই নাড়ীর নাম যশপ্রভা।

প্রতিভা। চিত্রে ২৯নং নাড়ী। অনাহত হইতে কর্ম্মপ্রধান সূর্য্যকেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত নাড়ীর নাম "প্রতিভা"।

প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধাই সূর্য্যস্তরের জ্ঞান এবং প্রচার, শিক্ষা, আর্ত্তের সেবা ও বিশ্ব আত্মীয়তার মনোবৃত্তি, সূর্য্যস্তরের কর্ম্মবিভাগ। মস্তিষ্ক নাড়ীর আলোচনায় "বিমলযশার" কথা বলা হইয়াছে। বিমলযশা সূর্য্যস্তরের নাড়ীর প্রধান ক্ষেত্র। এই নাড়ী মণিপুর সংযুক্ত নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা কল্পনার পরিচালক হয়। এই নাড়ী অনাহত সম্বন্ধযুক্ত

---

[*] প্রকাশকের নিবেদন - মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড পরিচয় চিত্রে ১৪ নং।

হইলে, ইহা ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রতিভা ও যশ দানের কারণ হয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, যশ, প্রতিভা, এ সব ঈশ্বরীয় শক্তি। বিমলযশা হইতে উহারা আসিয়া থাকে। যশ ও প্রতিভা কেহ চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, ইহা জন্ম-জন্মান্তরের যোগের ফলে ঈশ্বরীয় নিয়মে মানবের ভাগ্যে দেখা দেয়।

বিশোকার অনুভূতির পর সূর্য্যস্তরের অনুভূতি বিকশিত হয়। কোন কোন যোগীর ১০, ১৫ দিনের মধ্যেই সূর্য্যস্তরের অনুভূতি ফুটিতে দেখা গিয়াছে। বিশোকাজ্যোতি ফুটিবার পর সাধক যদি বুক দিয়া দেখা ও বুক দিয়া ধ্যান করার অভ্যাস করেন, তবে সূর্য্যস্তর ফুটিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার ফলে হৃদয় ও শরীর দুর্ব্বল হইবে। কাজেই সূর্য্যস্তরের জন্য ব্যস্ত না হওয়াই ভাল।

সুখশ্রীয়া। চিত্রে ২৮নং নাড়ী। অনাহত হইতে জ্ঞানপ্রধান বিষ্ণুস্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম সুখশ্রীয়া। এই নাড়ীর স্পন্দন আরম্ভ হইলে সাধকের চেহারা অত্যন্ত সুশ্রী দেখায়। ধন ও নারীর ভালবাসা এবং ঐশ্বর্য্য সাধককে ঘেরিয়া থাকে। আদর্শবাদী জনতা যতই তাঁহার নিন্দা করুক না কেন, তাহাতে যোগীবরের কোনই ব্যথাও নাই, অসুবিধাও নাই।

রাজশ্রীয়া। চিত্রে ২৮নং নাড়ী। যে নাড়ীটী অনাহত হইতে কর্ম্মপ্রধান বিষ্ণুস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত উহার নাম রাজশ্রীয়া। বিষ্ণুস্তর পর্য্যন্ত বিকশিত যোগীরাই রাজা হন। তাঁহারা অসুরই হউন বা দুর্ব্বল রাজাই হউন, রাজশক্তি বিষ্ণুস্তরের যোগভ্রষ্টের লক্ষণ।

বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি লাভের পরই সাধকগণ লোকসঙ্গ ভালবাসেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ তাঁহাদের এমনই আসিতে থাকে। তাঁহাদের ঐসব দিকে মন দিবার প্রয়োজন নাই।

মস্তিষ্ক নাড়ীর পরিচয়ে ''ধ্যানশ্রীয়ার'' কথা বলা হইয়াছিল। 'সুখশ্রীয়া' ও 'রাজশ্রীয়া' ধ্যানশ্রীয়ার নিকটস্থ নাড়ী। ইহাদের সংস্পর্শে যে সব সাধকগণ থাকেন, তাঁহাদের মুখে ও শরীরে যে ভাবে ধ্যানরস প্রবাহিত হয়, উহা দেখিলে প্রত্যেকেরই ইচ্ছা হয়, এঁকে শ্রদ্ধা করি। সুখশ্রীয়া ও যোগশ্রীয়া এবং ধ্যানশ্রীয়া অত্যন্ত গম্ভীর।

ধ্যানশ্রীয়াতে সোজা আসা খুব কঠিন। মন্ত্রযোগী তান্ত্রিক সাধক ভিন্ন অন্য কোন স্তরের যোগীদের এ স্তরে আসা যথেষ্টই অসম্ভব। যাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস কম তাহাদের পক্ষে এ স্তরের কল্পনাও অসম্ভব। নিদ্রার গভীরতর অবস্থায় মানুষ মাত্রই বিষ্ণুস্তরে আসিয়া থাকে। মন্ত্রযোগী মহাপুরুষগণ নিদ্রাভঙ্গের পরই ধ্যানে বসিবেন। ফলে এ স্তরে আসিবার যথেষ্ট উপাদান পাইবেন। নিদ্রার পর একটা সুখনেশা থাকে, ঐ নেশাটাকে স্মরণ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে ধ্যান ও জপাদি করিবেন।

বিশুদ্ধাখ্য*। কণ্ঠের ঠিক পেছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীতে এই কেন্দ্র বিদ্যমান। ইহাতে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ, এ সব বর্ণধ্যান করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ মর্ম্মকেন্দ্র এবং এই মর্ম্মে কোনও প্রকার নিম্নস্তরের মনোবিকাশ অবস্থান করে না। ইহাতে সা, রে, গা, মা, পা ধা, নি, এই সাতটী সুর এবং বিষ, এবং হুঁ, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, এই সাতটী মন্ত্র এবং অমৃত অবস্থান করে।

* প্রকাশকের নিবেদন - মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড সংযোগকারী নাড়ী চিত্রে ১৩ নং।

বীতরাগা। চিত্রে ৩১নং নাড়ী। বিশুদ্ধাখ্য হইতে গণেশকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম 'বীতরাগা'। ইহার রং ধূম্রাভ শ্বেত। ইহার স্পন্দনগতি ঊর্দ্ধমুখী। ইতিপূর্ব্বে আমরা 'বিশোকার' কথা বলিয়াছি। ইহার সব দৈব জগতের নাড়ী। ইহাদের স্পন্দন প্রবাহ না পাইলে যে কোন মানুষ যে কোন সময় অসুর বা অসুর দলের সমর্থক হইতে পারে। বীতরাগার স্পন্দন প্রবাহে আসিবার পর সাধক স্থায়ীভাবে জ্ঞানজগতে প্রবেশ করিলেন।

সুস্থিরা। চিত্রে ৩৪নং নাড়ী। বিশুদ্ধাখ্য হইতে জ্ঞানকেন্দ্র শিব পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী 'সুস্থিরা'।

সুতৃপ্তা। চিত্রে ৩৪নং নাড়ী। বিশুদ্ধাখ্য হইতে কর্ম্মপ্রান্ত শিবকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী 'সুতৃপ্তা'।

অমৃতা, সুস্থিরা, সুতৃপ্তা, মিশিয়া শিবস্তরের অনুভূতি। ইহাদের বিস্তারিত আলোচনার কোনই প্রয়োজন দেখি না। ইহাদের অনুভূতিতে সামান্য ইতর বিশেষ ভেদ থাকিলেও ইহারা সকলেই শুভ্রবর্ণ নাড়ী এবং ইহাদের স্পন্দনগতি নিম্নমুখী।

বেদান্তা। চিত্রে ৩৩নং নাড়ী। বিশুদ্ধাখ্য হইতে জ্ঞান প্রান্ত মহৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী 'বেদান্তা'।

সামগা। চিত্রে ৩৩নং নাড়ী। বিশুদ্ধাখ্য হইতে কর্ম্মপ্রান্ত মহৎ সংযুক্ত নাড়ী 'সামগা'।

সহজে শিবস্তরে আসিবার পথও ঋষিগণ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মটাই শিব ও শক্তি স্তরের ধর্ম্ম ছিল। ইহাকে ভাববাদী মহাত্মারা অত্যন্ত নিম্ন ও সমাজজীবনের আবর্জ্জনার স্তরে আনিয়া নামাইয়াছেন। যাঁহারা 'বিশোকার' অনুভূতি পান নাই, তাঁহাদের পক্ষে শিবস্তরে আসা সম্ভব নহে। নিত্য ঠিক সময় বৈদিক সন্ধ্যা করিতে হইবে। শিবপূজা ও রুদ্রীপাঠ, নিঃসঙ্গ ও ত্যাগজীবন হওয়া চাই। গঙ্গাতটে একান্তবাস ও ঐ সঙ্গে 'বিশোকার' অনুভূতি থাকিলেই শিবস্তরে প্রবেশ সহজ।

সন্ধ্যা, শিবপূজা এবং শক্তি পূজা কালে, কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে মস্তিষ্কের শিবকেন্দ্র হইতে অমৃত ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সন্ধ্যানুষ্ঠানের কিছুক্ষণ পরও এই ধারার স্রোত থাকে। পরে কম হইয়া যায়। এই ধারা ধরিয়া সন্ধ্যা পূজার পর ধ্যান জপাদি করিতে হয়। নিদ্রাভঙ্গ কালে নিদ্রা-নেশা স্মরণ করিয়া জপ ধ্যান যেমন বিষ্ণুস্তরের সন্ধানে সাহায্য করে, ঠিক সেইরূপ সন্ধ্যা, শিবপূজা ও শক্তিপূজার শান্তির নেশা ধ্যানসহ জপ ধ্যান শিবস্তরের সহায়ক হয়।

কুণ্ডলিনী জাগরণের পরও শিবস্তরের অনুভূতি লাভ হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত সহজ হইলেও যেরূপ 'গুরু' ও 'শিষ্য' সংযোগে উহা সম্ভব সেরূপ গুরু ও শিষ্য পাওয়া দুষ্কর।

বিশোকা অনুভূতি, বৈদিক সন্ধ্যা ও ত্যাগ জীবনের প্রতিষ্ঠা থাকিলে ধ্রুপদ সঙ্গীতও শিবস্তরের সংযোগ করাইয়া দিতে পারে।

সুকৃষ্ণা। সুঘোরা। চিত্রে ৩২নং নাড়ী। বিশুদ্ধাখ্য হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী দুইটী 'সুকৃষ্ণা' ও 'সুঘোরা'।

মস্তিষ্কের মধ্যে যতগুলি মর্ম্মকেন্দ্র বিদ্যমান, উহার সবগুলিই মেরুদণ্ডে রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে স্মৃতির কোন কেন্দ্র আমরা পাই নাই। মেরুদণ্ডে স্মৃতির স্থান করিয়া দিলে আমাদের মনে হয় মস্তকহীন জীব ও মস্তকহীন মানব সৃষ্টি অসম্ভব নহে।

মস্তিষ্কের অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছুই বলি নাই। সে সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে বা মেরুদণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে সেইগুলির বোধ সবই ঘোর অন্ধকার বর্ণ। জাগরণে, স্বপ্নে, নিদ্রায় সব সময়ই আমাদের মনের এক অংশ অসারবৎ থাকে ইহা আমরা একটু অন্তরদৃষ্টিতে বুঝিতে পারি। অনেক সময় হাঁটা ও বসাকালেও দেখা যায়, মনে ও বিশেষ অঙ্গে জড়তার অন্ধকার নামিয়া আসিয়া শরীর ও মনকে অবসন্ন করিতেছে। প্রত্যেকটী স্তরের বোধকালেই অনুসন্ধান করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই সেই বোধকেন্দ্রের কতকাংশে ঘোর তামস ক্রিয়াশীল আছে। শূন্যবোধ, প্রেমবোধ, শান্তিবোধ, বিজ্ঞানবোধ, পূর্ণবোধ, সবস্তরেই অব্যক্তের জড়তা ও অন্ধকার কতকাংশে বিদ্যমান থাকে। ইহার কারণ, অব্যক্ত হইতে অন্ধকার ও তামসস্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। অব্যক্ত ও ব্যক্তের দ্বন্দ্ব যুগযুগান্তরের দ্বন্দ্ব। যখন ‘‘অব্যক্ত’’ বেশী শক্তিশালী হয় তখন সমস্ত সৃষ্টি স্তব্ধবৎ হইয়া যায়। আবার যখন ‘‘ব্যক্ত’’ বেশী শক্তিশালী হয়, তখন সমস্ত সৃষ্টি পুনঃক্রিয়াশীল হয়। গীতায় বলিয়াছেন ‘‘ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে’’ ‘‘রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে প্রভবত্যহরাগমে’’, ‘‘তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে’’ ইত্যাদি। (শক্তিবাদীয় উপাসনা পুস্তকে কালী মূর্ত্তিরহস্য দেখুন)। অব্যক্তশক্তি সৃষ্টির ব্যক্ত লীলা ভালবাসেন না। তিনি এই সৃষ্টিকে স্তব্ধ করিতে চান। কিন্তু তিনিই তো সব শক্তি নহেন, কাজেই সৃষ্টি আবার হয়। তিনি সর্ব্বদা নিজের শক্তি প্রত্যেকটী কেন্দ্রে প্রেরণ করিতেছেন, ব্যক্ত শক্তিও (মহৎ) প্রত্যেক কেন্দ্রে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। আমরা যখন প্রথম শ্রান্ত হই, তখন সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অব্যক্ত আমাদিগকে অভিভূত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ত্তব্যরত সেনাগণ, অনেক সময় ২, ৩ দিন পর্য্যন্ত দিন রাত যুদ্ধ করিয়া এমন শ্রান্ত হইয়া পড়েন যে তখন সব শিক্ষা, সব দায়িত্ব, সব মমত্ব, সব শত্রুত্ব ভুলিয়া রণক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রের সম্মুখে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। এইরূপ, আমাদের আত্মগঠনেও প্রত্যেক শক্তির কার্য্যধারা আছে। অব্যক্ত যখন দেখেন ব্যক্ত (মহৎ) শ্রান্ত হইয়াছে, সেই সুযোগে তিনি বিশ্বকে স্তব্ধ করেন। একই নীতিই আমাদের দেহতত্ত্বে ও বিশ্বতত্ত্বে বিদ্যমান।

কালরাত্রি। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৪নং নাড়ী। জ্ঞানপ্রান্ত অব্যক্ত ও জ্ঞানপ্রান্ত শিব সংযোগকারী নাড়ীর নাম ‘‘কালরাত্রি’’।

মহামায়া। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৪নং নাড়ী। কর্ম্মপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে কর্ম্মপ্রান্ত শিব পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম ‘‘মহামায়া’’।

মহালয়া। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৬নং নাড়ী। জ্ঞানপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে জ্ঞানপ্রান্ত বিষ্ণু পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী ‘মহালয়া’।

মহামেধা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৬নং নাড়ী। কর্ম্মপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে কর্ম্মপ্রান্ত বিষ্ণু পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম ‘মহামেধা’।

মোহরাত্রি। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৭নং নাড়ী। জ্ঞানপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে জ্ঞান প্রান্ত সূর্য্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম মোহরাত্রি।

মহামোহা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৭নং নাড়ী। কর্ম্মপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে কর্ম্মপ্রান্ত সূর্য্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম 'মহামোহা'।

মহারাত্রি। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৮নং নাড়ী। জ্ঞানপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে কর্ম্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম মহারাত্রি।

মহানিশা। মস্তিষ্ক চিত্রে ২৮নং নাড়ী। কর্ম্মপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে কর্ম্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম মহানিশা। কর্ম্মশক্তির কেন্দ্রে আমাদের মন থাকে। মনে জাগ্রত, স্বপ্ন, নিদ্রা ও সুষুপ্তির স্তর আছে। কর্ম্মকেন্দ্রে মনের যে অংশ থাকে উহার নাম মন। মনের এই অংশ স্বপ্ন, নিদ্রা ও সুষুপ্তিকালে 'মহারাত্রি ও মহানিশার' প্রভাবে জড়তা প্রাপ্ত হয়। মনের স্বপ্ন অংশ সূর্য্যস্তরে থাকে। নিদ্রা ও সুষুপ্তিকালে মোহরাত্রি ও মহামোহা মনের স্বপ্ন (কল্পনা) অংশ অবসাদগ্রস্ত করে। বিষ্ণুস্তরের সুখ নিদ্রাকেই আমরা 'নিদ্রা' নাম দিয়াছি। সুষুপ্তিকালে মনের এই চিত্ত অংশ ''মহালয়া'' ও ''মহামেধা'' দ্বারা অবসাদ গ্রস্ত হয়। ''কালরাত্রি ও মহামায়া'' নামক নাড়ী দুইটীর প্রভাব সমাধি ভিন্ন বুঝা যায় না।

করালা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৩নং নাড়ী। জ্ঞানপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে গণেশ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম করালা।

মহাঘোরা। মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৩নং নাড়ী। কর্ম্মপ্রান্ত অব্যক্ত হইতে গণেশ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাড়ীর নাম মহাঘোরা। সৃষ্টি যখন অব্যক্তে চলিয়া যায় তখন গণেশের আর কোনই কাজ থাকে না। গণেশের কাজ মহৎ পর্য্যন্ত। সৃষ্টি অব্যক্তে প্রলীন হইবার পর গণেশকে করালা ও মহাঘোরা প্রলীন করিয়া লয়। মহতের ১৫ কলা ব্যক্ত কলা এবং ১৫ কলা অব্যক্ত কলা। (ক্রমবিকাশ ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য - দুর্গাধ্যান)। ব্যক্ত ১৫ কলায় গণেশ জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল থাকেন। অব্যক্ত ১৫ কলার মধ্যে ১৪ কলা পর্য্যন্ত গণেশের কাজ থাকে। অব্যক্ত ১৫ কলার প্রলয়ের সঙ্গে গণেশও প্রলীন হন। করালা ও মহাঘোরা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, সৃষ্টি থাকা পর্য্যন্ত গণেশ জাগ্রত থাকেন। মহৎ যেমন ধীরে ধীরে প্রলীন হন, গণেশও তেমনই প্রলীন হন। গণেশ সৃষ্টি ভালবাসেন না; কিন্তু সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও মন সৃষ্টি ভালবাসেন। কাজেই অব্যক্তস্তরের সব নাড়ীর ক্রিয়া একরূপ নহে।

অব্যক্তস্তরের নাড়ীগুলি কোন্ স্তরে কি কাজ করে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিলাম না।

অব্যক্তস্তরে আসিবার জন্যই উন্নতস্তরের যোগিগণের মধ্যে মহাসন্ধ্যা ও মহানিশার পূজাদি করিবার নিয়ম আছে। কালী পূজা, তারা পূজা, অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা ও অন্যান্য মহাবিদ্যার উপাসনা সবই অব্যক্তস্তরের উপাসনা। একযুগে ভারতের ইন্দ্রাদিগণ, মনুগণ, রাজা, মহারাজা এবং ঋষিগণ মহাশক্তির উপাসক ছিলেন। রাষ্ট্রের ধর্ম্ম ছিল শক্তিবাদ ও শক্তি উপাসনা। আজ আমাদের যবনবাদী নেতারা রাষ্ট্রধর্ম্ম তুলিয়া দিয়াছেন। রাজবংশগণকে ভিখারি করিয়াছেন। এ অবস্থা আরও কিছু দিন চলিলে, দেশে নর্ত্তন ও

কীর্ত্তনধর্ম্ম এবং পূজারীর ঘণ্টাবাজা ভিন্ন কোন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মই টিকাইয়া রাখা কঠিন হইবে।

পুরুষোত্তম ও ব্রহ্মনাড়ী

চিত্রে ১০নং নাড়ী। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ও, ং, ঃ, ইহারা মস্তিষ্কস্থিত শক্তিকেন্দ্র, ইহারা ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয়ে বিদ্যমান। অ = ইচ্ছাশক্তি। ই = বিজ্ঞান শক্তি। উ = শান্তিশক্তি। ঋ = কর্ম্মশক্তি। ঌ = প্রাণশক্তি। ও = সুখশক্তি। ং = জ্ঞানশক্তি। ঃ = কর্ত্তৃত্ব শক্তি।

এই সব শক্তিগুলি অনাদি। প্রলয়ে এ সব কোন শক্তিই বিলীন হন না। যখন সব বিলীন হয় তখন ঋ (কর্ম্মশক্তি) পুরুষোত্তম রূপে থাকেন। অন্যান্য সব শক্তিগুলি ইহার মধ্যে স্বতঃনিহিত থাকেন। সবগুলি শক্তিই ঐ কর্ম্মশক্তিকণার মধ্যে সক্রিয় ভাবে অবস্থান করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে অব্যক্ত শক্তি, যাহার মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত উপাদান প্রলীন আছে, তাহাও এই পুরুষোত্তমে ক্রিয়াশীল রূপে অবস্থিত। পুরুষোত্তমের স্তরে যে কোন শক্তিকে পাওয়া যায়।

এই সক্রিয় পুরুষোত্তম একটী দৃশ্য তত্ত্ব। ইনি নিজের গতিতে নিষ্ক্রিয়ও হন। তখন বুঝা যায়, তিনিই দ্রষ্টা, দৃশ্য বলিয়া কোন তত্ত্ব ছিল না এবং নাই। ব্রহ্মনাড়ীর যাহা তত্ত্ব তাহার শেষ পরিণতি এই নিষ্ক্রিয় পরম তত্ত্ব।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "তিনি ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি পুরুষোত্তম।" আমরা কথাটাকে আরও ব্যাপক ভাবে বলি - আত্মা যখন অহং, চিত্ত, বুদ্ধি, ও মনের আবরণে আবদ্ধ, তখন তিনি ক্ষরপুরুষ বা জীব। অহং এর গ্রন্থি ভেদ হইবার পর কয়েকটা স্তর অতিক্রম করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত চক্রের নিয়মে সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়মে মুগ্ধ আত্মাই "অক্ষর পুরুষ"। এই সৃষ্টি ও লয় নিয়মের পরপারস্থিত আত্মাই পুরুষোত্তম।

পুরুষোত্তমের স্তরে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ও, অং, অঃ ইহারা আটটী পরাশক্তি।

অক্ষর পুরুষের স্তরে, ইহাদের এক একটির শক্তিপ্রভাবে এক একটি জগৎ বিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। যথা - ঃ = অব্যক্ত জগৎ, ং = মহৎ জ্ঞান জগৎ, উ = শান্তি জগৎ, ই = বিজ্ঞান জগৎ, ঋ = কর্ম্মজগৎ, ঌ = প্রাণ জগৎ। পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব মহতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীববীজ সৃষ্টি হয়। এই জীব বিভিন্ন জগতে খেলিয়া বেড়ায় এবং ক্রমে বিকশিত হয়, ইহাই অক্ষর পুরুষের সৃষ্টিলীলা। বিভিন্ন জগৎগুলির কার্য্যধারা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়; কারণ ব্রহ্মা (ঋ), গণেশ (ই), সূর্য্য (অ), বিষ্ণু (ও), শিব (উ), মহাশিব (ং) এবং শক্তির (ঃ) কর্ত্তৃত্ব বিভিন্ন জগতের উপর বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই সব কেন্দ্রগুলিকে যখন আমরা ক্ষর পুরুষের স্তরে দাঁড়াইয়া দেখি, তখন আমাদের মন (ব্রহ্মা = ঋ), বুদ্ধি (গণেশ = ই), লীলা (সূর্য্য = অ), চিত্ত (বিষ্ণু = ও), অহং (শিব = উ), জ্ঞান (মহাশিব = ং), কর্ত্তৃত্ব (শক্তি = ঃ) বলি। ক্ষরের শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কাজেই ইহার মন, বুদ্ধি, লীলা, চিত্ত, অহং, জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ থাকে।

একই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে জীব, ঈশ্বর ও পুরুষোত্তমের লীলা কেমন ভাবে ক্রিয়াশীল আছে বুঝুন। ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করুন।

ষট্‌চক্র ধ্যানের কথা

সহস্রার ধ্যান সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি। ষট্‌চক্র ধ্যান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধকগণ যেন কোন চক্রের ধ্যানকেই বেশী লম্বা করিবেন না। বরং চক্রধ্যান অত্যন্ত সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটা চক্রে ৫, ৭ সেকেণ্ড যথেষ্ট। মনে ও স্নায়ুতন্তুতে যেন চাপ না পড়ে। খুব হালকা মনে ধ্যান করা প্রয়োজন। অনেকে ধ্যান করিতে করিতে কেন্দ্রবিশেষে প্রচুর আরাম পান। এইরূপ পরিস্থিতিতে একটা চক্রে অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করা চলে। ষট্‌চক্র ধ্যান করিতে হইলে প্রথমেই মূলাধার চক্রে একটু সময় কুণ্ডলিনী ধ্যান করিবেন। চক্রধ্যানের বিশেষ নিয়ম এই যে চক্রগুলির মুখ পেছন দিকে আছে, এইরূপভাবে দেখিতে হয়। কোন চক্রে কোন মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইলেও মূর্ত্তির মুখটি বা মূর্ত্তির সামনাটি ধ্যানকারীর পেছন দিকে আছে, দেখিতে হইবে। চক্রের বর্ণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ডান দিকে অর্দ্ধেক ও বামদিকে অর্দ্ধেক, অত্যন্ত হালকা মনে দেখিয়া যাইবেন। মূলাধারে চারটি বর্ণ - বং, শং, ষং, সং। ডান দিকে বং শং এবং বাম ভাগে ষং, সং দেখিবেন। গুরু পাদুকার নিয়মে প্রত্যেক চক্রের বর্ণবিন্যাস করা প্রয়োজন।

মূলাধার হইতে বর্ণধ্যান করিতে করিতে সহস্রার এর কেন্দ্র পর্য্যন্ত আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রার কেন্দ্র হইতে অমৃতধারা বর্ষিত হইতে থাকিবে এবং সেই সব অমৃতকণাদ্বারা প্রত্যেক চক্রের বর্ণগুলি অতি দ্রুত গড়িয়া উঠিবে। যখন এইরূপ অনুভব আসিবে, তখন জানিতে হইবে ঠিক ঠিক হালকা মনে ও স্বাভাবিক ভাবে ও নিশ্চিন্ত ভাবে বর্ণধ্যান হইয়াছে। যদি বর্ণধ্যানের ফলে এইরূপ অনুভব না আসে তবে সহস্রার হইতে ক্রমে আবার বিলোমে মূলাধার পর্য্যন্ত পুনঃ বর্ণধ্যান করিবেন। এবং পরে ব্রহ্মনাড়ীর পথে গুরুপাদুকায় প্রবেশ করিবেন। বর্ণধ্যান বেশী করিবার প্রয়োজন হয় না। ধ্যানে আরাম হওয়া চাই এবং ধ্যানদ্বারা আরাম পাওয়া চাই। ইহা ভিন্ন ধ্যান ধ্যানই নহে। স্নায়ুতন্তুতে চাপ না পড়িলে যতক্ষণ ইচ্ছা ধ্যান করা চলে; কিন্তু স্নায়ুতন্তুতে আঘাত লইয়া যেন ধ্যান না করা হয়। সব সময় ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান ভাল।

তত্ত্বধ্যান। ষট্ চক্রকেন্দ্রে তত্ত্বধ্যান করিতে হয়। মানস পূজায় তত্ত্বধ্যান গৃহীত হইয়াছে। ষট্‌চক্রের একপ্রান্তে গুরুপাদুকা অন্যপ্রান্তে কুণ্ডলিনী শক্তি। তত্ত্বধ্যানে মূলাধারে লং বীজ, স্বাধিষ্ঠানে বং বীজ, মণিপুরে রং বীজ, অনাহতে যং বীজ, বিশুদ্ধায় হং বীজ এবং আজ্ঞায় ওঁ বীজ চিন্তা করিবেন। তত্ত্বধ্যানের পথে মনকে ঠিক ঠিক পরিচালিত করিলে দেখা যায়, বিশুদ্ধাখ্য পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে মন একেবারে আকাশের মত স্বচ্ছ ও খালি হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আজ্ঞায় আর কোন আকারই ফোটে না। বর্ণধ্যানের সঙ্গে তত্ত্বধ্যান মিলাইবেন না এবং তত্ত্বধ্যানের সঙ্গেও বর্ণধ্যান মিলাইবেন না। কয়েকমাস ধরিয়া শুধু বর্ণধ্যান করিতে হয় এবং কয়েকমাস ধরিয়া শুধু তত্ত্বধ্যান করিতে হয়। সাধকের প্রথম ও শেষ অবলম্বন ব্রহ্মনাড়ী।

ষট্‌চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি ঈশ্বর ধ্যান, অজপা সাধনায় গৃহীত হইয়াছে। ষট্‌চক্রে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও যোগিনীর ধ্যান করিতে হয়। আমরা সাধকগণকে বলিয়া রাখি, যেন কোন ধ্যানকালেই অন্য ধ্যান করিবেন না। অনেক সময় চক্রবিশেষে আশ্চর্য্য শক্তি, দেবতা ও মহাপুরুষ-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা যায় এবং উঁহারা কয়েকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ভাবে দৃশ্যমানও থাকেন, দেখা যায়। মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে ব্যস্ত হইবার কোনই কারণ নাই। বিনা কল্পনায় যাঁহারা দর্শন দেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ভিন্ন এখানে আমাদের কিছুই করণীয় নাই। সাধক জানিয়া রাখুন, ষট্‌চক্র সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর। এবং উহারা এক একটি স্তরের সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। যে কোন সত্য অনুভূতি বা দর্শনকে কেন্দ্র করিয়া সেই স্তরের অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। ঐ সব স্তরে বহু সূক্ষ্ম শরীরী আত্মা অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে ভোগ নৈবেদ্য আদি দ্বারা তৃপ্ত করিলে, তাঁহারা সাধকের অসীম কল্যাণ করেন। পূজার নৈবেদ্য ঈশ্বর ভোজন করেন না; কিন্তু পূজার উপকরণ দ্বারা বিভিন্ন স্তরের সূক্ষ্ম শরীরীগণ ও সাধকের প্রাণ তৃপ্তি লাভ করেন এবং তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন এবং শরীর ভাল থাকে। শক্তিপূজায় এই জন্যই সব সময়ই অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিবেদন কর্ত্তব্য। পূজা ও যজ্ঞে স্থান শুদ্ধি, মনোশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির দিকে বিশেষ নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। ইহার ফলে উন্নতস্তরের শুদ্ধ আত্মারা আকৃষ্ট হন এবং আশীর্ব্বাদ করেন। শুদ্ধির অভাবে দুষ্ট আত্মাদের আগমন হয় এবং কোন কোন সময় ইহারা ক্ষতির কারণ হয়। ম্লেচ্ছাচারে চুম্বনে পিশাচ উপদেবতা ও দুষ্ট আত্মারা তুষ্ট হন এবং অসুরবাদিগণকে সাহায্য করেন। মক্কায় ও তাজিয়া উৎসবে যে সব অনুষ্ঠান হয়, উহাদ্বারা দুষ্ট পিশাচের তুষ্টি হয়।

প্রাণকেন্দ্র (৯ নং) ও উহার শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচনা আমরা করি নাই। প্রাণশক্তির কার্য্যধারাকে বিদ্যুৎ শক্তির সহিত তুলনা করা যায়। ইহার শক্তিধারা ব্রহ্মনাড়ী ভিন্ন সমস্ত নাড়ী মণ্ডলে ব্যাপ্ত আছে। নাড়ীগুলিতে প্রাণশক্তি যদি না থাকে তবে সেই নাড়ী পথে কোন কেন্দ্রই অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কোনও প্রকার আদানপ্রদান করিতে পারে না।

বায়ু পিত্ত ও কফ

এই তিনটি ধাতু সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসকগণ প্রচুর জ্ঞান রাখেন। এই তিনটি ধাতুর গতিবিধির সহিত নাড়ীজগতের সম্বন্ধ আছে। কফ ধাতুর মূল উৎস মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্র। ইহার সঙ্গে মেরুদণ্ড সঙ্গে সংযুক্ত নাড়ী গুলির কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে সূক্ষ্ম কফ, নাড়ী জগতে পরিবেশিত হয় এবং শরীরের সমস্ত যন্ত্রে পরিচালিত হয়। শরীরের কোন অংশে কোন প্রকারে কফ জমিয়া গেলে বা কফ শুকাইয়া গেলে সেই যন্ত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। শরীরের সমস্ত দ্বারে ও সংযোগ স্থানে এবং সমস্ত প্রকার মল ও শুক্রবাহী যন্ত্রে, রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুর গমনাগমন পথে কফ বিদ্যমান না থাকিলে কোন প্রকারের গমন পথই পিচ্ছিল থাকে না। এবং কোন বোধ বা ধাতুই গমনাগমন করিতে পারে না। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লসিকাগ্রন্থি হইতে কফস্রাব হয়। এ সব লসিকার মূলস্থান শিবকেন্দ্র।

পিত্ত ধাতুর মূল উৎস মস্তিষ্কস্থিত কর্ম্মকেন্দ্র (১নং কেন্দ্র)। এই কেন্দ্রের সঙ্গে যে সব নাড়ী মেরুদণ্ডের কেন্দ্রে সম্বন্ধ রাখে সেইগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শরীরস্থিত অগ্নিই স্থূলরূপে পিত্ত। ইহারও স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ আছে। স্থূল অগ্নি সমস্ত যন্ত্রে রক্তের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। ইহার প্রধান স্থূল কার্য্য পাচনযন্ত্রে পরিচালিত হয়।

বায়ু ধাতুর মূলস্থান মস্তিষ্কস্থিত প্রাণ (৯নং কেন্দ্র) কেন্দ্রে বিদ্যমান। এখান হইতে যে সব নাড়ী মেরুদণ্ডে প্রসারিত আছে সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ইহার স্থূল কার্য্য প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য নামে পরিচিত। সূক্ষ্ম প্রাণ সমস্ত নাড়ীমণ্ডলে ব্যাপ্ত আছে। সমস্ত নাড়ীতে প্রাণের গতি আছে বলিয়াই এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে বার্ত্তা গমনাগমন করিতে পারে। নাড়ী গুলিকে নরম ও স্নিগ্ধ রাখা সূক্ষ্ম কফধাতুর কার্য্য। ইহা না থাকিলে নাড়ীজগৎ শুষ্ক হয় এবং এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রের আদান প্রদান কষ্টদায়ক ও ব্যথাদায়ক হয়। অগ্নিরও সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্য আছে। নাড়ী জগতে ও স্থূল শরীরযন্ত্রের উষ্ণতা না থাকিলে শরীরের কোন কার্য্যই থাকে না। অগ্নির অগ্নিকার্য্য স্থানবিশেষে কম হইলে সেখানে ব্যথা হয়। পাঠক জানিয়া রাখুন শরীরস্থিত জ্ঞানজগতে, মনোজগতে এবং শরীরের স্থূল কার্য্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ অত্যন্ত সহযোগিতার সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহার যে কোন একটিকে বুঝিবার মত মন ও বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলে অন্য দুইটিকেও বুঝা যায়। এই তিনের একটি বিকল হইলে শরীরে ও মনে গ্লানি দেখা দিবে। সূক্ষ্ম মনোজগতে ইহাদের বিকৃতি হইলে মাথার রোগ ও উন্মাদ রোগ দেখা দিবে ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অকর্ম্মণ্য হইবে। মনোজগতের বিকৃতি অধিকাংশ স্থলেই নাড়ীজগতের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য হইয়া থাকে। ফলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা যন্ত্রবিশেষ অচল হইতে পারে।

মূলাধার হইতে চিত্রিণী নাড়ী মস্তিষ্কের শিবকেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। ইহা কফের নাড়ী। মূলাধার হইতে প্রাণনাড়ী মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। মূলাধার হইতে সুতীব্রা নাড়ী মস্তিষ্কের কর্ম্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। কাজেই দেখা যায়, মূলাধারই সমস্ত শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুখের কেন্দ্র। কাজেই মূলাধার ধ্যান করিলে বায়ু পিত্ত ও কফের কার্য্য সাম্য থাকে। স্নিগ্ধ অবস্থায় এই কেন্দ্রধ্যান ভাল। অগ্নি বিকৃতি হইলে অর্থাৎ হজমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে নাভিকুণ্ড ধ্যান করিবে। বায়ু বিকৃতি হইলে মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্র ধ্যান করিবে। আল্‌জিহ্বার পেছনে ব্রহ্মনাড়ীতে মনস্থির করিলেও বায়ুসাম্য হয়। নাভিতে মন দিলেও বায়ু ও মন সাম্য হয়। সহস্রার মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গ ধ্যান করিলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল থাকে ও বায়ু সাম্য থাকে। মণিপুর কেন্দ্র ধ্যান করা অপেক্ষা নাভিকুণ্ড ধ্যান শরীরের জন্য বেশী উপকারী। স্থূল হৃদয়ে (বুকে) কখনও কিছু ধ্যান করিবে না। ইহাতে হৃদয়ে বায়ু জমিয়া যায় এবং বুক দুর্ব্বল হয়। নরনারীর ভালবাসার চিন্তায়ও বুকে বায়ু জমিয়া যায়। ইহারা সব কষ্টদায়ক বায়ু। অনাহত কেন্দ্রে ধ্যান করা চলে, কিন্তু স্থূল বুকে ধ্যানের ফলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিবে। যাহারা ব্লাড্‌প্রেসারের রোগী, তাহারা নাভিকুণ্ড, আল্‌জিহ্বার পশ্চাতে ব্রহ্মনাড়ী, শিবপিণ্ড অথবা শিবকেন্দ্র ধ্যান করিলে ভাল থাকিবে এবং ধীরে ধীরে ভাল হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগের ধাপ্পাবাজ, পাপী, সদলপোষক ও নিরীহ জনতার সর্ব্বনাশকারী শাসকদের রাজ্যকালে মানুষের মনে শান্তি থাকিতেই পারে না। এবং বিশ্বেও অশান্তি ও দুঃখ বৃদ্ধি

হইবে; কাজেই মানুষের মনের অশান্তি ও চঞ্চলতা (বায়ু) দুইই বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং মানুষের চেষ্টা করিয়া শিবধারা পাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দিনের মধ্যে অন্ততঃ ১০ বার যখনই সুবিধা হইবে, তখনই ৫ সেকেণ্ডও নাভিকুণ্ড ধ্যান করিবে। শিবের ধারা মন বেশী খরচ করিয়া ফেলিলে প্রাণ স্নিগ্ধ থাকে না। ফলে গাত্রদাহ, মাথা জ্বালা, ব্লাড্‌প্রেসার, অস্থিরতা ও দুঃখ বৃদ্ধি হয়। সকলে চেষ্টা করিবে, যাহাতে 'প্রাণ' জগৎ প্রচুর অমৃতধারা ভোগ করিতে পারে এবং মন শুদ্ধ থাকে। ঋষি + রাজ শাসনের ফলে পৃথিবীতে অন্নের ও শান্তির প্রাচুর্য্য থাকে এবং মানুষের মনে শান্তি থাকে। ঋষি ও রাজশক্তিবিহীন এবং ধাপ্পাবাজ ও পাপীদের শাসনের ফলে মানুষের মন গরম ও উত্তেজিত থাকে ও পৃথিবী শস্যহীন হয়। মন গরম হইলেই সমান বায়ু (নাভি) গরম হইবে, ফলে মল ও মূত্র সম্বন্ধীয় অসুখ হইবে। নাভিকুণ্ড ধ্যানে সমান বায়ু গরম হইতে পারে না।

শরীরে প্রাণের কার্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে। আমরা সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি।

ধারণং চালনং ক্ষেপ সংকোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষ্যতে॥ ২৩
হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥ ৭০
ব্যান সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্ব গাত্রেষু সংস্থিতঃ।
নাগ ঊর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ॥ ৭১
কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোঽপি জৃম্ভণে।
ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব সাম্যতি॥ ৭২
এষ বায়ু নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ॥ ৭৩
জ্ঞান সংকলনী তন্ত্রম্॥

প্রাণ, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগ

প্রাণশক্তির প্রধান পুষ্টি ব্রহ্মচর্য্যে। ব্রহ্মচর্য্যের স্পষ্ট অর্থ স্ত্রী পুরুষের সংস্পর্শহীন জীবনে সুখানুভব। আমাদের মনে হয়, ইহার তুল্য কঠিন জীবন আর হইতে পারে না। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতম কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পদের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রাণশক্তির অবাধ গতি। ইহার যে কোন স্থানে সামান্য বিশৃঙ্খল হইলে সেখানে তৎক্ষণাৎ বায়ু জমিয়া যাইবে এবং মৃদু ব্যথা হইবে এবং সেখানে সেবা লইবার কারণ ঘটিবে। যদি তুমি বেশীক্ষণ পা ঝুলাইয়া বস, তবে তোমার পায়ে ব্যথা হইবে। তুমি যদি সচ্ছল ভাবে হাত পা ছড়াইয়া একক নিদ্রা যাইতে না পার, তবে তোমার শরীরে গ্লানি দেখা দিবে। ক্ষুধাকালে যদি তুমি আহার না কর, তোমার পেটে বায়ু জমিবে। যদি তুমি কাউকে ভালবাস, তোমার বুকে বায়ু জমিবে, তুমি যদি তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী বা প্রিয়তমকে অবিচার কর, তোমার বুকে বায়ু জমিবে। তুমি যদি অপাত্রে স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বাঁধন আঁটিয়া দাও, তুমি ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হইবে। আমাদের অহংকারটী সংস্কার, মোহ, ইচ্ছা ও ভ্রান্তি বশতঃ শরীরের বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে বায়ুর চাপ সৃষ্টি করে, ফলে

আমাদিগকে ভোগের পথে নামিতে হয়। এই ভোগ যদি শরীর পুষ্টির কারণ না হইয়া ক্ষয়ের কারণ হয় এবং বিবেকবিরুদ্ধ হয়, তবে উহা ব্রহ্মচর্য্য বিরুদ্ধ শক্তির কার্য্যস্থল হইবে।

ইন্দ্রিয় শক্তির বৈকল্যে, শরীরযন্ত্রের বৈকল্যে, বা মানস কারণে, শরীরস্থিত মর্ম্মকেন্দ্রে বায়ু জমিয়া চাপ সৃষ্টি করিলে, বিভিন্ন কেন্দ্রে মর্ম্মব্যথা উৎপন্ন হয়। দেখা যায়, স্ত্রী পুরুষ মিলনে অধিকাংশ মর্ম্মব্যথা সাম্য হয়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, স্ত্রী পুরুষ মিলনে মর্ম্মতৃপ্তি না হইয়া অতৃপ্তি বায়ু উৎপন্ন হয় এবং এভাবেও জ্ঞাননাশক বায়ু বিভিন্ন মর্ম্মকেন্দ্রে উৎপন্ন হইয়া নানাপ্রকার মর্ম্মবিকৃতি রোগ দেখা দেয়।

আমরা ঘরে ঘরে, নরনারীতে অশান্তি দেখিতে পাই। জলবায়ু, শুচিবায়ু, ধূলাবায়ু, বিদ্বেষ বায়ু, সন্দেহ বায়ু, ঈর্ষা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, দুঃখ, বিষাদ আদি দেখিতে পাই, ইহারা সবই প্রাণশক্তির মর্ম্ম বিশেষে বিকৃতির লক্ষণ। কুণ্ডলিনী জাগরণ ভিন্ন মর্ম্মের স্বচ্ছতা আসে না। আবার মন ও বায়ু যথেষ্ট স্বচ্ছ না হইলে কুণ্ডলিনী জাগরণও হয় না।

শিবস্তরের সরল ও নিঃসঙ্গজীবন এবং ব্রহ্মচর্য্যময় পবিত্র জীবনই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখময় জীবন। এইরূপ জীবন কেবল প্রাণশক্তিই দিতে পারে। এই পবিত্র জীবনের নীতির জন্যই ব্রহ্মচারিগণ আহারকালে গণ্ডুষ করেন। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় বায়ুকে অন্ন নিবেদন করেন এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবায়ুকে আহুতি দান করেন। বায়ুর স্বচ্ছতাই ব্রহ্মচর্য্য এবং বায়ুর বিকৃতি যদি বহুদিন চলিতে থাকে তবে সাধকের জীবন সংসারপথে আসিবে এবং জীবন জ্ঞানের পথে অযোগ্য হইয়া যাইবে। নিত্য ভোজনকালে এই দশটি বায়ু কি ভাবে শরীরে কাজ করেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ১০, ১৫ সেকেণ্ড চিন্তা করিয়া আহার আরম্ভ করিবে।

প্রারব্ধবশে অনেক উচ্চ স্তরের মহাপুরুষকে সাময়িকভাবে ভোগের দিকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে ভীষণ লাঞ্ছনাময় জীবন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষ মর্ম্মকেন্দ্রে বায়ুর অস্বাভাবিক চাপের সঙ্গে যুদ্ধে একমাত্র প্রারব্ধই মহাযোগীকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। হে প্রাণ দেবতা! তোমার আসীম শক্তি। তুমিই কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রধান সহায়ক ব্রহ্মচর্য্য ও কন্দর্পবায়ু এবং তুমিই মহাযোগীর কর্ম্মকেন্দ্রে প্রবল প্রারব্ধকর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবিত চাপ সৃষ্টি কর এবং মহাপুরুষদ্বারা সাময়িক ভাবে অসাধ্য সাধন করাইয়া থাক। প্রাণদেবতা, তোমাকে অনেক প্রণাম।

গ্রন্থে অনেক নাড়ীর কথা আছে। বিমলযশা ও ধ্যানশ্রীয়া এবং বিশোকার অনুভূতি বেশ উচ্চস্তরের অনুভূতি, ইহাতে সন্দেহ নাই। এসব নাড়ীর বোধ পর্য্যন্ত, সাধকগণ কুণ্ডলিনীজাগরণ ভিন্নও প্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ‘অহং’ কেন্দ্রভেদের জন্য কুণ্ডলিনী-কম্পন ভিন্ন পথ নাই। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণ ব্যতীত রুদ্রগ্রন্থিভেদ অসম্ভব। রুদ্রগ্রন্থিভেদ না হইলে জ্ঞান স্থায়ী হইবে না। হঠাৎ বুদ্ধত্ব বা জ্ঞান মানেই কুণ্ডলিনীক্রিয়া।

মর্ম্মবিকারের প্রতিক্রিয়া মানবের জন্মজন্মান্তরেও সঞ্চারিত হয়। ভোগ, আশা ও ভালবাসা, মানসবিকৃতির এই তিনটি কেন্দ্র। ভোগে অতৃপ্তি, আশায় ভঙ্গতা, ভালবাসায় আঘাত আসিবেই। কাজেই মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই তিনটিকে দৃঢ়তার সহিত অতিক্রম করিয়া যাওয়া। বিশোকা নাড়ীর আলোচনায় ‘কায়াকাশ’ ধ্যানের কথা আছে।

‘কায়াকাশ’ ধ্যান খুব ভাল ভাবে হওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে বিকৃত বায়ুদ্বারা কোনও প্রকার মর্ম্মবিকৃতি যে কোন কেন্দ্রেই হউক না কেন, উহা ধুইয়া যাইবে এবং মর্ম্ম নির্ম্মল হইবে। শৈশবে প্রাণদেবতা আমাদের সমস্ত শরীরে সমান ভাবে ও ব্যাপক ভাবে অবস্থান করেন। যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর জননযন্ত্রে প্রাণের সুখ-স্পৃহা কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বেই মণিপুর কেন্দ্রে নানা প্রকার বিচিত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় ও তদনুরূপ কাল্পনিক সুখ-স্বপ্ন সৃষ্টি হয়। যৌবন আরও পরিপক্ক হইলে অনাহতকেন্দ্রেও প্রাণের প্রভাব কেন্দ্রীভূত হয়। আমরা যোগীদের ভাষায় বলিতে পারি, প্রাণ অন্যায় ভাবে এই তিনটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয়; প্রাণ তাহার স্বাভাবিক ব্যাপকত্ব হারাইয়া ফেলে। ভোগে ও সংসারে প্রবেশের মূলে জীবের যে এত আকর্ষণ, ইহার মূলে প্রাণের এই অস্বাভাবিক সংগঠন-কার্য্যই দায়ী। “কায়াকাশ” সম্বন্ধে প্রাণকে মনের সঙ্গে সমস্ত শরীরে ও ব্রহ্মনাড়ীতে আবার ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহা ছড়াইয়া দেওয়া কঠিন কার্য্য নহে। যাহারা সংসার জীবনে, ভোগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য চায় এবং যাহারা কৌমার্য্য জীবনে নিগ্রহহীন ব্রহ্মচর্য্যের বিজ্ঞান বুঝিতে চায়, তাহাদের সকলের জন্য “কায়াকাশ ধ্যান” ও “ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান” দৃঢ়তার সহিত অবলম্বনীয়। প্রাণ যাহাতে কেন্দ্র বিশেষে জমিতে না পারে এজন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হয়। তবেই ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধি, ও ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি সম্ভব। এ পথে চলিয়াও যদি দেখা যায় শরীর গরম হইতেছে, তখন শিবধারার দিকে মনকে নিবিষ্ট করিয়া ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করা কর্ত্তব্য। উন্নত স্তরের যোগীকে কোনও প্রকার বিরক্ত না করিয়া এবং তাঁহার অনুকূলে থাকিয়া ধীরে ধীরে সব জানিতে হয়। মর্ম্মবিকার ও মর্ম্মনিগ্রহগুলির মধ্যে যে যেগুলি অন্য জন্মের সম্বন্ধ রাখে না, সেগুলি সহজেই অতিক্রম করা যায়। আর যেগুলির সঙ্গে অন্য জন্মের সম্বন্ধ জড়িত সেগুলি দীর্ঘকাল চেষ্টা দ্বারা অতিক্রম করিতে হয়। জ্ঞানের পথে চলিতে হইলে সবই অতিক্রম করিতে হইবে, এবং এ জন্য শক্ত ও দৃঢ় হইতে হইবে। মর্ম্মবিকারে বিকারগ্রস্ত অনেক নারীরই ধারণা তাঁহারা ভালবাসিয়া স্বামীকে কৃতার্থ করিয়াছেন; যাহার ফলে স্বামী-স্ত্রীকে ভীষণ কষ্ট পাইতে হয়।

বেদ উপনিষদ ও শাস্ত্রে নাড়ীতত্ত্ব প্রসঙ্গ

বৈদিক সন্ধ্যায় ও যজ্ঞে ব্যাহৃতি মহাব্যাহৃতির কথা আছে। ঐ সব মন্ত্র সবই ব্রহ্মনাড়ী ও উহার মধ্যস্থিত কেন্দ্র সম্বন্ধীয়।

উপনিষদে ব্রহ্মনাড়ী ও অন্যান্য নাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

“ওঁ শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য
স্তাসাং মূর্দ্ধান মভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্ত্ব মেতি বিম্বঙ্ ঙন্যা
উৎক্রমণে ভবন্তি॥” কঠ॥ ১২৫॥*

* প্রকাশকের নিবেদন - শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদে এই শ্লোকটির উল্লেখ “কঠ ১১৭”।

"হৃদয়ে (মস্তিষ্ক ও মেরুমর্ম্ম প্রদেশের নাম হৃদয়) একশত একটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী (ব্রহ্মনাড়ী) ব্রহ্মরন্ধ্রে নির্গত হইয়াছে। (সাধক) ঐ নাড়ীদ্বারা ঊর্দ্ধগমন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীগুলি অন্যান্য লোকে গমনের কারণ হয়।"

তন্ত্র শাস্ত্র তো নাড়ীতত্ত্বেরই শাস্ত্র। আমরা এই সম্বন্ধেও উল্লেখ করিলাম।

দেব্যুবাচ। নাড়ীভেদঞ্চমে ব্রূহি সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতম্।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশনাড়িকাঃ॥ ৭৪
ঈশ্বরউবাচ। ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসরা গমনায়তা॥ ৭৫
অলম্বুষা যশাঃ চৈব দক্ষিণাঙ্গে চ সংস্থিতাঃ।
কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতাঃ॥ ৭৬
এতাষু দশনাড়ীষু নানানাড়ী প্রসূতিকা।
দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি শরীরে নাড়িকাঃ স্মৃতা॥ ৭৭
এতা যো বিন্দতে যোগীঃ সযোগী যোগলক্ষণঃ।
জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনি॥ ৭৮
জ্ঞান সংকলনী তন্ত্রম্॥

নাড়ী ও কেন্দ্রসংস্থানে দেবদেবী

নাড়ী সংস্থানে সমস্ত দেব দেবী পরিকল্পিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা হইয়াছে। বিশেষ আরও দুইচার কথা বলা যাইতেছে।

চণ্ডীর মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। ব্রহ্মনাড়ীই মহাশক্তি। এই মহাশক্তিকে মস্তিষ্কস্থিত অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে অনুভব করিলে, ইনিই মহাকালী হন। ব্রহ্মনাড়ী বা মহাশক্তিকে মস্তিষ্কস্থিত বিষ্ণুকেন্দ্র হইতে অনুভব করিলে মহালক্ষ্মীরূপ ধারণ করেন। এই মহাশক্তিকে মহৎকেন্দ্র হইতে অনুভব করিলে ইনি মহাসরস্বতী হন। এই সব শক্তিই ধন, জ্ঞান, প্রতিষ্ঠা ও কর্ত্তৃত্ব দানকারী শক্তি। ইঁহারা সকলেই অসুরনাশিনী ও সিংহবাহিনী।

কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কালী ও মহাকালী একই স্তর, কারণ অব্যক্তস্তর ও শক্তিস্তর একই স্তর। ব্রহ্মনাড়ীর সংযোগহীন বিষ্ণুস্তরের শক্তিই লক্ষ্মী। ইনি যুদ্ধ ও জ্ঞান ভালবাসেন না। এবং বিলাসিতা পছন্দ করেন। এজন্য এই লক্ষ্মী দ্বিনয়না ও পেচক (দিব্যদৃষ্টিহীন জীব) ইঁহার বাহন। আমাদের দেশে সরস্বতীরও পূজা হয়। ইনি শিবস্তরের (মহৎ) শক্তি। ইনি জ্ঞান ও যোগ ভালবাসেন। গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরের মানুষ যদি উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষের সঙ্গ না পান তবে ইঁহাদের সমাজকার্য্য অসুরবাদের অনুকূল হয়। কাজেই উন্নত শিবস্তরের, মহৎ, অব্যক্ত ও শক্তিস্তরের দেবদেবীরা সকলেই অসুরনাশক। এজন্য সরস্বতী ও মহাসরস্বতী দুইই অসুরনাশক।

গায়ত্রী। গায়ত্রীর তিন মূর্ত্তির কথা সকলেই জানেন। ইহাও মহাশক্তির উপাসনা। ব্রহ্মনাড়ীকে মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্র (৯ নং) হইতে অনুভব করিলে ইনি ব্রহ্মাণী হন। এই ব্রহ্মাণী কৌমারী-শক্তি ও ব্রহ্মচারিণী। প্রাণকেন্দ্রের প্রভাব সমস্ত শরীরে বিদ্যমান। ব্রহ্মনাড়ীকে বিষ্ণুকেন্দ্র (৩ নং) হইতে অনুভব করিলে ইনি বৈষ্ণবী হন। মহালক্ষ্মীই

বৈষ্ণবী। দুর্গাপূজায় এই বৈষ্ণবী শক্তিরই পূজা হয়। সায়ং সন্ধ্যায় রুদ্রাণীর উপাসনা হয়। ব্রহ্মনাড়ীকে মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্র (৪ নং) হইতে অনুভব করাই রুদ্রাণীর উপাসনা, তান্ত্রিক দীক্ষায় তুরীয়া শক্তির উপাসনা হয়। ইহা অব্যক্ত ও ব্রহ্মনাড়ীর উপাসনা। দুর্গাপূজায় বোধন, ব্রহ্মনাড়ীস্থিত মূলাধারের উপাসনা। এখানেই মহাশক্তির জাগরণ হয়। ইহা কুণ্ডলিনী জাগরণ।

অর্থ ও অন্নশক্তি। মানবজীবনে অর্থ ও অন্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্তি। মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বা মেরুদণ্ডের যে কোন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, উহার যে কোন একটির অনুভূতি জাগ্রত করিতে পারিলে অন্নের অভাব থাকিবে না। যে দেশের রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক শক্তিবাদী ও অসুরবিরোধী এবং যাঁহার অনুভবে মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্র হইতে প্রবাহিত কোন একটি নাড়ীরও অনুভব আছে, তাঁহার রাজ্যে অন্নের হাহাকার থাকে না। বৃহস্পতিবার সায়ংকালে বেদ, গীতা, উপনিষদ, চণ্ডী, অথবা কৃপাণ দ্বারা আসন সাজাইবে এবং ধন বৃদ্ধির জন্য শিবধারা ধ্যানসহ উপাসনা করিবে। ইহা বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম ও জ্ঞানবর্দ্ধক অনুষ্ঠান। অসুরনাশের জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান মঙ্গলবারে করিবে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিবে। দুঃখনাশের জন্য শনিবার সায়ং কালে অনুষ্ঠান করিবে। এসব অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিবে। নিত্য সকাল সন্ধ্যায় ধূপ ও দীপ দানকালে বা মন্দিরে দেবদর্শনকালে শিবধারা ধ্যান করিবে। উপাসনার পর মূলাধারধ্যান সহ প্রণাম করিবে। ইহাতে ধন, বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

শক্তিবাদ আয়ত্ত করিবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান ও মূলাধার ধ্যান ও মূলাধার চিন্তা এবং কর্ম্ম, সুখ, শান্তি, অন্ন ও অর্থের প্রাচুর্য্যের জন্য শিবধারা, বিষ্ণুধারা ও সূর্য্যধারার অনুশীলন করিবে।

নাড়ী সংস্থান ও যন্ত্রতত্ত্ব

তন্ত্রে অনেক প্রকার যন্ত্রের কথা আছে। যন্ত্রতত্ত্ব অত্যন্ত উচ্চ স্তরের মনোবিকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। যন্ত্র অঙ্কনে মনের উপর বিশেষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। মন কি ভাবে শক্তিশালী হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার সময় এখনও হয় নাই। পৃথিবীতে যত প্রকারের ভাষা লিখিবার বিধান আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সব বিধানগুলি যন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। দেবনাগর (দেবতারা যে সব নগরে বাস করেন, সেই স্থানে ব্যবহৃত বর্ণমালাকে দেবনাগর বর্ণমালা বলে), লেটিন, আরবী, পারশী, বাঙ্গলা প্রভৃতি বর্ণমালার আকার এক প্রকারের নহে। বর্ণমালার আকারগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা সেই সব বর্ণমালায় কোন স্তরের চিন্তাধারা প্রকাশ পাইয়াছে, উহা স্থির করিতে পারি। যাঁহারা বর্ণমালার মূর্ত্তিগুলি পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনোবিকাশ ঐ সব বর্ণমালাগুলির আকারের মধ্যে নিহিত আছে। একটা দেশে একই সময় তিনজন বৈজ্ঞানিক তিনটি বর্ণমালার নির্দ্দেশ দিলেন; কিন্তু দেশ গ্রহণ করিল একটি। কেন একটি গ্রহণ করিল অন্য দুইটি গ্রহণ করিল না, ইহার কারণ আছে। ইহার কারণ, একটা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের চরিত্রে যে স্তরের প্রভাব বেশী, দেশ সেই স্তরের বর্ণমালা গ্রহণ করিবে। যন্ত্রতত্ত্বের এই গূঢ় বিজ্ঞান ভাবজগতের মতই সত্য। শক্তিবাদী বঙ্কিম চন্দ্রের

“বন্দেমাতরম্” এর অঙ্গচ্ছেদ ও বহিষ্কার, দুর্ব্বলবাদী কংগ্রেসের কীর্ত্তিতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। শক্তিবাদী বঙ্গদেশ ভাববাদের দিকে ঝুঁকিবার দরুণ কিরূপ অধঃপতন বরণ করিয়াছে, উহা বাংলার সর্ব্বতোমুখী অধঃপতনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম, সঙ্গীত, রাজনীতি, সমাজ, ব্যক্তিগত চরিত্র, সর্ব্বত্র বাংলার উপর একটা সাংঘাতিক ভাববাদিতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। এ সময় যদি বাংলাকে কেহ খোল করতালের মত গোল আকার বিশিষ্ট ইংরেজী বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করিতে বলে, তবে বাংলায় উহার প্রতিবাদের লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে।

উচ্চস্তরের মহাপুরুষ যে সব বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেগুলির সঙ্গে দুর্ব্বলস্তরের মহাত্মাদের প্রবর্ত্তিত বর্ণমালায় ভেদ আছে। শক্তিস্তরের বর্ণমালা, শিবস্তরের বর্ণমালা, বিষ্ণুস্তরের বর্ণমালা, সূর্য্যস্তরের বর্ণমালা ও গণেশ-স্তরের বর্ণমালা সম্বন্ধে মোটামুটি আভাষ দিলে, পাঠক যন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু সামান্য আভাষ বুঝিতে পারিবেন।

শক্তিস্তরের বর্ণমালা ত্রিকোণ প্রধান। এই বর্ণমালা সবচেয়ে শক্তিশালী। ত্রিকোণ অগ্নিতত্ত্ব। অত্যন্ত তেজস্বী মহাত্মাদ্বারা প্রবর্ত্তিত বর্ণমালা ত্রিকোণাকার হয়। বঙ্গদেশে এই বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত আছে। বর্ণমালা-তন্ত্রে এই বর্ণমালাই গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় বর্ত্তমানে যেরূপ মূর্খতা ও ভাববাদিতার ছড়াছড়ি দেখা দিয়াছে, উহার ফলে, বাংলার এই শক্তিবাদীয় বর্ণমালা গোলাকার হইবার দিকে গতি লইবে কিনা, কে জানে? আমরা ভারতবর্ষের লিখনীয় বর্ণমালা বাংলায় এবং ছাপার বর্ণমালা দেবনাগরের কথা বলিয়াছিলাম (শক্তিশালী সমাজ ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য)।

শিবস্তরের বর্ণমালা চতুষ্কোণ প্রধান। উচ্চ শিবস্তর ও নিম্ন শিবস্তর, শিবস্তরের এই দুই প্রকারের বিকাশের কথা আমাদের পাঠকগণ জানেন। দেবনাগর বর্ণমালা চতুষ্কোণ প্রধান। ইহা সাম্য ও ঠাণ্ডা বর্ণমালা। উচ্চ শিবস্তরের ঋষি ও নিম্ন শিবস্তরের জনসাধারণের জন্য ইহা ভাল বর্ণমালা। খুব ধীর ও শান্ত চিত্ত ভিন্ন অন্যদের জন্য এই বর্ণমালা লিখিতে আরাম-দায়ক হয় না। ইহা ঋষি বা শিবস্তরের মহাপুরুষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত বর্ণমালা।

বিষ্ণুস্তরের বর্ণমালা বক্ররেখা প্রধান। বিষ্ণুস্তরের দৈবী ও অসুর বিকাশই প্রধান বিকাশ (অপুষ্ট বিষ্ণু অপুষ্ট অসুরবিকাশ)। বিষ্ণুস্তরের চিন্তার গতি সব সময়ই বক্র। বাম হইতে ডানে লিখিলে ইহাই দৈবী বিষ্ণু বর্ণমালা হয় এবং ডান হইতে বাম দিকে (উল্টা) লিখিলে ইহাই আসুরিক বিষ্ণুস্তরের লেখা হয়। অসুরবিষ্ণু ও অপুষ্ট বিষ্ণুস্তরের এবং অসুরের দাসভাবাপন্নদের আসুরিক বর্ণমালা বেশী প্রিয় হয়। বিষ্ণুস্তরের বর্ণমালা তাড়াতাড়ি লিখিবার পক্ষে সুবিধাজনক। বেদ বিরোধী যবনবাদী হিন্দুরা এই বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সূর্য্যস্তরের বর্ণমালা ‘বর্ত্তুল’ প্রধান। ইহাকে গোলাকার ও অণ্ডাকার বর্ণমালা বলা যায়। ইহা লিখিতে ভাল ও আরামদায়ক। ইহা লোকপ্রিয়, কিন্তু দুর্ব্বল স্তরের বর্ণমালা। লেটিন বর্ণমালা এই স্তরের বর্ণমালা।

গণেশ স্তরের বর্ণমালা সরলরেখা প্রধান। ইহা সুবিধাজনক বর্ণমালা নহে। চীনদেশে এই বর্ণমালা প্রচলিত আছে।

তন্ত্র শাস্ত্র লৌকিক ও অলৌকিক সব কার্য্যেই যন্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছে। বিন্দু, রেখা, বর্ত্তুল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ ইত্যাদি প্রকারে যন্ত্রের লিখন হইয়া থাকে।

জ্যামিতি শাস্ত্রে ও স্থাপত্যবিজ্ঞানে বিন্দু, রেখা ও কোণাদির প্রয়োগ সকলেই জানেন; কিন্তু এই বিন্দু, রেখা ও কোণাদিকে কি ভাবে মনোজগতে ও শক্তিজগতে প্রয়োগ করা হয় এবং উহা দ্বারা আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সাধন করা হয়, উহা সত্যই বিস্ময়কর ঘটনা। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, শান্তি, বিদ্বেষণ এবং জ্ঞান ও বোধবিজ্ঞানে মনকে অনুকূল করিবার জন্য এবং রোগাদির শান্তির জন্য যন্ত্রের প্রয়োগ এবং উহাতে সুফল প্রাপ্তি, অনেক স্থানেই অস্বীকার করা যায় না।

উন্নত স্তরের শক্তিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য তন্ত্রে অনেক প্রকার যন্ত্রের প্রচার করিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে, যন্ত্রপূজা পূজাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। ত্রিকোণ যন্ত্রই যন্ত্রতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ কথা। যেখানে মনসংযোগ করা প্রয়োজন সেই খানেই তন্ত্র ত্রিকোণ যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা, আজ্ঞা, গুরুপাদুকা, সহস্রার, সর্ব্বত্রই তন্ত্র ত্রিকোণযন্ত্রে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন। ইহার অর্থ মনকে ঐ যন্ত্রের মধ্য দিয়া উক্ত কেন্দ্রের শক্তিরূপে পরিণত করা। দুর্গা, কালী, তারা ও ত্রিপুরা উপাসনায় ত্রিকোণ যন্ত্রের প্রয়োগ অত্যন্ত অলঙ্ঘনীয় ভাবে গৃহীত হইয়াছে। মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকায় নাড়ী ছয়টি; (১) বিমলযশা, (২) ধ্যানশ্রীয়া, (৩) অমৃতা, (৪) নির্ব্বাণা, (৫) নিষ্কলা, (৬) অতিমানসা। এই ৬টি নাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি প্রবৃত্তিমুখী ও নিবৃত্তিমুখী শক্তিজগৎ গঠিত আছে। এ সব শক্তিজগৎগুলিই এক একটি ত্রিকোণ যন্ত্র বা অনুভূতি জগৎ।

মস্তিষ্কস্থিত বিমলযশা = একটি রেখা। বিমলযশার জ্ঞানকেন্দ্র + গণেশকেন্দ্র (১৪ নং) = ২য় রেখা। বিমলযশার কর্ম্মকেন্দ্র + গণেশকেন্দ্র (১৪ নং) = ৩য় রেখা। এই ভাবে বিমলযশা ও গণেশকেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া একটি ত্রিকোণ হইল। এই তিন কোণ গতিতে একটি অনুভূতি এবং শক্তিজগৎ বিদ্যমান।

বিমলযশার মত ধ্যানশ্রীয়া ও অমৃতাকে এক একটি রেখা ধারণা করিয়া গণেশকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আরও দুইটি ত্রিকোণ আছে। সব নাড়ীগুলি মিলিয়া এইরূপ তিনটি ত্রিকোণযন্ত্র ঊর্দ্ধমুখী গতি সম্পন্ন ত্রিকোণ। ইহাদিগকে নিবৃত্তিমুখী ত্রিকোণ বলা যায়।

বিমলযশা, ধ্যানশ্রীয়া ও অমৃতাকে এক একটি রেখা ধারণা করিয়া মনকে কেন্দ্র করিয়া ঐ ভাবেই তিনটি ত্রিকোণ আছে। এই সব ত্রিকোণগুলিকে আমরা নিম্নমুখী ত্রিকোণ বলিব। ধনী, জ্ঞানী বা রাজা, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকলেই ত্রিকোণ নিষ্ঠ।

বিমলযশা, ধ্যানশ্রীয়া ও অমৃতাকে এক একটি রেখা ধারণা কর এবং বিশুদ্ধাখ্যকে একটি কোণ বলিয়া মানিয়া লও। দেখিতে পাইবে, বিশুদ্ধাখ্য হইতে জোড়া জোড়া নাড়ী বিমলযশার দুই প্রান্তে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। এই ভাবে তিনটি ত্রিকোণ হইল, এসব ত্রিকোণ নিম্নমুখী গতিসম্পন্ন ত্রিকোণ।

বিমলযশা ও ধ্যানশ্রীয়াকে এক একটি রেখা ধারণা কর। অনাহত কোণ হইতে এক জোড়া নাড়ী বিমলযশায় যাইয়া মিলিত হইয়া একটি ত্রিকোণ সৃষ্টি করিয়াছে। এবং অনাহত কোণ হইতে এক জোড়া নাড়ী ধ্যানশ্রীয়ার দুই প্রান্তে মিলিত হইয়া আরও একটি অনুভূতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাবে বিমলযশা ও অনাহত কোণকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি ত্রিকোণ জগৎ বা অনুভূতি জগৎ পাইলাম। ইহারা দুইটি ত্রিকোণ যন্ত্র।

নির্ব্বাণা ও নিষ্কলাকে কেন্দ্র করিয়াও ত্রিকোণ জগৎ, শক্তি জগৎ বা অনুভূতি জগৎ বিদ্যমান। ইঁহারা অত্যন্ত উচ্চস্তরের অনুভূতি জগৎ। গণেশকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিকোণ রেখা হইলে সেই সব ত্রিকোণ-জগৎ নিবৃত্তিমুখী বা ঊর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ হয়। মনকে এবং অনাহত, মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠানকে সম্বন্ধ করিয়া ত্রিকোণ হইলে সেই সব ত্রিকোণ বা শক্তিক্রিয়া নিম্নমুখী বা প্রবৃত্তিমুখী শক্তিদান করে।

বিশুদ্ধাখ্যকে সম্বন্ধ করিয়া ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কস্থিত ঐ ৬টি নাড়ীর যে কোন একটির সম্বন্ধ যুক্ত ত্রিকোণও নিবৃত্তিমুখী ত্রিকোণ। আমাদের চিন্তাজগতের ক্রিয়ার গতি সকলেরই প্রবৃত্তিমুখী। গণেশ ও বিশুদ্ধাখ্যকে বাদ দিয়া যে সব যন্ত্রের কথা বলা হইল সেগুলি অত্যন্ত উন্নত স্তরের অনুভূতি হইলেও সেগুলি নিম্নগতি ত্রিকোণ। গণেশ বা বিশুদ্ধাখ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সব ত্রিকোণ হয় সেগুলি সবই নিবৃত্তিমুখী অনুভূতি।

কালীযন্ত্রে ত্রিকোণ ৫টি (কালীযন্ত্র দ্রষ্টব্য), তারাযন্ত্রে ত্রিকোণ ২টি এবং শ্রীযন্ত্রে ত্রিকোণ ৯টি স্থান পাইয়াছে। এই ৯টি যন্ত্রের সংমিশ্রণে আরও অনেক ত্রিকোণ প্রস্তুত হইয়াছে। পাঠক শ্রীযন্ত্র দেখুন। তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে শ্রীযন্ত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানা হইয়াছে। বহু নিবৃত্তিমুখী ও বহু প্রবৃত্তিমুখী ত্রিকোণের সমষ্টিই এ মহাশক্তির স্বরূপ। এই বিশ্বে প্রকৃত সাধক কয়টি, যে মহাশক্তির একটি ত্রিকোণেরও তত্ত্ব অনুভব করিবে?

যে কোন যন্ত্রের মধ্য স্থানে ত্রিকোণ যন্ত্রগুলি থাকে। এই ত্রিকোণ যন্ত্রের বাহিরে অষ্টদলপদ্ম বিদ্যমান। এই অষ্টদলই অষ্টশক্তি। শ্রীযন্ত্রে এই অষ্টদল পদ্মের বাহিরে একটি ষোড়শদল কমল আছে। এই ষোড়শদল "মহৎ + অব্যক্ত" স্তর। অর্থাৎ মহৎ অব্যক্তস্তর ভেদ হইবার পর পুরুষোত্তমস্তরে মহাশক্তির স্তর অবস্থিত। এই ষোড়শদলের বাহিরে প্রবেশ-দ্বার। প্রত্যেক যন্ত্রেই ৪টি প্রবেশদ্বার আছে। ঐ সব দ্বারগুলিও সব যন্ত্রে একরূপ নহে। দ্বারগুলির ব্যাখ্যা ক্ষুদ্রগ্রন্থে সম্ভব নহে। খৃষ্টানদের গীর্জার কোণে যে সামান্য যন্ত্রাংশ এখনও আছে উহার সঙ্গে দুর্গা-যন্ত্রের একটা কোণের মিল আছে। মসজিদের একটা দিকে যে দ্বারচিহ্ন দেওয়া হয়, উহার সঙ্গেও শ্রীযন্ত্রের একটা অংশের সাদৃশ্য আছে। যন্ত্ররূপকে এইভাবে খণ্ডিতভাবে প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানবিরুদ্ধ ও মূর্খতাপূর্ণ অনুষ্ঠান।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশেরও যন্ত্রপ্রতীক আছে। ইহারাও যে গভীর অনুভূতির ইঙ্গিত পূর্ণ যন্ত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষিতি = চতুষ্কোণ। অপ্ = বর্ত্তুলাকার। তেজ = ত্রিকোণ। বায়ু = নাদাকার (৺)। আকাশ = শূন্যাকার। ইহারা যে বিভিন্ন তত্ত্বের বা অনুভূতির সংস্পর্শে মনের ও বোধজগতের কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত-পূর্ণ রূপ-ভেদ, এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিলাম। ভারতে আবার তান্ত্রিক যুগ জাগ্রত হউক, ইহা আমরা ইচ্ছা করি। কিন্তু ভণ্ডামি ও ছলনা যেন তান্ত্রিকতার আড়ালে দেখা না দেয়, ইহাও আমরা কামনা করি। দৈবীসম্পদের অনুশীলন, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান ও অসুরবাদের উচ্ছেদের আদর্শ লইয়া শক্তিউপাসনা ভারতকে ও বিশ্বকে সার্থক করুক।

দৈবী সম্পদ ও ভোগনিগ্রহ

দৈবী সম্পদই বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সমাজ ও বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তি। দৈবী সম্পদগুলি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অসুর সম্পদগুলির আশ্রয় ‘‘অহংকার, অজ্ঞানতা ও বিষয়বাদিতা।’’ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে এবং আমরাও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গীতার শক্তিবাদ টিপ্পনীতে করিব। এখানে সামান্য আলোচনা করা হইবে। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান ও দৈবী সম্পদ শক্তিবাদের ভিত্তি। ‘‘অসুর সম্পদ এবং বিষয়ধ্যান ও অহংকার’’ অসুর বাদের ভিত্তি।

জড় ও চেতনা (আত্মা) কে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদ। দৈবীসম্পদগুলির আশ্রয় আত্মা। আজকাল বিষয়বাদিতার রাষ্ট্র ও সমাজবাদ দেখা দিয়াছে। কম্যুনিজম ও ডেমোক্রেশী ইহাদের ভিত্তি। আমরা বিশ্বকে বলিয়া রাখি, ঐ সব ধাপ্পাবাজদিগকে বিশ্বাস করিও না। ইহারা বিশ্বের ক্ষয়ের কারণ। ইহাদিগকে আমরা চোর, চিটীংবাজ ও দলবদ্ধ গুণ্ডা নাম দিতে পারি। গীতার শক্তিবাদ টিপ্পনী দেখো।

মূলাধার কেন্দ্রের মনস্তত্ত্ব - বীরানন্দ, সহজানন্দ, যোগানন্দ ও পরমানন্দ। শক্তিবাদী চরিত্রের ইহাই বিশেষ লক্ষণ।

বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্রে ‘সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি’ সপ্ত স্বর এবং বিষ ; হুঁ, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, এই সাতটি মন্ত্র এবং অমৃত অবস্থান করে। এখানে ‘সপ্তস্বর’ ও ‘সপ্ত মহামন্ত্রের’ আলোচনা সম্ভব নহে। আত্মজ্ঞান, যোগ ও অধ্যাত্মবাদীয় সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনই ‘‘অমৃত’’। অসুরবাদ বিষয়বাদ ও ধাপ্পাবাজদের বিরুদ্ধে মহাজ্ঞানীদের কঠোরতাই ‘বিষ’। আত্মা (ব্রহ্মনাড়ী) কে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের স্বভাবে মূলাধার লক্ষণ ও বিশুদ্ধাখ্য লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এইরূপ মানুষই ঋষিস্তরের মানব। সূর্য্য, বিষ্ণু ও গণেশস্তরের মহাপুরুষদের চরিত্রে দুর্ব্বলতা ও অসুরপ্রীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই থাকিয়া যাইবে, যদি তাঁহারা আত্মাকে কেন্দ্র না করিয়া ‘অহং’কে কেন্দ্র করেন। অসুরবাদ প্রশ্রয়কারীরাও সকলেই অসুর এবং বিশ্বের সর্ব্বনাশকারী। এজন্য শাস্ত্রে শুক্রাচার্য্যের মত মহান যোগী ও শক্তিউপাসক মহাপুরুষকে অসুরগুরু বলা হইয়াছে।

স্বাধিষ্ঠানের ৬টি অজ্ঞান বৃত্তি - প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা। ইহারা কামজনিত মানসরোগ। ভোগের অতৃপ্তিতে বা অসংযত ভোগে অনেক সময় এই সব উগ্র বিকার দেখা জেয়।

মণিপুরের ১০টি অজ্ঞান বৃত্তি - লজ্জা, পিশুনতা*, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়; এই সব মনোবিকার আশাভঙ্গে উগ্ররূপে দেখা দেয়। মানুষ তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র আশা আপনার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা করে। সে ব্যক্তি হঠাৎ কোন ঘটনা দ্বারা সেই সব আশা ভঙ্গ হইল, মনে করিলে, এ সব সাংঘাতিক মনোবিকারগুলি উগ্ররূপ লয়।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘পিংশুতা’’ স্থানে ‘‘পিশুনতা’’ গৃহীত হল।

অনাহত কেন্দ্রের ১২টি অজ্ঞান বৃত্তি - "আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিফলতা, বিবেক, অহংকার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ।" ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া আঘাত আসিলে বা ভালবাসা চাপা পড়িলে, এই সব অজ্ঞান বৃত্তি মানব চরিত্রে উগ্ররূপে দেখা দেয়।

জীবনে ভোগ, আশা ও ভালবাসাকে চাপিয়া রাখিতে যাহারা বাধ্য হইয়াছে এমন বহু নরনারীর সংস্পর্শে আমরা আসিয়াছি এবং তাহাদের ব্যবহারও আমরা দেখিয়াছি। মানবজীবনে এই তিনটি অজ্ঞান গ্রন্থির বিকার দেখা দিলে মানব পাগল বা আত্মনাশক ভিন্ন আর কী হইতে পারে? মানুষে যত প্রকারের যৌন ব্যাধি আছে, উহার বেশীরভাগ ব্যাধি যৌন শক্তির অত্যন্ত অপপ্রয়োগ এবং অস্বাভাবিক নিরোধ। কোষ্ঠ সম্বন্ধীয় ও হজম সম্বন্ধীয় প্রায় সবগুলি রোগের মূলে থাকে বিচিত্র আশা ও আশাভঙ্গ এবং মনের অত্যধিক ক্রিয়াশীলতা। হৃদয় যন্ত্রের বহুরোগের কারণে থাকে ভালবাসা শক্তির অপপ্রয়োগ। এ সব রোগবিকার এবং এ সব অজ্ঞানতার গ্রন্থি মানব অতি সহজেই অতিক্রম করিতে পারে যদি সে ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয় লয়। এ সব 'অজ্ঞান বৃত্তি'গুলি 'অহং'কে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু আত্মার আলোতে ইহারা সুপ্ত ও স্তব্ধ হইয়া যায়। 'অহং' এবং 'আত্মা' আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত। তুমি অহংকার চাও, অহং পাইবে; আত্মা চাও, আত্মা পাইবে।

সমস্ত প্রকার অজ্ঞানবৃত্তি, বিষয়বাদিতা, অসুরবৃত্তি ও অজ্ঞানতা 'অহং'কে (মস্তিষ্কে শিবকেন্দ্রে ইহা অবস্থান করে) কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল হয় এবং সমস্ত প্রকার দৈবীভাবের জ্ঞানবৃত্তিগুলি আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সতেজ হয়। মস্তিষ্কস্থিত গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরকে কেন্দ্র করিয়া দৈবীসম্পদগুলি অবস্থান করে। আমরা আত্মধ্যান পরায়ণ হইলেই সেই দৈবীভাবগুলি জাগ্রত হয়। গীতানির্দ্দিষ্ট দৈবী সম্পদগুলির কেন্দ্র ও স্তর বলা যাইতেছে।

চিত্রে ৭ নং গণেশ কেন্দ্র। অভয়, দম, তপঃ, সত্য, ত্যাগ, নাতিমানিতা, এই কয়টি দৈবী বৃত্তি গণেশস্তর হইতে আসে।*

চিত্রে ২ নং সূর্য্যকেন্দ্র। স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, অহিংসা, মার্দ্দব, শৌচ, অদ্রোহ। এই কয়টি দৈবী সম্পদ সূর্য্যস্তরের।

চিত্রে ৩ নং বিষ্ণুকেন্দ্র। দান, যজ্ঞ, দয়া, মার্দ্দব, হ্রী, অচাপল্য, ক্ষমা, ধৃতি।

চিত্রে ৪ নং এবং ৫ নং শিবকেন্দ্র। অভয়, সত্ত্ব সংশুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ, দম, তপঃ, আর্জ্জব, সত্য, অক্রোধ, অপৈশুন, শান্তি, শৌচ, নাতিমানিতা।

চিত্রে ৬নং এবং ১০নং ব্রহ্মনাড়ী। অভয়, সত্য, অক্রোধ, তেজ।

কোন কোন দৈবীভাব দুইটি বা তিনটি স্তর হইতেও আসে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে দুইটি বা তিনটি স্তরেই উহার কেন্দ্র বিদ্যমান। যেখানে একই দৈবীসম্পদ দুই কেন্দ্রে দেখানো হইয়াছে সেখানে উন্নত কেন্দ্রেই উহার কেন্দ্র জানিতে হইবে; কিন্তু অন্যান্য কেন্দ্র

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এই সব দৈবীসম্পদগুলির তালিকা গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে যে ক্রমে এই সম্পদগুলি উল্লিখিত হয়েছে, সেই ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দৈবী সম্পদের সঙ্গে একটি সংখ্যা সংযোজিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, (১) অভয়। বাহুল্যবিধায় এই সংখ্যাগুলি পরিত্যক্ত হল।

হইতেও নাড়ী সাহায্যে উহার প্রতিভা বিস্তৃত হয় বলিয়া কোন কোন দৈবী সম্পদ দুই তিনটি কেন্দ্রে দেখানো হইয়াছে। ধরুন 'অভয়' গণেশ, শিব ও শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যমান। এখানে জানিতে হইবে অভয় শক্তিস্তরের দৈবীভাব। একমাত্র আত্মাই ঠিক ঠিক অভয়। শক্তিস্তরের অত্যন্ত নিকটস্থ স্তর মহাশিব (৫)। এজন্য শিবে উহা প্রতিফলিত হয়। গণেশেও ইহা প্রতিফলিত হয়, এজন্যই গণেশকে শিব ও শক্তির পুত্র বলা হয়।

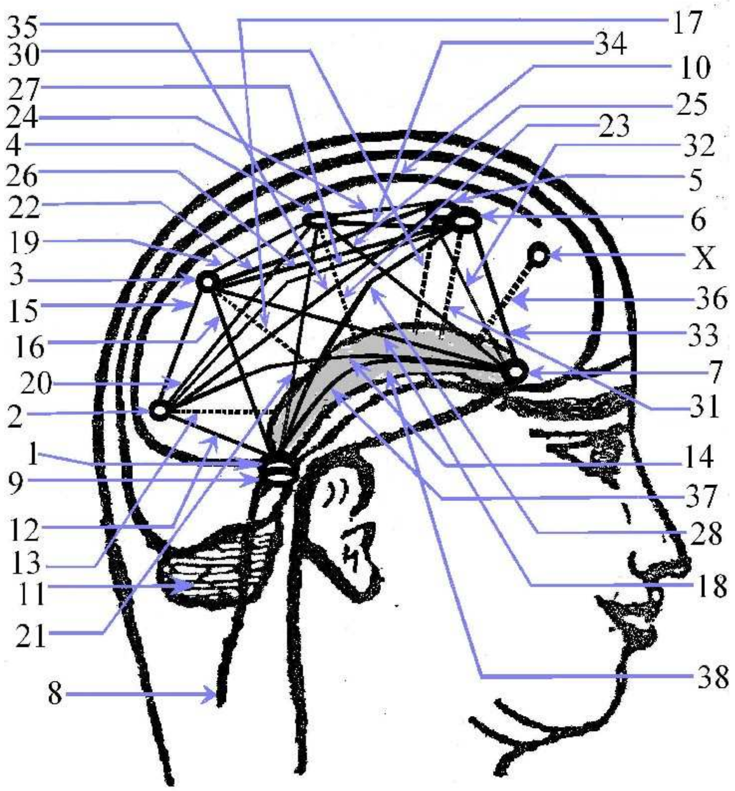

পাঠক জানিয়া রাখুন, দৈবী বৃত্তি, অসুর বৃত্তি ও অজ্ঞান বৃত্তি সবই আমাদের শরীররূপ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আমরা ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে বা রাষ্ট্রজীবনে যেটার বেশী চাষ করিব সেইটাই ফলবতী হইবে এবং আমাদের জন্য তদনুরূপ ফল দিবে।

গীতায় বলেন (১০ম অধ্যায়ে) –

বুদ্ধি র্জ্ঞানমসং মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখ দুঃখং ভাবোঽ ভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽ যশঃ।
ভবন্তি-ভবা ভূতানাং মত্তএব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫

যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান, মোহহীনতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, (জীবকল্যাণে) সুখ, (জীবের অকল্যাণে) দুঃখ, ভাব, ভাবহীনতা, (অন্যায় কার্য্যে) ভয়, (অসুরবাদনাশে) অভয়, অহিংসা, মমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ জীবে এসব ভাবগুলি আমা (আত্মা) হইতে আসিয়া থাকে।

গীতা ১৬ অধ্যায়ে অসুর লক্ষণে বলেন :-

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদ মাসুরীম্॥ ৪
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যং কামহেতুকম্॥ ৮
আত্মাসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমান মদান্বিতাঃ॥ ১৭

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা ইহারা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় (অহংকারই অজ্ঞানগ্রন্থির কেন্দ্র) এবং ইহারা অসুর সম্পদ। ৪॥ তাহারা শৌচ ও আচার (ব্রহ্মচর্য্য) মানে না এবং সত্য মানে না। ৭॥ তাহাদের মতে এই বিশ্ব অসত্যেই প্রতিষ্ঠিত এবং ঈশ্বরহীন। স্ত্রী-পুরুষ সংযোগই সৃষ্টির কারণ। ইহা ভিন্ন আর কোন সত্যই নাই। ৮॥ আত্ম বিষয়ক চিন্তাতে ইঁহারা স্তব্ধ থাকেন এবং ধন মান ও অহংকারে মত্ত হন। ১৭॥

গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন -

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গেস্তেষ্যু পজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

যে সব মানুষ বিষয়সকল চিন্তা করে, তাহাদের বিষয়সঙ্গ হইয়া যায়, ফলে বিষয়ে কামনা জন্মে। কামে বাধা হইলে কাম হইতে ক্রোধ হয়। ক্রোধের ফলে সংমোহ হয়। সংমোহ হইলে আর আত্মস্মৃতি থাকে না। ফলে বুদ্ধির বিভ্রম হয়। বুদ্ধির বিভ্রম হইবার পর ধীরে ধীরে নাশ প্রাপ্ত হয়। (একটা জাতি বা একটা মানুষ আত্মধ্যান ত্যাগ করিয়া অধিকার সাম্য (ডেমোক্রেশী), বিত্তসাম্য ও ধনসাম্যের (কম্যুনিজম) নামে, ভণ্ডদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া কি ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বলিয়াছেন)।

শ্রেয়ঃ হি জ্ঞানমভ্যাসাদ্ জ্ঞানধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ ত্যাগাচ্ছান্তি রসন্তরম্॥

জ্ঞানের অভ্যাস (পাঠাদি) হইতে জ্ঞানের ধ্যান (ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানই জ্ঞান-ধ্যান) শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের ফলে কর্ম্মফল ত্যাগের শক্তি আসে, (যাহারা জ্ঞানের ধ্যান না করিয়া বিষয়চিন্তা করিয়া মস্তবড় পলিটিসিয়ান তাহাদিগকে গদীতে বসাইলে দেখিতে পাইবে বান্দরের হাতে ফলের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে) এবং ঐ ত্যাগ হইতে (ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে) শান্তি আসে।

অসুরবাদকে সমাজজীবন হইতে বাধা দিবার জন্য কিরূপ কঠোর কর্ম্মবাদ, উপাসনা ও জ্ঞানবাদের নিয়মের মধ্যে প্রাচীন ভারত গড়া হইয়াছিল, শক্তিবাদীরা উহা বুঝিতে চেষ্টা কর এবং দৃঢ় হইয়া সেই পথে সমাজ ও বিশ্বকে গড়িবার পথ কর।

মৃত্যু ও উৎক্রামণ*

শরীর ত্যাগ করাকে ‘‘উৎক্রামণ’’ বলে। মস্তক ও শরীরস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি এক একটি জগৎ বা বিভিন্ন লোক। ইহারাই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য লোক বলিয়া খ্যাত। আমরা পূর্ব্বে† বলিয়াছি যে এক একটি নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া শরীর ত্যাগ করিলে এক এক লোকে গমন হয় এবং ব্রহ্মনাড়ীকে অবলম্বন করিয়া দেহী দেহত্যাগ করিলে আর জন্ম হয় না।

যুবকদের মধ্যে কিছু অমানুষ বা অতিমানুষ দেখা দিয়াছেন যাঁহারা আত্মা ও জন্মান্তর মানেন না। ইঁহারা সকলেই কার্লমার্ক্সের শিষ্য। আমাদের দেশেও জন্মান্তর মানেন নাই বা আত্মা মানেন নাই এইরূপ ঋষি আছেন। মহর্ষি জাবাল ও মহর্ষি চার্ব্বাকের নাম কে না জানে। ইঁহারা জন্মান্তর না মানিলেও সন্ধ্যা উপাসনা ও সত্য ত্যাগ করেন নাই। আমরা মস্কোর ঠিকেদারগণকে বলিয়া রাখি, জন্মান্তরবাদহীন ষ্টেট চলিতে পারে না। কারণ অধ্যাত্মহীন ষ্টেটে চোর ও গুণ্ডাদের রাজ্য হয়। সমাজকে শুধু ষ্টেট শাসন করে না, সমাজ শাসনে ধর্ম্ম ও সততা শিক্ষা সকলেরই প্রয়োজন আছে। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা অনেকটা অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক কল্পনার মধ্য দিয়া আত্মা মানেন কিন্তু জন্মান্তর মানেন না। পৃথিবীতে এই দুইটিই বিচিত্র ধর্ম্ম। যাহা কুরাণে বা বাইবেলে নাই উহা মানিলে ইহারা কাফের হইয়া যাইবেন এবং আল্লাহ্ মিঞা বা গড্‌বাবা ইহাদিগকে আগুনে ফেলিয়া দিবেন। আবার যে সব অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক মূর্খতা আল্লাহ্ মিঞা বা গড্‌বাবা তাঁহাদের তথাকথিত ‘‘আসমানী কেতাবে’’ বলিয়া ফেলিয়াছেন, সে সব না মানিলেও এসব বেচারারা বেহেস্তের বিবি না পাইয়া, আগুন পাইবেন। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলি, ‘‘মূর্খদের জন্য আগুনও নাই বিবিও নাই’’। সুকৃতির ফলে সুখ, দুষ্কৃতির ফলে দুঃখ, কর্ম্মফলের ইহাই চিরন্তন নিয়ম। যে সব দুষ্ট ও মূর্খগণ ধর্ম্মের নাশ, মিথ্যা ও মূর্খতা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সব পাপীদের জন্য দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই।

আমরা শরীরত্যাগ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিব, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত সত্য। তাহাতে দেখা গিয়াছে, উৎক্রামণ দুই রকম হয়। (১) কষ্টসহ উৎক্রামণ এবং (২) কোন প্রকার কষ্টহীন উৎক্রামণ। কষ্টসহ উৎক্রামণ আমার জীবনে অনেকবার হইয়াছে। একটি সুতার মত সংযোগ, শরীরের কোন একটা মর্ম্মস্থানের সঙ্গে উৎক্রামিত সূক্ষ্ম প্রাণাত্মায় থাকে এবং সেই আত্মা একটু দূরে আকাশে ভাসিতে থাকে। সাধারণতঃ নাভি হৃদয় বা ভ্রূমধ্যস্থলে সংযোগ রাখিয়া আত্মা বাহিরে উড়িতে বা ভাসিতে থাকেন। মস্তিষ্ক ও চিন্তার সব কার্য্যই তখন বাহির স্থিত সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে থাকে। শরীরটার কার্য্য সেই আত্মার ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ সংযোগ সূত্রদ্বারা হইতে থাকে। শরীরের যে কেন্দ্রটি বা মর্ম্মটিতে সংযোগ সূত্রটি থাকে, সেই কেন্দ্র বা মর্ম্ম (নাভি, হৃদয় বা ভ্রূমধ্য) টিতে অত্যন্ত ব্যথা ও যাতনা হয়। এবং সেই যাতনা সমস্ত স্থূল শরীরে ছড়াইয়া পড়ে।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - অভিধানানুসারে ‘‘উৎক্রামণ’’ অশুদ্ধ, সঠিক প্রয়োগ ‘‘উৎক্রমণ’’। আর্ষ প্রয়োগ বিধায় আমরা এই অনুচ্ছেদে সর্বত্র ‘‘উৎক্রামণ’’ই গৃহীত হল।

† প্রকাশকের নিবেদন - দ্রষ্টব্য ‘‘বেদ, উপনিষদ ও শাস্ত্রে নাড়ীতত্ত্ব প্রসঙ্গ’’।

তখন মনে হয়, সমস্ত শরীরটা যেন পোড়া বেগুনের মত নরম হইয়া গিয়াছে। একটা বাতাবী লেবুকে অনেকক্ষণ ধরিয়া আছড়াইলে উহা যেমন নরম হইয়া একটা ছোট ফুটবলের মত হয়, মনে হয়, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন কি অস্থিগুলি পর্য্যন্ত নরম হইয়া গিয়াছে। একটি অনুচ্চ ছাতের পর্ব্বতগুহায় আমি এক রাত্রি অবস্থান করিব বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমার কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। সমস্ত শরীরে এক মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখা দিল। বার বার আমি জপ ও ধ্যানে বসিতে চেষ্টা করিলাম। যখনই মনকে স্থির করিয়া বসি তখনই দেখা যায়, মন যেন শরীরের মধ্যে থাকে না। ছোট দরজা ছিল। সেই দরজার পথে আত্মা বাহিরে চলিয়া গিয়া সেখানে ঠিক এই শরীরেরই মত আর একটা আলো ছায়া মিশ্রিত শরীর প্রস্তুত হইয়াছে। শরীরের যাতনা কি এবং কেন, এবং প্রাণাত্মার এই উৎক্রামণ কি এবং কেন, এ সব সম্বন্ধে কতকটা বুঝা যাইতে পারে, সব বুঝিয়া আমি গুহার বাহিরে চলিয়া আসিলাম। আমার শরীরের গ্লানি ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল। অনুচ্চ ছাদ বিশিষ্ট গৃহে, গুহায় বা আশ্রয় অবস্থানে এইরূপ নিষ্ক্রামণ আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একবার বহুদিন পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকিয়া জ্বর প্রশমন কালে, অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কাতর অবস্থায়, আমি এক অনুচ্চ ছাতবিশিষ্ট স্থানে আসিলাম। আমি যে অভিজ্ঞতা উহাতে কিছুক্ষণ অবস্থানের পরেই সঞ্চয় করিয়াছিলাম, উহাতে আমি প্রত্যেক মানুষকে অনুরোধ করি যেন প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুকালে তাহাকে বাহিরে আনিয়া রাখা হয় এবং তখন সে শীত বা গরম যাহা ভালবাসে সেই ভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। গাড়ীতে চলা কালে দীর্ঘ সময় অনুচ্চ স্থানে অবস্থান হেতু আমি চির জীবনই যাতনা ভোগ করিলাম। যখন ই. আই. আর. গাড়ীগুলি কোম্পানীর হাত হইতে ষ্টেটের হাতে আসিল তখন কাঠের খরচ কমাইবার জন্য উহার উচ্চতা একফুট কম করা হইয়াছিল। ইহাতে আমি সত্যই চিন্তিত হইয়াছিলাম। এবং তখনই বুঝিয়াছিলাম ষ্টেটের হাতে যতই শক্তি ও কর্ম্মবিভাগ যাইতে থাকিবে ততই মানবের দুঃখ ও যাতনার মাত্রা বৃদ্ধি হইবে। যে সব চিন্তাশীল অনুচ্চ গৃহে সর্ব্বদা বাস করেন তাঁহাদের মাথায় নিশ্চয়ই অসুখ বা বাত হইবে। যে মানুষ আকাশের নীচে বা অত্যন্ত উচ্চ ছাতের নীচে আরামে বাস করিতে পারে, প্রতিপালিত হইতে পারে এবং মৃত্যু লাভ করে, সে এ বিশ্বে সত্যই সুখে থাকিয়াছে এবং সুখে সংসারত্যাগ করিয়াছে, বলিতে হইবে।

আমাদের শরীরকে ঘেরিয়া একটা জ্যোতির্ম্ময় শরীর আছে। উহা সূক্ষ্ম হইলেও খুব বেশী সূক্ষ্ম নহে। একটা চিমনী সহ বাতি একটু দূর হইতে দেখিলে বুঝা যায় বাতিটা ঠিক চিমনীর মত বড়। কিন্তু কাছে দেখিলে বুঝা যায় বাতিটা খুব ছোট আকারে অবস্থিত। ঠিক সেইরূপ আমাদের শরীরে একটা জ্যোতি বিদ্যমান। এই জ্যোতি শরীর হইতে অনেক বড়। গৃহের ছাত বা যানবাহনের ছাত এই জ্যোতির তুলনায় অপরিসর হইলে সেই জ্যোতির্ম্ময়-শরীরে চাপ পড়ে। এবং উহাতে ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি হয়। সেই ক্রিয়াশীলতার চাপ আমাদের মর্ম্মজগতের উপর প্রভাব করিয়া আমাদিগকে পীড়ন দেয়। মাথার উপর একটা লম্বা জ্যোতি রেখা সকলেরই থাকে। এই জ্যোতি রেখা অনেকেরই খুব বড় হইয়া যায়। উহাতে গৃহছাতের চাপ পড়িলে শরীরের যাতনা হয়। শরীরকে কেন্দ্র করিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় ঘেরা পাওয়া যায় উহার সঙ্গে এই মস্তিষ্কের উপরে অবস্থিত

জ্যোতির সম্বন্ধ আছে। এই জ্যোতিরেখা শরীরকে ঘেরিয়া অবস্থিত জ্যোতি মণ্ডলের কেন্দ্র। যাহাতে মৃত্যুকালে মৃত্যুটা আরামের হয় এজন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবং পরলোকগামীকে যথেষ্ট পূর্ব্বেই বাহিরে লইয়া আসাও প্রয়োজন। যখন দেখা যায়, শ্বাসটা নাভি অতিক্রম করিতেছে তখনই জানিতে হইবে সূক্ষ্মশরীর হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া বাহিরে গিয়াছেন। ৫, ৭ মিনিট মধ্যেই সূক্ষ্ম শরীর মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করিবেন। ইহার পূর্ব্বেই বাহিরে আনা প্রয়োজন।

আরামে নিষ্ক্রামণ কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। আরামে নিষ্ক্রামণের অনুকূল মনের স্থিতি প্রস্তুত হইলে নিষ্ক্রামণ যে কোন সময় হইতে পারে। নিঃসঙ্গ ভাবে ফাঁকা ও পবিত্র স্থানে অবস্থান হইবে, কাহারও উপর কোনও প্রকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ থাকিবে না। অদ্যকার ভাবনা, অতীতের ভাবনা বা ভবিষ্যতের কোনরূপ ধারণা হইতে মন একেবারে মুক্ত থাকিবে। একজন মানুষের মৃত্যুকালের কথা ভাবুন। সেই সময় তাহার কেহই আপনার থাকে না, কিছুই আপনার থাকে না। সে তখন নিঃস্ব। এই পরিস্থিতি সর্ব্বদার জন্য মনে ও বাহ্যব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নিষ্ক্রামণ স্বাভাবিক। এইরূপ নিঃস্ব অবস্থা যে খুবই আরামপ্রদ, ইহা শিবস্তরের যোগীদের বুঝাইতে হয় না। মনের, স্থানের ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির এরূপ সংযোগ আসিলে যে কোন সময় শরীর হইতে আত্মা বাহিরে চলিয়া যাইবেন। সে সময়ও একটি সংযোগ সূত্রদ্বারা শরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ থাকে। আত্মা সেই সূত্রে সংযুক্ত থাকিয়া বহু দূর দূরান্তরে চলিয়া যান। শত সহস্র আশায় আচ্ছন্ন মানব ও শত সহস্র মিথ্যা ও মোহসম্বন্ধে সংবদ্ধ মানব এই মুক্ত অবস্থার কি খবর লইবে? মানবের জীবনে আরামপ্রদ স্বাভাবিক নিষ্ক্রামণ ও তাঁহার শিবস্তরের জ্ঞান লক্ষণ এক। যে দিন সাধক নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, অন্নবস্ত্র-গৃহহীন অবস্থার মধ্যে এক অখণ্ড তৃপ্তির সন্ধান পাইবেন, সেই দিন প্রকৃতি তাঁহাকে নিষ্ক্রামণে যে কিরূপ স্বাধীন আনন্দ তাহাও দেখাইয়া দিবেন। এইরূপ নিষ্ক্রামণ কালে কিভাবে নিষ্ক্রামণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা সাধক জানিতে পারেন না। নিষ্ক্রামণের পর নির্ম্মল জগতে ভ্রমণ কালে অনেক সময় তাঁহার শরীরটীকেও তিনি দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ ঐ শরীরটা তাঁহার নিজের, এইরূপ ধারণা হইবে না, ততক্ষণ তিনি বাহিরেই থাকিবেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার ধারণা হইবে শরীরটি তাঁহার এবং তাঁহার নিকট হইতে উহা বিচ্ছিন্ন, তৎক্ষণাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি সেই সংযোগ সূত্রে প্রবেশ করিবেন এবং শরীরে চলিয়া আসিবেন। এইরূপ নিষ্ক্রামণ কালে শরীর মৃতবৎ থাকে, কিন্তু মরে না। সংযোগসূত্রে প্রবেশকালে মনে হইবে যেন একটি সূচের ছিদ্রে একটি বৃহদাকার হস্তী প্রবেশ করিল। আরামপ্রদ নিষ্ক্রামণ, নিঃসঙ্গ ও উন্নত শিবস্তরের জীবনেরই এপীঠ ও ওপীঠ মাত্র। ইহার লৌকিকটী আয়ত্ত হইলে অলৌকিকটীও দেখা দিবে।

জন্মগ্রহণ

মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, মনের এই চারপ্রকার কার্য্য। লৌকিক আশায় নিবিষ্ট মন, বিচার ও বিবেচনায় নিবিষ্ট মন, অতীতের ঘটনায় নিবিষ্ট মন, এবং কোন প্রকার সংযোগহীন একা মন; ইহারাই মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার প্রধান মনের চারিটি স্থিতি।

মন - আংশিক ব্রহ্মা, বুদ্ধি - আংশিক গণেশ, চিত্ত - আংশিক সূর্য্য ও বিষ্ণু, অহং - আংশিক শিব। মন যেমন স্তরে ক্রিয়াশীল থাকে, তাহার সঙ্গে সেই সব স্তরের সূক্ষ্ম আত্মার সংযোগ হয়। নরনারীর মনের এই ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে আমাদের অজ্ঞাত ভাবে বিভিন্ন স্তরের সূক্ষ্ম আত্মার সংযোগ সাধিত হয়। তাহাদের অনেকে আমাদের প্রিয় হইয়া পড়ে। এবং আমাদের নিকট আসিতেও চায়। প্রত্যেকটি নর ও প্রত্যেকটি নারীর মনোজগতের সঙ্গে আত্মার এইরূপ সংযোগ আছে। বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন স্তরের আত্মারা মানবের মনের বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীলতার সুযোগে আমাদের সংস্পর্শ লাভ করে এবং আমাদের সাথী হয়। তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই আমাদের নিকট চলিয়া আসে। যে সব আত্মা বহুদিন কোন নর বা নারীর সংস্পর্শে থাকিবার পর জন্ম হয়, তাহাদের চালচলন ও ব্যবহারে নিজের পিতা বা মাতার বাল্যকালের অনেক ঘটনা ও খেলার যথাযথ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। যে সব (পুং বা স্ত্রী) আত্মারা নারীর মনের সাথী থাকিয়া গর্ভে আসে তাহারা মায়ের স্বভাব বেশী লাভ করে। আবার যাহারা (পুং বা স্ত্রী) পুরুষের সঙ্গ প্রভাবে প্রভাবিত থাকিয়া গর্ভে আসে তাহারা পিতার মত স্বভাব পায়। একটি আত্মার গর্ভে আসা মোটেই একদিনের ব্যাপার নহে। বহু বৎসর ধরিয়া আত্মারা এক এক জন নর বা নারীর সংস্পর্শে থাকিবার পর গর্ভে আসিবার সংযোগ লাভ করে। অনেক সময় বিবাহ, বিচ্ছেদ, প্রেম, ব্যভিচার, আকর্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে ঐ সব সূক্ষ্ম আত্মাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। অনেকে আবার বহুকাল চেষ্টা করিয়াও গর্ভে আসিবার সুযোগ পায় না। গর্ভে আসিবার পরই অনেক আত্মার শরীর ধারণ অল্পক্ষণ হয়, অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতি হইলে গর্ভপাতও হয়।

শিবস্তর হইতে যে সব আত্মাগণ গর্ভে আসেন, তাঁহারা সকলেই বীজ হইতে শরীর ধারণ করেন। বৃক্ষ, পাখী ও পশুদের আত্মারা বীজজগৎ হইতে উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর সকলেই বীজ হইয়া যায়। মানবের আত্মারা কেহ সূর্য্য, কেহ বিষ্ণু, কেহবা শিবস্তর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরের আত্মাগণ গর্ভে আসিবার সময় নরনারীর মনের প্রভাবে, অথবা নর বা নারীর মনের প্রভাবে পড়িয়া বীজরূপ হন। প্রাকৃতিক ভাবেই হউক, বা কৃত্রিম ভাবেই হউক, সম্ভোগ কালে, জীবের মনের আনন্দ কিছুক্ষণ প্রাণ জগতে, পরে সূর্য্যস্তরে, পরে বিষ্ণুস্তরে এবং বীর্য্য বা রজঃ নিঃসরণ কালে আনন্দটা শিবস্তরে সংযুক্ত হয়। এ জন্যই আত্মারা যে কোন স্তরেই থাকুন না কেন সম্ভোগকালে মানবমনের সুখ-পরিবর্ত্তনের চক্রে পড়িয়া শেষ কালে তাহাকে বীজরূপ হইতেই হইবে। যে সব আত্মারা বীজরূপ হইতে কোন প্রকারে বাধা পান তাহাদের পক্ষে গর্ভে আসা সম্ভব নহে। সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবস্তরের আত্মারা অনেকেই সম্ভোগকালে বা কৃত্রিম ভোগকালে জন্মোন্মুখ হন, তাহাদের মধ্যে যাহার পরিস্থিতি অনুকূল বেশী তাহারই জন্ম হয়, অন্যদের হয় না। এখানে স্পষ্ট বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে প্রেতাত্মাদের জন্ম হয় না। যদিও ইহারা জন্ম নিতে সচেষ্ট। মৃত্যুর পর অজ্ঞানবশতঃ অনেকের আত্মীয়, ধন ও গৃহাদির উপর মোহ থাকে। এ মোহ যতদিন থাকে ততদিন তাহারা প্রেত থাকে এবং ইহাদের জন্ম হয় না। প্রেত থাকা খুবই কষ্টকর অবস্থান, ইহা খুব সহজেই অতিক্রম করা যায় এবং অতিক্রম করা কর্ত্তব্য।

অনেক জীবে ও বৃক্ষে শরীরস্থিত প্রাণ গ্রন্থিস্থানে বীজ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করে। কাজেই সেই প্রাণ গ্রন্থিসহ সেই সব অংশ কাটিয়া দিলে, নূতন জীবের জন্ম সম্ভব হয়। প্রস্তর ও কঙ্কর জাতীয় স্থাবর জীবের প্রাণগ্রন্থিতে জীববীজ থাকে এবং এ জন্য সেই সব গ্রন্থিসহ টুকরা হইতে নূতন স্থাবর জীব উৎপন্ন হয়। মানবের মর্ম্মগ্রন্থিতেও জীববীজ থাকে।

আরূঢ় পতন

অনেক মানবাত্মার পশু পক্ষী আদি হীন জীবে জন্ম হয়। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সব কথা মনে থাকে। তাঁহারা মৃত্যুর পর মানবাত্মার মত গতি লাভ করেন, কিন্তু পশু আত্মার মত গতি লাভ করেন না। মানবের গর্ভে অনেক সময় হীনস্তরের শরীরধারী জীবের জন্ম হয়। ঐ আত্মারা শিবস্তর হইতে (বীজজগৎ) হইতে গর্ভে আসেন। ইহাদের বিকাশ বীজটির বিকাশের স্তর অনুযায়ী ক্রমে হইতে থাকিবে।

যে সব ক্ষেত্রে নরের আকর্ষণ নারীর উপর অধিক হয়, সেই সব ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান হইবে। যে যে ক্ষেত্রে নারীর আকর্ষণ নরের উপর অধিক, সেই সেই ক্ষেত্রে পুত্র জন্মিবে। উপরের ব্যবহারে দেখা যায় স্ত্রী স্বামীর উপর খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু সন্তান উৎপন্ন কালে দেখা যায় সকলেই পুত্র। এসব স্থলে জানিতে হইবে, নারীরই আকর্ষণ বেশী এবং উহার গভীরতাও বেশী। যেখানে পুরুষের আকর্ষণ নারীর উপর অধিক, সেখানে নিশ্চয়ই কন্যা জন্মিবে। স্বামী স্ত্রীর উপরের ব্যবহার দেখিয়া মনে ভোগের আকর্ষণের গভীরতা কোন দিকে বেশী উহা বুঝা যায় না। সেটা বুঝা যায়, সন্তানদ্বারা। আকর্ষণ ও তাহার ব্যবহার নিশ্চয়ই এক বস্তু নহে।

আত্মার গর্ভে আগমন অত্যন্ত জটিল ও বিশদ বিষয়। ইহাতে শত শত প্রশ্ন জড়িত ঘটনা আছে। রজঃশক্তি বলবান কিন্তু পুরুষ আত্মা আসিল, ফলে গর্ভে থাকিবে না। বীর্য্যশক্তি বলবান, নারী আত্মা আসিল, ফলে গর্ভে থাকিবে না। নর বা নারীর যৌন যন্ত্রে অস্বাভাবিক রোগ থাকিলেও গর্ভ থাকিবে না। সূক্ষ্ম জগৎ হইতে আত্মারা অহরহ আমাদের মনের আকর্ষণে নামিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অনুকূল ক্ষেত্র না হইলে তাঁহাদিগকে আটকানো যায় না। অনেক বুদ্ধিমতী নারীকে স্বামী সহমতে বা গোপনে উচ্চকুলের পুরুষের সঙ্গ করিয়া বা উচ্চ বিকাশবান মানবের সঙ্গ করিয়া ভাল সন্তান লাভের চেষ্টা করিতে দেখা গিয়াছে। উন্নত বিকশিত আত্মারা কোথায় কি ভাবে জন্ম নিবেন, কেহই জানে না। এসব তত্ত্ব লইয়া বেশী বুদ্ধি খাটাইয়া কেহ যেন সমাজজীবনের শৃঙ্খলা নষ্ট করিবেন না। সুন্দর ব্যবহার, ভালবাসা, সংযম, পবিত্রতা ও সতীত্ব, সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা রাখায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবলম্বন। ইহার সব সময়ই রক্ষা হওয়া প্রয়োজন। নামী বংশে হীন স্তরের মানবের জন্ম হয়, আবার হীন বংশে মহাত্মার জন্ম হয়; ইহা কি এবং কেন ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন।

নারীর মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে সে নারী হইয়াই জন্মিবে অথবা নরের মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে সে নরই হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। নারী নর এবং নর নারী হইতে পারে। মৃত্যুকালে নৈসর্গিক নিয়মে কর্ত্তৃত্ব শক্তি (ঃ) প্রবল হইলে শরীর নরের মতন

হইবে এবং ইচ্ছা শক্তি (অ) প্রবল হইলে নারীর শরীর হইবে। প্রাচীন ভারতে কোন কোন নর নারী হইয়াছেন এবং নারী নর হইয়াছেন, এরূপ ঘটনা আছে। দুই নারীর সঙ্গদ্বারা অস্থিহীন সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজর্ষি ভগীরথ এইরূপ সন্তান ছিলেন। মহারাজ ইলা শিবের শাপে কখনও নারী হইয়াছিলেন।

কোন কোন নর নারীবেশ ধারণ করিয়া নারীভাবে সাধনার অভ্যাস করেন, দেখা যায়। ইঁহারা এ জন্মে বা পরজন্মে নারী হইবেন, এইরূপ আশা নাই। নরের নারী হওয়া বা নারীর নর হওয়া ভাবজগতের কথা নহে। ইহা শক্তিস্তরের কথা। শক্তিস্তরের কি নিয়মে কর্ত্তৃত্বশক্তি (ঃ) প্রবল হইবে এবং কি নিয়মে ইচ্ছা শক্তি (অ) প্রবল হইবে, ইহা ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। অনেকে মেয়েমানুষের ভাব লইয়া সাধনা করেন এবং মেয়েমানুষের বেশ ধারণ করিয়া বিচিত্র রূপসজ্জায় আত্মবিন্যাস করেন। আমরা বলি, ভাবদ্বারা বা সাজ সজ্জার পরিবর্ত্তনে শক্তিজগৎ বদলায় না। ভাব কোন বাস্তব বস্তুও নহে। আজ বিশ্বের নর ও নারীরা যেরূপ বেশ পরিধান করেন, কাল হয় তো উহার বিপরীত ধারা চলিবে এবং নারী নরের এবং নর নারীর বেশ ধারণ করিবে; কিন্তু ইহাতে নর নারী হইয়া যাইবে না এবং নারীও নর হইয়া যাইবে না। নরের নারী হওয়া বা নারীর নর হওয়া শক্তিজগতের ব্যাপার। ভক্তদের ভণ্ডামির সঙ্গে উহার কোনই সম্বন্ধ নাই।

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বাদীদের ধারণা রামকৃষ্ণদেবের মাসিক হইত, তাঁহার লেজ গজাইয়াছিল এবং তাঁহার মুসলমানী সাধনা হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ দুই চার দিনের জন্য নারী হইয়াছিলেন, না কি বাকী জীবনটাই তিনি নারী ছিলেন? শুধু মাসিক হওয়াই নারীর লক্ষণ নহে, রামকৃষ্ণের অন্যান্য নারী লক্ষণগুলি কোথায়? তাঁহার লেজ গজাইয়াছিল, তো মুখটা বান্দরের মত হইয়াছিল তো? তিনি মুসলমানী সাধনা করিয়াছিলেন তো "ছুন্নত"ও হইয়াছিল তো?

যাঁহারা মঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শক্তিউপাসনার পরিবর্ত্তে 'রামকৃষ্ণায় নমঃ' উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও ভবিষ্যৎ পরিণতি কি শীঘ্রই নারীত্বে, মর্কটত্বে এবং 'ছুন্নৎ বাদে' পর্য্যবসিত হইবে? হনুমান বা রামের উপাসকরা যদি এ জন্মেই লেজ লাভ করেন তবে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই বান্দর হইবেন। যাঁহারা 'ছুন্নৎ' করেন তাঁহারা কিন্তু ২০০০ বৎসরেও একটা ছুন্নৎ করা সন্তানের জন্ম দিতে পারেন নাই। রামভক্ত বাল্মীকির লেজ হয় নাই কেন? সাধনার ফলে, নর যদি বানর বা নারী হয়, তবে এ সাধনায় নরের লাভ কি?

নবম অধ্যায়

কর্ম্মফল

কর্ম্মফল বুঝা খুবই জটিল বিষয়। বিকাশবিজ্ঞান বুঝিলে কর্ম্মফল বুঝিতে স্থবিধা হইবে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, উন্নত শিব ও শক্তিস্তরের বিকাশ থাকিলে সঞ্চিত কর্ম্মভাণ্ডার হইতে কর্ম্মফল আকর্ষণ করা যায়। মানবের জীবনে তপস্যাই কর্ম্মফল ফলোন্মুখ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

মানবের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও সর্ব্ববিধ স্থখের স্রষ্টা মানব নিজে। যাহারা দুষ্কৃতকারী তাহাদেরও কর্ত্তব্য উচ্চস্তরের মহাপুরুষ ও সত্যনিষ্ঠদের মনে পীড়ন দেওয়ার নীতি ত্যাগ করিয়া চলা। দুষ্কৃতিকারীরা পুণ্যপ্রারব্ধ-বলে অনেক দুষ্কৃতি করিয়াও দুঃখে জড়াইবে না, যদি সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গণের মনের ব্যথার কারণ না হন। দুর্জ্জন মানব বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াও বাঁচিয়া যাইবেন যদি দুর্জ্জনে দুর্জ্জনে পাল্লা পড়ে, কিন্তু যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও সাধক, তাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ দুর্জ্জনবৃত্তি অত্যন্ত বিষময় ফল দিবে, যদি তাঁহারা মনে ব্যথা ও অপরাধ গ্রহণ করেন।

সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ কর্ম্মের মোটামুটি এইরূপ তিনটি বিভাগ। আমরা পূর্ব্বে বহুস্থানে বলিয়াছি, আমাদের জন্মজন্মান্তরে কৃতকর্ম্মের সংস্কার ও কর্ম্মফল বিষ্ণুস্তরে সঞ্চিত থাকে। মন হইতে যে সব নাড়ী বিষ্ণু কেন্দ্রে গমন করিয়াছে ও মণিপুর হইতে যে সব নাড়ী বিষ্ণুকেন্দ্র গমন করিয়াছে, উহাদের কাজ হইল বিষ্ণুস্তরকে উত্তেজিত করা; আবার শিবকেন্দ্র হইতে যে সব নাড়ী বিষ্ণু কেন্দ্রে গমন করিতেছে, সেই সব নাড়ীর কাজ বিষ্ণুস্তরে স্থখ প্রবাহিত করা, এবং বিষ্ণুস্তরে সঞ্চিত কর্ম্মফলগুলিকে ফলোন্মুখ করা। যাঁহারা ভাগ্যবান ও স্থখী তাঁহাদের সঙ্গ কর, দেখিতে পাইবে, তাঁহাদের মনে একটা তৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাসের ধারা বিদ্যমান। তাঁহারা যোগী নহেন, কিন্তু কোন অজ্ঞাত শক্তি বা পুণ্যফলে তাঁহারা বিষ্ণুস্তরের স্থখপ্রবাহ ধরিয়া রাখেন। সেই সব স্থখধারার ফল ফলোন্মুখ হইয়া তাঁহাদিগকে স্থখী করে। আমরা অন্যায় পথে উপার্জ্জনকারী অনেক ব্যবসায়ীকে দেখিয়াছি, যাহাদের মনে ঐরূপ তৃপ্তি বিদ্যমান। ব্যবসায়ীরা অনেকে বহুলোককে ঠকায়, কিন্তু কারবার ব্যাপারে বহুস্থান আছে, যেখানে অত্যন্ত সততা ও অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত কাজ করিয়া থাকেন। যখন মানবের স্থকৃতি ফলোন্মুখ হয় তখন তাহার মুখ চোখ দেখিলেই বুঝা যায়। ছাত্র, ছাত্রী, কৃতী ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী বা মজুর, বাহ্যকর্ম্মে যে যাই করুন না কেন স্থকৃতি ফলোন্মুখ সময়ে মনের ভিতর পুণ্যপ্রবাহ থাকিবে। এসব পুণ্যপ্রবাহ বিষ্ণুকেন্দ্র হইতে প্রবাহিত হয়।

কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালনসহ অস্থরবিরোধী মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে, নিত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপাসনা করিতে হইবে এবং যুক্তিবাদ অনুসরণ করিতে

হইবে, ইহাই সৎকর্ম্ম। অপুষ্ট লক্ষণ ও আসুরিক লক্ষণ দুষ্কর্ম্মের লক্ষণ। প্রারব্ধ ভাল থাকিলে ইহাদেরও সুখ, সুবিধা ও সৌভাগ্য হয়, কিন্তু এসব লোক যদি কোন পুণ্যাত্মার উপর অত্যাচার করে, এবং সেই পুণ্যাত্মা যদি মনে ব্যথা নেন, তবে ইহার ফলে একটা দুষ্কৃতকারীর প্রারব্ধ যতই ভাল হউক না কেন, দুষ্কর্ম্মের ফল ফলোন্মুখ হইবেই।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যামূলক কার্য্যও সৎকর্ম্ম। পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়া পবিত্র ভাবে আহার দানই 'যজ্ঞ'। অগ্নিতে যথাবিধি আহুতিদানও যজ্ঞ। যজ্ঞের ফলে সুখ হয়। কাউকে কিছু দেওয়ার নাম 'দান'। যাঁহারা অত্যন্ত তৃপ্ত প্রকৃতির যোগী এবং যাঁহারা যাহা পান তাহাতেই তৃপ্ত, এমন লোককে দান করিলে দানের ফল ভালো হয়। দান পাইয়া যাহাদের অতৃপ্তি বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে দান করিলে দানের ফল কম হয়। দানের ফলে প্রাপ্তি হয়। সাধন, স্বাধ্যায়, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, যোগ, পূজাদি, গুরুসেবা, গুরুজনের সেবা, এসব তপস্যা। তপস্যার ফলে জ্ঞান হয়। এমন অনেকে আছেন, যাঁহার সুন্দর গুছানো বাড়ী, কোন অভাব নাই। কিন্তু বাড়ী যাইয়া দেখো; স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কাহারও সঙ্গেই তাঁহার 'সুখসম্বন্ধই' নাই। বাড়ীতে নিত্য ভালো রান্নাও হয়; কিন্তু সে ভদ্রলোক অশান্তির চাপে কোনও প্রকারে বাড়ীর এক কোণে খিচুড়ি রান্না করিয়া আহার করেন। নিজেই উপার্জ্জন করিয়াছেন, নিজেই সব করিয়াছেন, নিজেই সব গড়িয়াছেন, কিন্তু ভাগ্যে যেন শান্তি নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে তুমি স্পষ্ট বুঝিয়া লইবে - লোকটার দানকর্ম্ম ছিল, উহার ফল ফলোন্মুখও হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞ করেন নাই। কাজেই এত পাইয়াও সুখী হন নাই। সেই লোকটারই সঙ্গ কর, দেখিতে পাইবে সংসারের চাপে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, কিন্তু সংসারের মোহ ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবারও শক্তি নাই। ইহাতে এখন তুমি স্পষ্ট স্থির করিয়া লও যে লোকটার তপস্যাও নাই।

এবার একজন লোককে ধর, হয় তো নামে সাধু। কিন্তু সাধুতাও নাই, ত্যাগও নাই। প্রচুর ধন, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, অনেক ভক্ত ও শিষ্য। তুমি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, লোকটা শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম বা বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম কিছুই জানেন না। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গোপাল, রাখাল, যাহা হউক একটা দীক্ষাও দেন। বড় বড় ধনীর দান ও বিদ্বানের সেবায় তিনি সুখী। যে কোন বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ লোক তাঁহার সঙ্গ করিয়া কখনও জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করেন না। তবুও সুখ ও প্রাপ্তির অভাব নাই। এখানে বুঝিতে হইবে দান ও যজ্ঞ আছে বা দানের ফল ও যজ্ঞের ফল ফলোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু লোকটার 'তপস্যা' নাই। যাঁহারা লোক চরাইয়া খান, যাঁহারা নেতৃত্ব করেন ও শত শত সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহারা নিজেদের দানের প্রভাবেই এসব কার্য্য করেন। এখানেও নীতি, অনীতি, সত্য বা অসত্যের প্রশ্ন নাই; হয়ত লোকটা একটা রাষ্ট্রের নায়ক। তাঁহার মূর্খতায় রাষ্ট্র ডুবিতে বসিয়াছে। সকলেই নিন্দা করে, কিন্তু ভোট দেবার সময় ঐ মূর্খটাকেই দেয়। লোকটার তপস্যা নাই, তাই বুদ্ধি মার্জিত ও দূরদর্শী হয় নাই। কিন্তু দান ও যজ্ঞের ফল ফলোন্মুখ হইয়াছে।

সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ কর্ম্ম

আমরা পূর্ব্বে বহু স্থানে বলিয়াছি যে বিষ্ণুকেন্দ্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সব কর্ম্ম, সব সংস্কারই সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত কর্ম্ম ফল প্রাকৃতিক নিয়মে সর্ব্বদাই ফলোন্মুখ হইতে চেষ্টা করে। যাঁহারা সঞ্চিত কর্ম্মফল ফলোন্মুখ করিতে পারেন না, তাঁহারা যতই ভাল প্রারব্ধবান পুরুষ হউন না, সঞ্চিত কুকর্ম্ম হইতে দুষ্কৃতি ফলোন্মুখ হইবেই। আমরা অত্যন্ত বর্ব্বর, শোষক ও দুষ্ট প্রকৃতির ভাগ্যবানের সঙ্গ করিয়াও দেখিয়াছি, গোপনে এমন সব কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান করেন, যাহাতে সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে সুকৃতিগুলি ফলোন্মুখ হইতে পারে। একটা আন্দোলনে বহু বুদ্ধিমান কর্ম্মী ভাগ লয়, কিন্তু আন্দোলনের ফলভোগের সময় দেখা যায়, অনেক ভাল কর্ম্মীরাই দুর্ভাগার দলে পড়িয়া রহিয়াছেন এবং কয়েকটা ভাগ্যবান দুষ্টই রাজ্য করিতেছেন। এখানে একই কর্ম্ম, কিন্তু ফল বিভিন্ন হইবার কি কারণ হইতে পারে? কাজেই দেখা যায়, বর্ত্তমান কর্ম্ম ও কর্ম্মফলই সব নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের জোর না পাইলে কেহই সুখ ও প্রাপ্তির আশা করিতে পারে না।

সর্ব্বদাই সঞ্চিত কর্ম্মভাণ্ডার হইতে কর্ম্মফল জাগ্রত হইতে চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা "কনসাস্ ও সাব-কনসাস্" এর রহস্য বুঝিতে পারেন, তাঁহারা কর্ম্মফল কি ভাবে জাগ্রত হয়, এবং পুনঃ মিলাইয়া যায়, ইহার কতকটা আভাষ বুঝিতে পারিবেন। এক দিকে বিষ্ণুস্তরে (চিত্ত ক্ষেত্রে) কর্ম্মফলগুলি জাগ্রত হইতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে। যে সব কর্ম্ম ও কর্ম্মফল জাগ্রত কালে মানুষের মৃত্যু হয়, উহাই সেই মানবের প্রারব্ধ। মৃত্যুকালে কাহার কোন কর্ম্মফল জাগিবে, কেহই জানে না।

চুরি করা কালে চুরির ফল, গুণ্ডামী ও বর্ব্বরতা করা কালে গুণ্ডামীর ফল, দানকালে দানের ফল, যজ্ঞকালে যজ্ঞফল, তপস্যা কালে তপস্যার ফলগুলি আমাদিগকে শক্তি দিতে থাকে। এজন্য যাহারা চোর তাহারা ক্রমে বেশী ভাল চোর হইতে থাকে। ইহার কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব চৌর্য্যফল তাহাদিগকে ভাল চোর করিয়া দিতে সাহায্য করে। যাহারা চোর ও গুণ্ডা তাহাদের কর্ত্তব্য উচ্চস্তরের সৎ লোককে পীড়নের পথ পরিহার করিয়া চলিতে থাকা, ফলে এসব দুষ্কৃতির ফলে প্রতিশোধ ফল শীঘ্র জাগ্রত হইতে পারিবে না। একটা সমাজ যখন শেয়াল কুকুরের মতন অধঃপতিত হয়, বা মূর্খ ও দুর্ব্বল হয়, তখন আসুরিক ও অপুষ্টগণের গুণ্ডামীর প্রতিশোধ আসিতে অনেক বিলম্ব হয়। যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহাদের কথা কেহই শুনে না। যখন দেখা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র অধর্মে ডুবিয়া গিয়াছে এবং রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই স্বার্থ, চৌর্য্য ও দুষ্কৃতিকেই ধর্ম্ম মানিয়া লইয়াছে, তখন সজ্জনরাও খুব সাবধানে জীবন যাপন করেন এবং পাপী প্রজাদের কোন কার্য্যে সহযোগ রাখেন না। তাঁহারা ভালভাবেই বুঝিয়া রাখেন, পাপে সমাজ ও রাষ্ট্র ডুবিয়া গিয়াছে, ইহার কুফলও আসিতেছে। তাঁহারা অধঃপতিত সমাজ ও পাপী রাজাকে অত্যন্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন।

ক্রিয়মান কর্ম্ম। যে কর্ম্ম এখন চলিতেছে উহার নাম ক্রিয়মান কর্ম্ম। ইহাতে কিছুটা প্রারব্ধ অংশ থাকে, কিছুটা পারিপার্শ্বিক কর্ম্ম থাকে। বাহ্য সুখ দুঃখের চাপে আমি কিছু

আশা হয় তো করিলাম; সে ভাবে কিছু কাজ আরম্ভও করিলাম, ইহা আমার ক্রিয়মান কর্ম্ম। এই কর্ম্মের ফলে আমার কোনই লাভ হইল না, কেবল পরিশ্রমই করিলাম। বুঝিতে হইবে, প্রারব্ধ অনুকূল নহে এবং সঞ্চিত সৎ কর্ম্মও ফলোন্মুখ হয় নাই। কুষ্ঠির ফল দেখিয়া বুঝা যায়, কোন্ কোন্ সময় ভাল প্রারব্ধ ফল দিবে। কোন ক্রিয়মান কর্ম্মই ভাল ফল দিবে না, যদি ভাল প্রারব্ধের ফল সম্মুখবর্ত্তী না হয়। ভাল প্রারব্ধের সময় না আসিলে কোন ক্রিয়মান কর্ম্মই ভাল ফল দিতে পারে না। যজ্ঞ, পূজা, মহাপুরুষের সেবা কোনটাই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোন্মুখ করিবে না, যদি প্রারব্ধের বেগ ভাল না থাকে। শুধু প্রারব্ধ, শুধু সঞ্চিত এবং শুধু ক্রিয়মান জীবনকে সুখী করিতে পারে না, যদি তিনের সামঞ্জস্য না হয়।

সঞ্চিত কর্ম্ম। আমরা যাহা কিছু করি, উহারই ফল সঞ্চিত ভাণ্ডারে জমা থাকে। মহাদুষ্কৃতিকারী মানুষও জ্ঞানী হইলে সঞ্চিত দুষ্কৃতির ফলকে স্তব্ধ করিয়া সঞ্চিত সুকৃতিকে ফলোন্মুখ করিয়া নিজের কৃত দুষ্কৃতির ফলকে স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনে কখনও সঞ্চিত দুষ্কৃতির ফল ফলোন্মুখ হয় না। তাঁহার প্রারব্ধফলে দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনা থাকিলে উহা ভোগের সঙ্গে তিনি অনেক সঞ্চিত সুকৃতিকে জাগ্রত করিয়া ভাল ভাবেই জীবন কাটাইয়া যাইবেন।

প্রারব্ধ কর্ম্মে জাতি, আয়ু ও ভোগ

মৃত্যুকালের চিন্তাধারা বিচার করিলে পরজন্মের* জাতি, আয়ু ও ভোগ বুঝা যায়। আবার এ জন্মের যে কোন মানুষের প্রকৃতি বুঝিলে প্রারব্ধগত জাতি বুঝা যায়। আয়ু এবং ভোগের কিছু কিছু সঠিক অংশ আমরা কুষ্ঠিবিচারে নির্ণয় করিতে পারি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র আবাল্য তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিদ্ধ অবস্থায়ও তাঁহার তেজস্বিতা ও ঈশ্বর-স্বভাব যায় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের মৃত্যুকালে যেরূপ কর্ম্মফলকে প্রারব্ধ করিয়া ছিলেন, উহা সত্ত্বরাজসস্তরের ছিল। এখন বশিষ্ঠদেব ও বুদ্ধের কথা ধরা যাক। এই দুইজন মহাপুরুষ আজীবন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ও শান্ত ছিলেন। জ্ঞানের বিচারে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ হইতে কম ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতিতে একজন রাজস্ এবং অন্য জন সাত্ত্বিক। অসীম ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন মহাবীর হনুমানের কথা ভাবুন। এই মহাপুরুষ আজন্ম দাসভাবাপন্ন ছিলেন। ইনিও মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু ইঁহার প্রকৃতি প্রারব্ধগত ভাবে শূদ্র ভাবাপন্ন ছিল।

আমি জগতের অজ্ঞানমূলক দুঃখ ও দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া উহার প্রতিকার উপযোগী উপায় ভাবিতে ছিলাম, এমন সময় কেহ আমার শিরচ্ছেদন করিল, এইরূপ পরিস্থিতিতে আমার প্রারব্ধ আমাকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া জন্ম দিবে।

আমি জগতের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেছিলাম এবং যাহারা এই সব দুঃখ দুর্দ্দশার স্রষ্টা সেই সব অসুর, গুণ্ডা, বর্ব্বর ও ধাপ্পাবাজদের কি ভাবে প্রতিশোধ দিয়া জগৎকে আবার সুখের স্থান করা যায় এজন্য ভাবিতেছিলাম। এমন সময় আমার মৃত্যু হইল। ফলে আমার আগামী জন্মটার জন্য ক্ষত্রিয় জাতীয় প্রারব্ধ হইল।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''পূর্ব্বজন্মের'' শব্দটির স্থানে ''পরজন্মের'' শব্দটি গৃহীত হল।

আমি কি করিয়া জগতে মহাপুরুষ বলিয়া পূজ্য হইব, কি ভাবে একটা জাতিকে একটা বর্ব্বর সভ্যতার পদানত করিব, কি ভাবে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইয়া একটা উচ্চ সভ্যতাকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিব এবং নিছক ভণ্ডামীর আবরণে জগৎ পূজ্য হইব; কি ভাবে চোর, শোষক, অসুর এবং বর্ব্বরগণকে বড় করিব এবং জনতাকে ফাঁকি দিয়া দুই দিকেই মহাপুরুষ হইব, এইরূপ ফন্দি ভাবিতেছি এবং ধর্ম্মের সং চালাইতেছি, এমন সময় কোন বীরের অস্ত্রে আমার মৃত্যু হইল। ফলে আমি একজন বৈশ্য ভাবাপন্ন অসুরের প্রারব্ধ লইয়া মৃত্যু বরণ করিলাম। ফলে আমি পরজন্মে একজন বৈশ্য ও ভণ্ড সাধুর মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিব।

প্রারব্ধগত জাতি মোট পাঁচ প্রকার। (১) ব্রাহ্মণ বা সাত্ত্বিক প্রকৃতি, (২) সত্ত্বরাজস্ প্রকৃতি ক্ষত্রিয়, (৩) রজোতামস্ প্রকৃতি বৈশ্য, (৪) তামস্ প্রকৃতি শূদ্র, (৫) তমঃ প্রধান রাজস প্রকৃতি অসুর, বর্ব্বর, শোষক, ভণ্ড ও ধাপ্পাবাজ প্রকৃতি। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছি, এসব জন্মগত প্রকৃতি কাহারও বদলায় না। (১) (২) (৩) ও (৪)র্থ প্রকৃতিগুলি জ্ঞান, যোগ ও তপস্যা দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষ হইতে পারেন। (৫)ম প্রকৃতিগুলি তপস্যা ও সাধনা দ্বারা ভোগশক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন; কিন্তু জ্ঞানসিদ্ধি পাইতে পারেন না। মৃত্যু ভিন্ন এসব প্রারব্ধগত প্রকৃতির কোনটাই বদলায় না।

প্রারব্ধের তিনটি শাখার মধ্যে আমরা 'জাতি' বুঝিলাম; আয়ু ও ভোগ বুঝিতে হইবে। মৃত্যুকালের প্রকৃতির সঙ্গে আরও সব চিন্তাধারা থাকে। উহাতে ঐ প্রকৃতির অনুকূলে বহু কর্ম্মফল জাগ্রত হইতে থাকে। আমার একখানা বাড়ী করিবার ইচ্ছা হইল। ইহাতে টাকা, সিমেণ্ট, ইট, বালি, কাঠ, পেরেক, চুনা, মিস্ত্রী, মজুর, ও স্থানের সংগঠন করিতে হইবে। বাড়ী করিবার ইচ্ছা ও ক্রিয়া আরম্ভ হইলে দেখা যাইবে, আমি সবই জমাইয়া ফেলিয়াছি। ঠিক এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও অসুরত্ব জাতির প্রেরণার সঙ্গে ভোগের উপাদানগুলিও সঞ্চিত কর্ম্মভাণ্ডার হইতে ফলোন্মুখ হইয়া যায়। এই জাগ্রত কর্ম্মফল সুপ্ত বা সাবকন্‌শাসে যাইবার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হইল, এজন্য ইহাই আমার প্রারব্ধ। চিরজীবন দুষ্কার্য্য করিলাম, কিন্তু মৃত্যুকালটার চিন্তাধারা ভাল হইল। ইহার ফলে আমার ভাল প্রারব্ধই হইবে। যাঁহারা জ্ঞানী হইয়া যান, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে কেবল সুকৃতিগুলিই ফলোন্মুখ হয়। এজন্য তাঁহাদের আর দুঃখ হয় না। মৃত্যুকালে যে সব কর্ম্মফল জাগ্রত হয়, সে সব কর্মের ফল ভোগ করিবার আমার সময়ের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় সময়ের নাম 'আয়ু'। যাঁহারা উন্নতস্তরের যোগী, তাঁহারা ধীরে ধীরে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া আয়ুবৃদ্ধি করিতে পারেন। একটা "টর্চলাইটে" যে ব্যাটারীটা লাগানো থাকে, উহার আয়ু ৬, ৭ ঘণ্টা। কিন্তু আমরা একজোড়া ব্যাটারীকে ৯ মাসও ব্যবহার করিতে পারি, যদি আমরা সাবধানে উহার ব্যয় কম করিতে পারি। প্রারব্ধের জাতি, আয়ু ও ভোগই আমাদের জীবনের সব নহে; বরং আমাদের জীবনের উহা একটা অংশ। আমাদের জীবনে সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মের প্রভাবই বেশী। প্রারব্ধের সঙ্গে সঞ্চিত কর্ম্ম জাগ্রত করিয়া আমরা কি ভাবে বেশী সুখী হইতে পারি এ বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যে সব দুর্ব্বল কর্ম্মের ফলে অসুর শক্তি ও বর্ব্বর শক্তি প্রশ্রয় পায়, এইরূপ কর্ম্ম দুষ্কর্ম্মের তুল্য ফল দেয়। যাহারা জানিয়া বুঝিয়া দুর্ব্বলস্তরের কর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রশংসা করে, তাহারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের ধাপ্পাবাজ।

কর্ম্মে বিশ্বকল্যাণ

বিশ্ব-কল্যাণ-কল্পে পৃথিবীতে অনেক প্রকার সমাজবাদ দেখা দিয়াছে। ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম্, এসব জনতাকে লোভ দেখাইয়া ধাপ্পা দিয়া দলবদ্ধভাবে কতকগুলি অসুর প্রকৃতির লোকের গদীতে বসিবার চাল মাত্র। ইসলাম, আল্লাহ্‌র নাম করিয়া কাফেরের ধন ও রাজ্য লুট করা ও সতীকে অপমানিত করা মাত্র। দুর্ব্বলস্তরের কর্ম্মবিজ্ঞান দাঁড় করাইয়া যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মের আড়ালে অসুর ও বর্ব্বর তোষণ করেন, তাঁহাদের কর্ম্মও অসুরকর্ম্মমাত্র। বিশ্ব যখন অসুরবাদে ছাইয়া যায় এবং দুর্ব্বলবাদে সমাজ জড়াইয়া যায়, সে সময় তুমি অন্নের জন্য যে কোন মতবাদীর সেবা করিতে পার; কিন্তু শক্তিবাদ, অসুরবাদ, ও দুর্ব্বলবাদ বুঝিয়া চলিবে এবং বলিবে। ফলে, তোমার কর্ম্ম উচ্চ হইবে এবং উহা সুকৃতির ফলোন্মুখ হইবার অনুকূলও হইবে। আমার হাতে সংগঠন ও রাষ্ট্রক্ষমতা থাকিলে আমি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রচার করিতে পারি, দেবতাকে অসুর ও অসুরকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়া সমাজের চিন্তাশক্তি বিষাক্ত করিতে পারি; কিন্তু আমরা বলিতে পারি, ইহার ফলে আমার রাষ্ট্র, জাতি ও ব্যক্তিগত ধ্বংস নিকটস্থ হয় মাত্র। মহারাজ যুধিষ্ঠির অসুরবাদকে ভ্রাতৃত্বের আড়ালে প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের দুষ্কৃতি ফলোন্মুখ করাইয়াছিলেন; সতী স্ত্রীকে অপমান করাইয়া ছিলেন এবং নিজেদের জন্য বহু দুঃখের কারণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার চক্ষু ফুটিল তখন তিনি শক্তিবাদীয় নীতি গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু ভারতের বুকে ভীষণ সর্বনাশ হইয়া গেল। কারণ, অসুর তখন অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। কর্ম্মের গতি দ্বারা একজন ব্যক্তি, একটা সমাজ ও একটা রাষ্ট্র কি ভাবে ধ্বংস হয় এবং কিভাবে মহান হয়, ইহা এক রহস্যজনক ঘটনা। ভারতের ঋষি ইহার বিশুদ্ধ মীমাংসা করিয়াছেন। শক্তিবাদ-বিজ্ঞানে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নিত্যকার জীবন ও নিত্য কর্ম্ম ধারা পরিচালিত করিবে। নৈমিত্তিক যজ্ঞ ও দানাদিও ঐ বিজ্ঞানে সম্পন্ন করিবে এবং অসুর কর্ম্মী ও দুর্ব্বল কর্ম্মিগণকে সাহায্য বা দান দিবে না, ইহার ফলে তুমি মহান হইতে পারিবে।

বিশ্বকল্যাণকল্পে যে সব মতবাদ পৃথিবীতে আসিয়াছে সে সব কর্ম্মেরই ফল আছে। বেদ শক্তিবাদীয় কর্মকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বকল্যাণকর বলিয়াছেন। ইহাতে অসুরবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং যুক্তিপূর্ণ লক্ষণ দেওয়া আছে। মানুষের বিদ্বেষ ঐ অন্যায় ও অসুরবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়া জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ ও চরিত্রবান হইতে বলা হইয়াছে। বিদ্বেষকে ভিত্তি না করিয়া কিছুতেই সঙ্ঘগড়া যায় না, এ কথা পাঠকগণ মনে রাখিবেন। যাহা বিকাশবিরুদ্ধ, যাহা জ্ঞানবিরুদ্ধ এবং যাহা আসুরিক, তাহাকে বিদ্বেষ কর এবং এই ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হও। ইহাই শক্তিবাদ বা বেদবাদ। জন্মগত ভাবে কতকগুলি লোককে উচ্চ ও কতকগুলি লোককে হীন মনে কর এবং এই ভাবে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হও; ইহার নাম পৌরোহিত্যবাদ। আল্লাহ নামক এক বিচিত্র

পিশাচকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাও, তাঁহাকে মানো, তাঁহার উপাসনা কর। যাহারা ইহা মানে না, তাহাদের সঙ্গে বিদ্বেষ কর এবং তাহাদের ধন, জীবন, নারী ও ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া রাজ্য কর। ইহার নাম ইসলামবাদ। যাহার জমি ও ধন আছে, যে অনেক বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা কিছু বাড়ী ও কর্ম্মবিধান গড়িয়া একটু ভাল ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাকে বুর্জ্জুয়া নাম দাও। এবং যত মজুর, কৃষক ও বেকার লোক আছে, তাহাদের শিক্ষা দাও যে ওদের মারিয়া ফেল, তাহাতে তোমাদের সুখ ও কল্যাণ অবস্থিত। এ ভাবে বিদ্বেষ করিয়া দল গড় ও নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে গদিতে বসাও ও দলের বহু লোককে ঐ সব হৃতবিত্তের কর্ত্তৃত্বে বসাইয়া দাও। নিত্য নূতন প্ল্যানিং কর, বিত্তশালীকে বিত্তহীন কর। পাপ, পুণ্য, অপরাধ, নিরপরাধ বিচারের আর প্রয়োজন নাই। যে কোন ভাবে দল পোষণ কর। সত্য, ধর্ম্ম ও লজ্জার মাথা খাইয়া টাকা জমাও। যাহাতে আর কেহ বিরোধ করিবার লোক না থাকে, এজন্য সব বুর্জ্জুয়া ও দলের অতৃপ্তদের ‘‘ষ্টেটের শত্রু’’ নাম দিয়া শিরচ্ছেদ কর; ইহার নাম ‘‘কম্যুনিজম’’।

আমাদের দেশের কংগ্রেসবাদীরা হিন্দুবিদ্বেষের এক অপূর্ব্বনীতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং হিন্দু বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়াছে বলিয়া ইহারা বহুদিন রাজত্ব করিতে পারিবে আশা করে। যাহারা কলিকাতা ও নোয়াখালীর বর্ব্বরতা করিল ও দেশভাগ করিল তাহাদের বর্ত্তমান বা অতীতের দুষ্কৃতি সম্বন্ধে কোন কথা বলা ‘‘সাম্প্রদায়িকতা’’। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যাহাতে আর কোন দিন দাঁড়াইতে না পারে এজন্য কংগ্রেসীরা ইতিমধ্যে রাজাদের উচ্ছেদ করিয়াছেন, জমিদার দিগকেও উচ্ছেদ করিয়াছেন। আমরা সব মতবাদীগণকেই বলি, শক্তিবাদ ভিন্ন যে কোন মতবাদই চালাও না কেন, উহার ফলে সমাজে ও দৈবজগতে প্রতিক্রিয়া হইবে এবং এজন্য সমাজকে বহু দুঃখ ও বহু দুর্দশা সহ্য করিতে হইবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মিথ্যা, ছলনা ও দুষ্কৃতিতে দেশ ছাইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত দুষ্কার্য্য মানুষ জন্মান্তরে ভোগ করে, কিন্তু সমাজগত ভুলের প্রতিফল মানুষ এখানেই ভোগ করে। বিশ্বকল্যাণের ভুল পথ লওয়া মারাত্মক। জানিয়া রাখিবে, কোন সংগঠনই বিদ্বেষ ভিন্ন চলে না। কাজেই বেদ যে অসুরবিদ্বেষ ও সংগঠন বিধান বলিয়াছেন, উহাই বিজ্ঞানসম্মত ও উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকল্যাণবাদ। বিস্তারিত ‘‘শক্তিশালী সমাজে’’ দেখ। বিকাশবাদীরা উহাই আঁকড়াইয়া ধরিবে। ফলে নিজের ও বিশ্বের কল্যাণ হইবে।

সৃষ্টির বিবর্ত্তন ক্রম

কি পথে একটি জীব বিকশিত হইয়া পুরুষোত্তম স্তরে আসে, উহার ক্রম আমরা দেখাইয়াছি। এই শেষ স্তরই ‘‘হরি ওঁ’’। ইনি সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত জীব, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত জগতের উপাদান স্বরূপ। ইঁহাকে আমরা ‘‘চিদ্ অণু’’ নাম দিয়াছিলাম। ইঁহাকে আমরা কেবল চিদ্অণুই বলি নাই, ইঁহাকে আমরা ‘সৎকণা’ও নাম দিয়া ছিলাম। কণাটি গতিশীল এজন্য ইনি ‘দৃশ্য কণা’ বা জড়। এ জন্য ইনি ‘‘সৎকণা’’। কণাটির গতিবেগ কমিয়া যায় এবং তখন স্পষ্ট বুঝা যায়, ইনিই দ্রষ্টা বা চেতনা। কিন্তু তিনি দৃশ্য বা দ্রষ্টা

কিছুই নহেন - যদি কণাটি একেবারে গতিহীন হন বলিয়া মানা যায়। ‘‘তিনি একেবারে গতিহীন হন, কি হন না’’ প্রশ্নে এখন জড়িত হইবার প্রয়োজন নাই।

অষ্ট শক্তির আটটি কণাই আটটি জগৎ - (১) অব্যক্ত জগৎ ঃ, (২) মহৎ জগৎ ঁ, (৩) শান্তি জগৎ উ, (৪) বিজ্ঞান জগৎ ই, (৫) সুখ জগৎ ও, (৬) ইচ্ছা জগৎ অ, (৭) কর্ম্ম জগৎ ঋ, (৮) প্রাণজগৎ ৯।

শক্তিস্তরের উপাদানভূত আটটি শক্তি আটটি জগৎ। আটটি শক্তিই যেমন অনাদি ঠিক তেমনই এই আটটি জগৎও অনাদি। বুঝিবার জন্য এবার আটটি রশ্মি সংযুক্ত একটি তারকা কল্পনা করুন। ইনিই পরমপুরুষ বা ‘‘হরি ওঁ’’, ইনিই সর্বশক্তি, সব জগৎ ও সব জীব এবং সৃষ্টিস্থিতিলয় স্বরূপ। ইনি সৎকণা বা চিদ্ অণু। ইঁহার মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টি বিদ্যমান।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি - ঃ অব্যক্ত শক্তি (১), ঁ - জ্ঞান শক্তি (২), উ - শান্তি শক্তি (৩), ই - বিজ্ঞান শক্তি (৪), ও - সুখশক্তি (৫), অ - ইচ্ছাশক্তি (৬), ঋ - কর্মশক্তি (৭), ৯ - প্রাণশক্তি (৮)। এখন আমরা বলিতেছি - ঃ অব্যক্ত জগৎ (১)। ঁ জ্ঞান জগৎ (২)। উ - শান্তি জগৎ (৩)। ই - বিজ্ঞান জগৎ (৪)। ও - সুখ জগৎ (৫)। অ - লীলা জগৎ (৬)। ঋ - কর্ম্ম জগৎ (৭)। ৯ - প্রাণ জগৎ (৮)।

এই আটটি শক্তি এবং আটটি জগৎ অনাদি। এবং ইহারা সকলেই একই চিদ্ অণুর অন্তর্গত। এই অনাদি শক্তি কণা, যাহা ৮টি মূল শক্তির সমষ্টি এবং যাহা আটটি অনাদি জগতের সমষ্টি, ইহা গতি সম্পন্ন, এজন্য ইহার নাম ‘সৎকণা’। এই অনাদি শক্তি গতিহীন হইবার মত অবস্থায় আসিলে বুঝা যায়, ইনি দৃশ্য নহেন, এবং ইনি স্বয়ংই দ্রষ্টা বা চেতনা। এজন্য ইনি চিদ্ অণু। ‘‘সদ্‌কণা’’ স্বরূপ অনাদি শক্তি কখনও দ্রষ্টা এবং কখনও দৃশ্য। এই জন্যই ব্রহ্ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে ‘‘সচ্চিদেকংব্রহ্ম’’ অর্থাৎ ‘সৎ ও চিৎ’ অথবা ‘জড় ও চেতনা’ একই ব্রহ্ম।

আটটি কণা বা আটটি জগৎ একক থাকা কালে ইহারা কখনও দ্রষ্টা হন না। ইহারা সদাই দৃশ্যকণা। পুরুষোত্তম কণা একাধারে দৃশ্য ও দ্রষ্টা অর্থাৎ জড় ও চেতনা; কিন্তু সপ্ত শক্তি বা অষ্ট শক্তি সব সময়ই দৃশ্য বা জড়। ইঁহারা কখনও দ্রষ্টা হন না। ইহারা সব সময়ই দৃশ্য।

পুরুষোত্তমকণা একাধারে দৃশ্য ও দ্রষ্টা। অষ্ট বা সপ্ত শক্তিকণা একাধারে এক একটি শক্তি ও এক একটি জগৎ। এবং ইহারা সব অবস্থায়ই দৃশ্য। একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

সৃষ্টির মূলীভূত অনাদি ও অব্যয় অংশ বুঝানো হইল। এবার সৃষ্টির ‘‘বিকৃতি অংশকে’’ বুঝানো যাইতেছে। বিকৃতির এক অংশ জীবকণা এবং অন্য অংশ জড়কণা। এই জীব ও জড়কণাগুলি মূল প্রকৃতির ৭টি বা আটটি জগতে যায় ও নানারূপে বিবর্ত্তিত হয়। ইহারা একবার জ্ঞানজগৎ হইতে প্রাণজগতে নানারূপে রূপান্তরিত হয় এবং প্রাণ হইতে পুনঃ অব্যক্ত পর্য্যন্ত বিপরীত পথে রূপান্তরিত হয়। বিকৃতির এই উভয় প্রকার গতিই সৃষ্টি।

মহৎ তত্ত্বের উপাদানে অ + ৺ = অং, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি + জ্ঞান = মহৎতত্ত্ব। এই মহতের বিপরীত দিকে অব্যক্ত থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টির অংশ বা বিকৃতিঅংশের মূল আধার অব্যক্ত বা ‘ ঃ’। ইহার আধারে মহৎ = অ + ৺ = অং মিলিত অবস্থায় অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে আমরা ধ্বনিসৃষ্টির বিজ্ঞান বলিয়া ছিলাম। সেখানে ক্ষরপুরুষ ও অক্ষর পুরুষের স্তর হইতে সৃষ্টি টানা হইয়াছিল। সেখানে পঞ্চতন্মাত্রা সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল। সেখানে পাদটীকায় ইহাও বলিয়া রাখা ছিল যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি তন্মাত্রার উপাদান ভূত হং, যং, রং, বং, এবং লং কে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে “ইহারা ঃ, ই, ঋ, উ এবং ৯ এরই পরিণতি”। ৭ম অধ্যায়ে আমরা সৃষ্টিটা অক্ষর পুরুষের স্তর হইতে টানিয়া ছিলাম। এখানে আমরা সৃষ্টিটা সোজা পুরুষোত্তম স্তর হইতে দেখিতেছি। এইরূপ দেখিলেই সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ মীমাংসা হয়। সোজা পুরুষোত্তম স্তর হইতে দেখিলেই সৃষ্টিতত্ত্ব ঠিকঠিক বিশ্লেষিত হয়।

মহত্তত্ত্বে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হন। ইহাই জীববীজ। মহত্তত্ত্বে অব্যক্ত শক্তি (ঃ), বিজ্ঞান শক্তি (ই), কর্ম্মশক্তি (ঋ), শান্তিশক্তি (উ), প্রাণশক্তি (৯), আবর্ত্তিত হয়। ইহারাই পঞ্চ তন্মাত্রার ধ্বনিময় রূপ। যতক্ষণ ইহারা মহৎস্তরে থাকে ততক্ষণ ইহাদিগকে ভাগ করা যায় না। এবং ততক্ষণ ইহারা একই জ্ঞানরূপে অবস্থান করে। আমরা ইহাদিগকে এস্তরে জ্ঞান তন্মাত্রা নাম দিলাম।

জীব বীজগুলি ১ হইতে ৭॥০ কলা পর্য্যন্ত বিকশিত। এই ১ হইতে ৭॥০ কলা বিকাশের মধ্যে কোটি স্তরের জীববীজ বিদ্যমান। এই সব জীববীজ মহতে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান জগতে আসিয়া ইহারা বিভক্ত হয়। শান্তি জগতে রক্ষিত হয়। সুখ জগতে আসিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগের উপযুক্ত হয় এবং বিন্দুরূপ ত্যাগ করিয়া রেখা রূপ হয়। সুখ জগতে সব বীজ আসে না। কিছু কিছু বীজ আসে মাত্র। লীলাজগতে আসিয়া ইহারা নানা প্রকার রূপ লাভ করে। সব বীজ লীলাজগতে আসে না। বরং খুব কম বীজই লীলাজগতে আসে। বেশীরভাগ বীজই শান্তি জগৎ হইতে সোজা স্থূল জগতে (প্রাণ জগতে) চলিয়া আসে। কোন কোন বীজ মৈথুনিক সৃষ্টি বা অন্য কোন বিজ্ঞানে সৃষ্টির নিয়মে স্থূলে চলিয়া আসে। আসিবার পথে বীজগুলি মিথুন সুখ ও মিথুন ক্রিয়ার মধ্য দিয়া বা অন্য যে কোন প্রাকৃতিক সুখ ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া আসিবার দরুণ বীজগুলিতে সুখ (ও) এবং কর্ম্মশক্তি (ঋ) প্রতিফলিত হয় (স্ত্রী-পুং মিথুনের সুখ ও সুখজগতের সুখ একই কথা)। ইহারা কর্ম্ম (ঋ) জগতে আসিলে মন লাভ করে এবং কর্ম্মী হয়। বীজগুলি প্রাণ জগতে আসিলে স্থূল শরীর লাভ করে।

জীববীজ মহৎ হইতে প্রাণজগতে আসিবার মত, জ্ঞান তন্মাত্রাগুলিও ধীরে ধীরে বিভিন্ন জগতে নামিয়া আসে। অর্থাৎ ধ্বনি (৺) জগৎ হইতে বিজ্ঞান (ই) জগতে আসে, পরে শান্তি (উ) জগতে আসে। যখন ইহারা বিজ্ঞান জগতে আসে তখন ইহারা ৫ ভাগে বিভক্ত হয়। যখন ইহারা শান্তি জগতে আসে তখন ইহারা স্থির হয়। এ স্তরেই ইহাদিগকে পঞ্চ তন্মাত্রা বলা হয়, সুখ (ও) জগতে আসিলে পঞ্চমহাভূত হয়। কর্ম্ম জগতে (ঋ) আসিলে জীবের কর্ম্মের উপযুক্ত হয়। প্রাণ (৯) জগতে আসিলে ইহারা পঞ্চীকৃত মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ (শব্দ) হয়। জীব বীজগুলি ও

জ্ঞানতন্মাত্রাগুলি একবার মহৎস্তর হইতে স্থূলে আসে এবং স্থূল হইতে ধীরে ধীরে মহতে যায়। ইহাই সৃষ্টি। যখন সমস্ত সৃষ্টি মহাপ্রলয়ে অব্যক্তে যায় তখন জীববীজগুলি মাত্র অব্যক্তে যায়, কিন্তু জ্ঞান তন্মাত্রাগুলি নিজ নিজ উপাদান মূলক বিভিন্ন শক্তির অঙ্গে চলিয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের এসব সূক্ষ্ম কথার বিশদ আলোচনা সাধারণ পাঠকের কোনই কাজে দিবে না। যাঁহারা উন্নত স্তরের সাধক ও দার্শনিক তাঁহাদের জন্য এইসব ইঙ্গিত যথেষ্ট। বিস্তারিত ক্রমবিকাশের ৫ম, ৭ম অধ্যায়ে দেখুন এবং ধর্ম্মশিক্ষায় দেখুন।

পুরুষোত্তম স্তরের একই তত্ত্বে 'চিৎ অণু' এবং 'সৎকণা'। ইহার পর সৎকণার অন্তর্গত সপ্ত 'শক্তিকণা'। এই সপ্তশক্তির অন্তর্গত সপ্তজগৎ। ইহাই সৃষ্টির আসল ও অটল উপাদান।

ইহার পর সৃষ্টি বিকৃতিস্তরের কথা অনুধাবন করুন। এখানে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি মিলিয়া 'মহৎ' সৃষ্ট হইবার পর পুরুষোত্তম (চিৎ অণু) প্রতিবিম্বিত হইয়া জীববীজ হয় এবং ৫টী মহাশক্তি বিবর্ত্তিত হইয়া জ্ঞান-তন্মাত্রা হয়। জ্ঞান-তন্মাত্রাই বিজ্ঞান জগতে ৫ ভাগ হয় এবং শান্তি জগতে ৫ তন্মাত্রা হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্রা সুখ জগতে আসিয়া পঞ্চ মহাভূত হয়, ইহারা কর্ম্ম জগতে (মনো জগতে) আসিয়া জগৎ সৃষ্টির উপাদানে পরিণত হয়। এই উপাদানভূত পঞ্চ মহাভূত প্রাণ জগতে আসিয়া স্থূল মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হয়। জীববীজগুলিও নানা জগতের মধ্য দিয়া প্রাণ জগতে (স্থূল জগতে) আসিলে শরীরধারী জীব হয়। জীবের আবাসস্থল পৃথিবী আদি বিশ্ব ঐ স্থূল পঞ্চভূতে প্রস্তুত হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বে শক্তিস্তর অনাদি। ইহাতে অন্তরনিহিত জ্ঞান, অব্যক্ত, বিজ্ঞান, শান্তি, সুখ, কর্ম্ম ও প্রাণ জগৎও অনাদি। সৃষ্টির 'বিকৃত' অংশ একবার স্থূলে (প্রাণ জগতে) আসে এবং অন্যবার অব্যক্তের দিকে যায়। ইহাকেই অক্ষর পুরুষ বলে।

শক্তিবাদীয় পুরুষ, শক্তিবাদীয় প্রকৃতি ও শক্তিবাদীয় বিকৃতির সব রহস্যই সংক্ষেপে বলা হইল।

এবার আমার প্রিয়তম গুরুদেবকে স্মরণ করি, তাঁহার চরণে প্রণত হই এবং ক্রমবিকাশ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করি।

ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ॥